

কিশোর জাতক সমগ্র

KISHORE JATAK SAMAGRA

This is a GRANTHIK publication
Edt: by Sudhanshu Ranjan Ghosh

Price: Rs:- 50-00 only

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মুদ্রণ বিশ্বরূপ ভৌমিক
ইম্প্রসিভ ইম্প্রেশন
প্রচ্ছদ মুদ্রণ স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং, কলকাতা-৯
বাঁধাই গোল্ডেন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস, কলকাতা-৯
আর্টপুল শ্রীজগদ্ধাত্রী প্রেস কলকাতা-৬
শ্রী শিশির বসু
শ্রী হীরেন পাল

কিশোর জাতক সমগ্র

গ্রন্থিক প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৮৫

1985

গ্রন্থিক

১এ কলেজ রো ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৯



গ্রন্থিকের পক্ষে শ্রীঅঞ্জন ভৌমিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং বিশ্বরূপ ভৌমিক কর্তৃক ইম্প্রেসিভ্ ইম্প্রেসণ্ হইতে মুদ্রিত



মূল্য ৫০ টাকা মাত্র

'কিশোর জাতক সমগ্রে'র রূপশিল্পীরা

সম্পাদনা : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

সম্পাদনা সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ
রূপায়ন ও পরিমার্জনা রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ ও জাতক
কাহিনীগুলির অলঙ্করণ গৌতম রায়
কাহিনীগুলির মুদ্রণ-রূপদান
রণেন গুপ্ত
সূচীপত্র ও পরিশিষ্ট-অংশ
অলঙ্করণ সোমনাথ রায়
অলঙ্করণ-সহযোগী বরুণ সাহা ও পুণ্যব্রত পত্রী
বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা হরিদাস ঘোষ
কর্মসচিব কুমার বাবলু

মুদ্রাকর : অঞ্জন সাঁতরা

প্রকাশক অঞ্জন ভৌমিক

উৎসর্গ

বাংলার কিশোর-কিশোরীদের উদ্দেশ্যে—
'জাতক সমগ্র' যাদের নতুন জীবনাদর্শে
উদ্বুদ্ধ করবে



কিশোর জাতক সমগ্র

গ্রন্থিক

১এ কলেজ বো ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৯

কেন 'কিশোব জাতক সমগ্র' ?

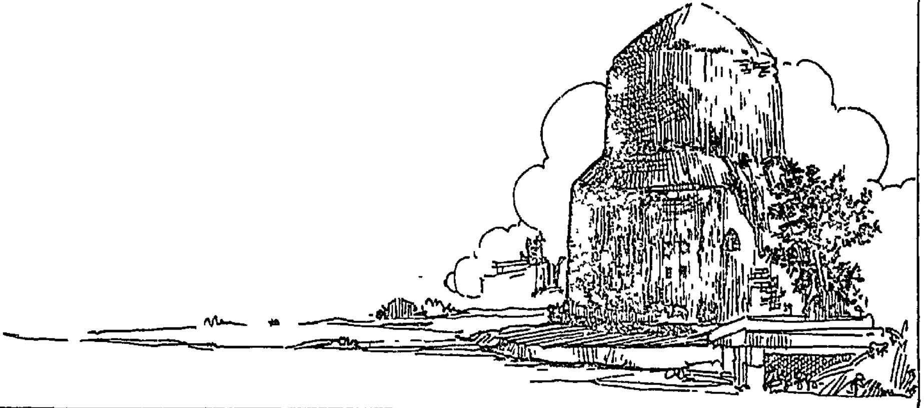
জাতকেব কাহিনীগুলিকে বাংলা ভাষায় প্রথম যোগ্য অনুবাদ কবেছিলেন মনীষী ঈশানচন্দ্র ঘোষ। এ জন্য তিনি পালি ভাষা শিখেছিলেন। আজ থেকে প্রায় ষাট বছব আগে পর্যাপ্ত টীকা, মূল্যবান নিবন্ধ ইত্যাদি সমেত ছটি খণ্ডে তিনি জাতকেব অনুবাদ প্রকাশ কবেন। অনুবাদ ও প্রকাশনায় তাঁব সময় লেগেছিল ষোল বছব—এই তথ্য থেকেই বোঝা যায় কি অপবিসীম নিষ্ঠা ও পবিশ্রম-সহকাবে তিনি কাজটি সম্পন্ন কবেছিলেন।

ঈশানচন্দ্রেব অনুবাদ-সম্বন্ধে সবচেয়ে বড কথা, তাঁব অনুবাদে কাহিনীগুলিব বস ও উৎকর্ষতা দুই-ই পবিপূর্ণভাবে উপস্থিত। সেই সময়েব পক্ষে অনুবাদেব ভাষাও যথেষ্ট প্রাঞ্জল। স্বভাবতই এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠবে, তাহলে কেন আবাব বর্তমান বইটিব আয়োজন ?

ঈশানচন্দ্রেব অনুবাদ-গ্রন্থে বয়েছে ধর্মবিষয়ে সুবিস্তৃত তত্ত্বকথা এবং দীর্ঘ গাথায় প্রশ্নোত্তব। এই পবিশ্রমসাপেক্ষ কাজটি অপবিণত পাঠকেব পক্ষে ঐ অমূল্য গ্রন্থটি পডাব ও বসগ্রহণেব পক্ষে অনেকসময় একটি বাধাবিশেষ বলে আমাদেব মনে হয়েছে। এ ছাড়া পুনবাবৃত্তি, একই গল্প ও 'মোটিফেব' বাব বাব ঘুবে ফিবে আসাও একটি অন্তবায়। সর্বোপবি সাম্প্রতিক বাংলা ভাষা থেকে এই অনুবাদ স্বভাবতই কিছুটা দূবেব। এই ত্রিবিধ অন্তবায় দূব কবে জাতক-কাহিনীগুলিকে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় কিশোব-কিশোবী তথা সাধাবণ পাঠককে পবিবেশনই এই 'জাতক সমগ্র' প্রকাশেব মুখ্য উদ্দেশ্য। পুনরুক্তিমূলক গল্প ও নীতিকথা-সর্বস্ব গল্প বর্তমান সংগ্রহে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিশোব-কিশোবীব গ্রহণে অসুবিধে হতে পাবে, এমন কিছু গল্পও বর্তমান সংগ্রহে বাখা হয় নি। একই উদ্দেশ্যে গল্পেব শবীবেও কিছু কিছু পবিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

সম্পূর্ণভাবে ঈশানচন্দ্রেব অনুবাদকর্মেব ওপব নির্ভবশীল এই বইটি ঈশানচন্দ্রেব অনুবাদে প্রবেশেব একটি দবজা হিসেবে কাজ করুক, এ বইয়েব পেছনে এই একটি উদ্দেশ্যই কাজ কবেছে। তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতিব নিখুঁত বিববণ-সম্বলিত এই জাতক-কাহিনীগুলি যদি কিশোব-কিশোবী তথা সাধাবণ পাঠককে নতুন জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ কবে, তাহলেই 'কিশোব জাতক সমগ্রে'ব প্রকাশনা সার্থক হবে।

বাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়





আজ থেকে ছ মাস আগে শ্রদ্ধেয সুধাংশুবঞ্জন ঘোষ 'কিশোব জাতক সমগ্র' প্রকাশনাব পবিকল্পনা আমাব কাছে বাখেন। প্রস্তাবটি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ কবতে আমি কোন দ্বিধাবোধ কবিনি, কাবণ প্রাচীন ভাবতেব সমাজ, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে এ যুগেব কিশোব-কিশোবীকে সচেতন কবতে এমন ধবনেব বইযেব প্রযোজন যথেষ্ট। নিজেব দেশেব ঐতিহ্য সম্বন্ধে যে যুবসমাজ সচেতন নয, সে কখনও সার্থক সমৃদ্ধ দেশ গঠন কবতে পাবে না—এই সহজ সত্যই সুধাংশুবাবুব প্রস্তাব গ্রহণেব পেছনে কাজ কবেছে।

কিন্তু প্রস্তাবে সম্মতি দান এবং প্রস্তাবকে কর্মে রূপাযণেব মধ্যে ফাবাক কতটা, তা বুঝলাম কাজে নামাব প্রায সঙ্গে সঙ্গেই। কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই—প্রকাশনাব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি বিভাগেবই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিব কাবণে এত বড বইযেব প্রকাশনা প্রথম থেকেই খুব দুর্বহ হযে পডে। তাব ওপব প্রচাব ও বিজ্ঞাপনেব ব্যাপাবটি এব সঙ্গে জুডে গিযে পবিস্থিতিকে আবও শোচনীয কবে তুলল। এই সঙ্কটময পবিবেশে প্রথমে বন্ধুবব বফিকুল ইসলাম মল্লিক এবং পবে শ্রদ্ধেয কবি-সাহিত্যিক হবিদাস ঘোষেব উদাব সহযোগিতাব হস্ত আমাব আবদ্ধ কার্য-সম্পাদনে মূল সহাযক হযে উঠল। হবিদাসবাবুব অকুণ্ঠ সহযোগিতায জাতক-কাহিনী প্রকাশেব আলো দেখেছে। তাঁব সমযোচিত নির্দেশাবলী আমাকে নানাভাবে এত সাহায্য কবেছে যে শুধু ধন্যবাদজ্ঞাপনে সেই অকুণ্ঠ ঋণভাব থেকে মুক্ত হওযা যাবে না।

আমাব অগ্রজপ্রতিম অকৃত্রিম সুহৃদ বণেন গুপ্তেব কাছেও 'কিশোব জাতক সমগ্র' প্রকাশেব জন্য আমি নানাভাবে ঋণী বযেছি। এই গ্রন্থ প্রকাশেব ব্যাপাবে তাঁব দীর্ঘদিনেব পবিশ্রম আমাকে তাঁব কাছে অপবিশোধ্য ঋণভাবে আবদ্ধ বেখেছে। পবম সুহৃদ বাঘব বন্দ্যোপাধ্যাযেব নিষ্ঠা এবং পবিশ্রমও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আশা বাখি, এতগুলি মানুযেব নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক পবিশ্রমেব ফসল যে বইটি তা সমাজেব সর্বশ্রেণীব মানুযেব কাছেই আদবণীয হবে।

অঞ্জন ভৌমিক

আর্য শূরের জাতক মালা

ভূমিকা

পাদটীকা

জাতক দুটি ভাষায় লেখা হয়, পালি ও বৌদ্ধসংস্কৃত। পালি জাতকই সংখ্যায় বেশি, প্রায় সাড়ে পাঁচশ এবং এগুলিই প্রথমে বচনা কবা হয়। অনেক পবে সংস্কৃত ভাষায় আর্য-শূব চৌত্রিশটি জাতক বচনা কবে নাম দেন 'জাতকমালা'। আর্যশূব সম্ভবত খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকেব (৩৫০ থেকে ৪০০ খ্রীস্টাব্দেব মধ্যে) কোনো সময়ে 'জাতক মালা' বচনা কবেন। ষষ্ঠ শতকেব সাহিত্যে দেখি 'জাতকমালা' শুধু বিখ্যাতই নয় বেশ জনপ্রিয়ও। 'জাতক মালা' ছাড়া আবও চাব পাঁচটি বই এঁব লেখা বলে বিখ্যাত, এগুলি ইনি নিজে পুবোপুবি বচনা না কবলেও সম্ভবত এঁব কিছু কিছু বচনা এগুলিব মধ্যে বযে গেছে। ('দিব্যাবদান' নামে বৌদ্ধ গ্রন্থে মৈত্রকন্যকাবদান ২২, ও ৩২ নং অবদান ও সম্ভবত এঁবই বচনা, কিংবা ইনি এগুলি পবিমার্জনা কবে দিযেছিলেন। আর্যশূব নামেব দুজন কবি ছিলেন, 'জাতক-মালা'ব লেখকই আগেকাব, পবেব আব একজন 'সুভাষিতবত্নকবন্ডককথা' বলে একটি কাব্য লেখেন। অনেক পবেব একজন সংস্কৃত কবি, নাম অভিনন্দ, বলেন 'আর্যশূবে হলেন শুদ্ধ কথাব কবি' (বিশুদ্ধোক্তি ঃ শূব ঃ। এটি পাই 'সদুক্তি কর্ণামৃত' বলে একটি কবিতা সংগ্রহেব বইতে ৫।২৬।৫ নং শ্লোকে ও 'সুভাষিত বত্ন কোষ' নামে আব একটি কাব্য সংকলনেব ১৬৯৮নং শ্লোকে।) এব থেকে বোঝা যায পববর্তী ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যও আর্যশূবকে কবি বলে সম্মান কবেছে।

আকর ও বিষয়

আর্যশূব 'জাতকমালা'ব গল্পগুলি পেলেন কোথা থেকে? না, এগুলো তিনি মন থেকে বানিযে লেখেন নি। চৌত্রিশটাব মধ্যে আঠাশ-টাই পালিজাতক বা পালি 'চবিযাপিটক' বা 'অপাদান' নামেব বইতে আছে, 'বিনযপিটক' ও 'মহাবস্তু' থেকেও কিছু কিছু নেওয়া হযেছে। বাকি ছ'টি কোথা থেকে নেওয়া তা ঠিক জানা যাযনা, এগুলি তাঁব কল্পিত কাহিনীও হতে পাবে। গল্পগুলিব মূল বক্তব্য হল নানান পাবমিতা। পাবমিতা হল কযেকটি গুণ যেমন দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা। বৌদ্ধবা বিশ্বাস কবতেন এগুলিব চর্চা কবে মানুষ ধাপে ধাপে ভাল হতে হতে ক্রমে বুদ্ধ হযে উঠতে পাবে।

উপাদান

পালি জাতক এবং অন্যান্য যেসব বই থেকে জাতকমালাব গল্পগুলি এসেছে মোটেব ওপব তাদেব তিনটি উৎস আছে ঃ প্রথমত, ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যেব গল্পগুলি যা আমবা বামাযণ মহাভাবত ও পুবাণগুলিতে পাই, দ্বিতীযত, বুদ্ধ কাহিনী অর্থাৎ বুদ্ধ সম্বন্ধে ইতিহাস ও বুদ্ধকে ঘিবে যেসব কাহিনী গড়ে উঠেছে সেগুলো। তৃতীযটি হল এদুটিবই উৎস, অর্থাৎ লোকেব মুখে-মুখে চলে আসা বিবাট একটি কাহিনী-সাহিত্য। যাব থেকে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যই হোক, বৌদ্ধ সাহিত্যই হোক কাহিনীগুলি নিযে আত্মসাৎ কবেছে।

গঠন

লক্ষ্য কবলেই দেখা যাবে 'জাতকমালা'ব প্রত্যেকটি গল্পেব একেবাবে প্রথমেই বলা হযেছে সে-গল্পটি বলাব উদ্দেশ্য কি, অর্থাৎ কোন্ বিশেষ পাবমিতাব মাহাত্ম্য প্রচাব কববাব জন্যে গল্পটি তৈবি হচ্ছে। তাবপবে কোথাও কোথাও সে সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন, কখনো বা সবাসবি গল্পটি শুবু হযে যায, 'যেমনটা শোনা যায' (তদ্ যথানুশ্রূযতে)। গল্পেব শেষে সেই গল্পেব কেন্দ্রে যে পাবমিতা আছে তাব সম্বন্ধে খানিকটা বুঝিযে বলা কিংবা সবাসবি ফলশ্রুতি অর্থাৎ ঐ গুণটিব অনুশীলন কবলে কি সুফল হয তাব উল্লেখ। কোথাও কোথাও গল্প শুবু হবাব সময়কাব ভূমিকাটিই হুবহু ফিবে এসেছে গল্পেব শেষে। (কোনো কোনো পন্ডিত মনে কবেন গল্পেব শেষেব অংশগুলি আর্যশূবেব বচনা নয, পবে জুড়ে দেওয়া হযেছে, কিন্তু এবকম মনে কবাব কোনো যুক্তি নেই, সমস্তটাই আর্যশূবেবই লেখা।)

জাতকমালাব প্রথম গল্প 'ব্যাঘ্রীজাতক' পালিজাতকে নেই বটে কিন্তু ক্ষুধার্ত বাঘেব

জন্যে নিজেব শবীব কেটে মাংস দেওয়ার কাহিনী ঐ সময়কার অন্যান্য অনেক বৌদ্ধ বইতে আছে। অবদানশতকেব ৩২ নং কাহিনীতে এই গল্পটি দুটি শ্লোক শুদ্ধই পাওয়া যায়। আবাব জাতকমালার প্রভাবও পরবর্তী সাহিত্যে মাঝে মাঝে দেখা যায়।

(যেমন সিংহলের 'হত্থবনগল্লবিহারবংশ' বলে বইটিতে জাতকমালা থেকে কুড়িটি শ্লোক পালি অনুবাদে পাওয়া যায়। একাদশ শতকের কবি বিদ্যাকব 'সুভাষিতরত্নকোষ' নামে একটি গ্রন্থে আর্যশূরকে 'জাতকমালা'র রচয়িতা বলে উল্লেখ কবেছেন এবং ৩৩ নং জাতকেব একটি শ্লোক ঐ বইতে সংকলন কবেছেন ।)

জাতকগুলি সংস্কৃত গদ্যে ও কবিতায় লেখা। কখনো গদ্যে খানিকটা গল্প বলে। সেটাই ছন্দে বলা, কখনো বা ছন্দেই প্রথমে ঘটনা বলে নিযে সেটা পবে গদ্যে বলা; কথোপকথন কখনো ছন্দে কখনো গদ্যে, নীতিকথাও তাই। কবিতা অংশগুলির নাম 'গাথা'। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন সহজে মনে বাখবাব জন্যে বহু কাহিনী বা কাহিনীব অংশ প্রাচীনকাল থেকেই লোকের মুখেমুখে শ্লোকের আকারে ঘুরছিল; ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দুই সাহিত্যই এগুলোকে ব্যবহার কবেছে। 'হিতোপদেশ' যেমন পশু পাখিরা গল্পের নায়ক নায়িকা হযে কথা বলছে এখানেও তেমনি মোট এগারোটি গল্পেব নাযক পশুপাখী, এইসব জন্মে বুদ্ধ যেন পশু বা পাখি হযে জন্মেছিলেন। বৌদ্ধরা অহিংসাব কথা বেশি বলতেন, জীবে দযা এ ধর্মের খুব বড কথা হযত সেজন্যে মানুষের চেযে নিচের জীবজন্তুব আকাবে বুদ্ধ পৃথিবীতে থেকে গেছেন একথাটিব মধ্যে জীবমাত্রের প্রতি সদয ব্যবহারেব একটা নির্দেশও এগুলিব মধ্যে আছে। (পশু-পাখিকে নাযক করে গল্প লেখার ইতিহাস খুব প্রাচীন, 'ইসপ্স্' ফেব্‌ল্‌স্' 'পিল্-পইস্ ফেব্‌ল্‌স্ ইত্যাদিও আমাদেব 'পঞ্চতন্ত্র' হিতোপদেশেব মত ঐ জাতীয গল্প সংগ্রহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেব মধ্যেই আছে। তবে বেশিরভাগ গল্পে মানুষই নাযক সে মানুষ বুদ্ধ, যিনি রাজা, বণিক ইত্যাদি নানা ভূমিকায় পৃথিবীতে এসেছেন। এব কারণ মানুষকে উপদেশ দেবাব জন্যই বইটি রচিত, তাই পশুপাখির আকারেও যখন বুদ্ধ পৃথিবীতে এসেছিলেন তখনও তিনি যে সাধ্যমত তাঁর দলের প্রাণীদেব উপকারেব চেষ্টা কবেছিলেন এইটে বলার জন্যেই ঐ পশু-পাখিদেব নাযক কবা হযেছে, অর্থাৎ ওরা যদি পবেব উপকারেব জন্যে স্বার্থত্যাগ কবতে পাবে তবে মানুষের ত আরোই পারা উচিত। স্বার্থত্যাগেব পরীক্ষা যখন চূড়ান্তভাবে হয, তখন প্রায়ই একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে, পবীক্ষা শেষ হয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

বুদ্ধ বুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেব মানুষ; তাঁর মৃত্যুব প্রায হাজারখানেক বছর পরে আর্যশূর 'জাতকমালা' রচনা করেন। ততদিনে বুদ্ধ প্রবাদপুরুষ, ইতিহাস ছেড়ে ধর্মে তাঁর স্থান হয়েছে, লৌকিক কাহিনীতে, কিংবদন্তীতে তিনি আর্যাবর্তের মানুষের মান একটি বিশিষ্ট আসন পেয়েছেন। এ সমযের প্রায দেড়শ বছর আগেই রামাযণ রচনা শেষ হযে গেছে, মহাভারত রচনা তখনো চলছে, মানে, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ ভগবানেব অবতার বলে বিখ্যাত হযেছেন 'ব্রাহ্মণ্যধর্মে' ও সমাজে। সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য ইতিহাসের বুদ্ধকে যুগপুরুষ বলে সম্মান কবে নাযকেব জায়গা দিচ্ছে সাহিত্যে। এঁরই নানা অবতারের কাহিনী হল জাতক। আর এই সময়েই কৃষ্ণের নানা অবতারের কাহিনী নিয়ে প্রথম পুরাণগুলোও লেখা শুরু হযেছে। অর্থাৎ অবতারেব কথা দিযে নানা ছড়ানো ধর্মকাহিনীকে গাঁথবাব যুগ এটা। সেদিক থেকে জাতকমালার একটা পৃথকত্বের স্থান আছে। তাছাড়া এগল্পগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত, বাহুল্যবর্জিত। মনে কবা যায় খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দী নাগাদ ভগবানের

অবতারের কল্পনাটা ছড়াতে আরম্ভ করে, শ' দুই বছরের মধ্যে রামায়ণের আদি ও উত্তর কাণ্ড—শুধু এ অংশেই রাম বিষ্ণুর অবতার—এবং মহাভারতে কৃষ্ণকে অবতার করে দেখানোর কাহিনীগুলো রচিত হতে শুরু করে। সেদিক থেকে জাতকের বুদ্ধের বৈশিষ্ট্য অনেক: জীবজন্তুর ভূমিকায় তাঁর সহজ ও স্বাভাবিক আচরণ, মানুষের ভূমিকাতেও তাঁর দয়া স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি মানবিক গুণের উৎকর্ষ তাঁকে সত্যিই আদর্শ পুরুষে পরিণত করেছে।

হীনযান ও মহাযান

বৌদ্ধ ধর্মের দুটি পর্ব: হীনযান বা শ্রাবকযান ও মহাযান (প্রথমটির সাহিত্য পালিভাষায়, দ্বিতীয়টির সংস্কৃতে। হীনযানে বুদ্ধ ভগবান নন, পথপ্রদর্শক ও উপদেষ্টা মাত্র। এ সাহিত্য তত্ত্বপ্রধান, এসে মানুষের সেবা করবে। যেমন জাতকমালায় বুদ্ধ নানারূপে ফিরে ফিরে জন্ম নিয়ে মানুষের উপকার করে উন্নতির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। জন্মান্তরবাদ তখন হাজার বছরের পুরনো তত্ত্ব। কিন্তু এই প্রথম তত্ত্বটিকে কাজে লাগানো হল ধর্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে। পালি জাতকেই প্রথম এ কাজটি হয় অনেক আগে। আর্যশূর খানিকটা শুষ্ক, উপনিষদের ঠিক পরবর্তী ধর্মসাহিত্য এটা এবং উপনিষদের মতই সাধারণের কাছে কঠিন, দুর্বোধ্য। এ ধর্মে প্রত্যেক মানুষকেই সারাজীবন ধরে একমাত্র নিজের নির্বাণের বা মুক্তির জন্যেই সাধনা করে যেতে হবে। মহাযান ধর্ম বুদ্ধকে দেবতায় পরিণত করল, শুরু হয়ে গেল বুদ্ধের মূর্তিনির্মাণ, চৈত্য, বিহার, স্তূপ নির্মাণ, ধূপ দীপ গান দিয়ে বুদ্ধের পূজা, ছবিতে সাহিত্যে ভাস্কর্যে বুদ্ধের জীবনী দেখানো হতে লাগল। ধর্মটি এসে গেল সাধারণ লোকের নাগালের মধ্যে। মহাযানে মানুষ শুধু নিজের মুক্তির চেষ্টা করবেনা, আশপাশের মানুষদের মুক্তির দিকে এগিয়ে দেওয়াই তাদের প্রধান কর্তব্য। এজন্যে দরকার হলে তারা জন্মে জন্মে ফিরে

সেখানকার কিছু গল্প ও অন্যান্য পালি বৌদ্ধ সাহিত্যের কিছু গল্প ব্যবহার করে মহাযান ধর্ম প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগালেন।

কাদের জন্য

যারা শক্ত তত্ত্বকথা বোঝেন প্রধানত সেই সব সাধারণ খেটে খাওয়া অশিক্ষিত লোকদের জন্যেই বৌদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু সংস্কৃতে রচনা হবার ফলে মহাযান সাহিত্য কতকটা সরে এল তাদের থেকে কারণ সাধারণ লোক প্রাকৃতে কথা বলত, সংস্কৃত বুঝত না। তাই মাঝে মাঝে বড় বড় সমাসও পাই এতে। তবে মনে হয় ধর্ম উপদেশে যাঁরা এসব গল্প ব্যবহার করতেন তাঁরা কথকঠাকুরের মত ব্যাখ্যা করে ভাষ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন লোককে, যাতে তাদের কাছে দুরূহ না ঠেকে তাদের উদ্দেশ্য করেই যে এগুলো লেখা তার প্রমাণ নানা অতিশয়োক্তি, অর্থাৎ ঐশ্বর্যের বা প্রতাপের বর্ণনার বাড়াবাড়িতে, আর নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে। উপনিষদের সময়ে সাধারণ লোক অনেকটাই ফাঁকিতে পড়েছিল, একদিকে জাঁকজমকের যজ্ঞও কমে গেছে অনেকটা, আবার উপনিষদের ঐ কঠিন তত্ত্ব তাঁরা ঠিকমত বুঝতে পারত না। সেই ফাঁকটা ভরাল একদিকে রামায়ণ মহাভারত, ব্রাহ্মণ্য সমাজে অন্যদিকে প্রথমে পালি বৌদ্ধসাহিত্য হীনযানে ও পরে সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য মহাযান বৌদ্ধ সমাজে। বৌদ্ধ ধর্মের সাহিত্য, ব্রাহ্মণ্য সমাজ থেকে লোককে বুদ্ধের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করাই এর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের একটা উপায় হচ্ছে নানা জন্মে বুদ্ধ যেমন নৈতিক উন্নতি প্রকাশ করেছেন তাঁর জীবনে, অন্যদের জন্যে কেমন দয়া, দান সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ দেখিয়েছেন তার কাহিনী বলা। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের হীন করে দেখানো, তাই শক্র বা ইন্দ্র নানা কাহিনীতে বুদ্ধকে পরীক্ষা করতে এসেছেন (উন্মাদয়ন্তী, সুপারগ, মৎস্য অন্যান্য জাতকেও)। ইন্দ্র ঐ সময়ের ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে দেবরাজ এবং বৃ[illegible], বৌদ্ধ সাহিত্যে যেমন জাতক-

মালায কিন্তু তিনি বৃষ্টিব দেবতা হযে মধ্যে মধ্যে দেখা দিলেও দেববাজ একেবাবেই নয়, ববং বেশ নিচু জাযগাতেই তাঁকে দেওযা হযেছে। তিনি বুদ্ধেব অধীনে এবং অনেকটা হীন চবিত্রের যখনই ছদ্মবেশে বুদ্ধকে ছলনা করতে আসেন তখনই ব্রাহ্মণেব বেশে আসেন। এটা লক্ষ্য কবি। মহাভাবতেও ইন্দ্র নিজের ছেলে অর্জুনেব স্বার্থে যখন কর্ণের কবচ-কুণ্ডল হরণ করতে এসেছিলেন তখনও ব্রাহ্মণেব বেশেই এসেছিলেন তখনও ব্রাহ্মণেব বেশেই আসেন। মাব বুদ্ধেব আর একজন শত্রু, সেও ছলনা ও পরীক্ষা কবে বুদ্ধকে; যেমন পবে বাইবেলেব শযতান যীশুকে পবীক্ষা করতে আসে ও হেরে যায় বুদ্ধ তাঁর চবিত্রেব বলে মাবকে হাবিযে দেন। মনে হয, মানুষেব মনের মধ্যে যত মন্দ প্রবৃত্তি আছে, যাকে শাস্ত্রে ষড়্‌বিপু বলে, মাব হল প্রতিমূর্তি।

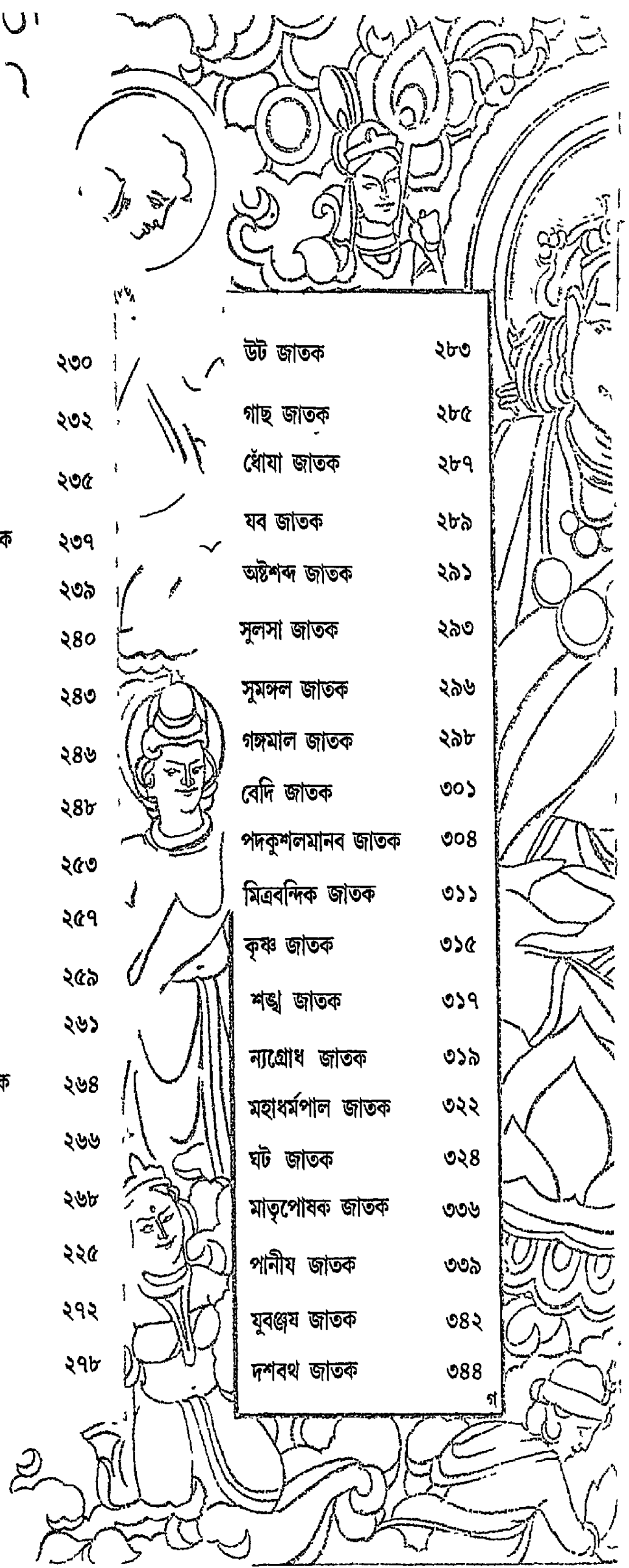
সমাজ

বৌদ্ধ সাহিত্যেব একটা বৈশিষ্ট হল এতে সমাজেব ছবি অনেক বেশি ফুটে উঠেছে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের—অন্তত ঐ সমযকার চেযে বৌদ্ধ সাহিত্যে সাধাবণ মানুষ ও তাব জীবনযাত্রার ছবি অনেক বেশি পরিমাণে পাওযা যায়। দেখতে পাই সমাজে বৈশ্য ও প্রধাণত বণিকেব প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠীবাই সমাজেব কর্তা। বাজারা ক্ষত্রিয, কিন্তু সমাজেব সত্যিকাব ক্ষমতা এখাবকাব মতই ধনী বণিকেব হাতে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রারও কিছু ছবি আছে, আব আছে বহু বিভিন্ন পেশাব কথা, যাবা হাতে কাজ কবে তাদেব কথা। শহর গ্রামেব চাবপাশেই তখন জঙ্গল ছিল, সেখানে সন্ন্যাসীদেব আশ্রম ছিল আব ছিল বহু পশুপাখীব আবাস। সব মিলে একটি পূর্ণ চিত্র, সমাজেব ধর্মপিপাসা আব কর্মজীবন পাশাপাশি জাযগা পেযেছে জাতকমালায।

বৌদ্ধ সাহিত্যে ধর্মেব একটি সজ্ঞা পাই—'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায, মহতো জনকাযস্যার্থায' অর্থাৎ বহুজনের সুখেব জন্য, মহৎ জনসমষ্টিব স্বার্থে। জাতকমালায বুদ্ধ নানা ভূমিকায এই ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেযেছেন যা সাধাবণ মানুষেব মঙ্গল এবং সুখেব চেষ্টা কববে, যা সাধারণ মানুষেব স্বার্থের জন্যেই প্রতিষ্ঠিত।

সুকুমাবী ভট্টাচার্য

সূচীপত্র



বোকা বণিক জাতক

বারাণসীতে তখন রাজত্ব করছেন ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব জন্ম নেন এক বণিক পরিবারে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য শিখলেন। বাণিজ্যে বোধিসত্ত্বের বুদ্ধি বেশ ধারাল হয়ে উঠতে লাগল। এক এক করে পাঁচশটি গোরুর গাড়ি করেছেন। আজ এদেশ, কাল ওদেশে যাচ্ছেন ব্যবসা করতে।

বোধিসত্ত্বের সময়ে বারাণসীতে আর একজন বণিক থাকতেন। তবে তাঁর মগজ তত সাফ নয়। শ পাঁচেক গোরুর গাড়ি অবশ্য তাঁরও ছিল।

একদিন বোধিসত্ত্ব ঠিক করলেন সমস্ত গোরুর গাড়ি নানারকম মালে বোঝাই করে দূর দেশে বেচতে যাবেন। হঠাৎ খবর পেলেন, সেই দ্বিতীয় বণিকও ঠিক করেছে সেখানে ব্যবসা করতে যাবে।



বোধিসত্ত্ব ভাবলেন দুজনের একসঙ্গে যাওয়াটা ঠিক হবে না। এক হাজার গোরুর গাড়ি, এত লোকলস্কর এক সঙ্গে গেলে বেশ অসুবিধে হবে। একে তো এত লোকের খাবারদাবার জল জোটানো বেশ কঠিন হবে। তারপর অতগুলো গোরুর খাবারও সব জায়গায় না পাওয়া যেতে পারে। ভালো হয় একজন আগে এবং একজন পরে গেলে। আর দুজনের যাওয়ার মাঝখানে মাসখানেক, মাস দেড়েক ফারাক থাকাই ভালো। তা যাই হোক, বোধিসত্ত্ব সেই বণিককে ডেকে সব কথা বুঝিয়ে বললেন। সব শুনে বণিকটি বলল সে আগে যেতে চায়। বোধিসত্ত্ব তাতে কোনই আপত্তি করলেন না।

ঐ বণিকটি ভেবেছিল আগে গেলে খাবারদাবার জোগাড় করতে সুবিধে হবে। তাছাড়া, বাণিজ্য করতেও অসুবিধে হবে না। সে আগে যাবে, তখন কোন প্রতিযোগী থাকবে না। ফলে মালপত্তর চড়া দামে বেচা যাবে।



আর বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, ওর পাঁচশ গোরুর গাড়ির চাকায় অসমান রাস্তা সমান হয়ে যাবে। সুতরাং পরে যখন বোধিসত্ত্ব যাবেন তাঁর কোন অসুবিধে হবে না। রাস্তায় যেতে যেতে জলের জন্য ওদের কুঁয়ো খুঁড়তেই হবে। বোধিসত্ত্ব ও তাঁর লোকজনকে জলের জন্যে পরে হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না। বণিকের গোরুগুলো রাস্তায় দুপাশে ঘাস খেতে খেতে যাবে। বোধিসত্ত্বের দলটি যখন ঐসব জায়গায় পৌঁছবে, ততদিনে সেখানে কচি ঘাস জন্মাবে। বোধিসত্ত্বের গোরুগুলো তরতাজা ঘাস খেয়ে চাঙ্গা হতে পারবে। এ ছাড়াও এক মস্ত সুবিধে হল বণিক আগে যাওয়াতে মালপত্তরের দর-দাম বাঁধা হয়ে যাবে। বোধিসত্ত্বের বেচাকেনা খুব সহজ হয়ে যাবে এতে।

দ্বিতীয় বণিক শুভ দিন দেখে যাত্রা শুরু করল। কয়েকদিন পরে তারা এক গহীন বনের কাছে এসে পড়ল। ঐ বনে যক্ষদের বাস। তারা মায়া যাদু জানে। ইচ্ছে করলেই মানুষ বা জীবজন্তুর রূপ ধারণ করতে পারে। বিপদ আরো আছে, ঐ বনের ত্রিসীমানার মধ্যে এক ফোঁটা জল নেই।



বণিক তাব দলবল সমেত বনেব কাছাকাছি আসা মাত্র যক্ষদেব বাজা এক ফন্দি কবল। সে ভাবল বণিককে যদি বোঝান যায় যে বনেব মধ্যে বিস্তর জল আছে, তাহলে বণিক জলেব জালা-গুলো ফেলে দেবে। আব তাহলেই কেল্লা ফতে। কেননা জলেব অভাবে তাবা খিদেতেষ্টায় কাতব হযে পডবে। তখন ওদেব ঘাযেল কবতে বেগ পেতে হবে না।

যক্ষদেব বাজা তখন মাযাবলে ধবধবে সাদা দুটো গোরু তৈবি কবল। সুন্দব একটা গোরুব গাডি বানাল। নিজে চমৎকাব পোশাকে সেজে গাডি ছুটিযে দিল। যক্ষ বাজাব দশ-বাবো জন অনুচব ছুটল গাডিব আগু-পিছু। অনুচবদেব গলায় ঝুলছে নীল ও শ্বেত পদ্মেব মালা। হাতে পদ্মেব ডাঁটা। পাযে কাদা।

বণিকেব কাছে এসে যক্ষবাজ বলল, 'মহাশযেব কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

'আমবা তো আসছি বাবাণসী থেকে। কিন্তু আপনাব গাড়িব চাকায কাদা এল কোত্থেকে? লোকজনেব পাযেই বা কাদা কেন? পদ্মফুল, পদ্মেব ডাঁটা এসব পেলেন কোথায?'

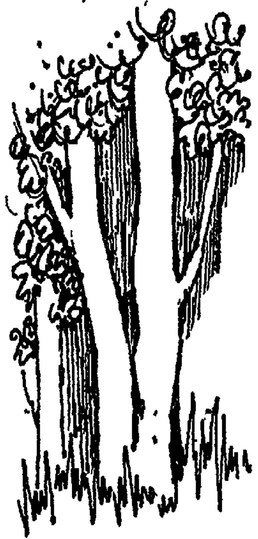
'পদ্মদিঘী থেকে ওবা তুলে নিযেছে, আব ওদিকে তো তুমুল বৃষ্টিও হচ্ছে।'

'কোথায়?'





'ঐ যে দেখছেন না দূরের গাছগুলো, ওখানে নীল ও শ্বেতপদ্মে ভবা কত সরোবর, কাজলকালো জল সেখানে, তার ওপর টানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে।'



যক্ষবাজের সঙ্গীবা বণিকের লোকজনকে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ মশাই, আপনাদের পেছনের দিকের গাড়িগুলো এত ভারি কেন?'

বণিকেব সঙ্গীবা বলল, 'ওগুলোতে জলেব জালা আছে।'

শুনে যক্ষবাজ বলল, 'খামোকা আর কেন ওগুলো বয়ে নিযে যাবেন, সামনে জলেব কোন অভাব নেই। তাছাড়া গাড়ি হাল্কা করলে তাড়াতাড়ি যেতে পাববেন।'

যক্ষবাজ তো তারপব গাড়ি চালিয়ে যক্ষপুবীতে ফিরে গেল। এদিকে বোকা বণিক ভাবল, সত্যিই তো, খামোকা আব জালাগুলো বযে নিযে যাই কেন। দলেব লোকেদেব হুকুম করল জল ফেলে দিতে।



জল ফেলে দিযে তাবা চলেছে তো চলেছে। কোথায় সবোবব। কোথায বৃষ্টি। ক্লান্ত হয়ে বাতে গাড়ি থামানো হল। কিন্তু রান্না হবে কি কবে। এক ফোঁটা জল নেই যে। এই অবস্থায তাবা যখন ধুঁকছে তখন যক্ষেবা হামলে পড়ল। বণিক, বণিকদের লোকজন ও গোরুগুলো সব যক্ষদের পেটে গেল। অক্ষত থেকে গেল গোরুব গাড়িগুলো। আব বিজন বনে পড়ে বইল ওদেব হাড়গোড।

দেড মাস পবে বোধিসত্ত্ব তাঁব লোকজন সমেত এসে পড়লেন সেই ভয়ঙ্কব বনেব কাছে। তিনি জানতেন এই বনের মধ্যে কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। তাই আগেই জালা জালা জল ভবে বেখেছেন। বনে ঢোকাব আগে সঙ্গীদেব সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে, 'আমাকে না জানিযে এ বনের কোন ফল খেও না, এখানে অনেক বিষাক্ত গাছ আছে।'

বোধিসত্ত্ব বনেব মধ্যে একটু এগোতেই যক্ষরাজা আগেব মতই চাতুবি কবতে এল। বোধিসত্ত্ব দেখলেন যক্ষবাজের চোখ বক্তেব মত লাল। মাটিতে তার ছায়া পড়ছে না। বুঝলেন, এ মানুষ নয়, অপদেবতা। যক্ষরাজ বলল, 'বনের মধ্যে প্রচুব জল, কেন খামোকা জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে।'



শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'যা ভাগ্ এখান থেকে! পাপী কোথাকার! আমি বণিক, বুঝলি। যা করব নিজের বুদ্ধিতেই করব। নিজের চোখে সরোবর দেখলে তখন ভাবতাম। তোর কথায় জল ফেলে তেষ্টায় মরতে রাজি নই, বুঝলি।'

যক্ষরাজ হাড়ে হাড়ে বুঝল এ পাত্র টলবে না। সুতরাং সে ফন্দি-ফিকির ছেড়ে ফিরে গেল।

বোধিসত্ত্বের দলের লোকজন কিন্তু এতে একটু বিগড়েই গেল। তারা ভাবল, সত্যি জল ফেলে দিলে বেশ তাড়াতাড়ি যাওয়া যেত। অভিযোগের বহর দেখে বোধিসত্ত্ব সবাইকে ডাকলেন।

'এ বনে জল আছে এমন কথা কেউ আগে শুনেছে কি?'

তারা বলল, 'না।'

'ঐ দূরের বনে যদি সত্যি সত্যি বৃষ্টি হত তাহলে এখানে বৃষ্টিতে ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস বইত নিশ্চয়ই?'

সকলে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'যে মেঘে বৃষ্টি হয় সেই মেঘ দূর থেকে দেখা যায় কিনা?'

সকলে বলল, 'হ্যাঁ যায়।'

'তোমরা কি সে রকম মেঘ দেখতে পাচ্ছ?'

তারা বলল, 'না।'

'মেঘের গর্জন দূর থেকে শোনা যায় কিনা?'

তারা স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, শোনা যায়।'

'তোমরা কি সেরকম কোন আওয়াজ শুনতে পেয়েছ?'

সকলে একবাক্যে বলে উঠল, 'না।'



বোধিসত্ব এবপব ব্যাখ্যা কবে বললেন, 'দেখ, প্রমাণ না পেলে কোন কিছু বিশ্বাস করা ঠিক নয়। আসলে যে লোকটা এত কথা বলে গেল সে মানুষ নয়, যক্ষ। ওর কথা শুনে আমরা জল ফেলে দিলে পবে জলের অভাবে বিপদে পড়তাম। খিদে-তেষ্টায় কাহিল হয়ে পড়লে তখন যক্ষেব দল আমাদের ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ করে দিত। মনে হচ্ছে সামনের দিকে এগালে আমরা দেখতে পাব ওবা আগের বণিকের দফা গয়া করেছে এইভাবে।'

আর কিছু দূব এগোনোর পর দেখলও তাই। গোরুর গাড়িগুলো পড়ে আছে, কিন্তু গোরুর পাত্তা নেই। লোকজন নেই। একটু তফাতে পড়ে আছে বণিক ও তার দলের লোকদের হাড়গোড়।

বোধিসত্ত্বব কযেকটা গাড়ি বাস্তার ধকল সামলাতে না পেবে একটু-আধটু ভেঙেছিল। তিনি বণিকেব গাড়ি থেকে কযেকখানা



ভাল গাড়ি বেছে নিলেন। কম দামী মাল ফেলে বণিকেব কিছু দামী মাল গাড়িতে তুলে নিলেন।

শেষকালে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কেনাবেচা শুরু করলেন। বোধিসত্ত্বেব কোন প্রতিযোগী না থাকায চড়া দাম পেলেন। সব কিছুই শুভ হল।

এব গোপন মন্ত্র একটাই : বিবেচনা করে কাজ কবা।



বুদ্ধিমান যুবক

ব্রহ্মদত্তের আমলে একবার বোধিসত্ত্ব এক বণিক বংশে জন্ম নেন। নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রমে তাঁর বেশ নামযশ হয়। কালে কালে বারাণসীর শেঠ হলেন। 'চুল্ল শ্রেষ্ঠী' খেতাব পেলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র তাঁর খুঁটিয়ে পড়া ছিল। গ্রহ নক্ষত্র বিচার করে যাকে যা বলতেন অক্ষরে অক্ষরে ফলে যেত।

বোধিসত্ত্ব একদিন রাজদরবারে যাবেন। রাস্তায় দেখেন একটা মরা ইঁদুর পড়ে আছে। সেই সময়কার নক্ষত্র বিচার করে তিনি দেখলেন ইঁদুরটি তুচ্ছ করার মত নয়। কারণ ভাল বংশের কোন সৎ লোক যদি এটাকে তুলে নিয়ে যায়, তাহলে তার কপাল ফিরে যাবে। ব্যবসা করে কোটিপতি হয়ে যাবে।

এখন হয়েছে কি, ঠিক সেই সময় ঐ রাস্তা দিয়ে সৎ বংশের এক সৎ যুবক কোথাও একটা কাজে যাচ্ছিল। সে বেচারা বেশ গরীব। বেকার। বোধিসত্ত্ব তাকে ডাকলেন, 'শুনছ, ও ভাই।'

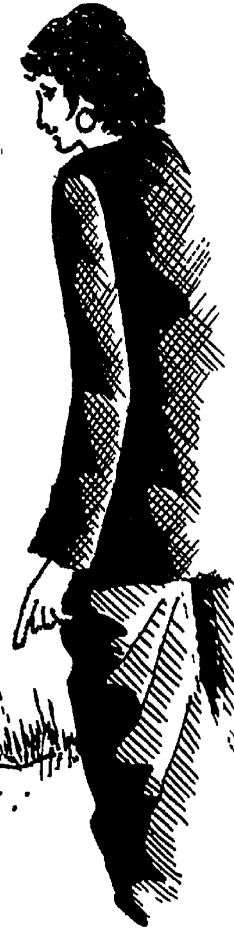
'কিছু বলছেন?'

'হ্যাঁ। এই যে মরা ইঁদুরটা দেখছ না…'

'হ্যাঁ।'

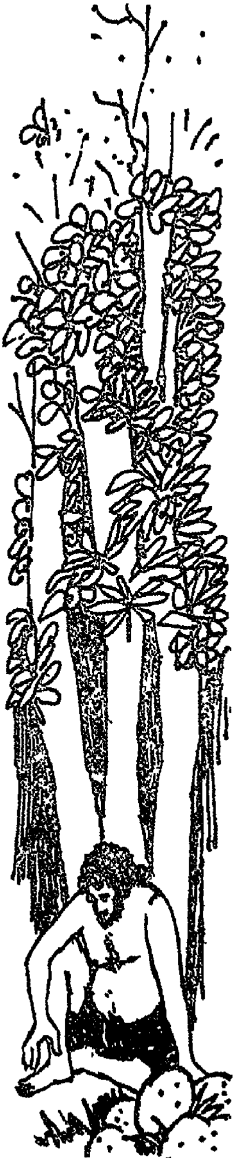
'ভক্তি করে এটা তুলে নিয়ে গিয়ে যদি ব্যবসা শুরু কর তোমার দুঃখ থাকবে না। রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবে।'

যুবকটি বোধিসত্ত্বের কথামত ইঁদুরটা তুলে নিয়ে হাঁটা শুরু করল। কিছুদূর যেতেই এক দোকানদার তাকে ডাকল। দোকান-দারের একটা পোষা বিড়াল আছে। এক পয়সা দিয়ে সে বিড়ালের



জন্য ইঁদুরটা কিনে নিল। যুবকটি ঐ এক পয়সা দিয়ে খানিকটা গুড় কিনল। তারপর এক জালা জল নিয়ে, থালার ওপর গুড় রেখে, এক বনের ধারে গিয়ে বসল।

মালিরা ঐ বনে রোজ জল তুলতে যায়। তারা জল তুলে ক্লান্ত হয়ে বন থেকে বেরিয়ে আসতেই যুবককে দেখতে পেল। তেষ্টায় তখন তাদের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। সবাই লাইন দিয়ে তার কাছে জল আর গুড় খেল। কলজে জুড়িয়ে গেল। তখন তারা সবাই যুবককে এক মুঠো করে ফুল দিয়ে গেল।



ফুল বেচে সে দু-চার পয়সা বেশি পেল। তখন সব পয়সা দিয়ে আবার গুড় কিনল। পরের দিনও তাকে দেখা গেল বনের ধারে জল আর গুড় নিয়ে বসে আছে। দ্বিতীয় দিন মালিরা জলের বদলে তাকে একটা করে ফুটন্ত ফুলের গাছ দিয়ে গেল। এবার ওগুলো বিক্রি করে সে আরো বেশি পয়সা পেয়েছে। এভাবে দু-চার দিনের মধ্যে ব্যবসা করার মত কিছু টাকা হল।

একদিন ভয়ঙ্কর ঝড় হল। রাজার বাগানে তুলকালাম কাণ্ড। কত গাছ যে উপড়ে গেল, কত যে ডাল ভেঙ্গে পড়ল তার কোন হিসেব নেই। অত সুন্দর, সাজানো বাগান তছনছ হয়ে গেল।

মালি কপালে হাত দিয়ে বসে পড়েছে। কি করে ডালপালা সাফ করবে ভেবে পাচ্ছে না। যুবক খবর পেয়ে মালির কাছে গেল। বলল, বিনা পয়সায় যদি তাকে ডালগুলো নিতে দেয় তাহলে সে বাগান সাফ করে দেবে। মালি তো হাতে স্বর্গ পেল। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

যুবক তখন পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের ডাকল। ডেকে গুড় খেতে দিল। তারা বেজায় খুশি। তখন সে সবাইকে বলল, 'আমার সঙ্গে চল সবাই, রাজার বাগান সাফ করবি চল।' তারা হৈ হৈ করে রওনা দিল।

বাগান পরিষ্কার করে সব ডালপালা এনে রাস্তায় গাদা করে রাখল। বিশাল এক ঢিবি তৈরি হল।

এখন হয়েছে কি, রাজার কুমোরের সেদিন সব কাঠ ফুরিয়ে গেছে, আগুন জ্বালতে পারছে না। মাটির হাঁড়ি, কলসী পোড়ানো যাচ্ছে না। খবর পেয়ে সে যুবকের সঙ্গে দেখা করল। নগদ কিছু



টাকা আর মাটির হাঁড়ি-কলসী দিয়ে সে সব কাঠ কিনে নিল।

বারাণসীতে তখন পাঁচশ ঘেস্তুড়ে ছিল। তাদের কাজ শুধু ঘাস কাটা। যে রাস্তা দিয়ে তারা ঘাস কেটে ফিরে আসে যুবক একদিন সেখানে জালা ভর্তি জল আর গুড় নিয়ে বসে গেল। ঘাস কেটে ফেরার পথে ক্লান্ত ঘেস্তুড়ের দল প্রাণ ভরে জল খেল। তৃপ্ত হয়ে তারা তাকে বলল, 'ভাই তুমি এত উপকার করলে, কি করে তোমার ঋণ শোধ করি বল দেখি।'

যুবক বলল, 'এ আর এমন কি।'

'না ভাই, তা হয় না, ঋণী করে রেখ না,' ঘেস্তুড়েরা বলল।

'বেশ, সময় হলে আমি নিজেই বলব', যুবক জবাব দিল।

এর কিছুদিন পরেই শহরে এল এক ঘোড়ার ব্যাপারী। সঙ্গে পাঁচশো ঘোড়া। তাকে দেখেই যুবকের মাথায় একটা ফন্দি এল। ঘোড়ার জন্য ঘাস লাগবেই। যুবক ঘেস্তুড়েদের কাছে গেল। তারা তাকে দেখে বেজায় খুশি। সে তাদের বলল, 'কাল তোমরা আমার একটা উপকার করবে।' তারা বলল, 'নিশ্চয়ই, বল কি করতে হবে।'

'কাল তোমরা আমাকে এক আঁটি করে ঘাস দেবে।'

'ঠিক আছে দেব।'

'আর আমার ঘাস যতক্ষণ না বিক্রি হচ্ছে ততক্ষণ তোমরা তোমাদের ঘাস বেচতে যাবে না।'

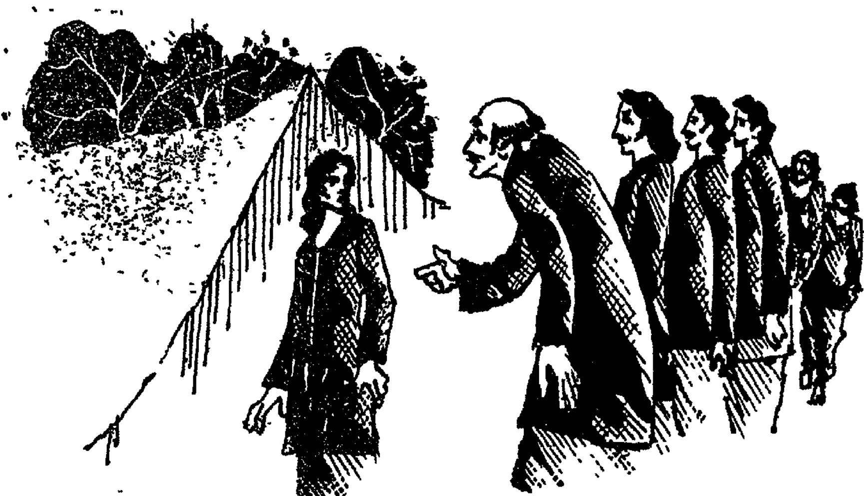
'ঠিক আছে।'

এদিকে সেই ঘোড়ার ব্যাপারী পড়ে গেল মহা বিপদে। যুবক তার কাছে চড়া দাম হাঁকল। সে আর কি করে, বাধ্য হল বেশি দামে ঘাস কিনতে। এভাবে যুবকের পুঁজি গেল বেড়ে।



কয়েকদিন পরে যুবক খবর পেল বন্দরে মালবোঝাই একটা জাহাজ এসেছে। সাত তাড়াতাড়ি সে জাহাজেব মালিকের সঙ্গে দেখা কবতে ছুটল। মালপত্তর দেখে শুনে দরদাম করে, একটা সোনার আংটি দিয়ে জাহাজেব পুবো মালটাই সে বায়না করে ফেলল। আংটিব ওপর তাব নাম লেখা ছিল। আংটিটা দিয়ে সে কাছাকাছি এক জায়গায় তাঁবু ফেলল। লোকলস্কব ভাড়া করে আনল। তারা তাঁবুব বাইরে পাহারা দিতে লাগল।

বারাণসীব প্রায় শ খানেক ব্যবসায়ী এসেছে জাহাজের খোঁজ পেয়ে। কিন্তু মাল কিনতে গিয়ে শুনল, এক মহাজন সব মাল বায়না কবে রেখেছে। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। মহাজনকে



পাওযা গেল সেই তাঁবুর ভেতব। কিন্তু ঢোকাব হুকুম নেই। দারোয়ান একজন একজন কবে তাদেব নিয়ে গেল তাঁবুব মধ্যে। ব্যবসাযীবা ভাবল মহাজন নিশ্চযই বিবাট বড়লোক।

ব্যবসাযী এক এক কবে এক এক হাজাব টাকা আগাম দিয়ে এল মহাজনকে। তা দিযে মোট মালেব সামান্য এক এক ভাগ পাওয়া যাবে। এব পবেও যুবকের নিজেব ভাগে থেকে গেল বেশ বড় একটা ভাগ। সেখান থেকেও কিছুটা কেনাব জন্য ব্যবসাযী-দেব মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এভাবে সমস্ত মাল বেচে যুবক দু লাখ টাকা লাভ কবল।



একদিনের নিঃস্ব যুবক আজ ধনী হয়েছে। কিন্তু সে বোধিসত্ত্বকে ভুলতে পাবে নি। তাব কপাল ফেবাব মূলে আছেন বোধিসত্ত্ব। যুবক বোধিসত্ত্বেব কাছে গেল। তাঁকে প্রণাম কবে সে অর্ঘ্য হিসাবে এক লক্ষ টাকা পাশে রেখে দিল।

বোধিসত্ত্ব অবাক হলেন। জিজ্ঞেস কবলেন, 'এত টাকা কোথায় পেলে ?'

যুবক তখন গোড়া থেকে সব কিছু খুলে বলল। বোধিসত্ত্ব খুব খুশি। মনে মনে ভাবলেন নিঃস্ব অবস্থা থেকে বুদ্ধি ও পবিশ্রমেব জোবে যে এত টাকা কবেছে তাব ভালোমন্দ দেখা উচিত। যাতে সে বিপথে না যায়, সেজন্য এই যুবকেব সঙ্গে আত্মীযতাব সম্পর্ক গড়ে তোলা দবকাব।

বোধিসত্ত্ব নিজেও ধনী। অঢেল তাঁব বিষয-আশয। তবে একমাত্র কন্যা ছাড়া তাঁব আত্মীয় বলতে আব কেউ নেই। কন্যাটি এখন বিবাহযোগ্যা। বিস্তব চিন্তাভাবনা কবে বোধিসত্ত্ব তাঁব মেয়েব সঙ্গে যুবকটিব বিয়ে দিলেন।

বোধিসত্ত্বের মেয়েকে বিয়ে কবায় যুবকটি এখন আবও ধনশালী। কালক্রমে বোধিসত্ত্ব দেহ রাখলেন। বোধিসত্ত্বেব মৃত্যুব পব বাবাণসীব শ্রেষ্ঠীপদও লাভ কবল সেই বুদ্ধিমান যুবক।

জাতকেব এই গল্পটির মূল শিক্ষা হল : স্ফুলিঙ্গ থেকে যেমন দাবানল সৃষ্টি করা যায়, তেমনি অতি সামান্য মূলধন থেকেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশাল ধনসম্পত্তি গড়ে তুলতে পাবে।



কাঠুরে মহারাজ

বোধিসত্ত্ব একবার রাজা ব্রহ্মদত্তের ছেলে হয়ে জন্মান। অবশ্য তাঁর এই জন্মগ্রহণের ঘটনাটা ছিল বেশ নাটকীয়।

রাজা ব্রহ্মদত্ত একবার বাগানে বেড়াতে গিয়েছেন। পরে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসছেন, এমন সময় হঠাৎ দেখলেন ঐ বনের মধ্যে এক যুবতী গান গাইতে গাইতে কাঠ কুড়োচ্ছে। ব্রহ্মদত্ত যুবতীর রূপে মুগ্ধ হলেন। তাকে গান্ধর্বমতে বিয়ে করলেন।

কিছুদিন পরে মেয়েটি গর্ভবতী হল। বোধিসত্ত্ব তার গর্ভে তখন চাঁদের কলার মত বৃদ্ধি পাচ্ছেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত যখন শুনলেন মেয়েটি গর্ভবতী হয়েছে, তখন তিনি তাকে নিজের নাম লেখা একটি আংটি দিলেন। বললেন, 'যদি তোমার মেয়ে হয় তাহলে এই আংটি বিক্রি করে সেই টাকায় তাকে বড় করবে। আর যদি ছেলে হয় তাহলে এই আংটিসমেত তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'



যথাসময়ে বোধিসত্ত্ব জন্ম নিলেন। একদিন মায়েব কোল থেকে নেমে খেলতেও শুরু করলেন। একটু বড় হতে, পাড়াব ছেলেরা তাকে 'বাবাব ঠিক নেই' বলে রাগাত। এতে বোধিসত্ত্ব খুবই দুঃখ পেলেন। একদিন তিনি মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, আমাব বাবা কে?'

মা বলল, 'বাবা, তুমি রাজার ছেলে।'

'তার প্রমাণ কি মা?'

'দেখ বাবা, বাজা যখন আমাদেব ছেড়ে চলে যান, তিনি এই আংটিটা দিয়ে গিয়েছিলেন। আংটিতে তাঁব নাম লেখা আছে। তিনি বলেছিলেন মেযে হলে ঐ আংটি বেচে তার ভরণপোষণ করতে। আব ছেলে হলে তাকে যেন তাঁব কাছে আংটিসমেত নিযে যাই।'

'তাহলে তুমি আমাকে বাজাব কাছে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?'

বোধিসত্ত্বের মা দেখল ছেলে তার বাবাকে দেখাব জন্য খুবই আকুল হয়ে উঠেছে। তাই আর দেবি না কবে ছেলেকে সঙ্গে নিযে সে রওনা দিল। বাজার বাড়িতে পৌঁছে বাজাকে খবব পাঠাল। বাজাব অনুমতি পাওয়া মাত্র সে সিংহাসনেব কাছে গিযে প্রণাম কবে বলল, 'মহাবাজ, এই আপনার ছেলে।'



রাজসভায় সকলেব মধ্যে লজ্জায় পড়ে যাবেন ভেবে মহাবাজ সব কিছু জেনেও না জানার ভান করলেন, 'সে কি কথা? এ আমাব ছেলে হতে যাবে কেন?' বোধিসত্ত্বের মা তখন বলল, 'মহাবাজ, তাহলে এই দেখুন আপনাব নাম লেখা আংটি।' বাজা এতে আবও অবাক হওযাব ভান কবে বললেন, 'এই আংটি তো আমাব নয।'

বোধিসত্ত্বের মা তখন নিরুপায়। সে বলল, 'এমন দেখছি ধর্ম ছাড়া আমার আব কোন সাক্ষী নেই। তাই ধর্মেব দোহাই দিযে বলছি যদি এই ছেলে আপনার হয় তাহলে সে যেন শূন্যে স্থিব থাকে, নাহলে মাটিতে আছড়ে পড়ে সে মাবা যাক।' এই বলে সে বোধিসত্ত্বেব পা-দুটি ধবে তাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল।

শূন্যে উঠে বোধিসত্ত্ব স্থির বইলেন। সেখানে বীবাসনে বসে তিনি মধুর স্ববে ধর্ম কথা বলতে বলতে মহারাজকে বললেন:



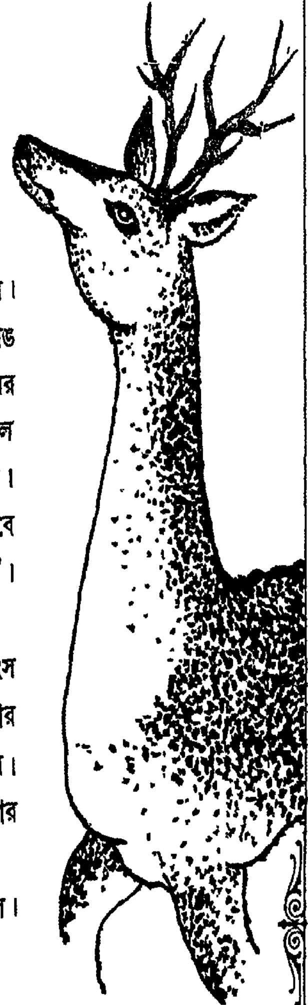
'বাজা, আমি তোমারই ছেলে। আমার মা তোমার ধর্মপত্নী।'

শুনে রাজা বললেন, 'আমার কোলে আয়, বাছা।' রাজার দেখা-দেখি অনেকেই বোধিসত্ত্বকে কোলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব নেমে এলেন বাজার কোলেই। বোধিসত্ত্বকে রাজা যুববাজ কবলেন। তাঁর মা-কে করলেন বাজরাণী।

একদিন ব্রহ্মদত্ত দেহ রাখলেন। বোধিসত্ত্ব তখন রাজ সিংহাসনে বসলেন। তাঁর নাম হল কাঠুরে মহাবাজ।

জাতকেব এই গল্পটির সঙ্গে মহাভারতেব দুষ্মন্ত-শকুন্তলা উপাখ্যানেব বেশ মিল আছে।

হরিণ জাতক



বাজা ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবাব হবিণকুলে জন্ম নেন। সাধারণ হবিণেব সঙ্গে তাঁব চেহাবার বিস্তর অমিল। গায়েব রঙ কাঁচা সোনা। শিং দুটি রূপোর মত চকচকে। চোখেব রঙ বক্ত কজ্জলের মত। লেজটি ছিল ছিল চমরী গাভীর মত। আব শরীরটি দেখতে ছিল তেজী ঘোড়াব ছানার মত। বোধিসত্ত্ব 'ন্যগ্রোধ মৃগরাজ' নাম নেন। পাঁচশ হবিণ-হরিণীব দলপতি হয়ে বনে ঘুবে বেড়াতেন। একটু দূবে এরকমই আরেকটি হবিণ বিচবণ কবত। তাব নাম 'শাখা মৃগ'। তার দলেও ছিল পাঁচশ হবিণ-হরিণী।

ব্রহ্মদত্ত হরিণেব মাংস খেতে খুব ভালবাসেন। হরিণের মাংস না থাকলে তাঁর খাওয়াই হয় না। বোজ বনে যেতেন শিকার কবতে। বাজাব সঙ্গে কর্মচারীদেরও ছুটতে হয় হবিণ শিকারে। ঘরদোব ফেলে, অন্য সব কাজ ফেলে বোজ শিকাব করতে যাওয়ার ঝামেলাট খুব কম নয়।

অনেক ভাবনা চিন্তা করে তাবা একটা ফন্দি বেব করল।



রাজার বাগানেই যদি অনেক হরিণ মজুত করে রাখা যায় তাহলে সমস্যা মেটে। এভাবে তারা দল বেঁধে বনে গেল। হরিণ তাড়িয়ে নিয়ে এল রাজার বাগানে। তাড়া খেয়ে হরিণের দল রাজার বনের মধ্যে ঢুকে পড়লে ফটক বন্ধ করে দিল। তারপর তারা রাজার কাছে গেল। বলল, 'মহারাজ, রোজ হরিণ শিকারে গেলে আমাদের ঘর-গেরস্থের কাজে বিস্তর অসুবিধে হবে। সেজন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করেছি। আপনার বাগানে বনের হরিণ এনে আটক করে রেখেছি। ফলে আপনার খুশিমত রোজ একটা হরিণ জবাই করতে কোন অসুবিধে হবে না।'



রাজা ব্রহ্মদত্ত বাগানে গেলেন। দেখে খুশি হলেন। একসঙ্গে এত হরিণ। 'ন্যগ্রোধ মৃগরাজ' আর 'শাখা-মৃগ'কে দেখে তিনি মুগ্ধ। ওদের দুজনকে ডেকে বললেন, 'তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। তোমাদের কোনদিন কোন ক্ষতি হবে না।'

এরপর থেকে রাজার লোকজন হরিণ মারতে বাগানে ঢুকত। রাজার লোক তীরধনুক নিয়ে ঢুকলে ভয়ে সমস্ত হরিণ ছুটোছুটি শুরু করে দিত, এর ফলে অযথা অনেকে তীর বিদ্ধ হয়ে মারা যেত।

'ন্যগ্রোধ মৃগরাজ' ও 'শাখা মৃগ' তখন সব হরিণদের ডেকে আলোচনা শুরু করল। কেননা এভাবে চলতে থাকলে হরিণকুল দুদিনেই শেষ হয়ে যাবে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হল, এবার থেকে পালা করে একেকজন নিজের ইচ্ছেয় হাঁড়িকাঠে মাথা দেবে।



ব্যবস্থাটি দু দলের সকলেরই পছন্দ হল। পরে রাজাকে জানান হল। তারপর থেকে এই নিয়মেই কাজ হতে থাকল। কোন্ হরিণ কোন্ দিন আত্মবলিদান করবে সেটা দল ঠিক করে দিত।

একদিন শাখা মৃগেব দলেব এক হরিণীব পালা এল। তখন ঐ হবিণীটি পূর্ণগর্ভা। সে শাখামৃগকে অনুবোধ কবল, 'দলপতি, আমি এই অবস্থায় মাবা গেলে বাচ্চাটাও মারা যাবে। তাতে দলেরই ক্ষতি। আজ যদি অন্য কেউ প্রাণ দেয় তাহলে খুব ভাল হয়।'

শাখামৃগ বলল, 'তা হয় না। আজ তোমার পালা। আমি আর কাউকে তোমার বদলে প্রাণ দিতে বলতে পারি না।'

হরিণী তখন বোধিসত্ত্বের কাছে গেল। সব কিছু শোনাব পর বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ভও পেও না, কথা দিচ্ছি তোমাকে বাঁচানোব দায়িত্ব আমার।'

হবিণী চলে গেলে বোধিসত্ত্ব নিজে হাঁড়িকাঠে মাথাটি গলিযে দিলেন।

বাজার লোকজন এসে ন্যগ্রোধ মৃগকে দেখে অবাক হল। সঙ্গে সঙ্গে তাবা বাজাকে খবব দিল। রাজা এসে ন্যগ্রোধ মৃগকে দেখে জিজ্ঞেস কবলেন, 'মৃগবাজ, আমি তোমাকে কথা দিয়েছি তোমাব কোন ক্ষতি হবে না। তাহলে তুমি কেন হাঁড়িকাঠে মাথা দিলে?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহাবাজ, নিয়ম অনুসারে আজ এক হবিণীব পালা। সে গর্ভবতী। তাছাড়া সে আমাব কাছে সাহায্য চেয়েছিল। আমি তার বদলে অন্য কাউকে মবতে বলতে পারি না। তাই নিজেব প্রাণ দিয়ে তাকে বাঁচাব ঠিক কবি।'

'ওঠ মৃগরাজ, তোমাকে আব সেই হবিণীকে অভয় দিচ্ছি।'

বাগানেব আব সব হবিণের কি হবে মহাবাজ?'

'তাদেরও অভয় দিলাম।'

'বনে যে সব হবিণ আছে তাদের কি হবে?'

'তাদেবও অভয় দিচ্ছি।'

'বনের অন্য প্রাণীদের কি হবে মহাবাজ?'

'তাদেবও অভয় দিচ্ছি।'



'মাছ বা জলচর প্রাণীদের কি হবে?'
'তারাও নিরাপদে থাকবে।'
'আকাশচারী পাখিদের কি হবে রাজা?'
'তাদেরও অভয় দিচ্ছি।'

এভাবে সমগ্র প্রাণিজগৎ রক্ষা পাওয়াব পব বোধিসত্ত্ব হাঁড়িকাঠ থেকে মাথা বের করে নিলেন।

তখন বাজা বললেন, 'মৃগরাজ, জীবজগতেব প্রাণ বাঁচাতে আজ তুমি যা করলে তার কোন তুলনা নেই। মানুষেব মধ্যেও এব নজিব নেই। আমি আমাব রাজ্যে আজ থেকে জীবহত্যা নিষিদ্ধ কবে দিলাম।'



তাবপব হবিণবা দল বেঁধে বনে ফিরে গেল। যাবাব আগে বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্মকথা শোনালেন, 'মহারাজ, হিংসা ত্যাগ করুন। সকলকে ভালবাসুন। মৃত্যুব পবে আপনাব স্বর্গ বাস হবে।'

বোধিসত্ত্বেব দয়ায় জীবন ফিবে পাওযাব কিছুদিন পবে সেই গর্ভিণী হবিণী এক শাবক প্রসব কবল। নবজাত সেই হবিণটি শাখা মৃগকে খুব পছন্দ কবত। তার সঙ্গে খেলে বেডাত। তা দেখে হবিণীটি একদিন তাকে বলল, 'বাছা, তুমি শাখামৃগেব সঙ্গে মেশা ছেড়ে দাও। ন্যগ্রোধ মৃগেব সঙ্গে থাক। এতে তোমাব মঙ্গল হবে। তাতে যদি কখনও তোমাব জীবন যায় তবু জানবে সেটাই ভালো। আব শাখামৃগেব সঙ্গে থেকে যদি অমব হও তবে জানবে তাতেও কোন সুখ নেই।'

ওদিকে বাজাব কাছ থেকে অভয় পেয়ে হবিণবা দুবন্ত হযে উঠল। লোকালযে গিযে শস্য ক্ষেত নষ্ট করতে শুরু কবল। বাজাব নিষেধ থাকায় কেউ তাদেব মারতে পাবছে না। সমস্ত প্রজা একজোট হযে একদিন বাজাব কাছে দববাব কবল, 'মহাবাজ, হবিণেব দাপটে আমরা মবতে বসেছি।'

রাজা ব্রহ্মদত্ত সব শুনে বললেন, 'ন্যগ্রোধ মৃগকে আমি যে বর দিযেছি তা ফিবিযে নিতে পাবি না। বাজ্য বসাতলে গেলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কবতে পাবি না।'



বোধিসত্ত্ব রাজার বিচার শুনে দলের হরিণদের ডাকলেন। বললেন, 'আজ থেকে তোমরা লোকের ক্ষেতের শস্য নষ্ট আর করবে না।' তারপর কৃষকদের কাছে খবর পাঠালেন, 'তোমরা ক্ষেতের চারপাশে বেড়া দিও না। ক্ষেতগুলো আলাদা করার জন্য পাতা দিয়ে ঘিরে রাখলেই হবে।'

লোকে বলে, পাতার মালা দিয়ে ক্ষেত ঘেরার প্রথা তখন থেকেই চালু হয়। হরিণরা তারপর থেকে কখনো পাতার মালা ডিঙিয়ে ক্ষেতে ঢোকে নি।

এই জাতকের মর্মকথা ঃ অহিংসা।

অশ্ব জাতক





বারাণসীতে তখন রাজত্ব করছেন ব্রহ্মদত্ত। সেই সময় বোধিসত্ত্ব একবার ঘোড়া হয়ে জন্মান। ভাল জাতের এবং যথেষ্ট সুলক্ষণযুক্ত ছিলেন বলে রাজা তাকে মঙ্গলাশ্ব করে নেন।

বোধিসত্ত্বকে আর পাঁচটি ঘোড়ার সঙ্গে সাধারণ ঘোড়াশালে না রেখে সুন্দর ঘর দেওয়া হয়েছিল। লাখ টাকা দামের সোনার থালায় তাকে দামী পুরনো চালের ভাত খেতে দেওয়া হত। তাছাড়া ঘরটি সুগন্ধে ভরিয়ে রাখা হত। মাথার ওপর সোনার তারা আঁকা চাঁদোয়া। গন্ধ তেলের প্রদীপ জ্বলত।

বারাণসীর আশপাশের রাজাদের অনেক দিনের লোভ বারাণসী দখল করা। একবার সাত রাজা একজোট হয়ে ব্রহ্মদত্তের কাছে একটি চিঠি পাঠাল। তাতে লেখা ছিল, 'আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যদি নিজের রাজ্য রাখতে পার তো ভাল, নাহলে রাজ্য ছেড়ে দাও। আত্মসমর্পণ কর।'

ব্রহ্মদত্ত রাজসভা ডাকলেন। মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি সবাই এল। চিঠিটা সবাইকে দেখিয়ে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি করা উচিত বলুন।' শলা-পরামর্শ করে সবাই একযোগে বলল,



'মহারাজ, প্রথমেই আপনি নিজে যুদ্ধে যাবেন না। ববং আপনি আমাদের বীর অশ্বারোহীকে যুদ্ধে পাঠান। সে যদি না পারে তখন দেখা যাবে কি করা যায়।'

ব্রহ্মদত্ত সেই ঘোড়সওয়ারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখ বাছা, তুমি কি সাত বাজাব সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে?' ঘোড়সওয়াব বলল, 'মহারাজ, যদি মঙ্গলাশ্বে চড়ে যুদ্ধ কবি তাহলে জম্বু দ্বীপেব সব বাজা একজোট হয়ে লড়লেও আমাব সঙ্গে এঁটে উঠতে পাববে না।' বাজা বললেন, 'তোমাব পছন্দমত যে কোন ঘোড়া বেছে নিয়ে যুদ্ধে যেতে পার। ঘোড়সওয়াব তখন নিচু হয়ে রাজাকে প্রণাম করে বলল, 'আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য।'



তারপব সে বোধিসত্ত্বকে তার ঘরের বাইবে নিযে এল। তাকে বর্ম পরিযে দিল। নিজেও সব রকম অস্ত্র গুছিযে নিয়ে বোধিসত্ত্বেব পিঠে চড়ে বসল। তলোযাব খুলে ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সে বেরিয়ে গেল। বোধিসত্ত্ব বিদ্যুৎ গতিতে এক বাজাব সৈন্য ডিঙ্গিযে তাব মুখোমুখি হলেন। ঘোড়সওয়ার সেই বাজাকে বন্দী কবে এক পলকে বাবাণসীতে ফিবে এল।

এভাবে পবপব পাঁচ বাজা বন্দী হল, কিন্তু ছ নম্বব বাজাকে বন্দী করাব সময় বোধিসত্ত্ব আঘাত পেলেন। যদিও তিনি সেই বক্তাক্ত অবস্থাযই ছ নম্বব বাজাকে ঘাযেল কবে বারাণসীতে ফিবে এলেন। কিন্তু ফিবে আসাব পব মাটিতে পড়ে গেলেন।

ঘোড়সওয়ার তখন বোধিসত্ত্বেব সাজ ও বর্ম খুলে আবেকটি ঘোড়াকে সাজাল। বোধিসত্ত্ব চোখ খুলে এই দৃশ্যে দেখে ভাবলেন, 'ঘোড়সওয়ার আবাব ঘোড়া সাজাচ্ছে। কিন্তু সাত নম্বব বাজাকে ঘায়েল কবে ধরে আনা তাব সাধ্যে কুলোবে না।'

তখন তিনি শুযে শুযেই ঘোড়সওয়াবকে ডেকে বললেন, 'ওহে বীব শোন, আমি ছাড়া আব কেউ শত্রুব শিবিবে ঢুকে সাত নম্বব বাজাকে বন্দী কবে আনতে পাববে না। এত কষ্ট কবে আমি যে কাজটা প্রায় সেবে এনেছি তা নষ্ট হতে দেব না। তুমি এক কাজ কব, আমাকে কোনবকমে তুলে দাঁড় কবিযে দাও। তাবপব আমাকে আবাব যুদ্ধসাজে সাজিযে দাও।'



একথা শুনে ঘোড়সওয়ার বোধিসত্ত্বের চোটজখমের জায়গাগুলো বেঁধে দিল। তাঁকে আবার সাজিয়ে দিল। আর, এবারও বোধিসত্ত্ব সাত নম্বর রাজাকে ধরে নিয়ে এলেন বারাণসীতে।

আহত বোধিসত্ত্বকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, এই সাত রাজাকে হত্যা করবেন না। এঁদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিন যাতে আর কখনও হিংসার কবলে না পড়ে। আমি আর এই ঘোড়সওয়ার যে কাজ করলাম তার পুরস্কার এই বীর যোদ্ধাকেই দেবেন। আপনি নিজে দান-ধ্যান করবেন। শান্তির পথে থাকবেন। সুবিচার করবেন।'



বোধিসত্ত্ব তখন মরণাপন্ন। রাজার লোকজন একে একে তাঁর সাজ খুলে ফেলতে লাগল। তবে তাদের কাজ শেষ হওয়ার আগেই বোধিসত্ত্ব পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

রাজা বোধিসত্ত্বের শেষ কাজ মর্যাদার সঙ্গে করলেন। বীরকে অনেক পুরস্কার দিলেন। অহিংসার পথে চলার শপথ করিয়ে রাজাদের ছেড়ে দিলেন। আর নিজে শান্তিতে রাজ্যশাসন করে একদিন লোকান্তরে গেলেন

এই জাতকের শিক্ষা হল : জ্ঞানী বিপদের মধ্যেও দিশেহারা হন না। প্রাণ দিয়ে কর্তব্য পালন করেন।



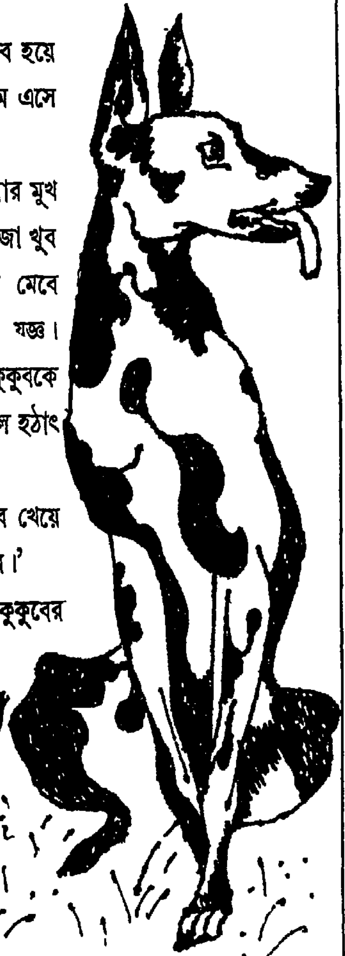
কুকুর জাতক



বোধিসত্ত্ব একবার কুকুরকুলে জন্ম নেন। স্থান ঃ সেই বারাণসী এবং বাজত্ব করেছেন ব্রহ্মদত্ত। বোধিসত্ত্ব তখন শ-শ কুকুবেব সঙ্গে মহাশ্মশানে থাকতেন।

সাজন্‌-গোছান রথে চড়ে বাগানে বেবিয়ে বাজা ব্রহ্মদত্ত এক সন্ধ্যায় ফিবে এলেন। চামডা দিয়ে সাজান বথের সাজগুলো সে বাতে আব খুলে বাখা হল না। সাজসমেত বথটি উঠানেই পড়ে রইল।

বাতে জোর বৃষ্টি হল। তাতে চামডাব সাজ ভিজে জবজবে হয়ে গেল। তখন বাজাব পোষা কুকুবেব দঙ্গল দোতলা থেকে নেমে এসে সেগুলো খেযে ফেলল।



পরেব দিন বাজাব চাকবেরা বাজাকে বলল, 'মহাবাজ, নর্দমার মুখ দিয়ে বাইবেব কুকুর ঢুকে বথেব সাজ খেয়ে ফেলেছে।' শুনে বাজা খুব বেগে গেলেন। হুকুম হল ঃ 'যেখানে যত কুকুব আছে সব মেবে ফেল।' সাবা শহবে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হযে গেল কুকুব হত্যা যজ্ঞ। প্রাণেব ভযে একদল কুকুব বোধিসত্ত্বেব কাছে ছুটে এল। অত কুকুবকে একসঙ্গে দেখে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস কবলেন, 'তোমবা সবাই মিলে হঠাৎ শ্মশানে এলে কেন?'

তারা বলল, 'আমাদেব বাঁচান। বাজাব রথেব সাজ কুকুবে খেয়ে ফেলেছে। রাজা হুকুম দিয়েছেন, কুকুব দেখলেই বধ কবা হবে।'

বোধিসত্ত্ব ভেবে দেখলেন, রাজবাড়িতে ঢুকে বাইবের কুকুবের





পক্ষে এ কাজ কবা সহজ নয়। রাজাব পোষা কুকুবরাই এর হোতা। মজা হল, দোষ করেও তাবা নিবাপদে আছে। আব যারা কোন দোষ করেনি তাবা মাবা যাচ্ছে। আমার উচিত রাজাকে দেখিয়ে দেওয়া কে দোষী। এতে আমাব জাতভাইদেব প্রাণ বাঁচবে।

তখন আর সব কুকুরকে ডেকে তিনি বললেন, 'তোমাদেব ভয় নেই। আমি তোমাদেব বাঁচাবাব বাস্তা খুঁজে বেব কবব। তবে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না বাজাব সঙ্গে দেখা কবে ফিবে আসছি ততক্ষণ তোমবা এখানে অপেক্ষা কববে।'

তাবপব বোধিসত্ত্ব ইষ্টদেবতার নাম স্মবণ নিলেন্। মনে মনে এই ইচ্ছা প্রকাশ কবলেন, 'বাস্তায় কেউ যেন আমাকে লাঠি বা ঢিল দিয়ে না মাবে।' ফলে তাঁকে দেখে কাবো মনে বাগ দেখা দিল না।



বাজা তখন বিচাবালয়ে। বোধিসত্ত্ব সেখানে ঢুকেই এক লাফে রাজাব আসনেব তলায় লুকিয়ে পড়লেন। বাজার চাকররা তাঁকে তাড়া কবল। কিন্তু বাজা তাদেব বাধা দিলেন। ভবসা পেয়ে বোধিসত্ত্ব বাজার আসনেব তলা থেকে বেবিয়ে এলেন। বাজাকে নমস্কাব করে জিজ্ঞেস কবলেন, 'মহাবাজ, আপনি কি কুকুব মেবে ফেলাব আদেশ দিয়েছেন?'

হ্যাঁ।

কুকুববা কি অপবাধ কবেছে বাজা?

তাবা আমাব বথেব চামড়াব সাজ খেয়ে ফেলেছে।

কোন্ কুকুব খেয়েছে জানেন কি?

না, তা জানি না।

সত্যিকাবের অপবাধীকে না চিনে সব কুকুব মাবার এই আদেশ দেওয়া কি ঠিক হয়েছে?

কুকুব বথেব চামড়া খেয়েছে, তাই সব কুকুরকেই মারা হবে।

আপনার লোক কি সব কুকুরকে মাবছে, না কি কোন কোন কুকুরকে মারা হচ্ছে না?

রাজবাড়িতে ভালো বংশের যেসব কুকুর আছে তাদেব মাবা হচ্ছে না।



তাহলে তো সব কুকুরকে মারা হচ্ছে না। রাজবাড়িব কুকুরবা রেহাই পাচ্ছে। এটা কি সুবিচারেব নমুনা হল? বিচাব হবে দাঁড়িপাল্লাব মত সমান সমান।

বেশ তো, কুকুর দলপতি, আপনিই বলুন না কে বথেব চামড়া খেযেছে?

বাজবাড়িব কুকুব মহাবাজ।

প্রমাণ কি?

আপনি বাজবাড়িব কুকুবদেব এখানে আনান। আমাকে একটু ঘোল আর কুশ দিন।

এব পব বোধিসত্ত্ব ঘোলেব সঙ্গে কুশ মিশিযে বাজবাড়িব কুকুবদেব খাওযালেন। তখন তাবা বমি কবে ফেলল। আর বমিব সঙ্গে চামড়াব টুকবো উঠে এল।

সব দেখে শুনে বাজা খুবই প্রীত হলেন। তিনি বললেন, 'বাঃ, এ বেশ ভালো ব্যবস্থা।' তাবপব নিজেব শ্বেতছত্র দিয়ে বোধিসত্ত্বেব পুজো কবলেন। বোধিসত্ত্বও বাজাকে অনেক ধর্মকথা শোনালেন।

এই জাতকেব মূল কথা ঃ স্বজাতিব মঙ্গল সাধনই জীবেব ধর্ম।



মহিলামুখ জাতক

বোধিসত্ত্ব এক সময বাজা ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী ছিলেন। তখন বাজার হাতিশালে সুলক্ষণযুক্ত একটি হাতি ছিল। তাব নাম মহিলামুখ। হাতিটি এত শান্ত ও ভব্য ছিল যে বাজা তাকে মঙ্গলহস্তী কবেন।

এক বাতে হাতিশালাব পাশে কযেকটি চোব এসে আলাপ কবতে বসে। চুবি-চামাবিব ব্যাপারে তাবা শলা পবামর্শ শুরু কবল। তাবা এইসব কথা বলাবলি করতে লাগল ঃ

'সিঁদ কাটতে হবে ঠিক এখানটায। পাঁচিলের এই জাযগায় ফোকব বানিযে ভেতবে ঢুকতে হবে। চুবিব মাল নিযে পালিযে যাওয়াব আগে ফোকবটা আবো বড কবে নিতে হবে। চুবি করাব



সময় যদি দরকার হয় তাহলে খুন পর্যন্ত করতে হবে। তাহলে আব কাবো সাধ্যি হবে না বাধা দেওয়াব। চোরের অত ভদ্র শান্ত হলে চলে না। তাকে হতে হবে দয়ামাযাহীন।'

এইসব পবামর্শ কবে সে বাতের মত তারা চলে গেল। তাবপর আবাব পরেব বাতে এল। কথাবার্তা সেই এক। ভোব হওযার আগে আবাব চলে গেল। এভাবে বাতের পব রাত চলতে লাগল।

বোজ রাতে এইসব পবামর্শ শুনে মহিলামুখ হাতির মাথাটা গেল বিগডে। সে ভাবল, 'এবা আমাকেই উপদেশ দিচ্ছে। আমাকে এবাব দয়ামাযা ছাড়তে হবে। খুনটুন কবতে হবে।' পবেব দিন সকালেই সে একেবাবে ভিন্ন মূর্তি ধারণ কবল। প্রথমে ভোরবেলা মাহুত আসা মাত্র তাকে শুঁডে জডিযে তুলে এক আছাড় মারল। সে বেচাবাব ভবলীলা সাঙ্গ হল। তাবপব যে এল হাতি তাকেই আছড়ে মাবতে লাগল।

মহিলামুখ পাগল হযে গেছে শুনে ব্রহ্মদত্ত খুব দুশ্চিন্তায পড়ে গেলেন। মন্ত্রী বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'আপনি একবাব দেখে আসুন না হাতিটাব কি হল, হঠাৎ কেন মাথাটা বিগড়ে গেল।'

বোধিসত্ত্ব নানাভাবে মহিলামুখকে খুঁটিযে দেখলেন। শবীবে বোগেব কোন চিহ্ন পেলেন না। তখন ভাবতে লাগলেন হঠাৎ এমন কি হল যে, শান্ত সুন্দব মহিলামুখ এমন দুর্দান্ত হয়ে উঠল। বোধিসত্ত্ব জানতেন হাতি খুব অনুকরণপ্রিয জীব। ফলে তাঁব মনে হল, নিশ্চয়ই বদমাযেশ লোকজন এব ধাবেকাছে বসে খারাপ কথা আলোচনা কবেছে। হাতি ভেবেছে তাকেই ঐসব করতে বলা হচ্ছে।



হাতিশালেব লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'ইদানিং হাতিশালেব কাছে কোন বদমাযেশ লোকজনকে ঘুবঘুব কবতে দেখেছ কি ?'

সে বলল, 'হ্যাঁ কর্তা, কদিন ধবেই কযেকটা চোব এসে কিসব ফিসফিস কবত।'

বোধিসত্ত্ব তখন বাজাকে বললেন, 'মহাবাজ, হাতিব শবীবে কোন বোগ নেই। চোবেব কথা শুনে তাব মাথা বিগডেছে।'

শুনে রাজা বললেন, 'এখন উপায কি ভাই বলুন।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'জ্ঞানী ব্রাহ্মণদেব ডাকিযে আনুন, তাঁবা কযেকদিন হাতিশালেব পাশে ভালো ভালো কথা আলোচনা কবলেই মহিলামুখ আবাব শান্ত হযে যাবে।'

ব্রহ্মদত্ত বললেন, 'আপনিই তাব বন্দোবস্ত করুন।'

বোধিসত্ত্ব সেবকম ব্যবস্থা কবলেন। ব্রাহ্মণবা আলোচনায বসে বলতে লাগলেন, 'কাউকে মাবধোব কবা খুব খাবাপ। সবাইকে ভালোবাসতে হবে। ক্ষমা কবতে হবে। তবেই না স্বর্গে যাওযা যাবে।'

এইসব উপদেশ শুনে মহিলামুখ আগেব মতই ভাবল, 'এবা আমাকেই উপদেশ দিচ্ছে। এখন থেকে আমি শান্ত সভ্য হযে চলব।' আর সত্যি মহিলামুখ আবাব আগেকাব মতই ভালো হয়ে গেল।



ব্রহ্মদত্ত এই কাণ্ড দেখে অবাক। ভাবলেন, সত্যি বোধিসত্ত্বেব গুণেব কোন শেষ নেই। জীবজন্তুব ভাবাও জানেন। বাজা তখন বোধিসত্ত্বকে খুবই সম্মান দেখালেন।

এই জাতকেব নীতিকথা হচ্ছে ঃ বিচাব বিবেচনা না কবে অন্ধ অনুকবণ উচিত নয।

কৃষ্ণ জাতক

ব্রহ্মদত্তেব আমলে বোধিসত্ত্ব একবার গোরু হযে জন্মান। যে গেরস্থের গোযালে তাঁব জন্ম হয তাদেব অবস্থা ভাল ছিল না। তাঁবা এক বৃদ্ধার বাড়িতে ভাড়া থাকত। পবে ভাড়া দিতে না পারায ভাড়াব বদলে বৃদ্ধাব হাতে বোধিসত্ত্বকে তুলে দেয। বৃদ্ধা তাঁকে ছেলেব মত ভালোবাসত। ভাত, ফ্যান ছাড়াও ভালো ভালো জিনিস খেতে দিত।



বোধিসত্ত্ব একটু ডাগব হতেই গাযেব বঙ হল কাজল কালো। গাঁযেব গোরুদেব সঙ্গে বোধিসত্ত্বও মাঠে চবতে যেতেন। তাঁর মেজাজ ছিল খুব ঠাণ্ডা। বাচ্চাবা তাব শিং ধবে টানত, কান ধবে টানত গলা ধবে ঝুলে পডত। কিন্তু তিনি কখনো তাদেব গুঁতোতেন না।

বোধিসত্ত্বেব সঙ্গে ঐ বৃদ্ধাব সম্পর্কটা দাঁড়িযে গিযেছিল মা-ছেলেব। একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'আমাব মা কত কষ্ট কবে। আমি ছেলে হযে কিছুই কবতে পাবছি না। যদি টাকা বোজগাব কবতে পাবি, মাব দুঃখ একটু কমে।' এই ভেবে তিনি কাজেব খোঁজ কবতে লাগলেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব দেখলেন নদীর ধাবে পাঁচশ গোরুব গাড়ি নিযে একজন লোক হিমসিম খাচ্ছে। বোধিসত্ত্ব তখন মাঠে চবছিলেন। নদী পর্যন্ত এসে গাড়িগুলো আব নডছে না। হাজাব গোরু একসঙ্গে যুতেও কোন লাভ হচ্ছে না। সবাই মিলে টেনেও একখানা গাড়ি অবধি নডাতে পাবছে না। আশপাশে যেসব গোরু চবে বেড়াচ্ছিল লোকটা তাদেব খুঁটিযে দেখতে লাগল। সে গোরু চিনত। এক নজব দেখেই বুঝতে পাবত কোন্ গোরুটা ভাল জাতেব, কোন্টা খাবাপ জাতেব।

বোধিসত্ত্বকে দেখেই বুঝতে পারল. 'এ বেশ ভাল জাতেব গোরু। গাযে জোব আছে। একে দিযেই আমাব কাজ হবে।' তখন সে বাখালকে জিজ্ঞেস কবল: 'এই গোরুটা কার? একে গাড়িতে যুতে গাড়ি পাব কবতে পাবলে ভাল মজুরি দেব।'



বাখাল বলল, 'গোরুব মালিক এখানে নেই। আপনি ইচ্ছে করলেই একে গাড়িতে যুতে নিতে পাবেন।'

কিন্তু লোকটা যখন বোধিসত্ত্বেব নাকে দড়ি লাগিয়ে তাঁকে টানতে গেল, সে এক পা-ও নডল না। বোধিসত্ত্ব মনে মনে ঠিক কবেছিলেন, 'মজুবি ঠিক না হলে নড়ছি না।' লোকটি তাঁব মনেব ভাব বুঝে বলল, 'আপনি এই পাঁচশ গাড়ি পাব কবে দিলে গাড়ি পিছু দু টাকা কবে দেব। মানে সবশুদ্ধ হাজাব টাকা দেব।' বোধিসত্ত্ব তখন নিজে থেকেই গাড়িগুলোব দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে একেকবাব একেকটা গাড়িব সঙ্গে যুতে দেওয়া হতে লাগল আব তিনি টেনে টেনে সেগুলো পাব কবে দিতে লাগলেন। এভাবে পাঁচশ গাড়িই পাব কবা হয়ে গেল।



লোকটি বণিক। সে ভাবল দু টাকাব বদলে এক টাকা কবে দিলে পাঁচশ টাকা বাঁচে। তাই সে পাঁচশ টাকা একটা ছোট থলেয পুবে বোধিসত্ত্বেব গলায ঝুলিয়ে দিল। তখন বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'লোকটা দেখছি এক নম্ববেব ঠগ, চুক্তিমত মজুবি দিচ্ছে না। তাহলে আমিও একে যেতে দেব না।' যেমন ভাবা তেমনি কাজ। বোধিসত্ত্ব গাড়িগুলো আগলে দাঁড়ালেন। তাঁকে এক চুলও নডান গেল না।

বণিক বুঝতে পাবল, 'আমি যে চুক্তিমত টাকা দিই নি সেটা বোধ হয গোরুটি টেব পেয়েছে।' তখন সে বোধিসত্ত্বেব থলেটিতে আবো পাঁচশ টাকা দিযে বলল, 'এই নিন, আপনাব মজুবিব পুবো টাকা দিযে দিলাম।'

বোধিসত্ত্ব হাজাব টাকা তাব মাকে দিলেন। বৃদ্ধা টাকা পেযে অবাক। 'কোথায পেলি বাবা' বলে সে বোধিসত্ত্বেব দিকে তাকাল। অত কষ্ট কবে বোধিসত্ত্ব তখন বেশ কাহিল। বাখালেব মুখে সব শুনে বৃদ্ধা বলল, 'আহাবে বাছা, তোব বোজগাবে খাব। আমি কোন দিন তো তোকে কিছু বলিনি, কেন তুই অত খাটতে গেলি।' তাবপব সে বোধিসত্ত্বেব শবীবে হাত বোলাতে লাগল। গবম জলে তাঁকে স্নান কবাল। খেতে দিল।

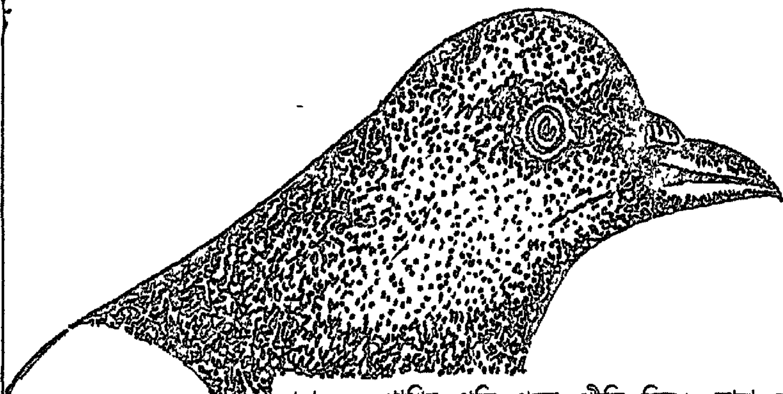
এই গল্পেব নীতিকথা হল ঃ মাযেব সেবা কবা প্রকৃত সন্তানেব কাজ।



কপোত জাতক



বাবাণসীব বাজা তখন ব্রহ্মদত্ত। বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্তের আমলে পাযবা হয়ে জন্মান। বাবাণসীব নাগবিকদেব মধ্যে তখন পায়রা ও



নানা বকম পাখিব প্রতি প্রবল প্রীতি ছিল। তাবা মনে কবত পাখিদের যত্নআত্তি কবলে নিজেদেব মঙ্গল হবে। পাখিদেব থাকাব সুবিধেব জন্য তাবা খড দিযে ঝুডি বানিযে দেযালে ঝুলিযে বাখত। বাবাণসীব প্রধান বণিকেব বাঁধুনিও বান্নাঘবে এবকম একটা ঝুডি ঝুলিযে রেখেছিল। বোধিসত্ত্ব সেই ঝুডিটিতে থাকতেন। বোজ সকালে তিনি খাবাবেব খোঁজে বেবিযে যেতেন। ফিবতেন সন্ধ্যাবেলা।

একটি কাক একদিন সেই বান্নাঘবেব চালেব ওপব দিযে উডে যাচ্ছিল। উডে যাওযাব সময বান্না মাংসেব সুগন্ধ পেযে তাব খুব লোভ হল। কি করে মাংস খাওযা যায ভাবতে লাগল। পাশেব একটা গাছে বসে বইল। আব ভেবে চলল। সন্ধ্যা হলে বোধিসত্ত্ব ফিবে এলেন। বোধিসত্ত্ব বান্নাঘবে ঢুকে গেলেন। তা দেখে কাক ভাবল এই পাযবাটাই আমাব ভবসা। ওব ওপব ভব কবলেই আমাব মনের আশ মিটিবে।

পবেব দিন ভোবে বান্নাঘবেব কাছে কাকটা অপেক্ষা কবছিল। বোধিসত্ত্ব খাবাবেব খোঁজে উডতে শুরু কবলে সে-ও পিছু পিছু উডে চলল। বোধিসত্ত্ব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমাব সঙ্গে আসছ কেন ভাই?'



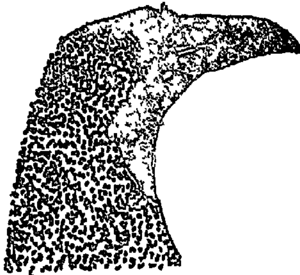
কাক বলল, 'আপনাকে আমাব খুব মনে ধবেছে, এখন থেকে আপনাব চেলা হয়ে থাকতে চাই।'

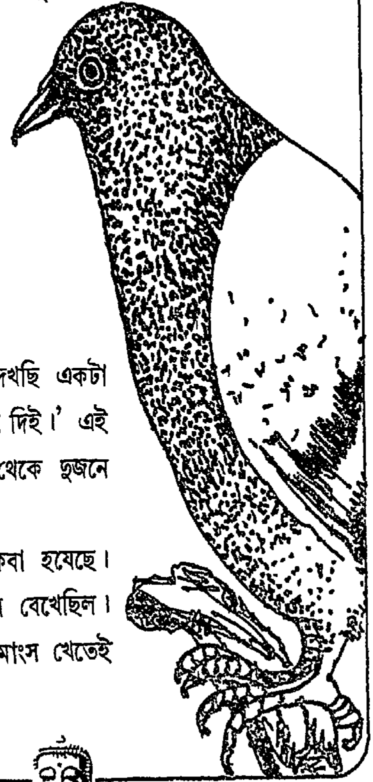
বোধিসত্ত্ব বললেন, 'সে কি কথা। তুমি এক জিনিস খাও, আমি আরেক জিনিস খাই। আমাব চেলা হলে তোমাব অনেক কষ্ট হবে।'

কাকেব মনে তো দুষ্টু বুদ্ধি। সে বলল, 'খাবাবেব ব্যাপাবটা সত্যিই আলাদা। যখন আপনি আপনাব খাবাবেব খোঁজে থাকবেন সেই ফাঁকে আমি খাবাবটা জুটিয়ে নেব। শুধু আপনাব সঙ্গে থাকাব অনুমতি দিন।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বেশ তাই হোক। তবে তোমাকে সাবধানে চলাফেবা কবতে হবে।'

কাককে সাবধান কবে দিয়ে বোধিসত্ত্ব ঘাসেব বীজ খুঁটে খেতে লাগলেন। কাকও তখন পোকামাকড ধবে খেতে লাগল। নিজেব পেটটি ভবাব পব সে বোধিসত্ত্বেব কাছে এসে বলল, 'প্রভু, আপনি অনেকক্ষণ ধবে খেয়ে যাচ্ছেন। বেশি খাওয়া ভালো নয়।' যাই হোক এবপব সন্ধ্যাবেলা বোধিসত্ত্ব বাসায় ফিবছেন। সঙ্গে সেই অনুগত কাকটিও আছে।





তাবা বান্নাঘবে ঢুকলে বাঁধুনি ভাবল, 'পাযবাটা দেখছি একটা সঙ্গী জুটিয়েছে। তাহলে এব জন্যও একটা ঝুডি ঝুলিয়ে দিই।' এই ভেবে সে আবেকটি ঝুডি ঝুলিয়ে দিল। তাবপব থেকে দুজনে ওখানেই বয়ে গেল।

একদিন বণিকেব বাডিতে মস্ত ভোজেব আযোজন কবা হযেছে। বাঁধুনি বান্নাঘবেব নানা জাযগায প্রচুব মাংস ঝুলিয়ে বেখেছিল। দেখে কাকেব দাৰুণ লোভ হল। 'যেভাবে হোক এই মাংস খেতেই হবে,' মনে মনে সে ঠিক কবল।

তারপর সে সারা রাত অসুখের ভান করে কাতরাতে লাগল। ভোরবেলা বোধিসত্ত্ব বললেন, 'চল ভাই, এবার চরতে যাই।' শুনে কাক বলল, 'আজ আপনি একাই যান, আমার কাঁধে বড় ব্যথা হয়েছে।' শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ভাই, কাকের যে কাঁধে ব্যথা হয় কোনদিন শুনিনি। মনে হচ্ছে রান্নাঘরের মাংসের লোভেই তুমি এসব বলছ। এসব বাদ দাও, মানুষের খাবার তোমার খাবার হতে পারে না। আমার সঙ্গে চল, নিজের খাবার খুঁটে খাবে।'

কাক বলল, 'না প্রভু, আমার সত্যি চলার শক্তি নেই।' তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কাজেই পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে লোভে পড়ে কিছু করতে যেও না।'

বোধিসত্ত্ব চলে গেলেন। বাঁধুনি মাংস রান্না করতে লাগল। ভাপ বের করে দেওয়ার জন্য কড়াইয়ের ডালাটা একটু ফাঁক করে দিল। তারপর কড়াইতে ঝাঁঝরি বসিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে একটু বাইরে গেল। কাকও তখন ঝুড়ি থেকে মাথা বের করে দেখল রাঁধুনি বাইরে গিয়েছে।

কাক ভাবল, মাংস খাওয়ার এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। বেশ বড় দেখে একটা মাংসের টুকরো খাওয়াই ভাল। এই ভেবে সে ঝাঁঝরির কাছে বসতে যেতেই ঝাঁঝরিতে ঝনঝন শব্দ হল। বাঁধুনিও ছুটে এল সঙ্গে সঙ্গে।

কাকের কাণ্ড দেখে সে বেজায় রেগে গেল। রান্নাঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে কাককে ধরে ফেলল। কাকের সমস্ত পালক ছাড়িয়ে নিল সে। তারপর নুন-লঙ্কা বাটা তার সারা শরীরে মাখিয়ে ঝুড়ির ভেতর ফেলে দিল।

বোধিসত্ত্ব ফিরে এসে দেখলেন কাক ছটফট করছে। কাছে গিয়ে তার হাল দেখে বুঝলেন, 'অতি লোভেই কাকের এই অবস্থা।' তারপর ভাবলেন, 'আমারও আর এখানে থাকা উচিত নয়।'

বোধিসত্ত্ব চলে গেলেন। বাঁধুনি কাককে ঝুড়িসমেত ময়লার গাদায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এই জাতকের মর্মকথা হল : বেশি লোভ করলে তার ফল পেতেই হবে।





বেদব্ভ জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বারাণসীতে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। ব্রাহ্মণ 'বেদব্ভ' মন্ত্রে সিদ্ধ ছিল । এই মন্ত্রের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। তিথি নক্ষত্র দেখে একটি বিশেষ যোগে এই মন্ত্র পাঠ করে আকাশের দিকে তাকালে সাত রকম রত্নের বৃষ্টি হত। বোধিসত্ত্ব লেখাপড়া শেখার জন্য এই ব্রাহ্মণের শিষ্য হন।

একবার বিশেষ দরকারে ব্রাহ্মণকে চেতিয় রাজ্যে যেতে হবে। বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে নিয়ে সে রওনা হল। পথে আছে এক গভীর বন। যেতে হলে সেই বনের মধ্য দিয়েই যেতে হবে। অথচ বনটি মোটেই নিরাপদ নয়। সেখানে 'প্রেষণক' নামে একদল ডাকাত থাকে। ডাকাতরা দলেও ভারি, পাঁচশ। তাদের হামলায় পথিককুলের বিপদের অন্ত ছিল না।

এই ডাকাতদের 'প্রেষণক' বলা হত, কারণ তারা দুজন পথিককে ধরলে একজনকে ছেড়ে দিত বাড়ি থেকে মুক্তিপণের টাকা নিয়ে আসতে। বাবা আর ছেলেকে ধরলে তারা মুক্তিপণ আদায়ের জন্য বাবাকে পাঠাত। মা আর মেয়েকে ধরলে পাঠাত মাকে। দু ভাইকে ধরলে মুক্তিপণ আনার ভার পড়ত বড় ভাইয়ের ওপর। গুরু-শিষ্যকে ধরলে শিষ্যকে পাঠাত।

ডাকাতের দল ব্রাহ্মণ আর বোধিসত্ত্বকে ধরে ফেলল। নিয়ম অনুসারে তারা বোধিসত্ত্বকে ছেড়ে দিল টাকা আনার জন্য। বোধিসত্ত্ব গুরুকে প্রণাম করে বললেন, 'দু-একদিনের মধ্যেই আমি ফিরে আসব। আমি যা বলছি আপনি যদি সেভাবে এই দুদিন থাকেন তাহলে কোন ভয় নেই। আজ রত্ন বর্ষণের যোগ আছে। কিন্তু সাবধান, ভুলেও এ কাজ করতে যাবেন না। যদি করেন তাহলে আপনি তো মরবেনই,





এই পাঁচশ ডাকাতও মারা যাবে।' গুরুকে সাবধান করে দিয়ে বোধিসত্ত্ব মুক্তিপণ আনতে রওনা দিলেন।

এদিকে সন্ধ্যা হল। ডাকাতরা ব্রাহ্মণকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছে। বনের মাথায় তখন পূর্ণিমার চাঁদ। ব্রাহ্মণ নক্ষত্র দেখে বুঝতে পারল 'মহাযোগ' এসে গিয়েছে। সে তখন মনে মনে ভাবল, 'খামোকা এত কষ্ট করছি কেন? ডাকাতরা রত্ন পেলেই আমাকে ছেড়ে দেবে। মন্ত্র পড়লেই রত্ন পাওয়া যাবে। ডাকাতদের মুক্তিপণ চুকিয়ে দিলে যেখানে খুশি যেতে পারব।' এই ভেবে সে ডাকাতদের ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা আমাকে বেঁধে রেখেছ কেন?'

'টাকার জন্য।'

'যদি টাকাই পেতে চাও তাহলে এক্ষুনি বাঁধন খুলে দাও। আমাকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরাও। চন্দন আর মালায় আমাকে সাজিয়ে দাও। তারপর কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও।'

ডাকাতরা ব্রাহ্মণের কথা শুনল। ব্রাহ্মণ যা-যা বলল তারা ঠিক সেভাবে সব কাজই করল। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়ে আকাশের দিকে তাকাতেই রত্নবৃষ্টি শুরু হল। ডাকাতরা পুঁটলিতে রত্ন বেঁধে নিয়ে রওনা দিল। ব্রাহ্মণও তাদের সঙ্গ নিল।



অবশ্য তাদের বেশি দূর যেতে হল না। আরেক দল ডাকাত, সংখ্যায় তারাও পাঁচশ, এসে প্রেষণকদের ঘিরে ফেলল। প্রথম ডাকাত দল দ্বিতীয় ডাকাত দলকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা আমাদের বন্দী করছ কেন?'

তারা জবাব দিল, 'টাকার জন্য।'

তখন প্রথম ডাকাত দল বলল, 'তাহলে এই ব্রাহ্মণকে ধর, উনি আকাশের দিকে তাকালেই রত্ন বৃষ্টি হয়। আমাদের সঙ্গে যেসব রত্ন দেখছ সব উনিই দিয়েছেন।'

দ্বিতীয় ডাকাত দল তখন ব্রাহ্মণকে ধরল, 'আমাদের এক্ষুনি রত্ন দাও।'

ব্রাহ্মণ বলল, 'দেখ ভাই, রত্ন বৃষ্টি সব সময় হয় না, তার জন্য বিশেষ যোগ আছে। যে যোগে রত্ন বর্ষণ হয় তা ফিরে আসতে আবার এক বছর লাগবে। তোমাদের রত্ন দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে।'

শুনে ডাকাতদল বেজায় রেগে গিয়ে বলল, 'চালাকি করছ। এক্ষুনি তুমি প্রেষণকদের রত্ন দিলে, আর আমাদের বেলায় এক বছর অপেক্ষা করতে বলছ?' সঙ্গে সঙ্গে তারা ব্রাহ্মণকে দু টুকরো করে ফেলল। তারপর আক্রমণ করল প্রেষণকদের। প্রেষণকরা মারা গেলে রত্ন নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ লাগল। মারামারি কাটাকাটি করে দুজন ছাড়া সবাই মারা গেল।





ঐ দুজন ডাকাত তখন গ্রামের কাছাকাছি এক জঙ্গলে রত্নগুলো লুকিয়ে রাখল। দুজনেরই খুব খিদে পেয়েছে। এক ডাকাত রত্ন পাহারা দিতে লাগল। আরেক ডাকাত চাল কিনে এনে রান্না চাপাল। রত্ন পাহারা দিচ্ছিল যে সে ভাবল আরেকজনকে শেষ করলে সে অনেক টাকার মালিক হবে। তাই তরোয়াল হাতে নিয়ে তৈরি থাকল, দ্বিতীয় জন ভাত রান্না করে আসা মাত্র তাকে মেরে ফেলবে। দ্বিতীয় ডাকাতও একই কথা ভাবছিল। তাই সে নিজের খাওয়া শেষ করে অপর জনের ভাতে বিষ মিশিয়ে নিয়ে এল। ফল যা হবার তাই হল। দুজনই মরে পড়ে রইল।

বোধিসত্ত্ব ফিরে এসে সব কিছু দেখলেন। গুরুকে দাহ করলেন। আর মনে মনে ভাবলেন, 'নিজের স্বার্থে যা খুশি তাই করলে এ রকমটাই হয়।'

মহাশীল জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার রাজমহিষীর গর্ভে জন্ম নেন। তাঁর নাম রাখা হয় 'শীলবান কুমার।' ষোল বছর বয়সের মধ্যে তিনি সর্ব বিদ্যায় শিক্ষিত হন। তারপর বাবার মৃত্যুর পর রাজা হলেন। রাজ্য পরিচালনায় ধর্ম বুদ্ধির জন্য লোকে তাঁকে মহাশীলবান রাজা বলত।

রাজা মহাশীলবানের এক মন্ত্রী অন্তঃপুরের এক যুবতীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। সেই ঘটনা পাঁচ কান হয়ে রাজার কানেও এল। শীলবান রাজা তখন তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন।



সেই মন্ত্রী তখন কাশী ছেড়ে কোশল রাজ্যে গেল। সেখানকার রাজার বেশ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। একদিন সে কোশলরাজকে বলল, 'মহারাজ, কাশী হল এমন এক রাজ্য যার তুলনা করা চলে মৌমাছি-হীন মৌচাকের সঙ্গে। ওখানকার রাজা খুব ভীতু, সামান্য সৈন্য নিয়েও কাশী দখল করা সহজ।'



শুনে কোশলরাজ ভাবল, 'লোকটা নিশ্চয়ই শত্রুর চর। নইলে কাশী অত বড় রাজ্য, আর এ বলে কিনা সামান্য সৈন্য নিয়ে কাশী দখল করা সম্ভব।' তখন কোশলরাজ তাকে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে তুমি কাশীরাজের গুপ্তচর।'

'না, মহারাজ। আমার কথা যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনি সীমান্তের গ্রামে অত্যাচারের জন্য দু-চার জন লোক পাঠান। দেখবেন তারা অত্যাচার করা সত্ত্বেও কাশীরাজ তাদের কোন শাস্তি দেবেন না।'

তার কথা শুনে কোশলরাজের মনে হল হয়ত ও ঠিকই বলছে। পরীক্ষা করার জন্য সে প্রথমে কাশীরাজের সীমান্তের গ্রামে হামলা করার জন্য জনকয়েক লোককে পাঠাল। হামলাকারীরা ধরা পড়ল। কাশীরাজের কাছে তাদের নিয়ে গেলে তিনি বললেন, 'তোমরা অহেতুক গ্রামের লোকগুলোকে মারতে গেলে কেন?'

তারা বলল, 'মহারাজ, আমরা পেটের জন্য ডাকাতি করি।'

তখন কাশীরাজ বললেন, 'অযথা প্রাণীবধ না করে আমার কাছে এলেই পারতে। যাক গে, যা হবার হয়েছে। এই নাও টাকা, এবার থেকে সৎভাবে বাঁচতে চেষ্টা কোরো।'

সেই লোকগুলি ফিরে এসে কোশলরাজকে ঘটনার বিবরণ দিল। কিন্তু কোশলরাজের সন্দেহ দূর হল না। সে আবার এক দল লোক পাঠাল রাজপথে ডাকাতি করতে। এবারও সেই এক ঘটনা ঘটল। কোশলরাজ এবার নিশ্চিত হয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে কাশী আক্রমণ করল।

কাশীরাজের এক হাজার বীর যোদ্ধা ছিল যাদের সঙ্গে লড়াই করে জেতা প্রায় অসম্ভব। মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লেও তারা পালিয়ে আসার পাত্র ছিল না। শীলবান রাজা আদেশ দিলে চোখের নিমেষে তারা কোশলরাজাকে বন্দী করে আনতে পারত কিন্তু কাশীরাজ প্রাণহানি চান না। তিনি বললেন, 'যুদ্ধে দরকার নেই। আমার জন্য প্রাণহানি হোক আমি চাই না। যার রাজ্য-লোভ আছে সে রাজ্য দখল করুক।'

বিনা বাধায় কোশলরাজ রাজসভায় ঢুকে পড়ল। রাজা আর তাঁর মন্ত্রীদের বন্দী করে আদেশ দিল, 'শ্মশানে গর্ত খুঁড়ে এদের পুঁতে ফেল। শুধু এদের মাথাটা যেন বাইরে থাকে। রাতে শিয়ালকুকুরে এদের খাবে।'







কাশীরাজের মনে এতেও রাগ দেখা দিল না। মন্ত্রীরাও শীলবান রাজার অনুগত। তারা কেউ কোন কথা বলল না। যাই হোক, কাশীরাজ ও তাঁর মন্ত্রীদের তো পুঁতে রেখে গেল কোশলরাজের চাকররা। এদিকে রাত হয়েছে। শিয়ালের দল এল। তখন রাজা আর মন্ত্রীরা চিৎকার করে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। পর পর তিনবার তাড়ানোর পর শিয়ালদের ভয় ভেঙ্গে গেল। তারা বুঝতে পারল চিৎকার করা ছাড়া এদের আর কোন ক্ষমতা নেই। তখন একটা শিয়াল কাশীরাজকে খেতে এল। কাশীরাজ শিয়ালের গলা কামড়ে ধরলেন। শিয়াল ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। তার নখের খোঁচায় মাটি আলগা হতে লাগল। এক সময় কাশীরাজ গর্ত থেকে উঠে এলেন। মন্ত্রীদেরও উদ্ধার করলেন।

তখন ঐ শ্মশানে দুটি যক্ষ মরার ভাগ নিয়ে ঝগড়া করছিল। তারা কাশীরাজের কাছে বিচার চাইল। রাজা বললেন, 'আমি সমান ভাগ করে দেব ঠিকই, তবে অশুচি হয়ে আছি, আগে আমাকে স্নান করাও।' কোশলরাজের সুগন্ধি জল যক্ষরাই এনে দিল। রাজা



তাতে স্নান করলেন। তারপর রাজাকে তারা কোশলরাজের সুন্দর কাপড়-চোপড়, সুগন্ধি আর ফুল এনে সাজিয়ে দিল। কোশলরাজের খাবার এনে রাজাকে খেতে দিল। কেননা রাজা খিদেয় কাতর ছিলেন। এবার যক্ষরা বলল, 'আর কি করতে হবে বলুন।' রাজা তখন প্রাসাদ থেকে মঙ্গল খড়্গ আনতে বললেন। যক্ষরা তা আনা মাত্র মরাটিকে এক কোপে সমান দু টুকরো করে দিলেন। যক্ষরা মাংস খেয়ে খুশি হল। রাজাকে বলল, 'আদেশ করুন মহারাজ, কি করতে হবে।'



রাজা তখন বললেন, 'কোশলরাজের শোওয়ার ঘরে আমাকে নিয়ে চল।' কোশলরাজ তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। কাশীরাজ তার পেটে মঙ্গল খড়্গের উল্টো দিক দিয়ে খোঁচা মারলেন। ভয়ে কোশলরাজ জেগে উঠল। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ, চারদিকে সৈন্য, দরজা বন্ধ। একটা পিঁপড়েও গলতে পারবে না। এখানে আপনি এই সুন্দর পোশাকে খড়্গ হাতে এলেন কি করে?'

কাশীরাজ তখন শিয়াল ও যক্ষের ঘটনা বললেন। বললেন, কিভাবে এখানে এসেছেন।

সব শুনে কোশলরাজের খুব অনুতাপ হল। সে কাশীরাজকে



বলল, 'নিষ্ঠুর রাক্ষসরা পর্যন্ত আপনার বশ। আপনার গুণ বুঝতে পারে। আর আমি মানুষ হয়েও কিছুই বুঝতে পারলাম না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।' তারপর সে খড়্গ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল, আর এ রকম খারাপ কাজ করবে না। কাশীরাজের কাছে ক্ষমা চাইল। তারপর কাশীরাজকে রাজশয্যায় শুইয়ে নিজে মাটিতে শুল।

পরের দিন কোশলরাজ রাজসভায় এসে কাশীরাজের কাছে আবার ক্ষমা চাইল। বলল, 'মহারাজ, এবার থেকে আপনিই প্রজাপালন করবেন, শুধু রাজ্য রক্ষার ভার আমি নিলাম।' কোশলরাজ সেই কুচক্রী লোকটাকে শাস্তি দিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে গেল।

কাশীরাজ সিংহাসনে বসে মনে মনে ভাবলেন, 'সত্যি উৎসাহ বজায় রাখতে পেরেছিলাম বলেই না আবার সব ফিরে পাওয়া গেল। আশায় বুক বেঁধে উৎসাহ রাখাই মানুষের কর্তব্য।'

মশক জাতক 

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব ছিলেন বণিক। ব্যবসা করে তিনি রোজগার করতেন।

তখন কাশীর সীমান্তের একটি গ্রামে অনেক ছুতোর থাকত। এক বৃদ্ধ ছুতোর আর তার ছেলে ছুতোরের কাজ করত। বুড়ো ছুতোরের মাথার সব চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল। চামড়া কুঁচকে গিয়েছিল বয়সের ভারে।



বুড়ো ছুতোর একদিন একটা কাঠ ফালা করে তারপর কাঠটাকে সমান করছিল। এমন সময় একটা মশা এসে তার তামার মত চকচকে টাকে বসল। শুঁড়টো ছুঁচের মত ঢুকিয়ে দিল সেই টাকে। ছুতোরের ছেলে সামনেই বসে ছিল। বুড়ো ছেলেকে ডেকে বলল, 'মাথার ওপর একটা মশা বসে হুল ফোটাচ্ছে। তাড়িয়ে দে না বাবা।' ছেলে বলল, 'বাবা, আপনি একদম নড়বেন না, এক আঘাতে আমি মশার দফা শেষ করছি।'

ঠিক তখন বোধিসত্ত্ব মালপত্র বিক্রি করতে ঐ গ্রামে এসেছেন। ছুতোরের বাড়ির উঠোনে বসলেন। ছুতোর তার ছেলেকে আবার বলল, 'দে না বাবা মশাটা তাড়িয়ে।' ছুতোরের ছেলে তখন 'তাড়াচ্ছি' বলে কুঠার তুলল।

তারপর এক আঘাতে বাবার মাথা দু টুকরো করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ছুতোর মারা গেল।

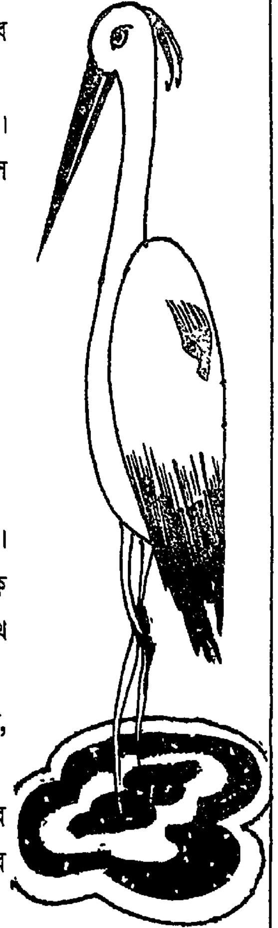
কাণ্ড দেখে বোধিসত্ত্ব থ। মনে মনে ভাবলেন, 'মূর্খ বন্ধুর থেকে বুদ্ধিমান শত্রু ভালো। আর কিছু না হোক অন্তত সে ফাঁসির ভয়ে মানুষ খুন করবে না।'



বক জাতক



একবাব বনেব মাঝখানে এক পদ্মসবোববেব পাশে বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মেছিলেন বোধিসত্ত্ব। পাশে একটি ছোট পুকুব ছিল। গবম-কালে সেই পুকুবেব জল শুকিয়ে যেত। সেই পুকুবেব মাছদেব দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একদিন এক বক ভাবল, 'কি কবে এদেব ঠকিয়ে খাওয়া যায়।' তাবপব খুব দুঃখী দুঃখী ভাব কবে সে পুকুবেব ধাবে বসে বইল।



মাছবা তাকে ঐ বকমভাবে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হল। মাছেবা তাকে জিজ্ঞেস কবল, 'আপনি এবকম মুখ শুকনো কবে বসে আছেন কেন?'

'চিন্তা কবছি ভাই।'

'কিসেব চিন্তা?'

'তোমাদেব কথা ভাবছি।'

'আমাদেব জন্য কিসেব চিন্তা?'

'পুকুবেব জল তো ফুবিয়ে এল, এখন তোমাদেব কি হবে।'

'কি কবা উচিত বলুন তো?'

'আমাব কথা যদি বিশ্বাস কব, তাহলে বলি বাস্তা একটা আছে। দূবে এক পদ্মসবোবব আছে, সেখানে প্রচুব জল। যদি বাজি থাক তাহলে তোমাদেব সবাইকে এক এক কবে আমি সেখানে বেখে আসতে পাবি।'

'অদ্ভুত কথা শোনালেন আজ। মাছেব দুর্গতি নিয়ে বক চিন্তিত, এমনটি কিন্তু আগে কখনো দেখা যায় নি।'

'তোমবা যদি বিশ্বাস না কব তাহলে যে কোন একজন আমাব সঙ্গে চল। সে ফিবে এসে যদি বলে যে সত্যি এ বকম সবোবব আছে তখন বিশ্বাস কোবো।'

মাছেবা ভাবল এ পবামর্শটা খাবাপ নয়। তখন তাবা একটা বুড়ো কানা মাছকে বলল দেখে আসতে। বক তাকে ঠোঁটে কবে

নিযে গেল। মাছটি ফিবে এসে বলল, 'হ্যাঁ সত্যি, খুব সুন্দব এক সবোবব দেখে এলাম।' তখন সব মাছ বককে বলল, 'আপনি খুবই মহৎ দেখছি। এখন আমাদেব সবাইকে নিযে চলুন।'

বক প্রথমে কানা মাছকে ঠোঁটে নিযে উড়ল। সবোববেব কাছাকাছি এক গাছে বসে সে কানা মাছকে খেযে ফেলল। কাঁটাগুলো মাটিতে পড়ে বইল। এইভাবে সে একেব পব এক সব মাছ খেযে শেষ করে ফেলল।

শেষে ঐ মজা পুকুবে একটা কাঁকড়া পড়ে বইল। বকেব ইচ্ছে, কাঁকড়াটাকেও খেযে ফেলা। কাঁকডা বকেব ঠোঁটে কবে যেতে চাইল না। সে বলল, 'আমাব দাঁড়া দিযে যদি তোমাব গলা ধবতে দাও তাহলে যাব।' বক তাতেই বাজি।

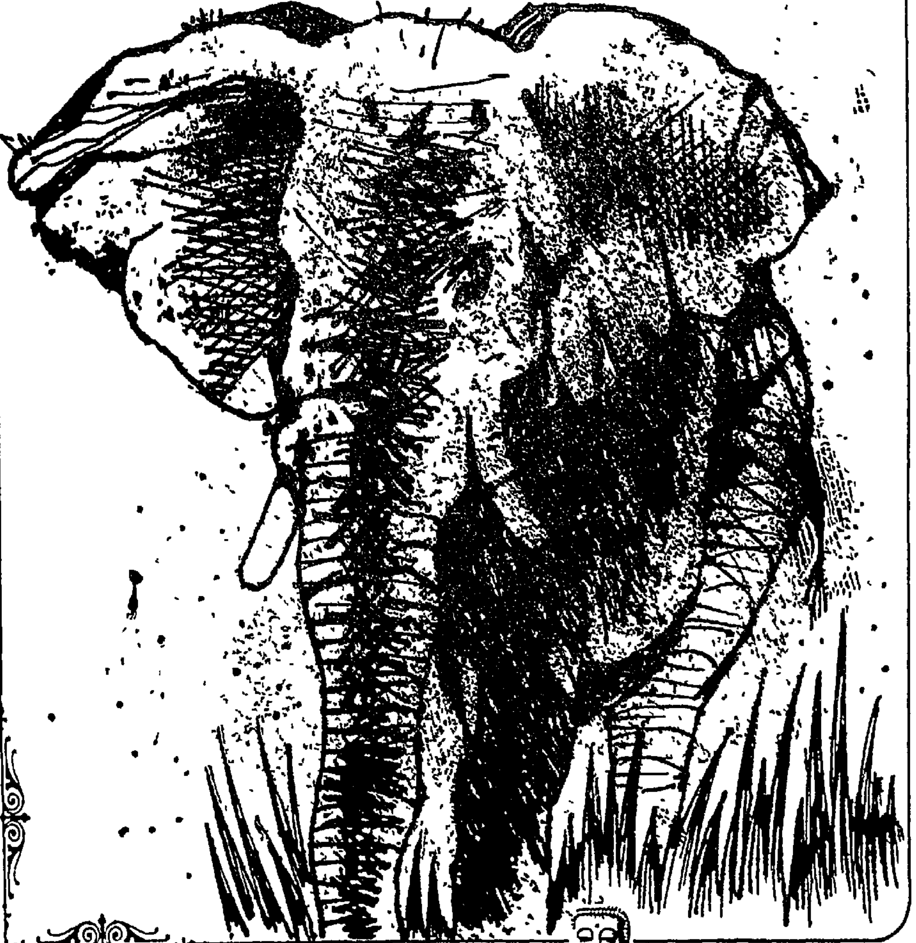
উড়ে যেতে যেতে তাবা সেই সবোববেব কাছে এসে পড়ল। বক তখন সেই গাছটাব দিকে উড়ে যাচ্ছে। কাঁকডা বলল, 'কি ভাই, তুমি সরোবব ফেলে চলে যাচ্ছ কেন?' বক তাকে বলল, 'আমি কি তোব চোদ্দপুরুষেব চাকব যে তোকে সবোববে পৌঁছে দেব? এক্ষুনি ধবাধাম ছেড়ে স্বর্গে যাবি।' কাঁকডা তখন 'তবে বে।' বলে বকেব গলা কামড়ে ধবল। প্রাণেব দাযে বক বলল, 'ছাড় ছাড়, তোকে সবোববে পৌঁছে দিচ্ছি।' কাঁকডা দাঁড়া একটু শিথিল কবল বটে, কিন্তু সরোববে নামাব আগেব মুহূর্তে এমন মোক্ষম কামড় দিল যে বকেব মাথা আর ধড় আলাদা হযে গেল।

বোধিসত্ত্ব সব দেখে শুনে মধুব স্ববে বলে উঠলেন, 'ঠগীদের একবাব না একবাব বিপদে পড়তেই হবে।'

শীলবান জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার হিমবন্ত প্রদেশে হাতি জন্ম নেন। রূপোর মত সাদা শরীর। মুখটি রক্ত কম্বলের মত লাল। এছাড়া তার পা দেখলে মনে হত যেন লাক্ষা দিয়ে পা রাঙানো হয়েছে। বড় হলে হিমালয় অঞ্চলের সব হাতি তাঁকে দলপতি করল। ষাট হাজার হাতির তিনি নেতা হলেন। তবু যখন দেখলেন দলের মধ্যে পাপ ঢুকেছে তখন দল ছেড়ে বনের মধ্যে একা থাকতে লাগলেন।

একবার বারাণসীর এক কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে এসে রাস্তা হারিয়ে ফেলে। শেষে হতাশ হয়ে দু হাত ওপরে তুলে কাঁদতে শুরু





কবে। তাব কান্না শুনে বোধিসত্ত্ব তাব কাছে এলেন। কিন্তু কাঠুবে তাঁকে দেখে পালাতে শুরু কবল। বোধিসত্ত্ব তখন থমকে দাঁড়ালেন। কাঠুবে খানিক দূব গিযে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন বোধিসত্ত্ব আবাব তাব দিকে এগোতে লাগলেন। তা দেখে কাঠুবে আবাব দৌড়তে শুরু কবল।

বাবকয়েক এবকম হওয়াব পব কাঠুবে বুঝল, এই হাতিটি তাকে আক্রমণ কবতে চাইছে না। হযত উপকাবই কবতে চায। তখন সে সাহস কবে দাঁড়িযে থাকল। বোধিসত্ত্ব তাঁব কাছে এগিযে গেলেন।

'তুমি কাঁদছিলে কেন?'

'প্রভু, আমি বাস্তা হাবিযে ফেলেছি, প্রাণেব ভযে কাঁদছিলাম।'

বোধিসত্ত্ব তখন তাকে নিজেব ডেবায নিযে গেলেন। নানারকম ফল খেতে দিলেন তাকে। তাবপব বললেন, 'ভয নেই, আমি তোমাকে বনেব বাইবে পৌঁছে দিযে আসব।' বোধিসত্ত্ব যখন তাকে পিঠে কবে লোকালযেব দিকে যাচ্ছেন কাঠুবে তখন বাস্তাঘাট খুঁটিযে দেখে নিতে লাগল। বন শেষ হলে বোধিসত্ত্ব তাকে বললেন, 'এই বাস্তা ধবে সোজা চলে যাও, সামনেই গ্রাম আছে, তবে কাউকে আমাব ডেবাব কথা বোলো না।' বিদায নিযে বোধিসত্ত্ব ফিবে গেলেন।

সেই কাঠুবে একদিন হাড়েব কাবিগবদেব পাড়ায ঢুকে পড়ে। সে যখন দেখল মবা হাতির দাঁত থেকে তাবা নানাবকম জিনিস বানাচ্ছে, তখন একটু অবাক হল।

'আচ্ছা, জ্যান্ত হাতি কেনো তোমবা?'

'কিনি বৈকি, মবা হাতিব চেযে জ্যান্ত হাতিব দাঁতেব দামও বেশি।'

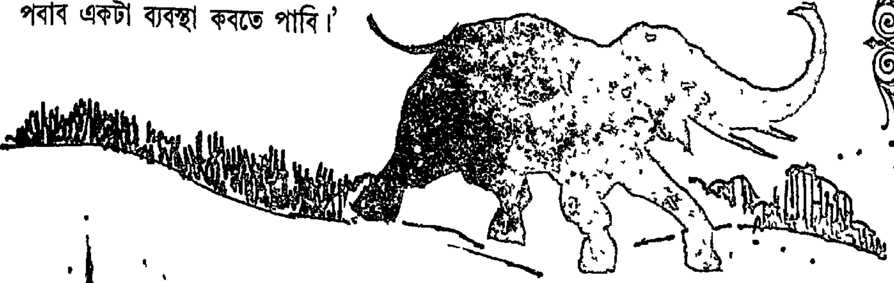
'ঠিক আছে, আমি জ্যান্ত হাতিব দাঁত এনে দেব।'

এই বলে সে একটা কবাত আব খানিকটা খাবাব নিযে জঙ্গলেব দিকে বওনা হল। খুঁজে খুঁজে ঠিক বোধিসত্ত্বেব কাছে এসে উপস্থিত।

বোধিসত্ত্ব তাকে দেখে বললেন, 'ফিবে এলে কেন ভাই?'



সে বলল, 'প্রভু, আমি খুব গবীব, আপনাব কাছে আপনাব দাঁতেব খানিকটা টুকবো ভিক্ষে চাইছি। যদি তা বেচে খাওযা-পবাব একটা ব্যবস্থা কবতে পাবি।'



বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তোমাব কাছে কবাত আছে?'

কাঠুবে বলল, 'হ্যাঁ প্রভু।'

বোধিসত্ত্ব তখন পা মুড়ে মাটিতে বসে বললেন, 'বেশ, তাহলে দুটো দাঁত থেকেই কেটে নিযে যাও।'

কাটা শেষ হলে বোধিসত্ত্ব শুঁড দিযে টুকবো দুটো তুলে নিযে একটু দেখলেন। তাবপব বললেন, 'দেখ ভাই, দাঁত দুটোব ওপব আমাব কোন মমতা নেই ভেব না। তবে সর্বজ্ঞতাব জন্য আমি এটুকু ছাডতে বাজি।'

কাঠুবে তা নিযে চলে গেল। বিক্রি কবে সে টাকাকডি ভালোই পেল। একদিন সে টাকাও ফুবিযে গেল। তখন সে আবাব বোধিসত্ত্বেব কাছে গেল। কান্নাকাটি কবে আবাব দাঁতেব খানিকটা চাইল। বোধিসত্ত্ব এবাবও তাকে ফিবিযে দিলেন না। এখন তাঁব দাঁত বলতে বইল স্রেফ গোডাটুকু। দিনকতক পবে সে আবাব ফিবে এল। এবাব সে ঐ গোডাটুকুও কেটে নিতে চাইল। বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বেশ, নাও।' এবাব কেটে নেওযাব কাজটা একটু কষ্টকব। লোভী কাঠুবে বোধিসত্ত্বেব মুখেব ভেতব এক পা বেখে, মাংসেব টুকবোসমেত হাডটুকু ছিঁডে নিল।

ফিবতি পথে এক মহা দুর্যোগ দেখা দিল। বোধিসত্ত্ব দেখতে পেলেন কাঠুবেব পাপে পৃথিবী দু টুকবো হল। সেই ফাটল থেকে আগুন উঠে আসছিল। লাল কম্বলেব মত সেই আগুন কাঠুবেকে পেঁচিযে নিযে তলিযে গেল।

এই জাতকেব শিক্ষা হলঃ অকৃতজ্ঞ লোভী লোককে কিছুতেই সন্তুষ্ট কবা যায না।

ইল্লীস জাতক

ব্রহ্মদত্তেব আমলে ইল্লীস নামে এক বণিক ছিল। এক কথায়, সে ছিল কুবেবেব মত ধনী। মণিমাণিক্যে তার ভাণ্ডাব পূর্ণ। সম্পদে সে যেমন পবিপূর্ণ ছিল তেমনি মানুষেব যত বকম দোষ হতে পাবে, সে সবেও সে পবিপূর্ণ ছিল। এ তো গেল চবিত্রের দিক। দেহেব দিক থেকে ইল্লীস হল খোঁড়া, কুব্জ, ট্যাবা। ধর্মে অশ্রদ্ধা ছিল তাব। আব সন্তুষ্টি কাকে বলে সে জানত না। ইল্লীস ছিল হাড়কিপ্টে। কাউকে তো এক পযসা দিতই না, এমন কি নিজেও এক পযসা ভোগ কবত না। যদিও তাব আগেব সাত পুরুষ ছিল এর উল্টো। তাবা দান-ধ্যান কবেছে বিস্তব। ইল্লীসের হুকুমে তাদেব দানশালা পুড়িযে ফেলা হয। সে শুধুই জমিযে যেত।

ইল্লীস একদিন বাজাব সঙ্গে দেখা কবে ফিবে আসছে। এমন সময দেখল একজন বাস্তাব ধাবে বসে স্ফূর্তিতে মদ খাচ্ছে। দেখে ইল্লীসেবও খুব মদ খেতে ইচ্ছে হল। কিন্তু ভাবল, 'আমি মদ খেলে আমার বাড়িব লোকেবাও খাবে। তাহলে অনেক টাকা খবচ হয়ে যাবে।' ফলে ইচ্ছেটা সে চেপে গেল।



বাড়িতে ফিরে এসেও কিন্তু ঐ ইচ্ছেটার কথা ভুলতে পারল না। তাকে কেমন শুকনো দেখাচ্ছিল। তার বৌ তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি হয়েছে? কেমন শুকনো দেখাচ্ছে।' ইল্লীস তাকে সব কথা খুলে বলল। বৌ বলল, 'তুমি একা আর কতটুকু খাবে, আমি ঘরেই বানিয়ে দিতে পারি।' ইল্লীস বলল, 'না, এখানে বানালে অনেকে দেখতে পাবে, এমন কি বাইরে থেকে কিনে এনে এখানে খেলেও ঝামেলা হবে।' শেষে চাকরকে পাঠাল এক ভাঁড় মদ কিনে আনতে। তারপর বাড়ি থেকে দূরে, একটা ঝোপের ভেতর বসে মদ খেতে লাগল।



ইল্লীসের বাবা নিজে প্রচুর দান-ধ্যান করেছিল। সে দেবলোকে শক্র হয়ে জন্মায় ঐ পুণ্যফলে। ইল্লীস যখন ঝোপের ভেতর বসে মদ খাচ্ছে তখন শক্রর হঠাৎ ছেলের কথা মনে হল। সে ভাবল, 'আমি বেঁচে থাকতে যে দান-ধ্যান করতাম সেসব এখনো চালু আছে কিনা একবার দেখি।'

ঐশ্বরিক ক্ষমতার জোরে শক্র টের পেল ইল্লীস সেসব পাঠ তুলে দিয়েছে। ছেলে কুলধর্ম ছেড়েছে। দানশালা পুড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আর কাউকে মদের ভাগ দেবে না বলে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে এখন একা একা মদ খাচ্ছে। শক্র মনে বড় কষ্ট পেল। তখন সে ঠিক করল, 'আমি এক্ষুনি মর্তে যাব। ছেলেকে এমন শিক্ষা দেব যাতে সে নিজের দোষ বুঝতে পারে। সৎ কাজে মন দেয়। দান-ধ্যান করে দেবত্ব পেতে পারে।'

শক্র পৃথিবীতে এল। নিজের শরীর এমনভাবে সৃষ্টি করল যে তাকে অবিকল ইল্লীসের মত দেখাতে লাগল। খোঁড়া, কুঁজো,



ট্যাবা—সবই এক রকম। তাবপর সে বাজার কাছে গেল। বাজা তাকে দেখে বললেন, 'বণিক, এই অসময়ে কেন এলে ?'

'মহারাজ, আপনার কাছে একটা আর্জি আছে।'

'বল, কি তোমার আর্জি।'

'আপনি জানেন আমাব অনেক সম্পত্তি আছে।'

'হ্যাঁ।'

'দয়া কবে এই সম্পত্তি আপনাব ভাণ্ডাবে নিয়ে নিন।'

'আমাব ভাণ্ডাবে ধনেব অভাব নেই, কেন আমি তোমার সম্পত্তি নিতে যাব।'

'তাহলে অনুমতি দিন আমি ইচ্ছেমত দান-ধ্যান কবি।'

'নিশ্চযই কববে।'

এবপব শক্র ইল্লীসের বাড়িতে গেল। তাকে দেখেই চাকব বাকবেবা ছুটে এল। শক্র তখন তাদেব বলল, 'আমাব মত দেখতে আব কেউ এ বাড়িতে ঢুকতে এলে তাকে পিটিযে ছাতু কববি, বুঝলি।' তাবপব সে প্রাসাদে ঢুকে শোওযাব ঘবে গেল। ইল্লীসেব বৌকে ডাকিযে এনে বলল, 'শোন, এখন থেকে আমবা দান-ধ্যান কবব।'



ইল্লীসের বৌ ভাবল, নিশ্চয়ই মদ খেযে মনটা দবাজ হযেছে। সে বলল, 'স্বামী, তোমার সম্পত্তি তুমি দান কববে, এতে বলাব কি কি আছে।' শক্র তখন বলল, 'তাহলে এক্ষুনি ঢাক পিটিয়ে নগবে জানিযে দাও সোনা-রূপো-মণি-মুক্তো পেতে চাইলে সবাই যেন এক্ষুনি ইল্লীসের বাড়িতে আসে।'

ইল্লীসেব বাড়িতে ধনবত্নেব জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। একজন কবল কি, ইল্লীসেরই একটি বথ টেনে নিল। তাবপব সেই রথে প্রচুব মণি-মাণিক্য তুলে নিয়ে বওনা দিল। সে রথ ছুটিযে যাওযার সময় চিৎকার কবে বলতে লাগল, 'প্রভু ইল্লীসেব একশ বছর আয়ু হোক। তিনি যা সোনাদানা আমাকে দিলেন তাতে সুখে আমার জীবন কেটে যাবে।'



ঝোপেব ভেতব থেকে ইল্লীসেব কানে গেল কথাটা। সে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে বথ চেপে ধবল, 'এই চোট্টা, আমাব বথ নিযে কোথায পালাচ্ছিস বে।' সে-ও ছাড়বাব পাত্র নয। ইল্লীসকে ঘা কতক দিযে বথ নিযে চলে গেল।

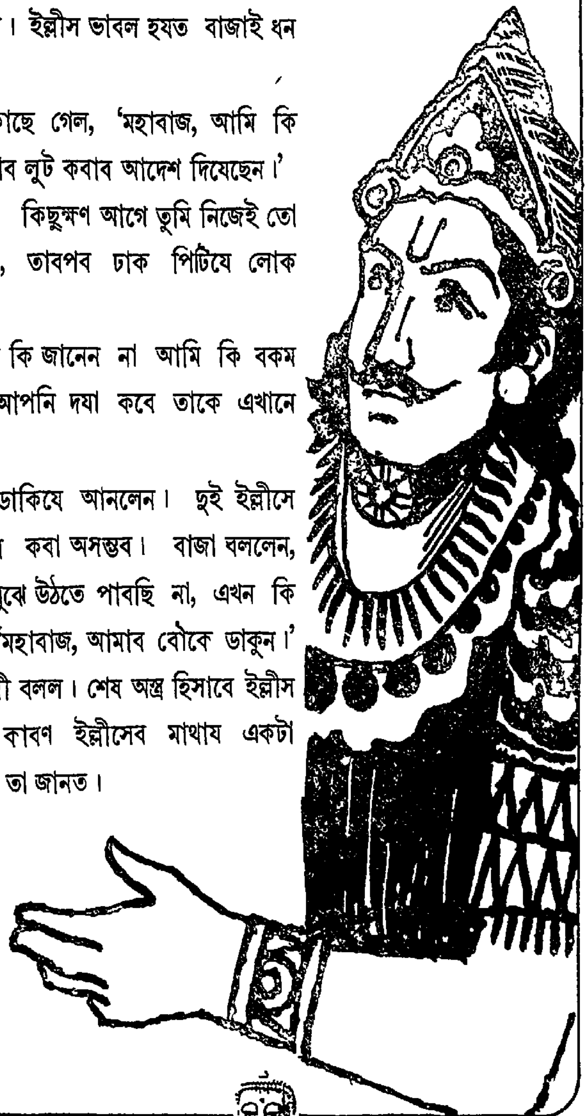
মার খেযে ইল্লীসেব নেশা ভেঙ্গে গেছে। তাডাতাড়ি সে বাড়িব দিকে বওনা হল। সেখানে তখন ভিড ফেটে পডছে। ইল্লীস তো দেখে থ। তাব বাডি থেকে কাতাবে কাতাবে লোক সোনাদানা নিযে বেবিযে আসছে। ইল্লীস বাডিতে ঢোকাব চেষ্টা কবতেই চাকববা তাকে ধবে আচ্ছা কবে পিটিযে দিল। ইল্লীস ভাবল হযত বাজাই ধন লুটের আদেশ দিযেছে।

নিরুপায হযে ইল্লীস বাজাব কাছে গেল, 'মহাবাজ, আমি কি দোষ কবেছি। কেন আমাব ভাণ্ডাব লুট কবাব আদেশ দিযেছেন।'

বাজা বললেন, 'সে কি ইল্লীস। কিছুক্ষণ আগে তুমি নিজেই তো এসে দান-ধ্যানেব আদেশ চাইলে, তাবপব ঢাক পিটিযে লোক ডাকালে।'

ইল্লীস বলল, 'মহাবাজ, আপনি কি জানেন না আমি কি বকম কিপ্টে। যে এই দানধ্যান কবছে আপনি দযা কবে তাকে এখানে আনান। বিচাব করুন।'

বাজা তখন দ্বিতীয ইল্লীসকে ডাকিযে আনলেন। দুই ইল্লীসে এমন মিল যে আসল নকল বিচাব কবা অসম্ভব। বাজা বললেন, 'তোমাদেব মধ্যে কে আসল আমি বুঝে উঠতে পাবছি না, এখন কি কবা যায?' আসল ইল্লীস বলল, 'মহাবাজ, আমাব বৌকে ডাকুন।' কিন্তু তাব বৌ শক্রকেই নিজেব স্বামী বলল। শেষ অস্ত্র হিসাবে ইল্লীস তখন নাপিতকে ডাকতে বলল। কাবণ ইল্লীসেব মাথায একটা আঁচিল আছে। একমাত্র নাপিতই তা জানত।



বোধিসত্ত্বই তখন ইল্লীসেব নাপিত। বাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'এদেব দুজনেব মধ্যে কে আসল ইল্লীস বলতে পাববে?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মাথা দেখে বলতে পাবব।' কিন্তু শক্র সঙ্গে সঙ্গে নিজেব মাথায় একটা আঁচিল বানিযে ফেলল। ফলে বোধিসত্ত্ব দুজনেব মাথা দেখে বললেন, 'না মহারাজ, পারব না, দুজনের মাথাতেই দেখছি আঁচিল আছে।'

বোধিসত্ত্ব এই কথা বলা মাত্র ইল্লীস অজ্ঞান হযে গেল। আব শক্র নিজেব ঐশ্বরিক শক্তিতে আকাশে উঠে গিযে শূন্য থেকে বলল, 'মহাবাজ, আমি ইল্লীস নই।'

আস্তে আস্তে ইল্লীসের জ্ঞান ফিরে এলে শক্র তাকে বলল, 'শোন ইল্লীস, তুমি যে প্রচুব সম্পত্তিব মালিক হযেছ তা ছিল



আমাব। আমি তোমাব বাবা। বেঁচে থাকতে আমি দান-ধ্যান কবতাম। তুমি সেসব বন্ধ কবেছ। তোমাকে শাস্তি দিতেই আমি এসেছিলাম। যদি কথা দাও দান-ধ্যান কববে তাহলেই তোমাব ধনসম্পদ থাকবে। না হলে এক্ষুনি সব হাওযা হযে যাবে। তোমাব মাথায বাজ ভেঙ্গে পডবে।'

ইল্লীস প্রতিজ্ঞা কবল সে দান-ধ্যান কববে। আব তাবপব থেকে সত্যি তাব চবিত্র বদলে যায।

এই জাতকেব শিক্ষা হল : পৃথিবীতে দানেব চেযে ধর্ম আব নেই।



ভীমসেন জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেন। বড় হয়ে তক্ষশিলায় এক পণ্ডিতের কাছে বেদ শেখেন। শুধু তাই নয়, ধনুর্বিদ্যায়ও সুপণ্ডিত হন। যেজন্য লোকে তাঁকে বলত 'চুল্ল ধনুগ্র্গহ পণ্ডিত।'

এই জন্মে বোধিসত্ত্ব বেশ বেঁটে আর কুঁজো ছিলেন। শিক্ষা শেষ করার পর রোজগারের রাস্তা দেখতে হবে। নিজের চেহারা নিয়ে বোধিসত্ত্ব তখন একটু ফাঁপরে পড়ে গেলেন। ভাবলেন, 'রাজার কাছে কাজ চাইতে গেলে রাজা আমাকে দূর করে দেবেন।' রাজা হয়ত বলবেন, 'তোমার মত বামন কখনও তীর তীরন্দাজ হতে পারে?'

এইসব সাত-পাঁচ ভেবে, বোধিসত্ত্ব লম্বা চওড়া একটা লোকের খোঁজ করতে লাগলেন। তাঁতীপাড়ায় ঐ রকম একজনের খোঁজ পেলেন। বোধিসত্ত্ব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, তোমার নাম কি?'

সে বলল, 'আমার নাম ভীমসেন।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এত সুপুরুষ হয়ে কেন তুমি তাঁতী হয়ে আছ?'

সে বলল, 'কি করব দাদা, উপায় নেই।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'উপায় আছে, তোমাকে আর তাঁতীর কাজ করতে হবে না।'

তারপর বোধিসত্ত্ব তাকে বোঝালেন যে দুজনে মিলে রাজার কাছে যাবেন। ভীমসেন রাজাকে বলবে যে তার মত তীরন্দাজ জম্বুদ্বীপে নেই। রাজা তখন তাকে কাজে বহাল করবেন। বোধিসত্ত্ব ভীমসেনের বালক চাকর হিসেবে থাকবে। যখন সত্যিকারের কাজ আসবে বোধিসত্ত্ব সে কাজ উদ্ধার করবেন।





বোধিসত্ত্ব যেমন যেমন বললেন ভীমসেন ঠিক সেইভাবে চল্ল। রাজা তাকে দু হাজার টাকা মাস মাইনের চাকরি দিলেন। যখন যেমন কাজ পড়ে বোধিসত্ত্ব তা করে দেন।

কিছুদিন পরে বনের একটা বাঘ মানুষখেকো হয়ে উঠল। তার অত্যাচারে সবাই অস্থির। রাজা ভীমসেনকে বাঘ মারতে বললেন। ভীমসেন বোধিসত্ত্বকে বলল। বোধিসত্ত্ব তাকে বুদ্ধি দিলেন, 'দেখ, আমি যাব না। কিন্তু একটা ফন্দি বলে দিচ্ছি। দু হাজার তীরন্দাজকে তুমি বাঘের গুহার সামনে পাঠাও। নিজে গভীর বনে ঢুকবে না। পাশে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে। বাঘটা বেরোলে লোকে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। তুমি তখন ঝোপের ভেতর থেকে একটা লতা নিয়ে বেরিয়ে এসে বলবে, 'কে মারল রে! আমি ভেবেছি লতা দিয়ে বেঁধে বাঘটাকে গোরুর মত টানতে টানতে নিয়ে যাব, আর তোরা কিনা বাঘটাকে মেরে ফেললি। বল কে মেরেছিস।' তখন সবাই ভয় পেয়ে যাবে। তোমাকে বলবে, 'প্রভু, দয়া করে এ কথা রাজাকে বলবেন না।' এদিকে রাজা জানবে তুমিই বাঘ মেরেছ।'

বোধিসত্ত্বের পরামর্শে ভালো ফল হল। ভীমসেন বিস্তর টাকাকড়িও পেল। কিছুদিন পরে বুনো মোষ মারার পালা এল। সে যাত্রাও ভীমসেন বোধিসত্ত্বের বুদ্ধিতে সফল হল। কিন্তু টাকাকড়ি আর মান সম্মান পেয়ে ভীমসেনের মাথা বিগড়ে গেল। সে বোধিসত্ত্বকে অবহেলা করতে লাগল। তাকে খারাপ খারাপ কথা বলল।



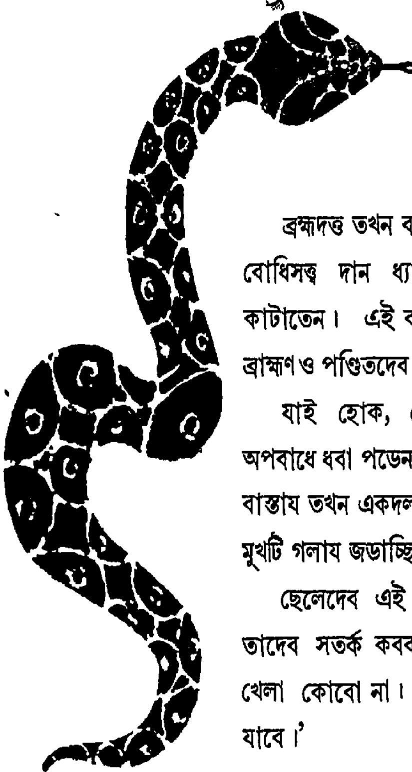
কিছুদিন পরে বারাণসী আক্রমণ করল এক শত্রু রাজা। ব্রহ্মদত্ত আবার ভীমসেনকে তলব করলেন। ভীমসেন ভাবল, 'আমি নিজেই শত্রু শেষ করব।' কিন্তু বোধিসত্ত্ব টের পেলেন ভীমসেন একা গেলে মারা পড়বে। কাজও হাসিল হবে না। তখন বোধিসত্ত্বও রথের পিছনে উঠলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকে ভীমসেনের বীরত্ব কর্পূরের মত উড়ে গেল। ভয়ে সে যায় যায়। বোধিসত্ত্ব তখন তাকে হাতির পিঠ থেকে নামিয়ে বাড়িতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। আর বীর বিক্রমে শত্রুরাজকে আক্রমণ করলেন। শেষে তাকে বন্দী করে নিয়ে এলেন। এবার সকলে বোধিসত্ত্বের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। রাজাও জানলেন প্রকৃত বীর কে।



এই জাতকের মর্মকথা হল ঃ নিজের গরিমা মূর্খে প্রচার করে।

শীল মীমাংসা জাতক



ব্রহ্মদত্ত তখন বারাণসীর রাজা। আর বোধিসত্ত্ব তাঁর পুরোহিত। বোধিসত্ত্ব দান ধ্যান করতেন, নানারকম সৎ কাজে তিনি দিন কাটাতেন। এই কারণে ব্রহ্মদত্ত তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। অন্য সব ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের থেকে বোধিসত্ত্বকে একটু বেশিই খাতির করতেন।

যাই হোক, বোধিসত্ত্ব একবার রাজভাণ্ডার থেকে টাকা চুরির অপরাধে ধরা পড়েন। রাজার সেপাইরা তাঁকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় তখন একদল ছেলে বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করছিল। সাপের মুখটি গলায় জড়াচ্ছিল। সাপের লেজ ধরে খেলছিল।

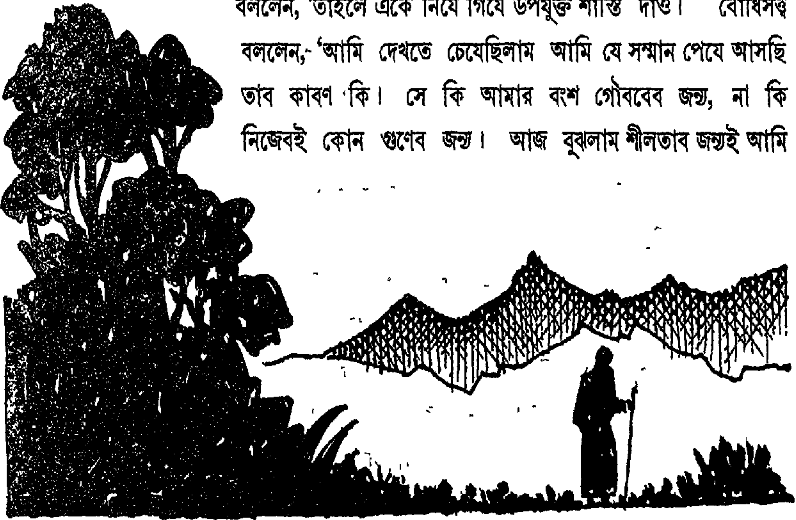
ছেলেদের এই বিপজ্জনক খেলা দেখে বোধিসত্ত্ব ভয় পেলেন। তাদের সতর্ক করবার জন্যে বললেন, 'দেখ বাবা, এভাবে সাপ নিয়ে খেলা কোরো না। সাপ খুব ভয়ঙ্কর। কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে।'



তারা এ কথা শুনে মোটেই ভয় পেল না। বরং হাসতে হাসতে বলল, ঠাকুর, আমাদের এই সাপটা খুব সভ্য। পোষা সাপ। খারাপ কাজ ভুলেও করে না। তুমি রাজার পুরুত হয়ে রাজার টাকা চুরি করেছ বলে সেপাইরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এই সাপটা তোমার চেয়ে অনেক ভালো।'

বোধিসত্ত্ব এ কথা শুনে ভাবলেন, 'সাপকেও লোকে ভদ্র শান্ত বলে যদি সে না কামড়ায়। মানুষের তো কথাই নেই। মানুষ হয়ে জন্মেও আমি সেই গুণ হারিয়েছি। পৃথিবীতে দেখছি শীলতাই শ্রেষ্ঠ গুণ।'

বোধিসত্ত্বকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হলে রাজা সেপাইদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কাকে ধরে এনেছ?' সিপাইরা বলল, 'মহারাজ, এই ব্রাহ্মণ রাজভাণ্ডার থেকে টাকা চুরি করেছে।' রাজা বললেন, 'তাহলে একে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত শাস্তি দাও।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি দেখতে চেয়েছিলাম আমি যে সম্মান পেয়ে আসছি তার কারণ কি। সে কি আমার বংশ গৌরবের জন্য, না কি নিজেরই কোন গুণের জন্য। আজ বুঝলাম শীলতার জন্যই আমি



সম্মান পেয়েছি।'

এরপর বোধিসত্ত্ব রাজাকে জানালেন যে তিনি আর রাজ্যে থাকতে চান না। বিষয়-বাসনার বাইরে থাকতে চান। তারপর বোধিসত্ত্ব প্রব্রজ্যা নিলেন।

এই জাতকের মর্মকথা হল : শীলতাই শ্রেষ্ঠ গুণ।

কুহক জাতক

এক গ্রামে এক ধূর্ত সাধু থাকত। এ ঘটনাও ব্রহ্মদত্তের আমলের বারাণসীর। ঐ গ্রামের জমিদার সাধুর ভড়ং দেখে ভুলে যায়। সে সাধুর জন্য একটি কুটির বানিয়ে দেয়। সাধু যাতে রোজ পেট ভরে ভালোমন্দ খেতে পাবে জমিদার তার পাকা ব্যবস্থা করে রেখেছিল। জমিদারের বাড়ি থেকে সাধুর জন্য রোজ খাবার-দাবার পাঠান হত।

সাধুর ওপর জমিদারের ছিল অগাধ বিশ্বাস। আশপাশের গ্রামে একবার খুব দস্যুর উৎপাত শুরু হল। জমিদার তখন একশ সোনার মোহর এনে সাধুর কুটিরের মধ্যে গর্ত করে পুঁতে রাখল।

সাধুকে বলল, 'প্রভু, আপনি একটু নজর রাখবেন।' শুনে সাধু বলল, 'দেখ বাছা, আমরা তপস্বী, আমাদের এসব কথা বলতে হয় না। পরের জিনিসে আমাদের কক্ষনো লোভ হয় না।' জমিদার সাধুর কথায় আরও ভরসা পেল। সাধুকে ভূয়সী প্রশংসা করে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে গেল।

ধূর্ত সাধু তখন মনে মনে হিসেব কষে দেখল, 'এই মোহরগুলো দিয়ে একজনের সারাটা জীবন আরামে আয়েসে কাটতে পারে।' দিনকতক মনে মনে ভেবে একদিন সে গর্ত খুঁড়ে মোহরগুলো তুলে নিল। পরে রাস্তার ধারে এক জায়গায় আবার মোহরগুলো পুঁতে রাখল। কয়েকদিন চুপচাপ সেই কুটিরেই থেকে গেল।

কয়েকদিন পরে জমিদারের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারল। তারপর জমিদারকে বলল, 'বাছা, অনেকদিন ধরে তোমার অন্ন ধ্বংস করছি। এক জায়গায় অনেকদিন থাকলে তপস্বীদের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। অথচ তপস্বীদের পক্ষে তা করা ঠিক নয়। ঠিক করেছি এবার অন্য জায়গায় চলে যাব।' জমিদার তাকে বহু অনুরোধ করল। কিন্তু সাধু তার সঙ্কল্পে অটল। তখন জমিদার বলল, 'আপনি যদি একান্তই থাকতে না চান, তাহলে আর



কি-ইবা বলব। বেশ, যেখানে যেতে চাইছেন যান।' এই বলে জমিদার তাকে গ্রামের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।

কিছুদূর যাওয়ার পর সাধু ভাবল, 'এই জমিদারটাকে একটু ঠকানো যাক।' তখন সে জটার মধ্যে এক টুকরো খড় গুঁজে নিয়ে আবার জমিদারের কাছে ফিরে এল। জমিদার তাকে দেখে বলল, 'এ কি বাবা, আপনি ফিরে এলেন যে!' তখন সাধু বলল, 'দেখ বাবা, তপস্বীরা যা দান হিসেবে পায়নি তা তারা নিয়ে যেতে পারে না। তাই এই খড়গাছা তোমাকে ফেরৎ দিতে এসেছি।' জমিদার বলল, 'আপনি খড়গাছা ফেলে দিন।' আর ভাবল, 'সত্যি কি মহাপুরুষ! পরের কুটোটি পর্যন্ত নিতে চান না!' সাধুর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রণাম করল। ভক্তি গদগদভাবে বিদায় দিল।

বোধিসত্ত্ব তখন বাণিজ্য করতে করতে ঐ গ্রামে এসে উঠেছেন। তাঁর কানে এই মহত্ত্বের বিবরণ এল। তখন তাঁর কেমন সন্দেহ হল। তিনি জমিদারের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা মশাই, আপনি ঐ সাধুর কাছে কখনও কিছু গচ্ছিত রেখেছিলেন কি?'

'হ্যাঁ। আমি ওঁর কাছে একশ সোনার মোহর রেখেছিলাম।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি গচ্ছিত ধন নিয়ে আসুন।'

জমিদার কুটিরে ছুটে গেল। শত খোঁড়াখুঁড়ি করে সে একটিও মোহর পেল না। ফিরে এসে বোধিসত্ত্বকে বলল, 'না মশাই, পেলাম না।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আপনার মোহর ঐ সাধুই নিয়ে পালিয়েছে। চলুন তাকে ধরি।'

সাধু বেশিদূর যেতে পারে নি। তল্লাসি করতেই মোহর বেরিয়ে পড়ল। ভণ্ড সাধু বেধড়ক মার খেল।

এই জাতকের মর্মকথা হল : ভড়ং দেখিয়ে চিরকাল কাউকে বোকা বানানো যায় না।



তৈলপাত্র জাতক

বোধিসত্ত্ব একবাব বাবাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তেব ছেলে হয়ে জন্মান। অবশ্য বাজাব ছেলে ছিল একশটি। বোধিসত্ত্ব সকলেব ছোট। আস্তে আস্তে তিনি বড হলেন। তাঁব বিচাববুদ্ধিও খুব প্রখব হল।

বোধিসত্ত্ব একদিন মনে মনে ভাবলেন, 'আমাব এত ভাই, ফলে এদেশে আমাব বাজা হবাব বোধ হয কোন সম্ভাবনাই নেই। তবু একবাব ভিক্ষুদেব জিজ্ঞেস কবে দেখি।' পবেব দিন ভিক্ষুবা বাজ-বাডিতে এলেন। হাত-পা ধুযে খেতে বসলেন তাঁবা। খাওয়াব পব যখন তাঁরা বিশ্রাম কবছেন বোধিসত্ত্ব তখন তাঁদেব কাছে গেলেন। পাশে বসে কথাটা জিজ্ঞেস কবলেন।

ভিক্ষুবা বললেন, 'দেখ বাজকুমাব, সত্যি কথা বলতে কি এখানে তুমি কোনদিনই বাজা হতে পাববে না। তবে এখান থেকে দু হাজাব যোজন দূবে তক্ষশিলা। তুমি যদি সাত দিনেব মধ্যে ওখানে যেতে পাব তাহলে সাত দিনের মাথায তুমি সেখানকাব বাজা হবে।'

ভিক্ষুবা তাবপব বোধিসত্ত্বকে সতর্ক কবাব জন্য আবো খুলে বললেন : 'বাস্তায এক ঘোব বন আছে। সে বন বড মাবাত্মক। তবে ঘুবপথেও যাওয়া যায়, কিন্তু তাতে বেশি সময লাগবে। ঐ বনে যক্ষদেব আড্ডা। যক্ষিনীবা বাস্তাব ধাবে মাযাবলে গ্রাম বানিযে বেখেছে। পথিকদেব মিষ্টি কথায ভুলিযে তাদের খুন কবে বক্ত খেযে ফেলে। তাদেব হাত এডিযে যাওয়া খুবই কঠিন। মানুষ যা যা ভালোবাসে, মাযা দিযে তাবা সে সবই তৈরি কবতে পাবে। যাই হোক যদি তাদেব দিকে না তাকাও তাহলেই বাঁচতে পাববে।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'নিশ্চয় পারব। তবু আপনারা এমন কিছু মন্ত্র পড়া আমাকে দিন যাতে মনের জোর ধরে রাখতে পারি।' ভিক্ষুরা তাঁকে মন্ত্রপূত বালি আর সুতো দিলেন। বোধিসত্ত্ব বাবা-মাকে প্রণাম করলেন। তারপর সঙ্গী আর অনুচরদের বললেন, 'রাজ্য পাওয়ার জন্য আমি এখন তক্ষশিলায় যাচ্ছি। তোমরা এখানেই থাক।' সে কথা শুনে তাঁর পাঁচজন অনুচর বলল, 'রাজকুমার, আমরাও যাব।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তোমরা পারবে না।'

অনুচররা জবাব দিল, 'কেন প্রভু?'

বোধিসত্ত্ব যক্ষিনীদের ব্যাপারটা তাদের বুঝিয়ে বললেন। কিন্তু তাতেও তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল না। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বেশ চল, তবে ভুল করলেই মারা যাবে মনে থাকে যেন।'

রাস্তায় যক্ষিনীদের সেই মায়া গ্রাম। তারা বোধিসত্ত্বের সঙ্গীদের একে একে লোভের ফাঁদে ফেলল। বোধিসত্ত্ব এখন একা। সঙ্গীরা যক্ষিনীদের মোহে প্রাণ হারিয়েছে। এক যক্ষিনী কিন্তু বোধিসত্ত্বকে ছাড়ল না। সে তাঁর পিছু পিছু যেতে লাগল। একদল কাঠুরে সুন্দরী যক্ষিনীকে জিজ্ঞেস করল, 'ঐ লোকটা তোমার কে?' যক্ষিনী বলল, 'উনি আমার স্বামী।' কাঠুরেরা তখন বোধিসত্ত্বকে ডেকে বলল, 'তুমি কেমন লোক হে, পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে ফেলে ঘোড়ার মত ছুটছ!' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এ মোটেই আমার স্ত্রী নয়, ও রাক্ষুসী, আমার পাঁচ বন্ধুকে খেয়েছে, এখন আমাকে খেতে চায়।' শুনে তারা বলল 'সত্যি, পুরুষ মানুষের রাগ বড় সাংঘাতিক না হলে নিজের বৌকে রাক্ষুসী বলে!'

যেতে যেতে যক্ষিনী মায়াবলে মা হল। কোলে কচি শিশু নিয়ে সে বোধিসত্ত্বের পিছু পিছু চলল। রাস্তায় আরও কয়েকজন লোক বোধিসত্ত্বকে একই প্রশ্ন করল। আর তিনি সেই এক জবাবই দিলেন। এভাবে তক্ষশিলায় পৌঁছে বোধিসত্ত্ব এক পান্থশালায় উঠলেন। বোধিসত্ত্বের শক্তিকে অমান্য করতে না পারায় যক্ষিনী ভেতরে ঢুকতে পারল না। সে ছেলে কোলে করে বাইরে বসে রইল।

তক্ষশিলার রাজা তখন বাগান বিহারে যাচ্ছিলেন। যক্ষিনীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিলেন তার স্বামী আছে কিনা। যক্ষিনী বলল, 'ঐ যে আমার স্বামী।' কিন্তু বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এ যক্ষিনী, আমার পাঁচ সঙ্গীকে খেয়েছে।' যক্ষিনী তখন বলল, 'হায়, রাগের মাথায় পুরুষ কি না বলে।' রাজা লোক মারফৎ সব শুনে বললেন, 'তাহলে ওকে নিয়ে এস।'

যক্ষিনী রাজার পাটরাণী হল। আর রাতে যক্ষপুরে গিয়ে সমস্ত যক্ষদের ডেকে আনল। পরের দিন সকাল কেটে যাওয়ার পরও রাজপ্রাসাদের দরজা খোলে না। প্রজারা তখন দরজা ভেঙ্গে ফেলল। ভেতরে ঢুকে শুধু হাড়ের স্তূপ দেখতে পেল। তখন তাদের বোধিসত্ত্বের কথা মনে পড়ল। 'তাহলে তো সে ঠিকই বলেছিল। রাজা রূপের মোহে রাক্ষুসীকে এনে সব শেষ করল, নিজেও শেষ হল।'

সবাই মিলে তারপর আলোচনা করে ঠিক করল, ঐ নির্লোভ মানুষটিই আমাদের রাজা হওয়ার উপযুক্ত। পান্থশালায় গিয়ে তারা বলল, 'প্রভু, আপনিই আমাদের রাজ্যের রাজা হোন।'



কটাহক জাতক



বাবাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবাব বণিক জন্ম নেন। যথেষ্ট বিত্ত এবং প্রভাব ছিল তাঁব। সেই সময় বোধিসত্ত্বের একটি ছেলে জন্মায়। একই দিনে তাঁর চাকবেরও একটি ছেলে হয়।



দুটি শিশু একসঙ্গে বড় হতে থাকে। বোধিসত্ত্বেব ছেলে যখন পড়তে যেত, চাকবের ছেলেও তাব সঙ্গে যেত। দুজনে একসঙ্গে খেলাধুলো কবত। এভাবে চাকরেব ছেলে নেহাৎ মূর্খ না হযে বেশ কিছুটা লেখাপড়া শিখল। কালে কালে সে বেশ বলিযে কইযে হল। দেখতেও মন্দ নয়। তাকে কটাহক নামে ডাকা হত। বণিকেব ভাঁড়াব দেখাব কাজে তাকে লাগান হল।



কটাহকেব মনে খুবই চিন্তা। সে কেবল ভাবে, জীবনটা ভাঁড়াব সামলাতেই কেটে যাবে। সাবাটা জীবন তাকে চাকব হযে থাকতে হবে। ব্যাপাবটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পাবছিল না। সে তখন এক ফন্দি বেব কবল। সীমান্তে বোধিসত্ত্বেব এক বন্ধু থাকে। সে-ও বড বণিক। তাব একটি মেযেও আছে। কটাহক ভাবল, 'প্রভুব সই জাল করে একটা চিঠি তৈবি করতে হবে।'

সে কবলও তাই। নিজেই একটা চিঠি লিখল : 'আমাব ছেলে অমুক তোমাব কাছে যাচ্ছে। তোমাব-আমাব পরিবাবকে এক সুতোয বাঁধতে চাই। দুই পরিবাবেব মধ্যে পাবিবাবিক সম্বন্ধ হলেই তা সম্ভব। আমাব ইচ্ছে, আমাব ছেলেব সঙ্গে তোমাব মেযেব বিযে দাও। তাবপর তাবা তোমাব কাছে থাকুক। সময সুযোগ বুঝে আমি যাব।'



কটাহক চিঠিটায় শীলমোহর নকল করে ছাপ দিল। বোধিসত্ত্বের সই জাল করল। তারপর ভাঁড়ার থেকে যত খুশি জিনিসপত্র নিয়ে একদিন রওনা দিল।

সীমান্তের গ্রামে গিয়ে কটাহক সেখানকার বণিককে প্রণাম করল। বণিক জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথা থেকে আসছ বাছা।'

'বারাণসী থেকে।'

'তুমি কার ছেলে?'

'বারাণসীর বণিকের।'

'কি জন্যে এসেছ বাছা?'

'এই চিঠিটা পড়লেই সব জানতে পারবেন।'

বণিক চিঠি পড়ে মহা খুশি। সে কটাহকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিল। কটাহকের নিজের মূর্তি কিন্তু গোপন রইল না। সে যা খায়, যা পরে সব কিছুকেই বলে খারাপ। সব সময় সব কিছুরই খুঁত ধরত সে।





ওদিকে অনেকদিন কটাহককে দেখতে না পেয়ে বোধিসত্ত্বের দুশ্চিন্তা হল। তিনি চারদিকে কটাহকের খোঁজে লোক পাঠালেন। একজন সীমান্ত অঞ্চলে গিয়েছিল। সে ফিরে এসে বোধিসত্ত্বকে কটাহকের কুকীর্তি জানাল।

সব শুনে বোধিসত্ত্ব গেলেন রেগে। কটাহককে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি সীমান্তের দিকে চললেন। বোধিসত্ত্বের সীমান্ত যাত্রার কথা পাঁচ কান হয়ে কটাহকের কানে এল। সে তখন বেশ ঘাবড়ে গেল।

মনে মনে সে আরেক ফন্দি আঁটল। প্রথমে দিনকতক সে শুধু বলে বেড়াতে লাগল, আজকালকার ছেলেরা বাপ-মাকে দেখে না। তাদের যত্ন-আত্তি করে না। হাত-মুখ ধোয়ার জল এগিয়ে দেয় না। খেতে দিয়ে বাতাস করে না। পা টিপে দেয় না ইত্যাদি, ইত্যাদি। চাকররা যেসব কাজ করে সে সেগুলোর কথাই বেশি করে বলত।

একদিন সে শুনল বোধিসত্ত্ব কাছাকাছি এসে গিয়েছেন। তখন সে বণিকের অনুমতি নিয়ে নিজেই এগিয়ে গেল বোধিসত্ত্বকে সম্বর্ধনা জানিয়ে নিয়ে আসতে। আসার পথে চাকর হিসেবে তাঁর খুব খিদমত করল। আর প্রার্থনা করল, 'প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। এখানে আমার যেটুকু মান সম্মান হয়েছে দেখবেন তা যেন থাকে।' বোধিসত্ত্ব তখন তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।'



বন্ধুর বাড়িতে বোধিসত্ত্ব যে কদিন ছিলেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করলেন না যে, কটাহক তাঁর ছেলে নয়। ফিরে যাওয়ার সময় বোধিসত্ত্ব বন্ধুর মেয়েকে ডেকে গোপনে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ছেলে তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তো?' এর জবাবে মেয়েটি বলে, 'ওর সবই ভালো, কিন্তু খাবার-দাবার নিয়ে বড় বায়নাক্কা, সব কিছুই খারাপ বলে।' বোধিসত্ত্ব তখন তাকে একটি ছড়া শিখিয়ে দিলেন।

বোধিসত্ত্ব চলে যাওয়ার পর কটাহকের গুমোর গেল আরো বেড়ে। এখন তার আর কোন ভয় নেই। একদিন বণিকের মেয়ে তাকে খেতে দিলে সে আবার বলতে শুরু করল, 'কি ছিরি রান্নার, এ জিনিস মুখে দেওয়া যায়?' বণিকের মেয়ে তখন বিড়বিড় করে সেই ছড়াটি বলে গেল :



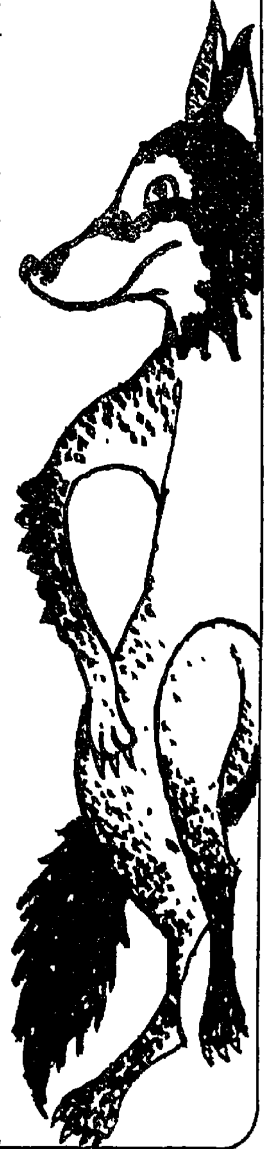
বিদেশী, গুমোর কত বোঝা যাবে
মনিব যদি আসে আবার দেখা যাবে।
কটাহক, অত দেমাক কিসের তোমার,
যা দিচ্ছি চুপ করে খাও সোনা আমার।

কটাহক বুঝতে পারল বোধিসত্ত্ব তাকে সবই বলে দিয়েছেন। সেই থেকে সে আর টুঁ শব্দটি করত না।





বিড়াল জাতক



বোধিসত্ত্ব একবার ইঁদুর হয়ে জন্মান। তবে সচরাচর ইঁদুররা যত ছোট হয় দেখতে বোধিসত্ত্ব মোটেই তা ছিলেন না। বরং তাঁর শরীর বেশ বড়সড় ছিল। সব সময় শ-শ ইঁদুর সঙ্গে নিয়ে তিনি বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন।

ইঁদুরের দল একবার এক লোভী শেয়ালের নজরে পড়ে গেল। শেয়াল মনে মনে ভাবল, 'যে করেই হোক এদের খেতে হবে।' শেয়াল ইঁদুরের গর্তের পাশে সূর্যের দিক মুখ করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে বাতাস গিলতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব খাবারের খোঁজে বেরিয়ে শেয়ালকে দেখে ভাবলেন, 'মনে হচ্ছে এই শিয়াল বেশ সাত্বিক।' তিনি শিয়ালকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মশাই, আপনার নাম কি?'

'ধার্মিক।'

'মাটিতে চার পা দিয়ে না এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

'আমি চার পা দিয়ে দাঁড়ালে পৃথিবী সেই ভার বইতে পারবে না।'

'মুখটা ফাঁক করে রেখেছেন কেন?'

'আমি ভাত খাই না, শুধু বাতাস খাই, সেজন্যে হাঁ করে আছি।'

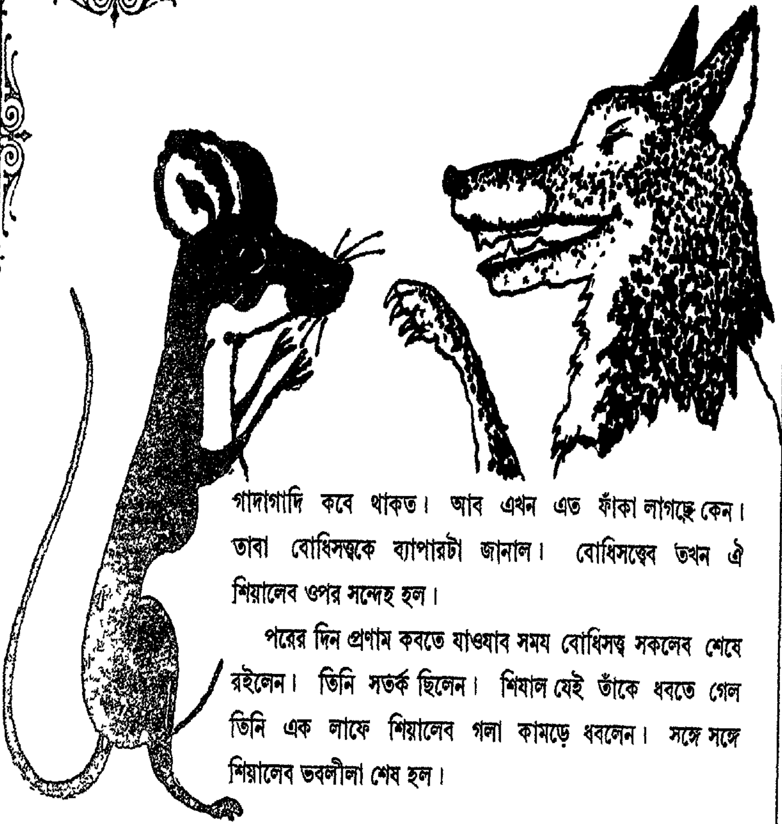
'সূর্যের দিকে মুখ করে আছেন কেন?'

'সূর্যকে নমস্কার করার জন্য।'

বোধিসত্ত্বের আর কোন সন্দেহ রইল না। ইনি নিশ্চয়ই একজন মহান ধার্মিক। তারপর থেকে বোধিসত্ত্ব ইঁদুরদের নিয়ে রোজ শিয়ালকে প্রণাম করতে যেতেন। ইঁদুররা শিয়ালকে প্রণাম করে যখন ফিরত তখন শেষের ইঁদুরটাকে ধরে শিয়াল খেয়ে ফেলত।

এইভাবে চলতে লাগল। ইঁদুররা একদিন দেখল গর্তটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। তাদের সন্দেহ হল। আগে এই গর্তে তারা





গাদাগাদি কবে থাকত। আব এখন এত ফাঁকা লাগছে কেন। তাবা বোধিসত্ত্বকে ব্যাপারটা জানাল। বোধিসত্ত্বেব তখন ঐ শিয়ালেব ওপর সন্দেহ হল।

পরের দিন প্রণাম কবতে যাওযাব সময বোধিসত্ত্ব সকলেব শেষে রইলেন। তিনি সতর্ক ছিলেন। শিযাল যেই তাঁকে ধবতে গেল তিনি এক লাফে শিয়ালেব গলা কামড়ে ধবলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালেব ভবলীলা শেষ হল।

অসম্প্রদান জাতক

একবার মগধের বাজগৃহ নগবে বোধিসত্ত্ব বণিককূলে জন্ম নেন। তিনি তখন মগধ বাজ্যেব শ্রেষ্ঠী ছিলেন। বোধিসত্ত্বের প্রচুব সোনা-রূপা ধনদৌলত ছিল বলে তাঁব নাম হয 'শঙ্খ শ্রেষ্ঠী'। বাবাণসীতে তখন বোধিসত্ত্বেব মতই ধনবান আবেক বণিক ছিল। তার নাম পিলিয শ্রেষ্ঠী। দুজনেব মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। একদিন পিলিয় তাব স্ত্রীকে সঙ্গে নিযে বারাণসী থেকে পাযে হেঁটে মগধে এল। হঠাৎ তার সম্পত্তি নষ্ট হযে যাওয়ায় পিলিয মহা সমস্যায় পড়ে বন্ধুর কাছে এসেছে। শঙ্খ তাকে মহা সমাদরে বাখলেন। তারপর একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার এই হঠাৎ আসার কারণ কি বল।'



'আমি খুব বিপদে পড়েছি।'

'খুলে বল।'

'বাণিজ্যে এমন ক্ষতি হয়েছে যে আমি এখন সর্বস্বান্ত।'

'অত দুশ্চিন্তা কোরো না।'

'এখন তুমি সাহায্য না করলে আর দাঁড়াতে পারব না।'

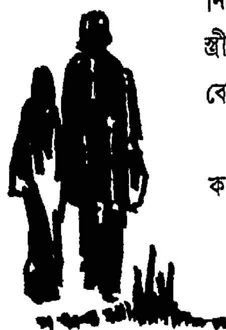
'নিশ্চয়ই করব।'



শঙ্খ তখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দাস-দাসী সমান দু ভাগে ভাগ করে এক ভাগ পিলিয়কে দিলেন। পিলিয় সেই সম্পত্তি নিয়ে বারাণসীতে ফিরে গেল। সুখে দিন কাটাতে লাগল।

কিছুদিন পরে শঙ্খের খুব বিপদ দেখা দিল। হঠাৎ বাণিজ্যে এমন লোকসান হল যে, শঙ্খশ্রেষ্ঠীর পরনের কাপড়টুকু ছাড়া নিজের বলতে আর কিছুই রইল না। অনেক ভেবে তিনি ঠিক করলেন বন্ধুর কাছে যাবেন। বন্ধুর বিপদে তিনি তাকে দেখেছেন, বন্ধু কি আর তাঁকে দেখবে না।





স্ত্রী আর সঙ্গীদের নিয়ে শঙ্খ বারাণসীর দিকে রওনা হলেন। বারাণসীতে পৌঁছে ভাবলেন স্ত্রীকে এভাবে হাঁটিয়ে না নিয়ে গিয়ে পান্থশালায় রেখে যাই। তারপর বন্ধু পাল্কী পাঠিয়ে তাঁর স্ত্রীকে প্রাসাদে আনাবেন। এই ভেবে স্ত্রীকে এক পান্থশালায় রেখে লোকজন নিয়ে তিনি রওনা হলেন।

পিলিয় শঙ্খকে দেখে মোটেই খুশি হল না। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ কি মনে করে?'

'তোমাকে দেখতে এলাম।'

'উঠেছ কোথায়?'

'বাসা ঠিক হয়নি এখনও, স্ত্রীকে ধর্মশালায় রেখে এসেছি।'

'এখানে তো ভাই জাযগা নেই, তুমি বাসাব ব্যবস্থা কবো আগে। তারপব বেঁধে বেড়ে খাও। ঘোবাঘুবি কবে চলে যাও। তবে, আমাব কাছে একদম এস না।'

এই বলে পিলিয় তার কর্মচাবীকে ডেকে বলল, 'ওবে, একে এক বাটি আটাব ভূসি নিযে দে।' শঙ্খ তখন ভাবলেন, এই বন্ধুব ব্যবহাব! এক বাটি আটা দিতে চাইছে। না নিলে বন্ধুত্ব নষ্ট হয। শঙ্খ তা কবতে চান না। ফলে কাপড়েব খুঁটে এক বাটি আটা নিযে ফিবে এলেন।

শঙ্খব স্ত্রী সব কিছু শুনে কাঁদতে লাগলেন। তখন শঙ্খব এক পুবনো চাকব, যে পিলিযব কাছে ছিল, সে দেখতে এল ব্যাপাব কি। সব শুনে তাব খুব কষ্ট হল। শঙ্খ ও তাঁব স্ত্রীকে সে নিজেব বাসায নিযে গেল। শঙ্খব আগেকার চাকবদেব ডেকে জানাল কি ঘটেছে। তাবপব আগেকাব মনিব-মনিবপত্নীব যত্ন আত্তি করল। তাবপব বাজাব কাছে শঙ্খকে নিযে গেল।

বাজার কাছে নালিশ কবায় রাজা পিলিযকে ডেকে পাঠালেন। পিলিয় শঙ্খেব অভিযোগ অস্বীকাব করতে পাবল না। বাজা তখন হুকুম দিলেন পিলিয়ব সমস্ত সম্পত্তি শঙ্খ পাবে। কিন্তু শঙ্খ বললেন, 'না মহারাজ, আমি আমার পাওনা টাকা পেলেই খুশি হব।'

রাজাব আদেশে বোধিসত্ত্ব তাঁব আগেকাব সম্পত্তি ফিবে পেলেন। মগধে গিযে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

এই জাতকের বাণী হল : বন্ধু চেনা যায় বিপদে।



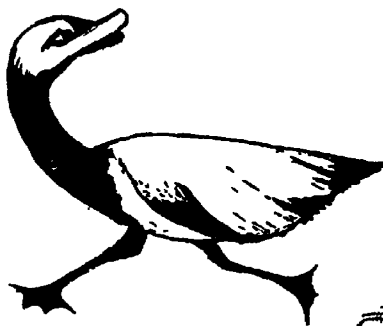
সুবর্ন হংস জাতক

বোধিসত্ত্ব একবাব এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নেন। এক সময় তাঁব বিযেব বযস হল। বিযেব পব বোধিসত্ত্ব পব পব তিনটি মেযেব বাবা হলেন। নন্দা, নন্দবতী ও সুন্দবীনন্দা তাদেব নাম। বোধিসত্ত্বেব অকালে মৃত্যু হয। ফলে তাঁব তিন মেযে আব স্ত্রীকে পবেব বাড়িতে কাজ কবে খেতে হচ্ছিল।

ওদিকে মৃত্যুব পবে বোধিসত্ত্ব সোনাব হাঁস হযে জন্মালেন। তিনি জাতিস্মব বলে আগেব জন্মেব সব কথাই জানতে পাবলেন। তখন তিনি ভাববাব চেষ্টা কবলেন, 'এখন আমাব স্ত্রী আব মেযেবা কি কবে সংসাব চালাচ্ছে।' ভাববাব চেষ্টা কবতেই তিনি পবিষ্কাব দেখতে পেলেন, তাবা কত কষ্ট কবে বেঁচে আছে।

সোনাব হাঁসেব সমস্ত পালকগুলোই পেটা সোনাব। তাই তিনি ভাবলেন, 'আমি যদি ওদেব একটা কবে পালক দিই, তাহলে ওদেব সংসাবেব হাল ফিবে যাবে।' এই ভেবে তিনি তাদেব কুঁড়েব পাশে উড়ে গিযে বসলেন। বোধিসত্ত্বকে দেখে তাঁব মেযেবা জিজ্ঞেস কবল, 'প্রভু, আপনি কোথা থেকে আসছেন?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি তোমাদেব বাবা, মৃত্যুব পব সোনাব হাঁস হযে জন্মেছি। বোজ আমি তোমাদেব একটা কবে সোনার পালক দেব। সেটা বিক্রি কবে তোমবা আবামে থাকতে পাববে। লোকেব বাড়িতে আব তোমাদেব কাজ কবতে যেতে হবে না।' এই বলে তিনি তাদেব একটা সোনাব পালক দিয়ে উড়ে চলে গেলেন।







তারপর থেকে বোধিসত্ত্ব মাঝে মাঝে এসে ওদের একটা করে সোনার পালক দিয়ে যেতে লাগলেন। ফলে মা আর তিন মেয়ের অবস্থা ফিরে গেল। একদিন মা মেয়েদের ডেকে বলল, 'দেখ, তোদের বাবা তো এখন পশুপাখির নামান্তর। এদের স্বভাব বোঝা কঠিন। হয়ত আসাই বন্ধ করে দিল। তার চেয়ে এক কাজ কর, এবার এলে আমরা তার সমস্ত পালক ছিঁড়ে নেব।'

পরে বোধিসত্ত্ব এলে তাঁর বৌ তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমার কাছে আসুন।' বোধিসত্ত্ব যাওয়া মাত্র সে বোধিসত্ত্বের সব পালক ছিঁড়ে নিল। কিন্তু বোধিসত্ত্বের অনিচ্ছায় নেওয়া হল বলে পালকগুলো এক মুহূর্তে বকের পালকের মতই সাদা হয়ে গেল।

বোধিসত্ত্ব তখন উড়ে যাবার জন্য ডানা ছড়িয়ে দিলেন। কিন্তু



উড়তে পারলেন না। তাঁর আগের জন্মের স্ত্রী তখন তাঁকে একটা জালার মধ্যে রেখে দিল। রোজ সেখানে তাকে খাবার দাবারও দিত। কয়েকদিন পরে বোধিসত্ত্বের পালক গজাল। কিন্তু সব পালকই সাদা। একদিন তিনি উড়ে চলে গেলেন। আর কখনও তিনি তাঁর মেয়ে-বৌকে দেখতে আসেন নি।

এই জাতকের মর্মকথা হল : বেশি লোভ করলে সব হারাতে হয়।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার সমুদ্র দেবতা হন। একদিন এক কাক আর তার বউ খাবার খুঁজতে খুঁজতে সমুদ্রের তীরে চলে আসে। তখন অনেকে সমুদ্র পুজো করছিল। ক্ষীর, পায়েস, মাছ, মাংস আর মদ সমুদ্রের তীরে ঢেলে দিচ্ছিল। কাক আর কাকের বউ পুজোর মাছ-মণ্ডা-মিঠাই আশ মিটিয়ে খেল। এমন কি অনেকটা মদও খেয়ে ফেলল।

কাক তখন তার বউকে বলল, 'চল, সমুদ্রে স্নান করি।'

বউ বলল, 'হ্যাঁ, চল। খুব মজা হবে তাহলে।'

নেশার ফূর্তিতে তারা জলে নেমে খুব খেলতে লাগল। ডুব দিয়ে স্নান করতে লাগল। হঠাৎ এক মস্ত ঢেউ এসে কাকের বউকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তখন বড় একটা মাছ খপ করে তাকে ধরে ফেলল। কাকের বউ গেল মাছের পেটে।

কাক জাতক



বেচারা কাক বউকে খুঁজে না পেয়ে সুর করে কাঁদতে শুরু করল। কাকের কান্না শুনে যেখানে যত কাক ছিল ছুটে এল। তারা কাককে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে ভাই?'

কাক বলল. 'পাজি সমুদ্র আমার বউকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।'

শুনে তারা বলল, 'ঠিক আছে, আমরা সবাই মিলে সমুদ্র সেঁচে ফেলব।' সত্যি সত্যি তারা কাজে লেগে পড়ল। ঠোঁটে করে একেকজন জল এনে তীরে ফেলতে লাগল। নুনে মুখ পুড়ে যাচ্ছিল, চোখ লাল হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে তারা একটু জিরিয়ে নেয়, আবার জল সেঁচে ফেলে। এভাবে অনেকক্ষণ কাজ করে গেল। কিন্তু জল এক বিন্দুও কমে না। শেষে তারা হতাশ হয়ে বলল, 'নুন জলে মুখ পোড়ালে কি হবে, জল কমার নাম নেই। এভাবে কিছু হবে না ভাই।'



তখন তাবা কাকেব বউযেব কথা বলে বিলাপ কবতে লাগল। তাব লেজ কত সুন্দব ছিল, সে কি মিষ্টি সুবে ডাকত—এইসব বলে কাঁদতে লাগল। তারপব তাবা সমুদ্রকে গালমন্দ করতে লাগল। সমুদ্রদেবতা তখন ভীষণ ৰূপ ধাবণ কবে কাকদেব সামনে এলেন। ঐ ৰূপ দেখে কাকরা ভযে পালিযে গেল। আব ঠিক তখনি এক বিশাল ঢেউ সেখানে আছড়ে পডল। ভাগ্যিস কাকরা পালিযেছিল, নইলে একটা কাকও প্রাণে বাঁচত না।

এই জাতকেব শিক্ষা হল : খুব বড়ব সঙ্গে লডাই কবা যায না।



অনুশাসক জাতক



বোধিসত্ত্ব একবাব পাখি হযে জন্মান। বড হযে তিনি পাখিদেব বাজা হলেন। হাজাব হাজাব পাখি তাঁকে সব সময ঘিবে থাকত। একবাব তিনি কযেক হাজাব পাখিকে সঙ্গে নিযে হিমালয পর্বত এলাকায ঘুবতে যান।

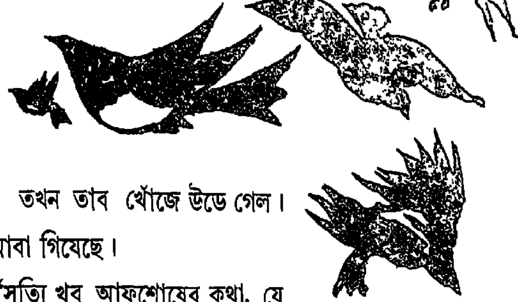
তখন একটি মেযে পাখি খাবাবেব লোভে বাজপথে চবতে শুরু কবেছিল। বাস্তায গাড়ি থেকে ধান, মুগ পড়ে যেত। পাখিটি সেসব দানা খুঁটে খেত। সে মনে মনে ভাবল, 'বাস্তায খাবাব পাওয়া ঢেব সোজা। কিন্তু আব সব পাখি এসে পডলে আমাব খাবাব কমে যাবে। তাই এমন একটা ফন্দি বেব করতে হবে যাতে আব কেউ এখানে চরতে না আসে।'

এইসব সাত-পাঁচ ভেবে সে পাখিদেব সাবধান কবে দিল, 'খবর্দাব, বাজপথে কখনও চবতে যেও না। দিন রাত ষাঁড়গুলো গাড়ি টেনে নিযে যাচ্ছে। যখন-তখন উড়ে গিযে বাঁচাও সহজ নয। যে কোন সময চাকাব তলায় চাপা পড়ে প্রাণ খোযাতে হবে। তাব চেযে না যাওযাই ভালো।'



রোজই সে এভাবে সাবধান করত বলে পাখিরা তার নাম দিয়েছিল অনুশাসিকা। একদিন সে রাজপথে চরছিল এমন সময় শব্দ শুনে বুঝল ঝড়ের বেগে একটা গাড়ি আসছে। সে ভাবল, 'গাড়ি এসে পড়ার আগেই আমি উড়ে যাব। ততক্ষণ খাওয়া যাক।'

এদিকে গাড়িটা নিমেষের মধ্যে এসে পড়ল। সে আর উড়ে যাওয়ার সুযোগ পেল না। গাড়িটা তাকে দু টুকরো করে রেখে গেল। এরপর বোধিসত্ত্ব দেখলেন, সব পাখি ফিরে এসেছে, কিন্তু



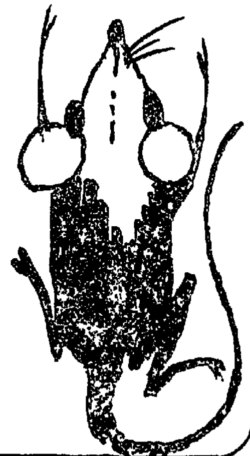
অনুশাসিকার দেখা নেই। পাখিরা তখন তার খোঁজে উড়ে গেল। একটু পরেই খবর পাওয়া গেল সে মারা গিয়েছে।

সব শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'সত্যি খুব আফশোষের কথা, যে সবাইকে সাবধান করত, সে নিজেই ঐ বিপদের মধ্যে গিয়ে মারা গেল।'

এই জাতকের শিক্ষা : নিজে সাবধান না হয়ে অন্যকে সাবধান করা কোন কাজের কথা নয়।

বভ্রূ জাতক

এককালে কাশীতে এক বিরাট ধনী বণিক ছিল। তার সিন্দুকে ছিল গাদা গাদা সোনা। কালে ঐ বণিকের বংশ একে একে শেষ হয়ে গেল। বণিকের বউয়ের টাকাকড়ির ব্যাপারে খুবই দুর্বলতা ছিল। সে ইঁদুর হয়ে জন্মাল। সে সেই সোনার গাদার ওপর থাকত। ঐ গ্রামে তখন আর কেউ বেঁচে নেই।



সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব ঐ গ্রামে পাথর কাটতেন। সোনার গাদার পাহারাদার ইঁদুর বারবার বোধিসত্ত্বকে দেখে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ে। ইঁদুর একদিন ভাবল, 'আমার তো এত সোনাদানা, এই লোকটার সঙ্গে ভাগ করে সম্পত্তি ভোগ করলে মন্দ হয় না।' এই ভেবে সে একদিন এক টুকরো সোনা মুখে করে নিয়ে বোধিসত্ত্বের কাছে গেল।

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সোনা নিয়ে এলে কেন?'

'এটা দিয়ে তুমি নিজের খাবার কিনে আন, আমার জন্যও একটু মাংস এনো।'

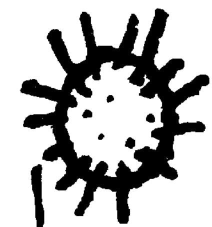
তারপর থেকে বোধিসত্ত্ব তাই করতে লাগলেন। রোজই তিনি খাবার কিনে আনেন। ইঁদুরের জন্য মাংস কেনেন। একদিন হল কি, এক বিড়াল ইঁদুরকে চেপে ধরল। ইঁদুর খুব মিনতি করে বলল, 'প্রভু, আমাকে মেরো না।' বিড়াল বলল, 'কেন মারব না, খিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে। মাংস খেতে ইচ্ছে করছে।' ইঁদুর তখন বলল, 'তোমার কি একদিন মাংস খেলেই চলবে, না কি রোজই মাংস খেতে চাও?' বিড়াল বলল, 'রোজ পেলে তবে তো?' ইঁদুর তখন বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিলে রোজ তোমাকে মাংস দেব।' বিড়াল বলল, 'ঠিক তো?' ইঁদুর বলল, 'হ্যাঁ, তুমি দেখতেই পাবে।' এরপর থেকে ইঁদুর তাকে নিজের মাংসের আধখানা দিয়ে দিত।



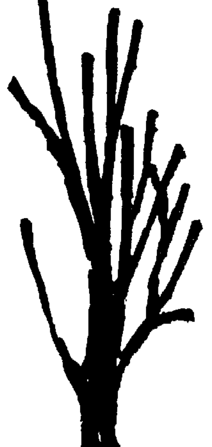


ইঁদুরের কপালে সুখ নেই। কদিন পরে তাকে আরেক বিড়াল ধরল। ইঁদুর তার সঙ্গেও একই রকম বন্দোবস্ত করল। নিজের খাবার এখন তাকে তিন ভাগ করতে হচ্ছে। এতেও রেহাই নেই। আরও দুটো বিড়াল তাকে ধরল। ফলে মাংস পাঁচ ভাগ করে সে নিজে মোটে এক ভাগ খেতে লাগল।





কম খেয়ে ইঁদুর শুকিয়ে যেতে লাগল। বোধিসত্ত্ব দেখলেন, ইঁদুর বেচারার শরীর অর্ধেক হয়ে গেছে। তিনি এখন তাকে জিজ্ঞেস করে সব কিছু জানতে পারলেন। ইঁদুরকে বললেন, 'এর জন্য তুমি মরতে বসেছ? দেখ, একদিনে সব কটা বিড়ালকে জব্দ করব।'



বোধিসত্ত্ব তখন কাঁচের মত স্বচ্ছ পথ দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে দিলেন। ইঁদুরকে বললেন, 'তুমি এর মধ্যে ঢুকে বসে থাক, বিড়ালরা এলে ওদের গালাগালি করবে।' ইঁদুর গুহার ভেতর ঢুকে বসে রইল। প্রথম বিড়াল আসতেই ইঁদুর বলল, 'আজ থেকে মাংস বন্ধ, খেতে হলে নিজের মাংস খা।' রাগে গরগর করে বিড়াল ইঁদুরকে ধরার জন্য লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে স্ফটিক পাথরে ধাক্কা খেয়ে বিড়ালের মাথা ভাঙল। বিড়ালটা মরে গেল। এইভাবে চারটে বিড়ালই শেষ হল। বিড়ালের দল শেষ হলে ইঁদুর আর বোধিসত্ত্ব সেই সোনা খরচ করে আরামে দিন কাটাতে লাগলেন।

এই জাতকের শিক্ষা হল : সবাইকে সন্তুষ্ট করা যায় না।

আম জাতক

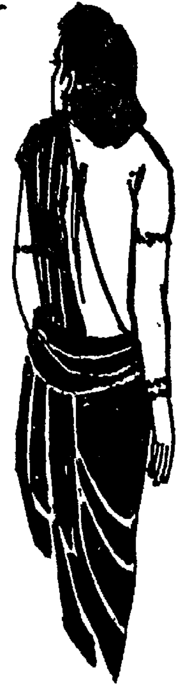




বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একবার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। পরে পাঁচশ শিষ্য নিয়ে তিনি হিমালয় অঞ্চলে তপস্যা করতে যান।

একবার হল কি, হিমালয় অঞ্চলে ভয়ঙ্কর জলের অভাব দেখা দিল। ভয়ানক অনাবৃষ্টি হওয়াতেই ঐ অবস্থা। পশুপাখি জলের তেষ্টায় মর মর। দেখে শুনে এক তপস্বী মনে মনে খুব কষ্ট পেলেন। তখন তিনি একটি গাছ কেটে কাঠের মগ বানালেন। তারপর তাতে জল-ভরে পশুপাখিকে পান করতে দিলেন। জল পেয়ে তারা বেঁচে গেল।

তখন আশপাশ ও দূরদূরান্ত থেকে দলে দলে পশুপাখি ছুটে আসতে লাগল। তপস্বীও ক্রমাগত তাদের জল যুগিয়ে যেতে লাগলেন। ফলে তপস্বীর নাওয়া-খাওয়ারও সময় রইল না। তবু



তিনি নিজে না খেযে থেকেও পশুপাখিব জীবন বাঁচাতে জলদান কবে চললেন।

পশুপাখিব দলও সমস্যাটা বুঝতে পাবল। তাবা ভাবল 'কি কবে প্রভুব জীবন বাঁচাই।' ভেবে ভেবে ঠিক কবল, এবাব থেকে জল খেতে আসাব সময তাবা তপস্বীর জন্য ফল নিযে আসবে। তাবপব ফল আনা শুরু হল। এত ফল আসতে লাগল যে আশ্রমেব পাঁচশ তপস্বী খেযেও তা ফুরোতে পাবল না।

দেখেশুনে বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'সৎ কাজেব ফল সত্যি অদ্ভুত। এক তপস্বীব সৎ কাজেব ফলে পাঁচশ তপস্বী আশ্রমে থেকেই খাবাব পাচ্ছে।'

একপর্ণ জাতক



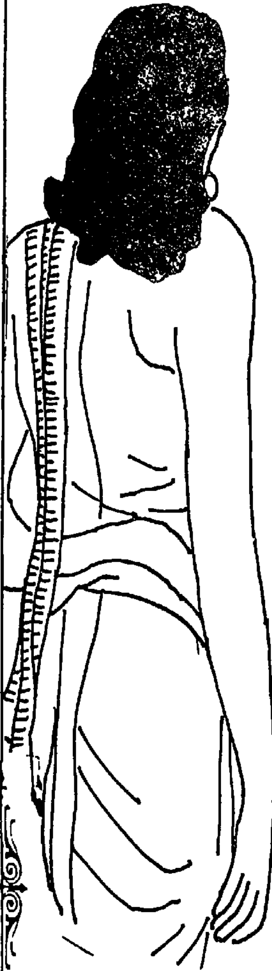
একবাব বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। বযস হলে তিনি শাস্ত্র পাঠ নিতে তক্ষশিলায যান। সেখান থেকে বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র শিখে বাড়ি ফিবে আসেন। কিছুদিন বাবা-মাব সেবা কবলেন। তাবপব তাঁদেব মৃত্যু হলে তপস্বী হযে হিমালয়ে চলে গেলেন। সেখানে ধ্যান কবে তিনি সিদ্ধি লাভ কবলেন।

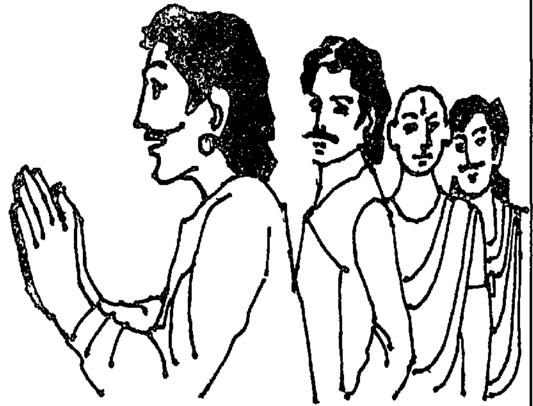
মাঝে একবাব টক আব নুনেব খুব দবকাব হল। নিজেব কাছে যা ছিল সবই ফুবিযে গিয়েছিল। ফলে তাঁকে লোকালযে আসতে হয। তখন তিনি বাবাণসীতে এসে বাজাব বাগানে থাকতে শুরু কবলেন। বাবাণসীতে আসাব পবেব দিন বোধিসত্ত্ব তাপস বেশে নগবে ঢুকলেন। ঘুবতে ঘুবতে চলে এলেন বাজাব বাড়িব কাছে।



জানলা দিযে বাজা হঠাৎ তাঁকে আসতে দেখলেন। বোধিসত্ত্বেব হাঁটা চলাব মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে বাজা চোখ ফেবাতে পাবলেন না। বাজা মনে মনে ভাবলেন, 'এই তপস্বী খুব ধীব স্থিব, সামনেব দিকে তাকিযে সাবধানে কি সুন্দব হাঁটছেন। দেখে মনে হচ্ছে ধর্ম এঁব হৃদযে বিবাজ কবছে।' এইসব ভেবে বাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'ঐ তপস্বীকে এখানে নিযে এস।' মন্ত্রী বোধিসত্ত্বকে ভেতবে আসাব অনুবোধ কবলে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'দেখুন, আমি হিমালযে থাকি, বাজভবনে যাই না।'

মন্ত্রী ফিবে এসে বাজাকে বলল, 'উনি ভেতবে আসবেন না।' শুনে বাজা বললেন, 'আমাদেব তো কোন ধর্মগুরু নেই, বল, আমবা





তাঁকে ধর্মগুরু কবতে চাই।' মন্ত্রী ফিবে বোধিসত্ত্বকে প্রণাম কবল। তাবপব আর্জি পেশ কবল, 'প্রভু, আপনি আমাদেব ধর্মগুরু হোন।'

এবপব বোধিসত্ত্ব বাজভবনে এলেন। বাজা তাঁকে সোনাব সিংহাসনে বসতে দিলেন। নিজেব খাবাব তাঁব সঙ্গে ভাগ কবে খেলেন। খাওযা দাওযাব পব বোধিসত্ত্ব জিবোচ্ছিলেন, বাজা তখন তাঁকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'প্রভু, আপনাব আশ্রম কোথায ?'

'হিমালযে।'

'এখন কোথায যাবেন ?'

'আমি এখন বর্ষাকালটা কোথায কাটাব ভাবছি।'

'দযা কবে আমাব বাগানেই থাকুন না।'

'বেশ, তাই হবে।'



তাবপব বাজা বাগানে একটা কুঁড়েঘব বানিয়ে দিলেন। ঘবটি এমনভাবে বানানো হল যাতে দিনেব বেলা একটা দিক আব রাতেব বেলা আবেকটা দিক ব্যবহাব করা যায়। তপস্বীদেব আব যেসব জিনিস লাগে, বাজা সেসবেবও ব্যবস্থা কবলেন। বাগানেব দাবোযান বোধিসত্ত্বেব সুবিধে-অসুবিধে দেখত। বাজা বোজ দু-তিনবাব বোধিসত্ত্বেব সঙ্গে দেখা কবতে যেতেন।

এই বাজাব এক ছেলে ছিল। তাব মত হার্মাদ, নিষ্ঠুর খুব কম দেখা যায়। বাজা অনেক চেষ্টা কবেও ছেলেব স্বভাব শোধবাতে পাবেন নি। বকা-ঝকা, ভালো কথা কোন কিছুই কোন কাজে আসে নি।

বোধিসত্ত্বকে দেখে বাজাব মনে হল, 'পাবলে এই তপস্বীই পাববেন। একবাব এঁব কাছে ছেলেটাকে নিযে গিযে দেখাই যাক না।' এই ভেবে বাজা ছেলেকে সঙ্গে নিযে বাগানে এলেন। বোধিসত্ত্বকে সব কথা খুলে বললেন। চলে যাওয়াব সময ছেলেকে বোধিসত্ত্বেব জিম্মায় বেখে বলে এলেন, 'আপনি একে সৎ পথে ফিবিযে আনুন।'

বাজা চলে গেলে বোধিসত্ত্ব ছেলেটিকে সঙ্গে নিযে বাগানে ঘুবতে লাগলেন। পাযচাবি কবতে কবতে একটি কচি নিমগাছেব সামনে এসে দাঁডিযে পডলেন। নিমগাছটি তখন সবে পাতা মেলেছে।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'কুমাব, এই চাবাগাছটাব একটা পাতা খেযে বল তো স্বাদটি কেমন?'



কুমাব পাতা একটা চিবিযেই বলে ওঠে 'থুঃ থুঃ।'

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস কবলেন, 'কি হল ?'

কুমাব বলল, 'বিষেব ঝাড়। এইটুকু গাছ যদি এত তেতো হয বড হলে এ খেযে তো লোক মাবা যাবে।'

এই বলে সে গাছটি তুলে ফেলে দিল। বোধিসত্ত্ব তখন তাকে বললেন, 'দেখ কুমাব, এই নিমগাছটা তেতো বলে তুমি উপড়ে ফেললে। বড হলে এখানকাব প্রজাবাও তোমাকে এভাবেই উপড়ে ফেলবে। তাবা ভাববে ছেলেবেলাতেই যে এত নিষ্ঠুব বড হলে তো সে পাষণ্ড হবে। সে বাজা হলে বাজ্যে শান্তি থাকবে না। কুমাব, তুমি এখন থেকে সাবধান হও।'



এতদিনে যা হয নি বোধিসত্ত্বেব মধুব কথায তাই হল। কুমাবেব মতি ফিবল।

কালে কালে সে শান্ত, ধীব স্থিব হল। বাবাব মৃত্যুব পব সে বাজাও হল। তাবপব দান-ধ্যান আব পুজো-আচ্চা কবে একদিন ইহলোক ত্যাগ কবল।

অশাতরূপ জাতক



বোধিসত্ত্ব একবাব ব্রহ্মদত্তেব প্রথম বাণীব সন্তান হযে জন্মান। তিনি লেখাপড়া থেকে যুদ্ধবিদ্যা সব কিছুতেই বেশ পটু হযে উঠলেন। বাবা মাবা গেলে নিজে বাজা হলেন। প্রজাপালনে মন দিলেন।

একদিন কোশলবাজ বহু সৈন্য নিযে বাবাণসী আক্রমণ কবল। যুদ্ধে বোধিসত্ত্ব এঁটে উঠতে পাবলেন না। কোশলবাজ তাঁকে হত্যা কবল। আব তাঁব স্ত্রীকে জোব কবে ধবে নিযে গেল। বাবাণসীব পতন হল।

বোধিসত্ত্বকে কোশলবাজ যখন হত্যা কবছে তখন বোধিসত্ত্বেব ছেলে নর্দমা দিযে পালিযে যায। কিছুদিন পবে সেই ছেলে সৈন্য যোগাড কবে বারাণসী আক্রমণ কবল। বাবাণসীকে ঘিবে ফেলে সে

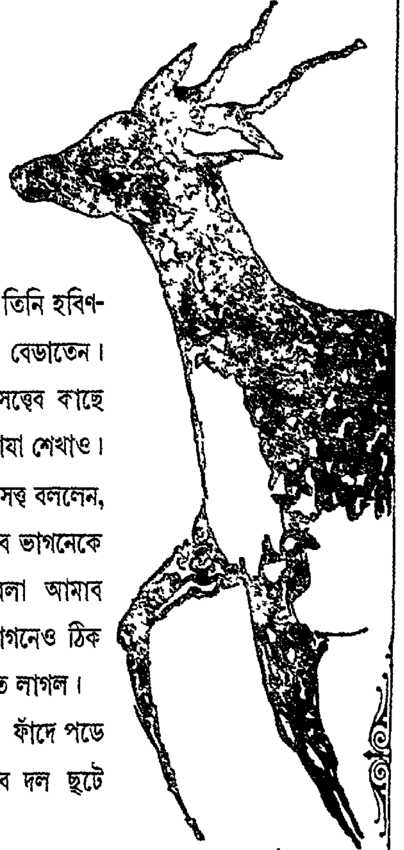
কোশলরাজকে চিঠি পাঠাল, 'হয় রাজ্য ছেড়ে দাও, নাহলে যুদ্ধ কর।' রাজা জবাব পাঠালেন, 'যুদ্ধ করব।'

বোধিসত্ত্বের স্ত্রী সে কথা শুনে ছেলেকে গোপনে একটি চিঠি পাঠাল। তাতে লিখল, 'যুদ্ধ করার কোন দরকার নেই। বারাণসীতে ঢোকার সব রাস্তা বন্ধ করে দাও। তাহলে খাবারদাবার আর জলের অভাব দেখা দেবে। প্রজারা তখন ক্ষেপে উঠবে। তুমি সহজেই বারাণসী দখল করতে পারবে।'

ছেলে মায়ের কথামত সব রাস্তায় কড়া পাহারা বসিয়ে দিল। বারাণসী থেকে কেউ বেরোতে পারছে না, বারাণসীতে কেউ ঢুকতেও পারছে না। প্রজারা এক সময় সত্যি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সৈন্যবাহিনীও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। তারা কোশলরাজের মাথা কেটে বোধিসত্ত্বের কাছে পাঠাল। কুমার তখন নগরে ঢুকে রাজ্যের দায়িত্ব নিলেন।

এই জাতকের শিক্ষা হল: বুদ্ধি দিয়ে নানা অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।

ত্রিপর্যস্ত জাতক

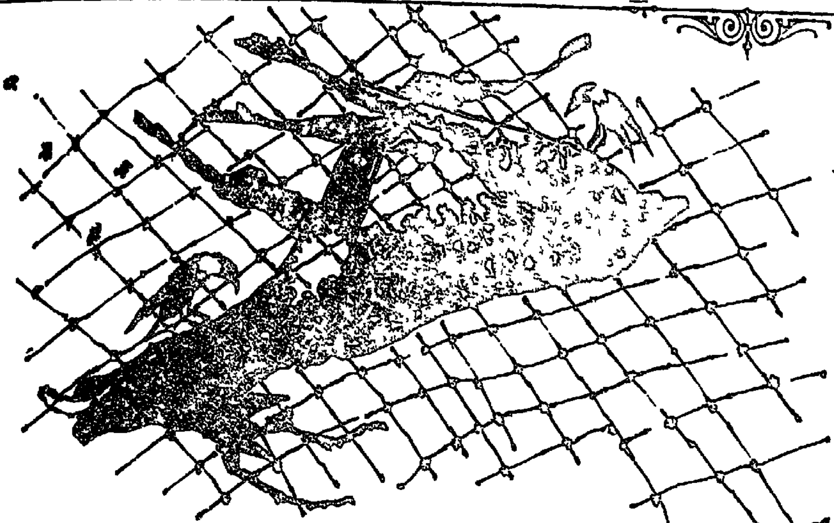


বোধিসত্ত্ব একবার হরিণকুলে জন্মান। বুদ্ধির জোরে তিনি হরিণদের নেতা হলেন। একদল হরিণ নিয়ে অবাধে বনে ঘুরে বেড়াতেন।

একদিন তাঁর বোন নিজের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ত্বের কাছে এল। বোধিসত্ত্বকে বলল, 'দাদা, তোমার ভাগনেকে মৃগমায়া শেখাও। দেখো, ও যেন সব মায়াগুলোই শিখতে পারে।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তোর কোন চিন্তা নেই। ওকে সব শিখিয়ে দেব।' তারপর ভাগনেকে বললেন, 'যা বাবা, এখন খেলতে যা, সকাল-সন্ধ্যে দু বেলা আমার কাছে আসবি, তোকে ফাঁদ কাটা শিখিয়ে দেব।' ভাগনেও ঠিক মামার কথামত এসে একে একে মৃগমায়াগুলো শিখে নিতে লাগল।

হঠাৎ একদিন বনে বিচরণ করার সময় সেই হরিণটি ফাঁদে পড়ে চিৎকার করতে লাগল। তার চিৎকার শুনে সঙ্গী হরিণের দল ছুটে





গিযে তাব মাকে খবব দিল। তখন বোধিসত্ত্বেব বোন ব্যাকুল হযে তাঁব কাছে ছুটে এল। জিজ্ঞেস কবল, 'দাদা, তুমি আমাব ছেলেকে সমস্ত মাযা শিখিযেছিলে কি ?'

'একদম চিন্তা কবিস না।'

'ও কি সব ভালোভাবে শিখেছে ?'

'খুব ভালভাবে সমস্ত মাযা সে শিখেছে। তুই নিশ্চিন্ত থাক, ও ঠিক ফাঁদ কেটে বেবিযে আসবে।'

বোধিসত্ত্ব যখন বোনকে আশ্বস্ত কবছেন ভাগনে তখন ফাঁদ কাটাব চেষ্টা কবছে। সে প্রথমে এক কাত হযে শবীবটা ছডিযে শুযে পডল। পাগুলো ছডিযে দিল। বমি কবল। মাথাটা এমন কাত কবে বাখল যেন ঘাড ভেঙ্গে গিযেছে। জিভ বেব কবে লালা আব ফেনায মুখ ভবিযে ফেলল। চোখ উল্টে নিঃশ্বাস বন্ধ কবে পডে বইল। নীল মাছিবা অবধি তাকে মডা ভেবে গাযে এসে বসল। কাক বসল পিঠে।

ব্যাধ ফিবে এসে হবিণকে ঐ অবস্থায দেখে ভাবল, নির্ঘাৎ অনেক আগে সে ফাঁদে পডেছে, হযত মাংসও পচতে আবম্ভ কবেছে। সে তখন হবিণেব বাঁধন খুলে দিল। তাবপব শুকনো কাঠ আব শুকনো পাতাব খোঁজ কবতে লাগল। হবিণ সুযোগেব অপেক্ষায ছিল। সঙ্গে সঙ্গে গা ঝাডা দিযে উঠে পডল। বাতাসেব তাডনায মেঘ যেভাবে ছোটে সেইভাবে ছুটে সে মাযেব কোলে ফিবে এল।

অভীক্ষ জাতক

বোধিসত্ত্ব তখন বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী। রাজার একটি প্রিয় হাতি ছিল। রাজা সেই সুলক্ষণা হাতিকে মঙ্গলহস্তী করেছিলেন।

মঙ্গলহস্তী খুবই আদর যত্নে থাকে। ভালো-মন্দ খাবার আসে তার জন্য। খাবারের লোভে একটা কুকুর রোজ হাতিশালে আসত। মঙ্গলহস্তীর ফেলে দেওয়া খাবার খেত। রোজ দেখাসাক্ষাৎ হতে হতে দুজনের মধ্যে খুব ভাব হল। একজন আরেকজনকে না দেখে থাকতে পারে না।

গ্রামের এক চাষা হাতিশালের মাহুতকে টাকা দিয়ে একদিন কুকুরটাকে কিনে নিয়ে চলে গেল। এদিকে কুকুরকে না দেখে মঙ্গলহস্তীর খুব কষ্ট হল। মনের দুঃখে সে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল।

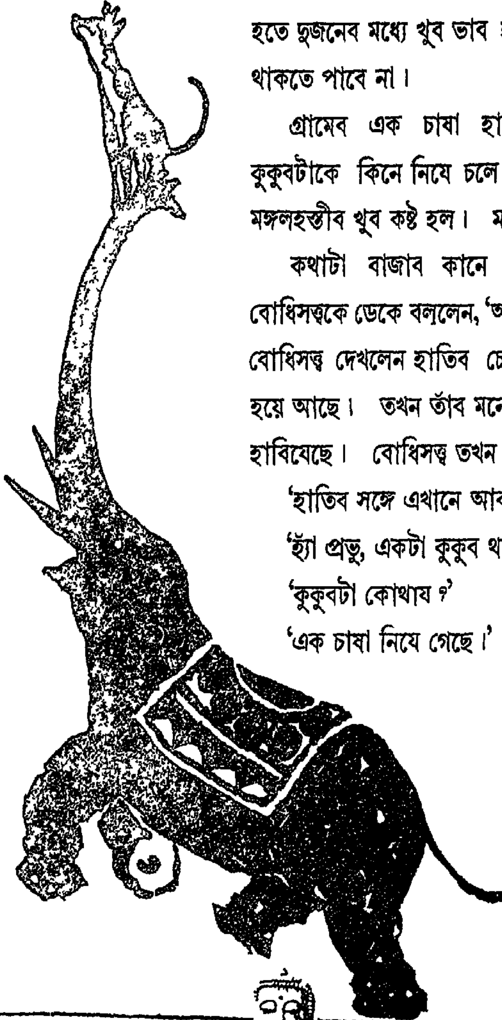
কথাটা রাজার কানে যেতে রাজা খুবই বিচলিত হলেন। বোধিসত্ত্বকে ডেকে বললেন, 'আপনি একবার হাতিটাকে দেখে আসুন।' বোধিসত্ত্ব দেখলেন হাতির চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বেচারা মনমরা হয়ে আছে। তখন তাঁর মনে হল নিশ্চয়ই হাতিটা কোন প্রিয়জনকে হারিয়েছে। বোধিসত্ত্ব তখন মাহুতকে ডাকলেন।

'হাতির সঙ্গে এখানে আর কোন জন্তু থাকত কি?'

'হ্যাঁ প্রভু, একটা কুকুর থাকত।'

'কুকুরটা কোথায়?'

'এক চাষা নিয়ে গেছে।'

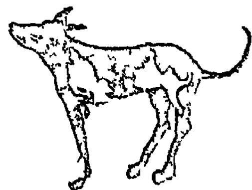




'তার বাড়ি চেন ?'

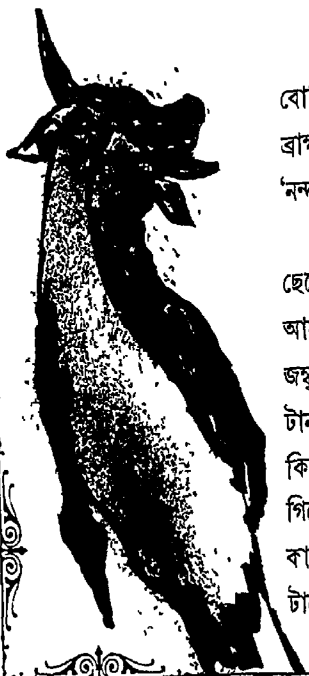
'না প্রভু।'

বোধিসত্ত্ব রাজাকে সব খুলে বললেন। তখন রাজা বললেন, 'কিন্তু কুকুরটাকে পাই কি করে।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ভেরী বাজিয়ে ঘোষণা করা হোক, আমাদের মঙ্গলহস্তীর বন্ধু একটি কুকুরকে কে বা কারা নিয়ে গেছে। যার বাড়িতে সেই কুকুর পাওয়া যাবে তার জেল হবে।'



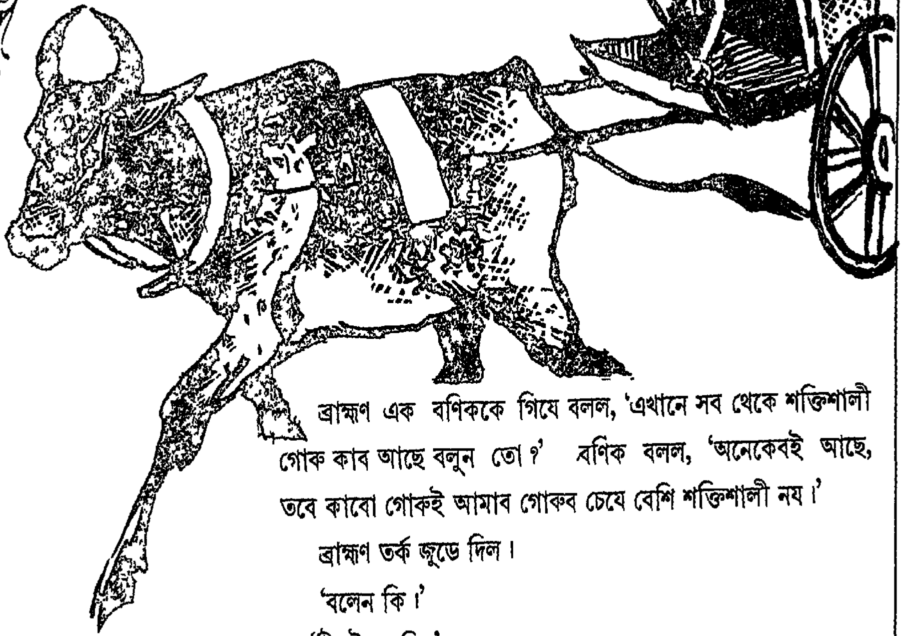
ভেরী বাজিয়ে রাজার ঘোষণা চাউর করা হল। যে কুকুরটাকে নিয়ে গিয়েছিল সে সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাকে ছেড়ে দিল। কুকুরটাও ছাড়া পেয়ে এক ছুটে হাতির কাছে চলে গেল। হাতি আনন্দে তাকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে নিজের মাথার ওপর বসিয়ে দিল। দুজনে খেলতে লাগল। রাজা এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ। ভাবলেন, 'বোধিসত্ত্ব জন্তু-জানোয়ারের মনের কথাও টের পান।'

নন্দিবিলাস জাতক



তক্ষশিলায় তখন রাজত্ব করছেন গান্ধার রাজারা। সেই সময় বোধিসত্ত্ব গোরু হয়ে জন্মান। বোধিসত্ত্ব যখন খুব ছোট, তখন এক ব্রাহ্মণ দান হিসাবে তাঁকে পান। ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের নাম রাখলেন 'নন্দীবিলাস।'

বোধিসত্ত্ব ঐ ব্রাহ্মণের কাছে বেশ যত্নে ছিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে ছেলের মত ভালোবাসত। বোধিসত্ত্ব বড় হয়ে ভাবলেন, 'ব্রাহ্মণ আমাকে কত কষ্ট করে খাওয়ায়। ছেলের মত ভালোবাসে। সারা জম্বুদ্বীপে আমার মত শক্তিশালী গোরু নেই। আমার মত ভার টানতে কেউ পারে না। আমার এই শক্তি কাজে লাগিয়ে ঠাকুরের কিছু উপকার করা যাক।' এই ভেবে একদিন তিনি ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, 'ঠাকুর, যে বণিকের অনেক গোরু আছে এমন কারো কাছে গিয়ে বলুন, আমার গোরু একশ মাল বোঝাই গাড়ি একা টানতে পারে। এই বলে এক হাজার টাকা বাজি ধরুন।'



ব্রাহ্মণ এক বণিককে গিয়ে বলল, 'এখানে সব থেকে শক্তিশালী গোরু কার আছে বলুন তো?' বণিক বলল, 'অনেকেরই আছে, তবে কারো গোরুই আমার গোরুর চেয়ে বেশি শক্তিশালী নয়।'

ব্রাহ্মণ তর্ক জুড়ে দিল।

'বলেন কি।'

'ঠিকই বলছি।'

'আপনার কোন্ গোরু একা একশ মাল-বোঝাই গাড়ি টানতে পারবে? এ রকম গোরু পৃথিবীতে নেই।'

'আমার আছে।'

'বেশ, তাহলে বাজি ফেলুন।'

'এক হাজার টাকা বাজি।'

তারপর ব্রাহ্মণ একশ গাড়িতে মাল তুলল। গাড়িগুলো পরপর সাজিয়ে বোধিসত্ত্বকে জোয়ালে জুতে দিল। নিজে গাড়ির মাথায় বসে, মিছিমিছি দিপটি নাড়িয়ে বলতে লাগল, 'হেই, হ্যাট, টান বদমাশ, জোরে টান, বদমাশ কোথাকার।'

তখন বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'আমি বদমাশ নয়, ঠাকুর খামোকা আমাকে গাল দিচ্ছে, আমি এক পা-ও নড়ব না।' বোধিসত্ত্বের চার পা অমনি চারটি স্তম্ভের মত অনড় হয়ে গেল।





এক হাজাব টাকা হেবে ব্রাহ্মণ মুষড়ে পড়ল। নন্দীবিলাসেব বাঁধন খুলে দিযে একা একা বাড়ি ফিবে শুযে পড়ল। নন্দীবিলাস চবে এসে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস কবল, 'ঠাকুব কি ঘুমোচ্ছেন?'

'যাব হাজাব টাকা খোওযা যায তাব কি ঘুম থাকে?'

'আচ্ছা ঠাকুব, আমি কি আগে কখন আপনাব কোন ক্ষতি কবেছি?'

'না।'

'কোন জিনিস নষ্ট কবেছি?'

'না।'

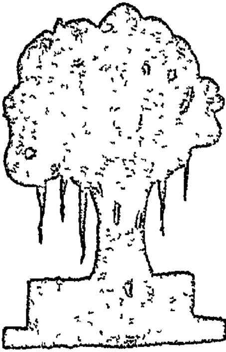
'তাহলে আপনি আমাকে বদমাশ বলছিলেন কেন? নিজেব দোষেই আপনাব ক্ষতি হযেছে। যাই হোক, আবাব বণিকেব কাছে যান, এবাব দু হাজাব টাকা বাজি ধরুন। আব আমাকে গালমন্দ কববেন না।'

ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বেব কথামত সব কিছু কবল। এবাব অতি সহজে দু হাজাব টাকা জিতে ফিবে এল। যাবা ঐ দৃশ্য দেখতে এসেছিল তাবা বোধিসত্ত্বেব শক্তি দেখে মুগ্ধ হযে গেল। নিজেব থেকে তাবা অনেক উপহাব দিল। সব টাকাই ব্রাহ্মণ পেল।

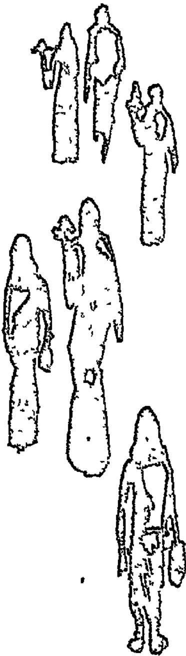
দুর্মেধা জাতক



বোধিসত্ত্ব একবার ব্রহ্মদত্তের ছেলে হয়ে জন্মান। তাঁর নাম রাখা হল ব্রহ্মদত্ত কুমার। মাত্র ষোল বছর বয়সের মধ্যেই ব্রহ্মদত্ত কুমার নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত হলেন। ব্রহ্মদত্ত তখন তাকে যুবরাজ পদে বসালেন।



বারাণসীবাসীরা তখন খুব ঘটা করে ঠাকুর দেবতার পুজো করত। তখন শয়ে-শয়ে ছাগল-মোষ-কুকুর-শুয়োর বলি হত। নিহত পশুর রক্তমাংস দিয়ে দেবতার অর্চনা করত তারা। এইসব দেখে শুনে বোধিসত্ত্বের খুব দুশ্চিন্তা হল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'আজকাল পুজোপার্বণের নামে লোকেরা অধর্ম করছে, প্রাণীহত্যা করছে। বাবার পরে আমি রাজা হলে এই নিষ্ঠুর প্রথা তুলে দেব।'



একদিন বোধিসত্ত্ব রথে চেপে নগর ঘুরতে বেরিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন অনেক লোক একটা গাছের কাছে জড়ো হয়েছে। ব্যাপার কি দেখার জন্য বোধিসত্ত্বও নামলেন। লোকের মুখে শুনলেন যে ঐ গাছে ভগবান আছেন। বৃক্ষ দেবতা। সবাই তাঁর কাছে মানত করতে এসেছে। বোধিসত্ত্ব নিজেও ফুল, চন্দন দিয়ে গাছটিকে পুজো করলেন। গাছের গোড়ায় জল ঢাললেন। তারপর থেকে তিনি মাঝে মাঝেই গাছটিকে পুজো করে আসতেন।

ব্রহ্মদত্তের মৃত্যুর পর বোধিসত্ত্ব সিংহাসনে বসলেন। যথাভাবে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করে চললেন। কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর বোধিসত্ত্ব মনে মনে ভাবলেন, 'রাজা হয়েছি,মনের একটা ইচ্ছে পূর্ণ হল, আমার দ্বিতীয় ইচ্ছেটি এখনও অপূর্ণ।' তখন তিনি মন্ত্রী, সম্মানীয় কয়েকজন নগরবাসী ও ব্রাহ্মণকে ডাকলেন।

'আমি কেন রাজপদ পেলাম আপনারা জানেন কি?'

'না, মহারাজ, আমরা জানি না।'

'আমি একটি গাছকে পুজো করতাম জানেন কি?'

'হ্যাঁ মহারাজ, জানি।'





'তখন আমি বৃক্ষ দেবতাব কাছে প্রার্থনা কবতাম আমি যদি কোন দিন রাজা হই তবে তাঁব পুজো কবব।'

'তাহলে তো এক্ষুনি পুজো দিতে হয মহাবাজ।'

'হ্যাঁ, সেইমত আযোজন করুন।'

'কি আযোজন কবতে হবে মহাবাজ?'

'আমি দেবতাব কাছে প্রতিজ্ঞা কবেছিলাম প্রাণী হত্যাব মত খাবাপ কাজ যাবা কবে তাদেব হৃৎপিণ্ড, মাংস আব বক্ত দিযেই বৃক্ষ দেবতাব পুজো কবব।'

বাজাব চববা সাবা দেশে ভেবী পিটিযে এই কথা ঘোষণা কবল।

এই ঘোষণা শুনে নিজেব প্রাণ বাঁচাতে সবাই ঐ নিষ্ঠুব কাজে ক্ষান্তি দিল। দেশ থেকে পশুবলি উঠে গেল। এভাবে বোধিসত্ত্ব কাউকে কোন বকম শাস্তি না দিযেই দেশেব লোককে সৎ পথে ফিবিযে আনলেন।

ফল জাতক

বোধিসত্ত্ব একবাব বণিককুলে জন্ম নেন। বড় হয়ে যথাবীতি ব্যবসা বাণিজ্য শুরু কবেন। একবাব পঞ্চাশ গাড়ি মালপত্তব ও অনেক লোকজন দিয়ে বাণিজ্য কবতে বেবিয়েছেন। যেতে যেতে তাঁবা এক গভীব বনেব কাছে এসে পড়লেন। ঐ বনেব ভেতর দিয়েই তাঁদেব যেতে হবে। তিনি তখন সঙ্গেব লোকজনকে ডাকলেন। সবাইকে এক জায়গায় জড়ো কবে বললেন, 'শুনেছি এই বনে বিষ ফলেব গাছ আছে। তাকে কিম্ফল বলে। কিন্তু ঐ গাছেব ফল যে কি রকম তা কেউ জানে না। যাই হোক, এই বনেব কোন গাছেব ফল, ফুল বা পাতা আমাকে জিজ্ঞেস না কবে কেউ খেতে যেও না।'

সকলেই সে কথা মেনে নিল। তাবা বনেব মধ্যে ঢুকল। বনেব শুরুতেই ছিল একটি গ্রাম। আব গ্রামেব সামনেই বয়েছে একটি কিম্ফল গাছ। সেই গাছেব ডাল, গোড়া, পাতা আব ফল সব কিছুই অবিকল আম গাছেব মত। শুধু দেখতেই নয়, কিম্ফলেব স্বাদ আব গন্ধও হুবহু আমেব মত। কিন্তু একবাব পেটে গেলে আব বক্ষা নেই। হলাহল বিষেব মতই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হবে।

দলেব আগে আগে যাবা চলেছিল তাদেব লোভ বেশি। কিম্ফলকে আম ভেবে পটাপট ছিঁড়ে দু-চাবজন খেয়ে ফেলল। বাকি লোকেবা ভাবল, 'বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস না কবে খাওয়াটা ঠিক হবে না।' তাবা কয়েকটা কিম্ফল পেড়ে হাতে নিয়ে বসে বইল। বোধিসত্ত্ব আসাব পব তারা জিজ্ঞেস কবল, 'আর্য, আমবা এই আমগুলো খাব?'

'এগুলো আম নয় ভাই।'



'তাহলে কি ?'

'এগুলোই কিম্ফল, বিষফল।'

'কি সর্বনাশ, ওবা যে এগুলো খেযেছে।'

বোধিসত্ত্ব তখন যাবা ফল খেযেছিল তাদেব গলায আঙুল দিযে বমি কবালেন। তাবপব তাদেব ওষুধ খেতে দিলেন। এভাবে তাদেব প্রাণ বক্ষা পেল।

বাস্তায যখনই বণিকেব দল যেত, কিম্ফল খেযে তাদেব ঐ মৃত্যু ছিল অবধাবিত। পাশেব গ্রামেব লোকেবা পবেব দিন সকালে এসে বণিকদেব সর্বস্ব লুট কবে নিযে যেত। বোধিসত্ত্বেব দলকে আগেব দিন বনে ঢুকতে দেখে তাবা ঠিক পবেব দিন সকালে লুট কবার আশায কিম্ফল গাছেব দিকে চলল।

কেউ বলল, 'আমি শুধু গোরুগুলো নেব।' কেউ বলল, 'আমি নেব গাড়িব মালপত্তব।' কেউ বা বলল, 'আমি গাড়িগুলো নেব।' এই সব কথাবলি কবতে কবতে তাবা গাছতলায হাজিব হযে দেখে সবাই দিবি্য বেঁচে আছে। তখন তাবা তাদেব জিজ্ঞেস কবল, 'ভাই, তোমবা কিভাবে বুঝলে যে এটা বিষ ফলেব গাছ ?' বোধিসত্ত্বেব দলেব লোকেবা বলল, 'আমবা তো বুঝিনি, আমাদেব বণিক বুঝতে পেবেছিলেন।'

গ্রামেব লোকেবা তখন বোধিসত্ত্বেব কাছে গেল। তাঁকে জিজ্ঞেস কবল, 'হ্যাঁ মশাই, আপনি কি কবে বুঝলেন এগুলো বিষ ফলেব গাছ ?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'খুব সোজা। গ্রামেব কাছে একটা গাছ ফলে নুযে পড়েছে, অথচ গ্রামবাসীবা সেই ফল ছিঁড়ে নিচ্ছে না দেখেই আমাব সন্দেহ হল।'

তাবপব বোধিসত্ত্ব গ্রামবাসীদেব ধর্মকথা শোনালেন।



পঞ্চায়ুধ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবাব ব্রহ্মদত্তেব ছেলে হযে জন্মান। ছেলেব যেদিন নাম ঠিক কবা হবে, বোধিসত্ত্বেব মা সেদিন আটশ পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে নেমন্তন্ন কবলেন। ছেলেব ভাগ্য কেমন হবে তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন। পণ্ডিতবা বোধিসত্ত্বেব সমস্ত লক্ষণ বিচাব কবে বললেন, 'এই কুমাব মহাবাজেব মৃত্যুব পব বাজা হবে। নানা গুণে এব চবিত্র গঠিত হবে। প্রবল শক্তিশালী হবে এই কুমাব। পাঁচ বকম আযুধ এব দখলে থাকবে। জম্বুদ্বীপে এ বকম শক্তিশালী ও গুণবান আব কোন বাজাব দেখা পাওযা যাবে না।'

ভবিষ্যৎবাণীব সঙ্গে মিলিযে বোধিসত্ত্বেব নাম বাখা হল 'পঞ্চাযুধ কুমাব।'

বোধিসত্ত্ব একদিন যোল বছবে পা দিলেন। ব্রহ্মদত্ত দেখলেন যে ছেলের ভালমন্দ বিচাবেব বযস হযেছে। তখন একদিন বোধিসত্ত্বকে ডেকে তিনি বললেন, 'বাছা, তোমাব বযস হযেছে, এখন তোমাকে শাস্ত্র শিখতে হবে।'

'কাব কাছে শিখব।'



'তক্ষশিলার বিখ্যাত আচার্যের কাছে। তোমাকে এই এক হাজার টাকা দিচ্ছি। এটা দিয়ে গুরুকে প্রণাম করবে।'

তারপর বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় গেলেন। অনেকদিন ধরে গুরুর কাছে নানা বিদ্যা শিখলেন। তাঁর ঘরে ফেরার সময় হল। গুরু তখন তাঁকে কাছে ডেকে পাঁচ রকম অস্ত্র দিলেন।

বোধিসত্ত্ব তো পঞ্চায়ুধ নিয়ে বারাণসীতে ফিরে চলেছেন। রাস্তায় পড়ল এক গহীন বন। সেই বনে বাস করত এক যক্ষ। তার নাম শ্লেষলোম। বোধিসত্ত্ব সেই বনের কাছাকাছি এলে আশপাশের গ্রামবাসীরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ঠাকুর, কোথায় যাবেন?'

'এ বন পেরিয়ে বারাণসী যাব।'

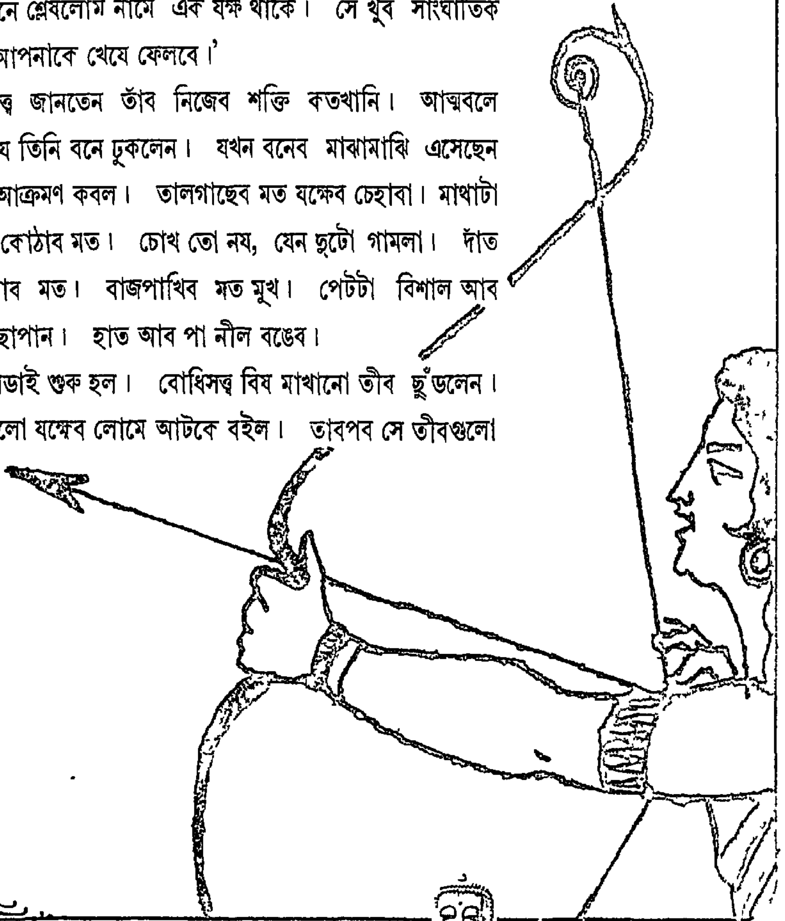
'খবর্দার ঠাকুর, বনে ঢুকবেন না।'

'কেন?'

'এই বনে শ্লেষলোম নামে এক যক্ষ থাকে। সে খুব সাংঘাতিক রাক্ষস। আপনাকে খেয়ে ফেলবে।'

বোধিসত্ত্ব জানতেন তাঁর নিজের শক্তি কতখানি। আত্মবলে বলীয়ান হয়ে তিনি বনে ঢুকলেন। যখন বনের মাঝামাঝি এসেছেন যক্ষ তাঁকে আক্রমণ করল। তালগাছের মত যক্ষের চেহারা। মাথাটা যেন চিলে কোঠার মত। চোখ তো নয়, যেন দুটো গামলা। দাঁত গুলো মূলোর মত। বাজপাখির মত মুখ। পেটটা বিশাল আর নানা রঙে ছোপান। হাত আর পা নীল রঙের।

তুমুল লড়াই শুরু হল। বোধিসত্ত্ব বিষ মাখানো তীর ছুঁড়লেন। কিন্তু তীরগুলো যক্ষের লোমে আটকে রইল। তারপর সে তীরগুলো



ঝেড়ে ফেলে বোধিসত্ত্বকে ধবাব জন্য ছুটে এল। বোধিসত্ত্ব তখন তেইশ আঙুল লম্বা খড়্গ তুললেন। খড়্গও যক্ষেব লোমে আটকে গেল। তাবপব বোধিসত্ত্ব তাকে ঘুসি মাবতে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্যেব ব্যাপাব, তাঁব হাত দুটোও আটকে গেল। পা ছুঁড়লেন। পা দুটো আটকে গেল। তবু বোধিসত্ত্ব ভয় পেলেন না। মাথা দিয়ে মাবতে গেলেন। মাথাও আটকে গেল।

যক্ষ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস কবল, 'এবাব কি হবে?'

বোধিসত্ত্ব নির্ভয়ে বললেন, 'কি আব হবে।'

যক্ষ তখন বলল, 'তোব মবাব ভয় নেই?'

বোধিসত্ত্ব জবাব দিলেন, 'জন্মালে মবতেই হবে, এতে ভয়েব কি আছে। তবে তুমি যদি আমাকে খেয়ে ফেল তাহলে তুমিও মববে। কেননা আমাব পেটেব মধ্যে বজ্রায়ুধ (জ্ঞান-তববাবি) আছে। তাতে তোমার নাড়িভুঁড়ি টুকবো টুকবো হয়ে যাবে।'

যক্ষ নিজেই মবাব ভয়ে তখন কাহিল। মনে মনে ভাবল, 'এ সত্যিকাবেব বীব, এব এক টুকবো মাংসও আমি হজম কবতে পাবব না। তাব চেয়ে ববং একে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'

যক্ষেব হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি তো না হয় ছাড়া পেলাম। কিন্তু তোমাব কি হবে। এই যে এত পাপ কবছ, তোমাব তো কোনদিনই মুক্তি হবে না।' ইত্যাদি বলে তিনি যক্ষকে অনেক ধর্মকথা শোনালেন। সৎ শিক্ষা দিলেন। যক্ষের মনও বদলে গেল। বোধিসত্ত্ব তখন তাকে বনেব দেবতা কবে নিজেব ঘরে ফিবে চললেন।



রাজোববাদ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের প্রথম রাণীর গর্ভে জন্ম নেন। বোধিসত্ত্বের নাম রাখা হল 'ব্রহ্মদত্তকুমার।' যথাবয়সে বোধিসত্ত্ব শাস্ত্রপাঠ ও অন্যান্য শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় গেলেন। বেশ কিছুদিন সেখানে থেকে মন দিয়ে শাস্ত্র, পুরাণ ও বেদ পড়লেন। তারপর সব রকম শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন।

কিছুদিন পরে মহারাজ ব্রহ্মদত্ত দেহ রাখলেন। রাজ্যভার এখন বোধিসত্ত্বের হাতে। রাজা হিসেবে অচিরেই তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। এমন নিরপেক্ষ, নির্লোভ রাজা সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর বিচার খুবই সূক্ষ্ম। কখনো তা ন্যায়ের পথ থেকে সরে যেত না।

রাজা ধর্ম মেনে শাসন করেন। ফলে মন্ত্রী এবং অমাত্যরাও ধর্ম অনুসারে চলে। বিচার সূক্ষ্ম হত বলে বদ লোকরাও মিথ্যে মামলা হাজির করত না। দেশবাসীও অন্যায়ের রাস্তায় যেত না। সেজন্য বিচারপ্রার্থীর সংখ্যা কমতে লাগল। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে রাজ্যে একজনও লোক রইল না যার সুবিচার দরকার। রাজসভার লোকজন বিচার করার জন্য বসে থেকে থেকে রোজ সন্ধ্যায় একজনও বিচারপ্রার্থী না পেয়ে ফিরে যেত। ফলে বিচারালয় জনশূন্য হল।



এভাবে কিছুদিন চলাব পব বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'বাজ্যে সুবিচাব আছে, আমি ধর্ম মেনে চলি। তাই সবাই খুশি। কিন্তু সবাই শুধু আমার গুণগান করে। আমাব দোষের কথা কেউ বলে না। আমার দোষগুলো জানতে পাবলে তা কাটাবাব চেষ্টা কবা যেত।'

তাবপর থেকে তিনি সব সময় দোষ ধবাব লোক খুঁজতে লাগলেন। অনেক খোঁজ কবেও কিন্তু বাজভবনে এ বকম একজনও খুঁজে পেলেন না। তিনি বাজভবনেব বাইরেও লোক খুঁজতে লাগলেন। কেননা তাঁব মনে হল, 'বাজভবনেব লোকবা হয়ত ভয়ে মুখ খুলছে না।' কিন্তু প্রাসাদের বাইরেও এ বকম কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না। নগরবাসীদেব জিজ্ঞাসা করা হলে তাবাও কেবল তাঁব গুণের কথাই বলতে লাগল।

তখন তিনি ঠিক কবলেন, ছদ্মবেশে প্রজাদেব মধ্যে খোঁজ কবতে যাবেন। মন্ত্রীদেব হাতে কিছুদিনেব জন্য বাজ্যভাব দিয়ে তিনি বথ সাজাতে বললেন। শুধু সাবথিকে সঙ্গে নিয়ে বওনা দিলেন।

ওদিকে কোশলবাজ মল্লিকও ঠিক একই উদ্দেশে মন্ত্রীদেব হাতে বাজ্যভাব দিয়ে বেবিয়ে পডেছেন। বাস্তায় যেতে যেতে দুটি বথ মুখোমুখি হল। দুটি বথ যাওয়াব মত চওডা বাস্তা নয়। ফলে যে কোন একজনকে আগে যেতে হবে। দুই সাবথিব মধ্যে বচসা শুরু হল কে আগে যাবে তা নিয়ে। এ বলে 'আমি আগে যাব', ও বলে 'আমি আগে যাব।'

বাবাণসীরাজেব সাবথি তখন বলল, 'তোমাব বথ ঘুরিয়ে নাও, আমাব বথে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত আছেন।'







তখন কোশলবাজেব সাবথি বলল, 'আমাব বথে আছেন স্বযং কোশলবাজ।'

তাবপব দুই সাবথি কোশলবাজ ও বাবাণসীবাজেব বযস তুলনা কাব দেখল। বযসে যিনি বড হবেন তাঁব বথই আগে যাবে। কিন্তু দেখা গেল দুজনেই সমবযস্ক। তাবপব দুজনেব বাজোব আযতন, সেনাবল, সম্পদ, যশ, বংশ মর্যাদা—সব কিছুব তুলনা কবা হল। আশ্চর্যেব ব্যাপাব, দেখা গেল সব ব্যাপাবেই তাঁবা পবস্পবেব সমান। তখন সাবথিবা ঠিক কবল, 'এবাব দুজনেব চবিত্রগুণেব তুলনা কবা যাক।'

কোশলবাজেব সাবথি তাব বাজাব চবিত্র বর্ণনা কবল এভাবে ঃ 'কঠোবেব সঙ্গে তাঁব আচবণ কঠোব। কিন্তু কোমলেব প্রতি তিনি খুবই কোমল। সাধু লোকেব সঙ্গে তাঁব ব্যবহাব সাধুজনোচিত। সংক্ষেপে এই তাঁব নীতি।'

বাবাণসীবাজেব সাবথি এই গুণ বর্ণনা শুনে ভাবল 'এই যদি গুণ হয তাহলে দোষ কাকে বলে।' তাবপব সে বাবাণসীবাজেব চবিত্র বর্ণনা কবল ঃ 'কঠোবকে তিনি জয কবেন কোমলতা দিযে। সাধু আচবণে অসাধুকে জয কবেন। সত্য দিযে মিথ্যাকে দমন কবেন। এখন বুঝলে তো শ্রেষ্ঠ কে, এবাব তোমাব বথ ফেবাও।'

সব শুনে কোশলবাজ নিজেই বথ থেকে নেমে এলেন। বাবাণসী-বাজকে বাস্তা ছেড়ে দিলেন। বাবাণসীবাজ কোশলবাজকে তখন ধর্মকথা শোনালেন। তাবপব নগবে ফিবে গেলেন।

খদিরাঙ্গার জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার বণিককুলে জন্মান। রাজার ছেলের মত আদর-যত্নে তিনি বড় হতে থাকেন। যখন তাঁর সবে ষোল বছর বয়স তখনই তিনি নানা বিষয়ে পণ্ডিত হন। বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

বাবার মৃত্যু হলে বোধিসত্ত্ব রাজ্যের শ্রেষ্ঠীপদ পেলেন। তখন তিনি নগরে ছটি দানশালা তৈরি করালেন। এই ছটি দানশালার মধ্যে একটি ছিল তাঁর প্রাসাদের গায়ে। রোজ এইসব দানশালা থেকে তিনি বিস্তর দান-ধ্যান করতেন। তারপর শাস্ত্র আলোচনা করে ফিরে যেতেন।

এদিকে এক ভিক্ষু এক সপ্তাহ সমাধি পালন করে দেখলেন ভিক্ষার উপযুক্ত সময় হয়েছে। তখন তিনি ভাবলেন, 'আজ বারাণসীর শ্রেষ্ঠীর কাছে ভিক্ষা নেব।' হিমালয়ের বিশেষ হ্রদে (অনবতপ্তহ্রদে) হাত-মুখ ধুয়ে তিনি শুদ্ধ কাপড় পরলেন। যোগবলে আহরণ করলেন মাটির পাত্র। ওদিকে বোধিসত্ত্ব তখন সবে সকালের ভালো মন্দ জল-খাবার খেতে যাচ্ছেন। ঠিক তখন আকাশপথে উড়ে এসে ভিক্ষু বোধিসত্ত্বের প্রাসাদ-লাগোয়া দানশালার কাছে দাঁড়ালেন।

বোধিসত্ত্ব ভিক্ষুকে দেখেই উঠে পড়লেন। নিজের অনুচরকে বললেন, 'আর্যের হাত থেকে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এস।'



ঠিক তখন পাপী মাব খুব ব্যস্ত হযে পড়ল। ভিক্ষু সাতদিন খান নি, আজও যদি না খেতে পাবেন, তাহলে তাঁব নির্ঘাৎ মৃত্যু হবে। তাহলে বোধিসত্ত্বেব পুণ্য কাজেও বাধা দেওযা হবে। এইসব ভেবে মাব ভিক্ষুব সামনে এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড তৈবি কবল। বোধিসত্ত্বেব অনুচব ঐ আগুনেব জ্বালা সহ্য কবতে না পেবে ফিবে গেল। বোধিসত্ত্ব তাকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'কি হে, তুমি ফিবে এলে কেন?' অনুচব বলল, 'প্রভু, বাস্তায আগুনে-কুযো জ্বলছে।' আবো কযেক জনকে পাঠানো হল। কিন্তু কেউই সেই আগুন পেবিযে যেতে পাবল না।

বোধিসত্ত্ব চিন্তা কবে বুঝতে পাবলেন, 'এ সবই মাবেব চক্রান্ত, আজ দেখা যাবে মাব আমাব দানেব বাধা কি কবে হয।' তাবপব ভিক্ষুব জন্য খাবাব নিযে সেই আগুনেব সামনে গেলেন। ওপব দিকে তাকাতেই আকাশে মাবকে দেখতে পেলেন।



'কে বে তুই?'

'আমি মাব।'

'এই আগুন তুই জ্বেলেছিস?'

'হাঁ।'

'কেন?'

'তোমাকে বাধা দেওযাব জন্য আব ভিক্ষুকে মাবাব জন্য।'

'তোব কোন উদ্দেশ্যই সফল হবে না, এই দেখ।'

বলে তিনি সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডেব দিকে পা বাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে



আগুনেব ভেতব থেকে আশ্চর্য এক মহাপদ্ম উঠে এল। বোধিসত্ত্ব তার ওপব দাঁড়িয়ে ভিক্ষুকে খাবাব ঢেলে দিলেন। ভিক্ষু খাবাব নিযে বোধিসত্ত্বকে মধুর কথা বললেন তাবপব সেই পাত্রটি আকাশে উডিযে দিযে সকলেব চোখেব সামনে নিজেও আকাশপথে হিমালযেব দিকে উডে গেলেন। তাঁব চলে যাওযাব বাস্তাটি নানা আকাবেব ছেঁডা ছেঁডা মেঘ বলে মনে হল।

বোধিসত্ত্ব তখন ঐ মহাপদ্মেব ওপব দাঁডিযে থেকে সবাইকে ধর্ম-কথা শোনালেন।

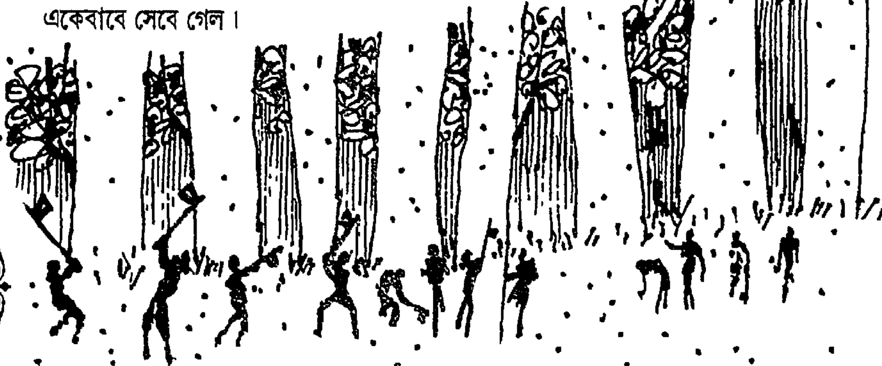


অশীন চিত্ত জাতক

ব্রহ্মদত্ত তখন বারাণসীর রাজা। নগর থেকে একটু দূরে তখন ছুতোরদের একটি গ্রাম ছিল। গ্রামটির নামও ছিল ছুতোরপাড়া। সেখানে পাঁচশ ছুতোর থাকত। নৌকায় চেপে, নদী উজিয়ে তারা দল বেঁধে বনে যেত। সেখানে গিয়ে কাঠ কাটত। তারপর বনের মধ্যেই বাড়ি তৈরি করার জন্য দরকারি আড়া, তক্তা, খুঁটি তৈরি করে নিত। এভাবে একতলা, দোতলা, তিনতলা বাড়ির কাঠামো তৈরি করে তাতে নম্বর দিয়ে রাখত। তারপর নদীর তীরে এনে সব জড়ো করত। নৌকায় তক্তা বোঝাই করে নগরে ফিরে আসত। তারপর যার যেমন দরকার, সেই রকম ঘর বানিয়ে দিয়ে ন্যায্য দাম নিত। এরপর আবার বনে ফিরে যেত। এই ছিল তাদের রুটি-রুজির রাস্তা।

এখন একবার হল কি, ছুতোররা বনের মধ্যে কাঠ কাটছিল। তখন কিছু দূরে, বনের মধ্যে এক হাতির পায়ে খয়ের কাঠের কুচো ফুটল। খয়ের কাঠ সাংঘাতিক। হাতির পা ফুলে ঢোল হল। পূঁজ জমল। বেচারা ব্যথায় কাহিল। বনের মধ্যে কাঠ কাটার শব্দ পেয়ে সে ভাবল, 'এদের কাছে গেলে হয়ত কুচোটা বের করে দিতে পারবে।' তখন সে তিন পায়ে কোনরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুতোরদের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

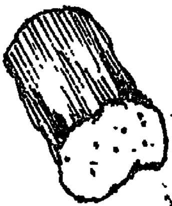
ছুতোররা তার ফোলা পা দেখে কাছে এল। চিমটে দিয়ে খয়ের কাঠের কুচো টেনে বের করল। তারপর গরম জলে ঘা ধুইয়ে দিল। পূঁজ বের করে দিল। এভাবে দিন কয়েক সেবার পর হাতির পা একেবারে সেরে গেল।



রোগ সারবার পর হাতি ভাবল, 'ছুতোরদের জন্যই প্রাণে বেঁচেছি, আমারও উচিত ওদের জন্য কিছু করা।' এ কথা ভেবে সে ছুতোর-দের সঙ্গেই থেকে গেল। ছুতোররা যখন কাঠ কাটে, সে কাঠ বয়ে নিয়ে যায়। শুঁড়ে জড়িয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে আসে। কাঠের গুঁড়ো উল্টেপাল্টে দেয় ছিলার কাজের সময়। ছুতোররাও খাবার সময় প্রত্যেকে এক মুঠো করে ভাত দিত তাকে; ফলে সে পাঁচশ গ্রাস ভাত পেত।



এই হাতির একটা ছেলে ছিল। তার সারা শরীর সাদা। সব রকম মঙ্গলচিহ্ন ছিল তার শরীরে। আবার সে সেরা বংশেও জন্মেছে (আজানেয)। হাতি ভাবল, 'আমি বুড়ো হয়েছি। এখন ছেলেকে এ কাজে লাগানো দরকার। তাহলে নিজে একটু ঘুরেফিরে বেড়াতে পারি।' এই ভেবে ছুতোরদের কিছু না জানিয়ে সে গভীর বনে চলে গেল। ফিরে এল ছেলেকে সঙ্গে করে। তারপর ছুতোর-দের বলল, 'আপনারা চিকিৎসা করে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। এ আমার ছেলে। চিকিৎসার দাম হিসাবে আমি আমার ছেলেকে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।'



তারপর থেকে সেই আজানেয হাতিটি ছুতোরদের সঙ্গে থাকে। তাদের কাজে সাহায্য করে। ছুতোরদের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করে। জলকেলি করে।



একদিন দারুণ বৃষ্টিতে সব ভেসে গেল। ফলে ডাঙ্গা থেকে হাতির মল নদীতে ভেসে গেল। সেখান থেকে ভাসতে ভাসতে গেল বারাণসীর ঘাট। তখন রাজার হাতিদের স্নান করানোর জন্য ঘাটে আনা হয়েছিল। কিন্তু আজানেয় হাতির মলের গন্ধ পেয়ে কোন হাতিই জলে নামতে চায় না। সবাই পালাতে লাগল। মাহুতরা তখন হাতি বিশেষজ্ঞের (গজাচার্য) কাছে গেল। সব শুনে সে বলল, 'জলে নির্ঘাৎ কোন দোষ আছে। জল শোধন কর।' জল শোধন করতে গিয়ে তারা আজানেয় হাতির মল পেল। তখন তারা আসল ব্যাপার বুঝতে পারল। এক কলসী জলে আজানেয় হাতির মল ফেলে সেই জল হাতিদের গায়ে ছেটানো হল। এতে হাতিদের শরীর থেকে সুগন্ধ উঠে আসতে লাগল। গজাচার্য মহারাজকে এই বৃত্তান্ত জানিয়ে বলল, 'মহারাজ, এই দুর্লভ আজানেয় হাতিকে আনিয়ে আপনার হাতিশালে রাখলে মঙ্গল হবে'

পরামর্শটি মহারাজের মনে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে লোক-লস্কর নিয়ে নৌকো সাজিয়ে ব্রহ্মদত্ত রওনা হলেন। আজানেয় হাতি তখন জলকেলি করছিল। ভেরীর শব্দ শুনে সে ছুতোরদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ছুতোররা ব্রহ্মদত্তকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ, আপনার কাঠের দরকার হলে তো লোক পাঠালেই চলত। নিজে কেন কষ্ট করতে গেলেন?' ব্রহ্মদত্ত বললেন, 'কাঠের জন্য আসি নি, আমি এই হাতিটির জন্য এসেছি।'

'এ তো আপনারই হাতি মহারাজ, যখন খুশি নিয়ে যান।'



ছুতোররা রাজাকে হাতি দিতে চাইলেও হাতি এক পা-ও নড়তে রাজি নয়। রাজা তখন হাতিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে হস্তীবর, তুমি কি চাও বল?' হাতি বলল, 'মহারাজ, এই ছুতোররা আমাকে খাওয়াতে গিয়ে এতদিন যা খরচ করেছে সেই টাকাটা দিয়ে দিন।' রাজা তাদের এক লক্ষ টাকা দিলেন। হাতি তবুও নড়ে না। রাজা তখন ছুতোর-ছুতোরের বউ, তাদের ছেলেমেয়ে সবাইকে নতুন কাপড় দিলেন। ছুতোরের বাচ্চাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। আজানেয় হাতি এবার যেতে রাজি হল।

বাজাব হাতিশালে এসে সে মঙ্গলহস্তী হল। আবামে যত্নে তার দিন কাটে। সে বাজাব বাহন। বাজাকে সে প্রাণেব চেয়ে বেশি ভালবাসতে শুরু কবল।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। অকালে বাজা দেহ বাখলেন। বোধিসত্ত্ব তখন বাজমহিষীব গর্ভে। আজানেয় হাতিকে বাজাব মৃত্যুব খবর জানানো হল না, কাবণ তাহলে হাতি শোকে মাবা যেতে পারে। এদিকে বোধিসত্ত্বেব ভূমিষ্ঠ হওয়াব সময় আসন্ন হয়ে এল। ঠিক তখন কোশলবাজ ব্রহ্মদত্তহীন বাবাণসী দখল কবাব জন্য বাজ্য আক্রমণ কবলেন। নগববাসীবা নগবেব মূল ফটক বন্ধ কবে রেখে কোশল-বাজকে খবব পাঠাল, 'আমাদেব বাজমহিষীব এক সপ্তাহেব মধ্যে সন্তান হবে। এখন যুদ্ধ স্থগিত বাখুন। সন্তান কন্যা হলে আমবা স্বেচ্ছায় আপনাকে বাজ্য ছেড়ে দেব। পুত্র হলে যুদ্ধ কবব।' কোশলবাজ ঠিক কবলেন সাতদিন অপেক্ষা কববেন।

সাত দিন পবে বোধিসত্ত্ব জন্মালেন। ঘোব যুদ্ধ শুরু হল। সৈন্য বেশি থাকা সত্ত্বেও বাবাণসীব সৈন্যবাহিনী দক্ষ সেনাপতিব অভাবে হাবতে লাগল। মন্ত্রীবা তখন বাজমহিষীকে গিয়ে বলল, 'অবস্থা খাবাপ। আমবা হেবে যেতে পাবি। আপনি ভেবে দেখুন, বাজাব মঙ্গলহস্তী কোন বিপদেব কথাই জানে না। বাজাব মৃত্যু, কুমাবেব





জন্ম ও শত্রুব আক্রমণেব কথা এখন তাকে জানানো দবকাব কিনা।'

বাজমহিষী বললেন, 'হ্যাঁ, জানানো দবকাব!' তাবপব কুমাবকে সাজিযে নিযে নিজেই মঙ্গলহস্তীব কাছে শুইযে দিয বললেন, 'প্রভু আপনাব বন্ধু আব ইহলোকে নেই। এই শিশু তাঁব পুত্র। কোশলবাজ নগব ঘিবে ফেলেছে, সে আপনাব এই শিশুব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে চাইছে। এখন আপনি হয এই শিশুটিকে মেবে ফেলুন, নইলে শত্রু নিধন করুন।'

মঙ্গলহস্তী কুমাবকে শুঁড দিযে আদব কবল। বন্ধুব শোকে চোখেব জল ফেলল। তাবপব দারুণ শব্দ কবে যুদ্ধেব জন্য তৈবি হল। মন্ত্রী ও অনুচববা তাকে যুদ্ধসাজে সাজিযে দিল নগবেব ফাটক খুলে মঙ্গলহস্তীব সঙ্গে সঙ্গে বাবাণসীব বীববাও যুদ্ধ কবতে ছুটল। কিছুক্ষণেব মধ্যে শত্রুব শিবিব ভেঙে মঙ্গলহস্তী কোশলবাজকে এনে বোধিসত্ত্বেব পাযেব কাছে ফেলে দিল।

তখন অনেকেই কোশলবাজকে হত্যা কবাব জন্য অস্ত্র তুলেছিল। মঙ্গলহস্তী তাদেব ঠেকাল। আব কোশলবাজকে বলল, 'আপনাকে ছেডে দিচ্ছি মহাবাজ। তবে সাবধান, কাশীবাজকুমাব শিশু বলেই যে বাজ্য দখল কবা সহজ এ কথা কখনও ভাববেন না।'

ময়ূর জাতক

সে অনেক দিন আগেকাব কথা। বাবাণসীতে তখন বাজত্ব কবেছেন ব্রহ্মদত্ত। বোধিসত্ত্ব সেই সময ময়ূব হযে জন্মান। তাঁকে দেখতে এত সুন্দব ছিল যে, একবাব চোখে দেখলে চোখ জুড়িযে যেত। গাযেব বঙ ছিল সোনাব মত উজ্জ্বল। ডানাদুটিব নিচে লাল একটি দাগ ছিল।

বোধিসত্ত্ব সকাল-সন্ধ্যা সূর্যস্তব পাঠ কবতেন। সমস্ত দিন চডে বিকেলে পাহাড়-চূড়ায ফিবে আসতেন। সেখানে এসে বুদ্ধেব গুণাবলী স্মবণ কবতেন।

বারাণসীব এক ব্যাধ ঘুবতে ঘুবতে হিমবন্ত প্রদেশে চলে যায়। সেখানে দণ্ডক হিরণ্য পাহাডেব চূডায বোধিসত্ত্বকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায দেখতে পায। ফিবে এসে ঐ ব্যাধ তাব ছেলেকে এই অপূর্ব ময়ূব সম্পর্কে অনেক কিছু বলল। এই ঘটনাব কিছুদিন পবে বারাণসী বাজেব স্ত্রী ক্ষেমা স্বপ্ন দেখল একটি সোনাব ময়ূব তাকে ধর্মকথা শোনাচ্ছে ক্ষেমা বাবাণসীবাজাকে জানাল 'মহাবাজ, আমাব খুব ইচ্ছে কবছে ঐ সোনাব ময়ূবেব মুখে ধর্মকথা শুনি '

বাজা মন্ত্রীদেব সঙ্গে পবামর্শ কবতে বসলেন মন্ত্রীবা বলল, 'ব্রাহ্মণবা বলতে পাববেন সোনাব ময়ূব কোথায আছে ' ব্রাহ্মণদেব ডাকা হলে তাবা বললেন, 'ব্যাধবা জানতে পাবে ' ব্যাধদেব ডাকা হলে তখন সেই ব্যাধেব ছেলেটি বলল, 'মহাবাজ, হিমবন্ত প্রদেশে দণ্ডক হিবণ্য নামে একটা পাহাড আছে, সেখানে একটি সোনাব ময়ূব থাকে।' বাজা তাকে আদেশ কবলেন, 'যাও, এক্ষুনি ধবে আনো। তবে দেখো তাব গাযে যেন আঘাত না লাগে। সুস্থ জীবন্ত অবস্থায ধবে আনবে।'

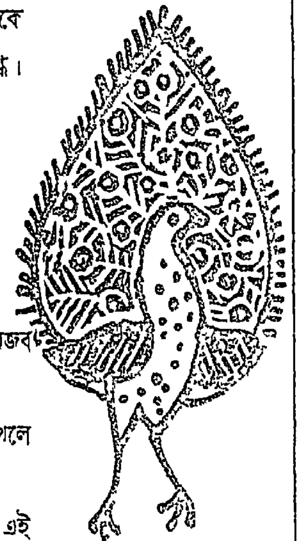


ব্যাধের ছেলে গিয়ে ফাঁদ পাতল। আশ্চর্যের ব্যাপার, বোধিসত্ত্ব সেই ফাঁদ পা দিয়েও আটকা পড়লেন না। ব্যাধের ছেলে সাতবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। তারপর ব্যাধ হিমালয় অঞ্চলেই মারা গেল। রাণী ক্ষেমারও আশা পূর্ণ হল না। কিছুদিন পরে ক্ষেমাও মারা গেলেন।

সামান্য একটা ময়ূরের জন্য রাণী মারা যাওয়ায় রাজা খুব রেগে গেলেন। তিনি তখন রাজ্যময় একটি বাণী খোদাই করে দিলেন, 'হিমবন্তের কাছে দণ্ডক হিরণ্য পাহাড়ে এক সোনার ময়ূর থাকে। যে তার মাংস খাবে, সে-ই অজর-অমর হবে।' এর কিছুদিন পরে রাজারও মৃত্যু হল।

রাজার মৃত্যুর পর যিনি রাজা হলেন তিনি ঐ ঘোষণা পড়ে অজর, অমর হতে চাইলেন অমর হওয়ার আশায় তিনি-ও এক ব্যাধকে হিমালয়ে পাঠালেন এই দ্বিতীয় ব্যাধও ব্যর্থ হল। সে বছরের পর বছর চেষ্টা চালিয়ে গেল। শেষে সে-ও প্রথম ব্যাধের মতই একদিন মারা গেল। এরপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ—ছ জন রাজার রাজত্বকাল শেষ হল।

সপ্তম রাজা সিংহাসনে বসার পর আবার এক ব্যাধ সোনার ময়ূর ধরতে গেল। এই ব্যাধ বোধিসত্ত্বের দুর্বলতার সুযোগে তাঁকে ধরে ফেলল। রাজার কাছে নিয়ে এলে রাজা তো তাঁকে দেখে মুগ্ধ। তারপর সোনার ময়ূরের সঙ্গে রাজার এই রকম কথাবার্তা হল।



'মহারাজ, আমাকে ধরে এনেছেন কেন?'

'শুনেছি তোমার মাংস খেলে অজর অমর হওয়া যায়।'

'কিন্তু আমি তো মারা যাব।'

'তা যাবে।'

'আমি যদি মরি তাহলে আমার মাংস খেয়ে লোকে কি করে অজর অমর হবে?'

'তোমার রঙ সোনার মত, তাই নাকি তোমার মাংস খেলে অজর অমর হওয়া যায়।'

'দেখুন, আমার সোনার রঙ এমনি হয় নি। এক কালে আমি এই নগরেরই রাজচক্রবর্তী ছিলাম। তখন খুব দান-ধ্যান করেছি তাই।'

'এর কোন সাক্ষী আছে?'

'আছে, মহারাজ।'

'কে সেই সাক্ষী?'

'যখন আমি রাজচক্রবর্তী ছিলাম তখন রক্তের তৈরি রথে আকাশে ঘুরে বেড়াতাম। সেই রথ মঙ্গল পুকুরের তলায় আছে, খুঁজে দেখুন।'

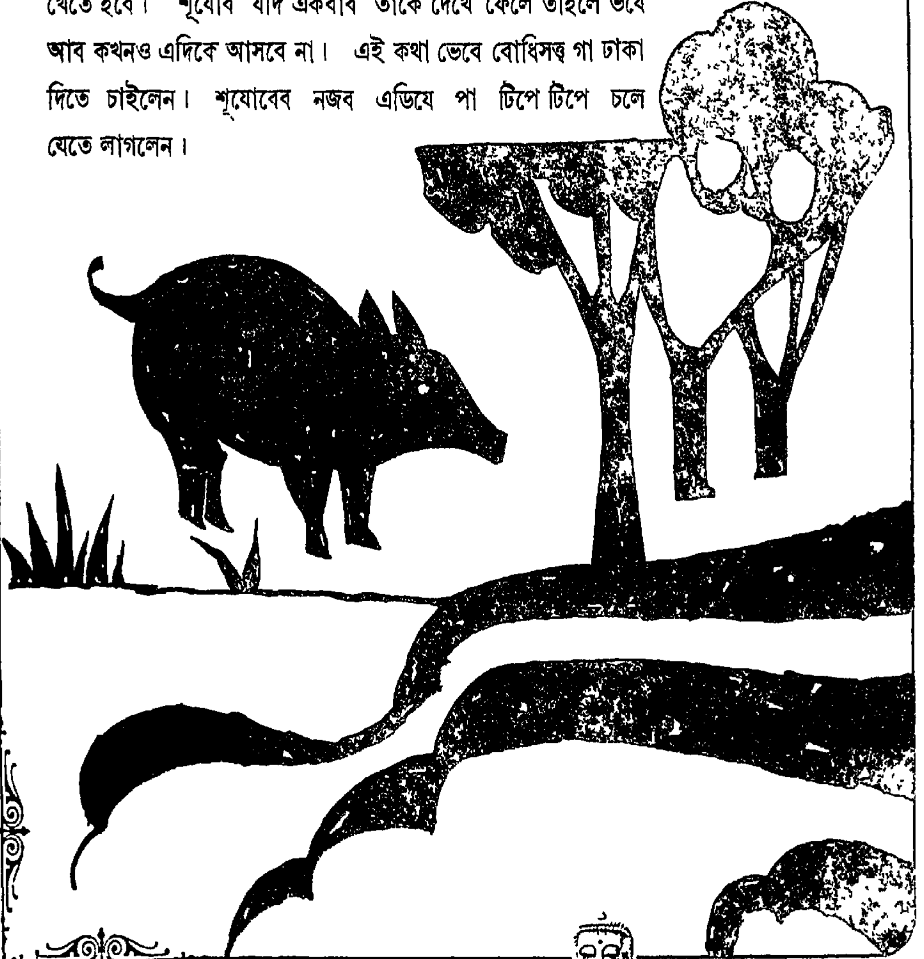
তারপর রাজা মঙ্গলপুকুরে খুঁজে সত্যি সেই রথ পেলেন। আর বোধিসত্ত্ব রাজাকে শিক্ষা দিলেন, 'মহারাজ, মহানির্বাণ ছাড়া এ জগতে সবই অসাড়।'

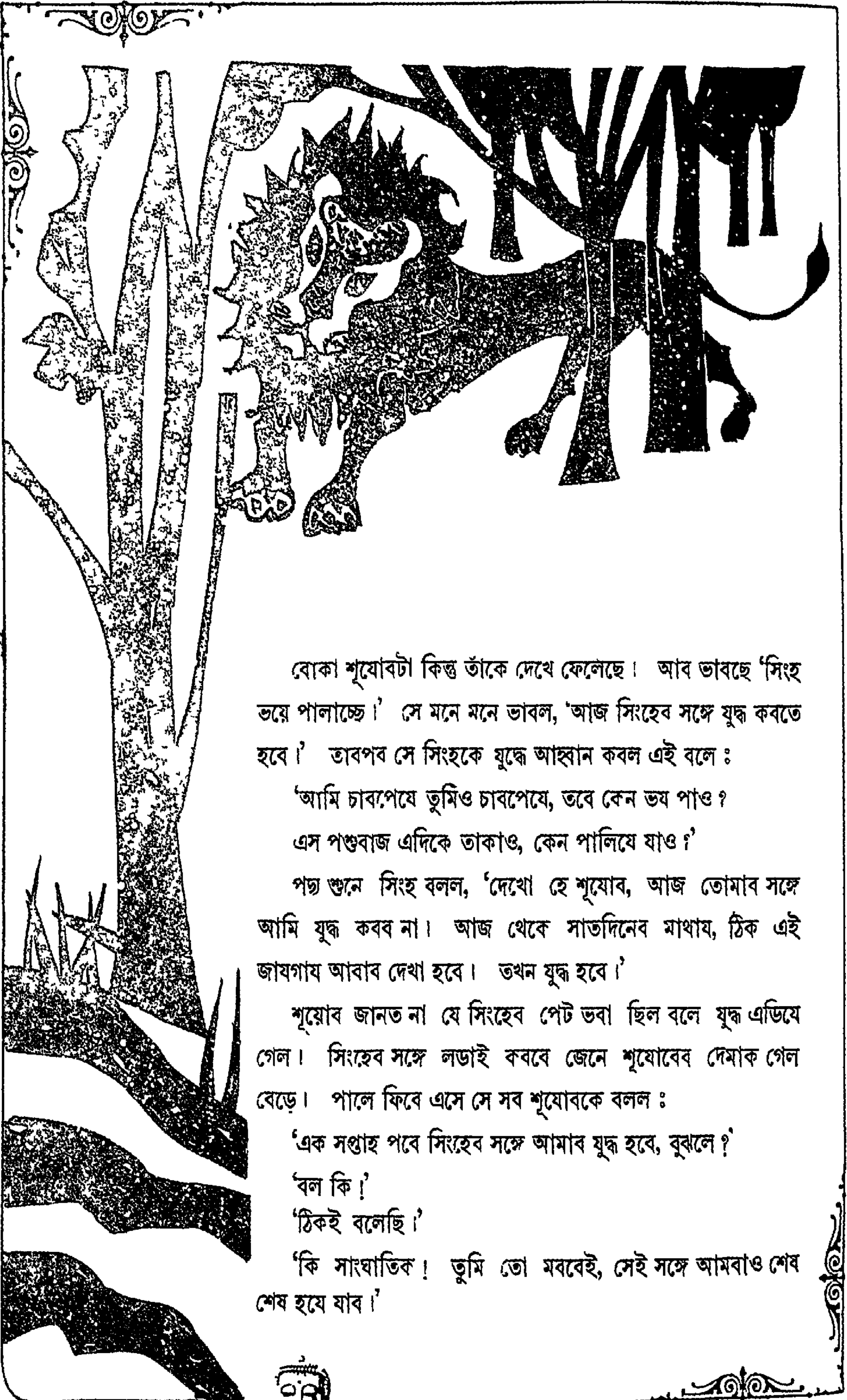


শূকর জাতক

পুবাকালে বোধিসত্ত্ব একবার সিংহ জন্ম নেন। হিমালয় পাহাড়েব এক গুহায থাকতেন তিনি। কাছেই ছিল একটি সবোবব। সেখানে এক পাশে এক পাল শূযোব থাকত। আব এক দিকে ছিল তপস্বীদেব কুটিব।

সিংহৰূপী বোধিসত্ত্ব একদিন একটা বুনো মেষ শিকাব কবে পেট ভবে খেলেন। তাবপব সবোববে গেলেন তেষ্টা মেটাতে। তখন বেশ মোটাসোটা একটা শূযোব চড়ছিল সেখানে। জল থেকে ওঠাব সময বোধিসত্ত্ব তাকে দেখতে পেলেন। ভাবলেন, 'এটাকে একদিন খেতে হবে।' শূযোব যদি একবাব তাঁকে দেখে ফেলে তাহলে ভযে আব কখনও এদিকে আসবে না। এই কথা ভেবে বোধিসত্ত্ব গা ঢাকা দিতে চাইলেন। শূযোবেব নজব এড়িযে পা টিপে টিপে চলে যেতে লাগলেন।





বোকা শূয়োরটা কিন্তু তাঁকে দেখে ফেলেছে। আর ভাবছে 'সিংহ ভয়ে পালাচ্ছে।' সে মনে মনে ভাবল, 'আজ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।' তারপর সে সিংহকে যুদ্ধে আহ্বান করল এই বলে :

'আমি চারপেয়ে তুমিও চারপেয়ে, তবে কেন ভয় পাও?

এস পশুরাজ এদিকে তাকাও, কেন পালিয়ে যাও?'

পদ্য শুনে সিংহ বলল, 'দেখো হে শূয়োর, আজ তোমার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব না। আজ থেকে সাতদিনের মাথায়, ঠিক এই জায়গায় আবার দেখা হবে। তখন যুদ্ধ হবে।'

শূয়োর জানত না যে সিংহের পেট ভরা ছিল বলে যুদ্ধ এড়িয়ে গেল। সিংহের সঙ্গে লড়াই করবে জেনে শূয়োরের দেমাক গেল বেড়ে। পালে ফিরে এসে সে সব শূয়োরকে বলল :

'এক সপ্তাহ পরে সিংহের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবে, বুঝলে?'

'বল কি!'

'ঠিকই বলেছি।'

'কি সাংঘাতিক! তুমি তো মরবেই, সেই সঙ্গে আমরাও শেষ শেষ হয়ে যাব।'

আত্মীয বন্ধুব কথায আস্তে আস্তে শূযোবেব চৈতন্য হল। তখন্ 'সে নিজেও ভযে কাঁপতে শুরু কবেছে। তাহলে এখন উপায? শূযোববা অনেক ভেবে চিন্তে বলল, 'তপস্বীবা যেখানে পাযখানা কবে তুই সেখানে যা। এই সাতদিন শুধু সেখানে গডাগডি দে। এক হপ্তা পবে সাবা গাযে দুর্গন্ধ নিযে সিংহ আসাব আগেই লডাইযেব জাযগায চলে যাবি। তাবপব যেদিক থেকে বাতাস আসছে সেই দিকে দাঁড়াবি, যাতে সিংহ এলেই প্রথমে তাব নাকে ঐ গন্ধটা যায। সিংহবা খুব শুচিবাযু হয। ঐ গন্ধ একবাব পেলে সে নিজেই হাব স্বীকাব কবে নেবে।'

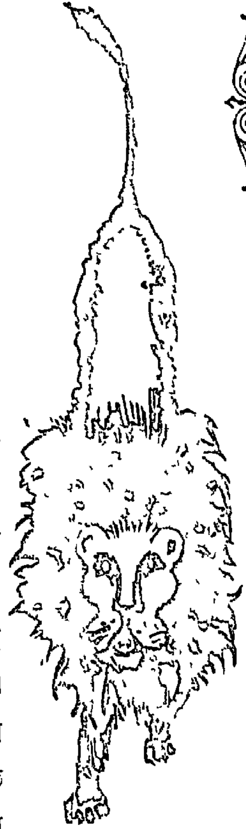
যেমন যেমন বলা হল শূযোব ঠিক তাই কবল। তাবপব সাত দিনেব মাথায যুদ্ধক্ষেত্র হাজিব হল। সিংহ বাতাসে কূট গন্ধ পেযে একবাব নাক কুঁচকে শূযোবকে বলল, 'ওহে বীব শূযোব, তুমি জব্বব ফন্দি বেব কবেছ। সাবা গাযে যদি নোংবা না মাখতে তাহলে এক্ষুনি তোমাকে খুন কবতাম। এখন তোমাব নোংবা শবীবে আমি দাঁত বসাতে পাবব না। এমন কি পা দিযেও মাবতে পাবব না। বেশ কাযদা কবে জিতে গেলে।'



সিংহ তাবপব আহাবেব খোঁজে চলল। খাওয়া-দাওয়া সেবে আবাব সেই সবোববে তেষ্টা মেটাতে এল। তাবপব গুহায ফিবে গেল। ওদিকে শৃযোব পালে ফিবে এসে খুব লাফাতে লাগল, 'সিংহকে আজ গো-হাবা হাবিযেছি।' পালেব অন্য শৃযোববা তাব কথা কানে নিল না। সিংহেব ভযে তাবা সেই জাযগা ছেড়ে পালিযে গেল।



গুণ জাতক



ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার সিংহ হয়ে জন্মান। তখন তাঁর আস্তানা ছিল পাহাড়ের এক গুহায়। একদিন গুহা থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের তলার দিকে তাকিয়েছিলেন। পাহাড়ের নিচের দিকে বিশাল এক সরোবর ছিল। তলায় জলকাদা থাকলেও সরোবরের কাছে তীরের খানিকটা জায়গার ওপরটা বেশ শক্ত হয়ে উঠেছিল। এমন কি সেখানে কচি ঘাসও গজিয়েছিল। বোধিসত্ত্ব দেখলেন সেখানে একটি হরিণ চরছে।

কোন রকম বিচার বিবেচনা না করে হরিণটাকে ধরার জন্য তিনি এক লাফ দিলেন। প্রাণের ভয়ে চিৎকার করতে করতে হরিণটা তো পালিয়ে গেল। ওদিকে বোধিসত্ত্ব পড়লেন মহা বিপদে। তাল সামলাতে না পেরে ওপরের শক্ত মাটি ভেঙে তিনি কাদায় পড়লেন। আস্তে আস্তে কাদায় ডুবে যেতে লাগলেন। বোধিসত্ত্বের বিপুল দেহ কাদায় ডুবে গেল। তাঁর চার পা চারটি স্তম্ভের মত অনড় হয়ে গেল।

এভাবে সাতদিন তিনি কাদায় বন্দী হয়ে রইলেন। সাতদিন কিছু খেতে পেলেন না। তখন এক শিয়াল খাবার খুঁজতে খুঁজতে তাঁর কাছাকাছি চলে আসে। বোধিসত্ত্বকে দেখামাত্র সে-ও প্রাণের ভয়ে দৌড় লাগাল। বোধিসত্ত্ব চিৎকার করে শিয়ালকে ডাকতে লাগলেন। শিয়াল তাঁর আর্ত চিৎকার শুনে কিছু দূর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এল। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'শিয়ালভাই, তুমি পালিও না। আমি কাদায় আটকে গেছি, আমাকে বাঁচাও।' শুনে শিয়াল বলল, 'প্রভু, আমি হয়ত আপনাকে বাঁচাতে পারি, কিন্তু ভয় হচ্ছে।'



'কিসের ভয় ভাই?'

'আপনি ছাড়া পেলেই আমাকে মেরে ফেলবেন।'

'কোন ভয় নেই।

'অভয় দিচ্ছেন?'

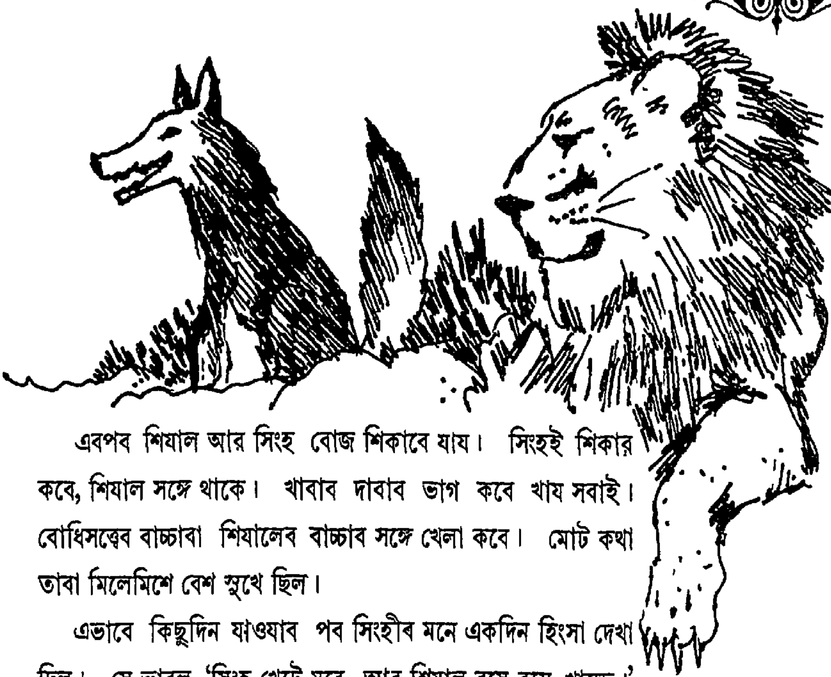
'শুধু তাই নয়, ছাড়া পেলে আমি তোমার অনেক উপকার করব।'

তখন শিয়াল প্রথমে বোধিসত্ত্বের পা-গুলোকে মুক্ত করল। গর্ত খুঁড়ে প্রায় কুয়ো করে ফেলল। মাটির তলা থেকে জল উঠে কাদা পাতলা হয়ে গেল। শিয়াল তারপর বোধিসত্ত্বের পেটের তলায় ঢুকে মাথা দিয়ে ঠেলতে লাগল, 'প্রভু, এবার ওঠার চেষ্টা করুন।' বিস্তর চেষ্টা করে বোধিসত্ত্ব কাদা থেকে মুক্ত হলেন। এক লাফে শুকনো ডাঙায় গিয়ে পড়লেন। তারপর স্নান করে কাদা ধুয়ে ফেললেন। পেটে তখন আগুন জ্বলছে। বোধিসত্ত্ব একটা বুনো মোষ মারলেন। তারপর ধারাল দাঁত দিয়ে খানিকটা মাংস খাবলে নিয়ে শিয়ালের সামনে রাখলেন, 'আগে তুমি খাও।' শিয়ালের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজে খাওয়া শুরু করলেন না।

দুজনের খাওয়া শেষ হলে শিয়াল এক টুকরো মাংস তুলে নিল। বোধিসত্ত্ব তখন শিয়ালকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই মাংসটা কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছ?' শিয়াল বলল, 'প্রভু, আপনার দাসীর জন্য।' তারপর বোধিসত্ত্বও সিংহীর জন্য মাংস নিলেন। শিয়ালকে বললেন, 'চল ভাই, প্রথমে আমার গুহায় যাই। সেখানে একটু জিরিয়ে তারপর তোমার বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাব।' তারপর প্রথমে নিজের গুহায় এলেন শিয়ালকে সঙ্গে নিয়ে। পরে শিয়ালের বাসায় গেলেন। শিয়ালের বউয়ের সঙ্গে গল্প করলেন। তারপর ঠিক করলেন, 'এরপর থেকে তোমরা আমার সঙ্গেই থাকবে। আমার গুহার পাশেই একটা গুহা ফাঁকা পড়ে আছে। সেখানে চল। তোমাদের রক্ষা করার ভার আজ থেকে আমি নিলাম।'







এরপর শিয়াল আর সিংহ রোজ শিকারে যায়। সিংহই শিকার করে, শিয়াল সঙ্গে থাকে। খাবার দাবার ভাগ করে খায় সবাই। বোধিসত্ত্বের বাচ্চারা শিয়ালের বাচ্চার সঙ্গে খেলা করে। মোট কথা তারা মিলেমিশে বেশ সুখে ছিল।

এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর সিংহীর মনে একদিন হিংসা দেখা দিল। সে ভাবল, 'সিংহ খেটে মরে, আর শিয়াল বসে বসে খাচ্ছে।' তার মনে হল সিংহ নিজের বাচ্চাদের চেয়ে শিয়ালের বাচ্চাদের বেশি ভালোবাসে একদিন সিংহ আর শিয়াল বেরিয়ে গেলে সে শিয়ালের বউকে অকথা-কুকথা বলল। বলল, 'দূর হয়ে যা, পরের ঘাড়ে বসে খাস লজ্জা করে না?' বাচ্চাদের শিখিয়ে দিল শিয়ালের বাচ্চাগুলোকে জব্দ করতে।

শিয়াল ফিরলে তার বউ সব খুলে বলল। তখন শিয়াল বোধিসত্ত্বকে বলল, 'প্রভু, অনেকদিন আপনার গলগ্রহ হয়ে আছি, এবার ছুটি দিন। চলে যাই।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'কেন ভাই?'

শিয়াল তখন সিংহী যা যা বলেছে সব খুলে বলল। বোধিসত্ত্ব তখন সিংহীকে ডেকে বললেন. 'সেই যেবার আমি এক সপ্তাহ গুহায় ফিরিনি সেবার কি হয়েছিল জান?' সিংহী বলল, 'না।' বোধিসত্ত্ব তখন যা যা ঘটেছিল সব খুলে বললেন। তারপর বললেন, 'তবেই বুঝতে পারছ, শিয়াল যতই দুর্বল হোক, সে আমার কত বড় বন্ধু। সাবধান, এদের সঙ্গে কক্ষনো খারাপ ব্যবহার করবে না।'

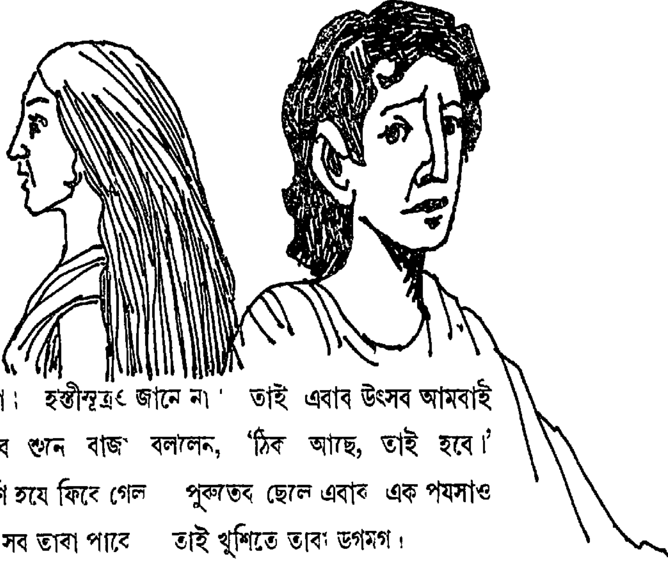
তারপর থেকে ঐ দুই পরিবার মহা সুখে ছিল। বাচ্চারাও সবাই সবাইকে খুব ভালোবাসত। বাবা-মা মারা গেলে সিংহ আর শিয়ালের ছেলেমেয়েরা এই বন্ধুত্ব নষ্ট করে নি। শোনা যায়, সাত পুরুষ পর্যন্ত তাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল।



সুসীম জাতক

বারাণসীতে এক সময় সুসীম নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। বোধিসত্ত্ব সুসীমের পুরুত ঠাকুরের ছেলে হয়ে জন্মান। বোধিসত্ত্বের যখন ষোল বছর বয়স তখন তাঁর বাবা মারা যান। বোধিসত্ত্বের বাবা রাজার হস্তী মঙ্গলকারক ছিলেন। অর্থাৎ হাতির এক ধরনের উৎসব হতো হস্তীসূত্র বিশারদরা এই উৎসবের দেখাশোনা করত। এ বাবদ তারা প্রচুর উপহার ও টাকা পেত। হাতিকে সাজাবার জন্য যেসব বেশভূষা আনা হতো সেসবও হস্তী মঙ্গলকারক পেত।

যখনকার কথা বলা হচ্ছে সে সময় হস্তীমঙ্গলযোগ চলছিল। বোধিসত্ত্ব ছাড়া বারাণসীর সমস্ত ব্রাহ্মণ রাজার কাছে দল বেঁধে গেল। তারা রাজাকে বলল, 'মহারাজ, যোগ এসেছে। আপনি মঙ্গলোৎসব পালন করুন। আপনার পুরুতের ছেলে নিতান্তই বাচ্চা। সে তিন



বেদ জানে না। হস্তীসূত্রং জানে না। তাই এবার উৎসব আমরাই দেখব।' সব শুনে রাজা বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে।' ব্রাহ্মণরা খুশি হয়ে ফিরে গেল। পুরুতের ছেলে এবার এক পয়সাও পাবে না। সব তারা পাবে। তাই খুশিতে তারা ডগমগ।

বোধিসত্ত্বের মা খবর শুনে মুষড়ে পড়লেন। ভাবলেন, 'সাত পুরুষ ধরে এই আমাদের কুল ব্যবসা। এবার বোধহয় বংশ মর্যাদা গেল। টাকা পয়সাও যাবে কমে। আমাদের কি হবে?' বোধিসত্ত্ব মাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তুমি কাঁদছ কেন?'

এই প্রথম আমাদের বংশের কেউ হস্তী মঙ্গলকারক হচ্ছে না।

'আমি হব।'

'বাবা, তুই তো আর তিন বেদ মুখস্থ করিস নি, হস্তীসূত্রও জানিস না।

'হস্তীমঙ্গলোৎসব কবে হবে মা ?

'তিন দিন পরে।'

'তিন বেদ ও হস্তীসূত্রবিশারদ কে আছেন ?'

'এখান থেকে দু হাজার মাইল দূরে তক্ষশিলায় এক আচার্য আছেন শুনেছি।'

'আমি সেখানে যাব।'

'কি করে যাবি বাছা ?'

'যে ভাবেই হোক, বংশ গৌরব রাখতেই হবে।'

মাকে আশ্বস্ত করে বোধিসত্ত্ব রওনা হলেন। দু হাজার মাইল একদিনেই পেরিয়ে গেলেন তিনি। আচার্যের কাছে গিয়ে বললেন, 'প্রভু, আমি বারাণসী থেকে আসছি।'

'কেন ?'

'তিন বেদ আর হস্তীসূত্র শিখতে।'

'বেশ, মুখস্থ কর।'

'কিন্তু প্রভু, আমার হাতে বেশি সময় নেই। আজ রাতের মধ্যে সব শিখতে হবে।'

'পারলে শিখে নাও।'

আচার্যের মত নিয়ে বোধিসত্ত্ব তখন হাত-পা ধুয়ে এলেন। দক্ষিণা হিসাবে আচার্যকে এক হাজার টাকা দিয়ে এক পাশে নম্রভাবে বসলেন। সারা রাত আচার্য তাঁকে শাস্ত্র শিক্ষা দিলেন। পরের দিন

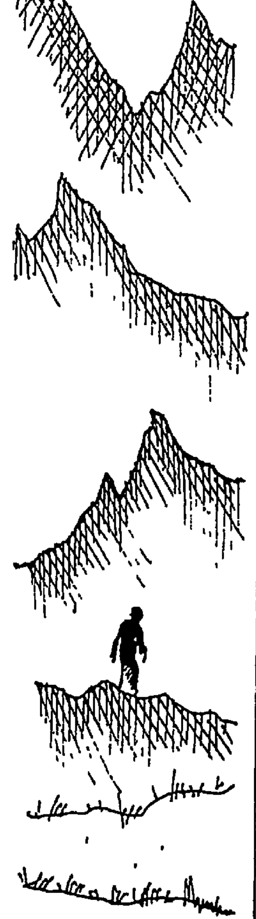




আকাশ তখনও লাল হয়ে ওঠেনি, বোধিসত্ত্ব আচার্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গুরুদেব, আমার কি আর কিছু শেখার আছে?'

'না বাছা, তুমি তিন-বেদ আর হস্তীসূত্র, সবটাই শিখে ফেলেছ।'

আচার্যকে প্রণাম করে বোধিসত্ত্ব তখন বাড়িমুখো হলেন। একদিনের মধ্যে বারাণসীতে ফিরে এসে মাকে প্রণাম করলেন। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'বাছা, তোর ইচ্ছে পূরণ হয়েছে তো?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'হ্যাঁ, বেদ আর হস্তীসূত্র আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।'



পরের দিন হস্তী মঙ্গলোৎসব। একশ হাতি সাজানো হয়েছে। সোনার পতাকা উড়ছে। ব্রাহ্মণরা নিশ্চিন্ত মনে ভাবছে 'আজ আমরাই মঙ্গলোৎসবের হোতা।' যথেষ্ট সেজেগুজে তারা এসেছে। বোধিসত্ত্বও যুবরাজের পোষাকে সেজে রাজার কাছে হাজির। তিনি মুখে মুখে পদ্য রচনা করে জানতে চাইলেন, 'মহারাজ, আপনি জানেন হস্তী মঙ্গলোৎসব পরিচালনা আমাদের বংশগত ব্যাপার। কিন্তু শুনছি এবার নাকি আমাকে তা করতে দেওয়া হবে না।'

রাজা সুসীম বললেন, 'আমি শুনেছি তুমি তিন বেদ আর হস্তীসূত্র জান না, তাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

বোধিসত্ত্ব তখন গর্জন করে বললেন, 'এখানে দেখছি অনেক ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছেন। ঠিক আছে, এঁদের মধ্যে যদি একজনও তিন বেদ আর হস্তীসূত্র আবৃত্তি করায় আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন তাহলে আপনি তাঁকে দিয়েই মঙ্গলোৎসব পরিচালনা করাবেন। ডাকুন, দেখি কে পারেন?'

ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজনও সাহস করে এগিয়ে এল না। তখন বোধিসত্ত্বই মঙ্গলোৎসব পরিচালনা করলেন। কুল মর্যাদা রক্ষা পেল। প্রচুর সম্পদ নিয়ে বোধিসত্ত্ব ঘরে ফিরলেন।



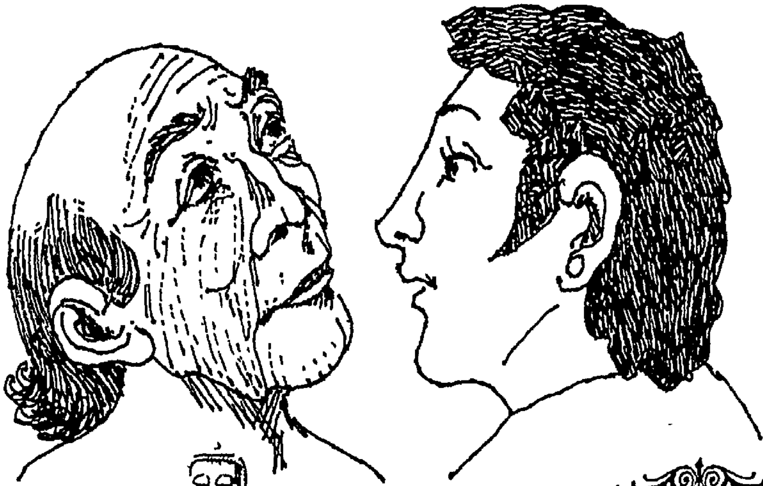
উপাসাঢ় জাতক

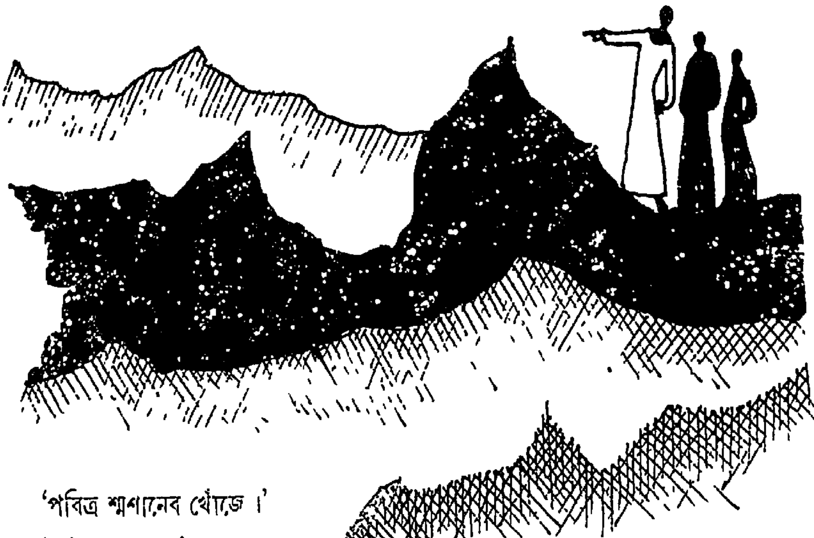
অনেককাল আগে বাজগৃহ নগবে এক ব্রাহ্মণ বাস কবতেন। ব্রাহ্মণ ও তাব ছেলে এই ছিল ব্রাহ্মণেব পবিবাব। ঠিক সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব মগধে জন্মেছিলেন। তাঁবও জন্ম হযেছিল এক ব্রাহ্মণ পবিবাবে। যথাসময়ে বেদ শাস্ত্র শিখে তিনি নানা বিষযে পাবদর্শী হলেন। তাবপব প্রব্রজ্যা নিলেন।

বোধিসত্ত্ব অনেক দিন হিমবন্ত প্রদেশে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। শেষে নুন আব টকেব বড অভাব দেখা দিল। তখন তিনি গৃধ্রকূটে পাতাব ছাউনি দেওযা এক কুঁডেঘবে থাকতে লাগলেন।

ওদিকে বাজগৃহ নগবেব সেই ব্রাহ্মণও তাব ছেলেকে সঙ্গে নিযে গৃধ্রকূটে উপস্থিত। ঐ ব্রাহ্মণেব বেশ বযস হযেছে। মৃত্যুব পব তাকে কোথায দাহ কবা হবে এ ব্যাপাবে সে খুব চিন্তা কবত। শ্মশানেব ব্যাপাবে তাব খুঁতখুতে ভাব ছিল। একটি পবিত্র শ্মশানে মৃত্যুব পব তাকে দাহ কবা হোক—এই তাব ইচ্ছে। পবিত্র শ্মশান বলতে সে বুঝত সেটাকেই যেখানে আগে কাউকে দাহ কবা হয নি।

ব্রাহ্মণ তাব ছেলেকে যখন এই শেষ ইচ্ছে জানাল তখন তাব ছেলে খুব ফাঁপডে পডে গেল। অনেক ভেবে সে তখন বাবাকে বলল, 'তাহলে জাযগাটা আপনিই আমাকে দেখিযে বাখুন।' ঐ ব্রাহ্মণ গৃধ্রকূটে এসেছে সেই পবিত্র শ্মশানেব খোঁজে। বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে দেখে জিজ্ঞেস কবলেন, 'কোথায চললেন ঠাকুব?'





'পবিত্র শ্মশানের খোঁজে।'

'সেটা কোথায়?'

'ঐ পাহাড়ের চূড়ায়।'

'তাই নাকি? চলুন তো দেখে আসি।'

দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ত্ব পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। ব্রাহ্মণ তিন পাহাড়ের মাঝে একটি সমতল জায়গার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ঐ যে ঐখানটা।'

বোধিসত্ত্ব তখন তাঁদের বললেন, 'এখানে যে কত শব দাহ করা হয়েছে তার কোন হিসেব নেই। তোমার পিতা, এই ব্রাহ্মণই তো একবার রাজগৃহ নগরের ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছিলেন উপসাঢক নামে। সেবার তাঁকে এখানেই দাহ করা হয়েছিল। তবে এ-জায়গা সে-জায়গার কথা নয়, গোটা দুনিয়ায় এমন কোন জায়গা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় যেখানে কখনও শবদাহ করা হয় নি।'

তারপর তিনি তাদের এই ধর্মকথা শোনালেন: 'যেখানে সবাই মূল চারটি সত্য জানে, সব সময় ধর্মের পথে থাকে, সব সময়, সংযম ও অহিংসা আছে শুধু সেখানেই যমরাজের শমন ঢুকতে পারে না।'



শকুনঘ্নী জাতক

একবার বোধিসত্ত্ব চড়াই পাখি হয়ে জন্মান। খাবারের খোঁজে চষা ক্ষেতে ঘুরে বেড়াতেন। ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়ার ফলে বেশ কিছু পাথরের টুকরো ওপরে উঠে এসেছিল। পাথরের ঐ টুকরোগুলোর ফাঁকের মধ্যে তিনি খেলা করে বেড়াতেন। একদিন ঐ চষা ক্ষেত ছেড়ে তিনি খাবারের খোঁজে বনে গিয়েছিলেন। হঠাৎ এক শকুনের নজর পড়ল। শূন্য থেকে পাক খেয়ে নেমে এসে শকুন তাঁকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল।



শকুন যখন তাঁকে ধরে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে কাছাকাছি কোন গাছে বসে খাবে বলে, বোধিসত্ত্ব তখন কান্নার সুরে বলে চললেন : 'কি ভুল করলাম। আমার মাথায় যদি এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকত। নিজের এলাকার বাইরে এলাম কেন? আজ যদি নিজের এলাকায় থাকতাম তবে শকুনের ক্ষমতায় কুলোত না আমাকে ধরা। এমন কি ও যদি হম্বিতম্বি করে আমার সঙ্গে লড়তে আসত তাহলেও এঁটে উঠতে পারত না।'



এ কথা শুনে শকুনেব মেজাজ গেল বিগড়ে। সে বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস কবল, 'হ্যাঁবে ব্যাটা চড়াই, কোনটা তোব এলাকা ?'

'চষা ক্ষেত।'

'কোন্ দিকে ?'

'ঐ দিকে।

'নে, তোকে ছেড়ে দিচ্ছি, দেখি সেখানে গিয়ে কেমন কবে বাঁচিস।'

বোধিসত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে সেই চষা ক্ষেতে উড়ে গেলেন। বড দেখে একটা পাথবেব টুকবোব ওপব বসলেন। তাবপব হম্বিতম্বি কবে শকুনকে ডেকে বললেন, 'এবাব এস, দেখি কেমন তোমাব শক্তি।' শকুন ডানা ছড়িয়ে বাগে গবগব কবতে কবতে ঝড়েব বেগে ছুটে এল। শেষ মুহূর্তে বোধিসত্ত্ব পাথবেব আড়ালে সবে গেলেন।

শকুন আব তখন বেগ সামলাতে পাবল না। তাব বুক পাথবে আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড ফেটে গেল। কোটব ঠেলে চোখদুটো বেবিযে এল। অতি দর্পে শকুনেব ভবলীলা সাঙ্গ হল।

তিন্দুক জাতক

একবার বোধিসত্ত্ব বানর জন্ম নেন। তখন তিনি হাজার হাজার বানরের সঙ্গে হিমবন্ত প্রদেশে থাকতেন। বানরকুলের দলপতিও তিনিই। বানরদের এলাকার একটু দূরেই ছিল একটি গ্রাম। ঐ গ্রামে কখনও লোক থাকত, আবার কখনও গ্রামে একটিও লোক থাকত না। ঐ গ্রামের মাঝখানে ছিল একটি গাব গাছ। বানরের দল পাকা গাব ফল খুব ভালবাসে। বিশেষ করে এই গাছটিতে যেমন প্রচুর গাব ধরত, তেমনি ফলগুলোও হতো দারুণ মিষ্টি। গ্রামে লোক না থাকলে বানরের দল এসে মহানন্দে গাব খেয়ে যেত।

গাব গাছে একবার পাকা গাব হয়েছে প্রচুর। কিন্তু তখন গ্রামটিতে অনেক লোক আছে। তারা বাঁশ দিয়ে গাছটা ঘিরে ফেলল। কড়া পাহারা বসাল। গাছে তখন এত ফল যে তার ভারে ডালগুলো পর্যন্ত নুয়ে পড়েছে।



গাব গাছে ফলের মরশুম আসায় বানররা তখন ভাবছে, 'আমরা তো ঐ গ্রামে গিয়ে গাব ফল খাই। একবার দেখে আসা দরকার কি রকম ফলন হয়েছে। গ্রামে লোকজন আছে কিনা।' এই ভেবে তারা এক বানরকে সরজমিনে দেখে আসার জন্যে পাঠাল। সে ফিরে এসে বলল, 'এবার ফল হয়েছে দেখার মত। তবে গ্রামে অনেক লোক ঘোরাফেরা করছে দেখলাম।'

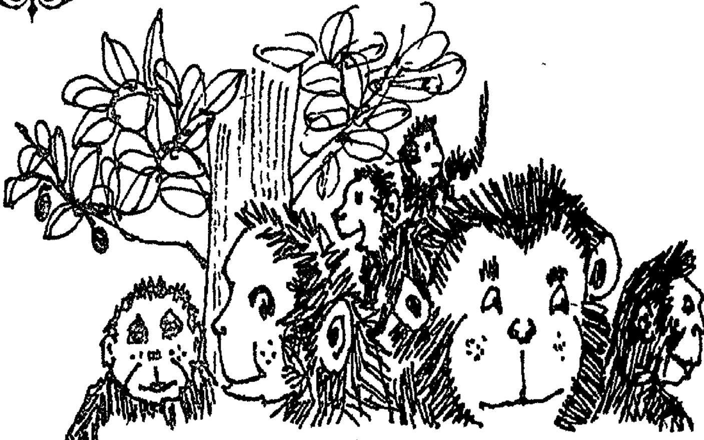
বানরের দল তখন মহানন্দে দলপতি বোধিসত্ত্বের কাছে গিয়ে বলল, 'প্রভু, আমরা ঐ মিষ্টি ফলগুলো খেতে যাব।'

তখন বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করলেন, 'গ্রামে লোকজন আছে?'

তারা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, অনেক লোক।'

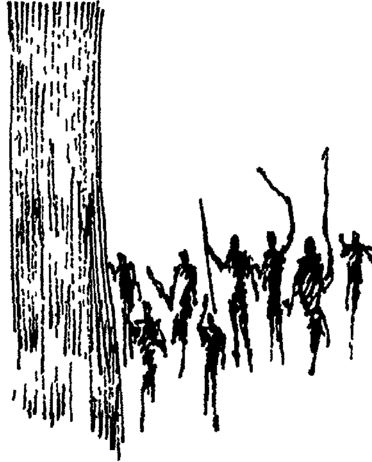
বোধিসত্ত্ব উপদেশ দিলেন, 'তাহলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। মানুষরা হাজার রকমের কৌশল জানে।'





বানররা তখন বলল, 'প্রভু, আমরা মাঝ রাতে যাব। তখন লোকজন ঘুমিয়ে থাকবে।'

এভাবে তারা কোনমতে দলপতির অনুমতি জোগাড় করে হিমালয় পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল। নেমে গ্রাম থেকে বেশ খানিকটা দূরে অপেক্ষা করতে লাগল। মাঝ রাতে লোকজন ঘুমিয়ে পড়ল। গ্রামটি অন্ধকারে ডুবে গেল। তখন তারা গাছে উঠে দিব্যি পাকা গাব খেতে লাগল।



ওদিকে মাঝ রাতে এক গ্রামবাসীর পায়খানা পেয়েছে। সে মাঠে যাওয়ার সময় বানরকুলকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে জাগিয়ে জানিয়ে দিল। তখন দলে দলে লোক তীর-ধনুক, লাঠি, টাঙি নিয়ে ছুটে গেল। গাছটাকে ঘিরে রেখে বলতে লাগল, 'সকাল হোক, তারপর এদের উচিত শিক্ষা দেব।'

বানবেব দল তাই দেখে ভযে কাঁপতে লাগল। তখন তাবা ভাবল, 'দলপতি বোধিসত্ত্ব ছাডা কেউ আমাদেব বাঁচাতে পাববে না।' বানবদেব মধ্যে একজন চলে গেল বোধিসত্ত্বকে খবব দিতে। সব শুনে তিনি বললেন, 'অত ভয পাওযাব কিছু নেই। মানুষেব কি একটা কাজ, তাদেব শত শত কাজ থাকে। আমবা এদেব জন্য এমন একটা কাজেব ব্যবস্থা কবব যে তাবা আব বানবদেব ব্যাপাবে মাথা ঘামানোব সময পাবে না।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'সব বানবদেব এক জাযগায জডো হতে বল, আমি যাচ্ছি।' কিন্তু তিনি সেখানে গিযে দেখলেন একটি বানবকে দেখা যাচ্ছে না। বানববা বলল, 'প্রভু, সেনককে দেখছি না।' সেনক বোধিসত্ত্বেব ভাগনে। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'সেনক নেই মানে সে নিশ্চযই কোন ফন্দি কবেছে। দেখবে সে-ই মুক্তিব উপায বেব কববে।'



ওদিকে হয়েছিল কি, বানররা যখন ফল খেতে যাচ্ছিল তখন সেনকও দলে ছিল। অপেক্ষা করার সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙ্গার পরে যখন আবার যেতে শুরু করেছে তখন দেখে, লোকজন লাঠি সোটা নিয়ে বানরদের তাড়া করেছে। তার আর বুঝতে বাকি রইল না কি ঘটতে চলেছে। তখন সে হঠাৎ দেখতে পেল গ্রামে এক বুড়ি ঘরে আগুন জ্বেলে ঘুমোচ্ছে। সেনক তখন পা টিপে টিপে সেই জ্বলন্ত কাঠটি তুলে নিল। তারপর যেদিক থেকে বাতাস বইছিল, সেই দিকে গিয়ে কয়েকটি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল।

দেখতে দেখতে গ্রামটি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। লোকজন বানরদের কথা ভুলে সঙ্গে সঙ্গে আগুন নেভাতে ছুটে গেল। বানররা পালাবার সময় প্রত্যেকে সেনকের জন্য একটা করে পাকা ফল নিয়ে গেল।



কচ্ছপ জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার কুমোরকুলে জন্মান। মাটির হাঁড়ি কলসি বানিয়ে তিনি পেট চালাতেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ করতেন।

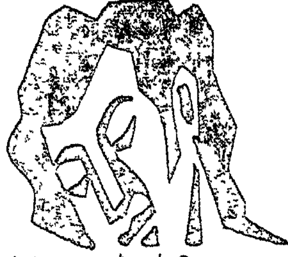
তখন বারাণসীর মহানদীর কাছে বিশাল এক বিল ছিল। বর্ষাকালে জল বেশি হলে এই বিল নদীর সঙ্গে মিশে যেত, আবার জল কমলে আলাদা হয়ে যেত।

মাছ আর কচ্ছপদের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। তা দিয়ে তারা আগে থেকে বুঝতে পারে কোন বছর বৃষ্টি বেশি হবে, আর কোন বছর বৃষ্টি কম হবে। ঐ বিলের মাছ আর কচ্ছপরা একবার বুঝতে পারল, 'এ বছর বৃষ্টি হবে না, শুখা যাবে।' তাই যখন বিল আর নদী এক হয়ে গেল, তখন তারা বিল ছেড়ে নদীতে চলে গেল। সবাই চলে গেলেও এক কচ্ছপ কিন্তু নড়ে নি। তারা তাকে ডেকে বলল, 'এখানে থাকলে মরবে।'

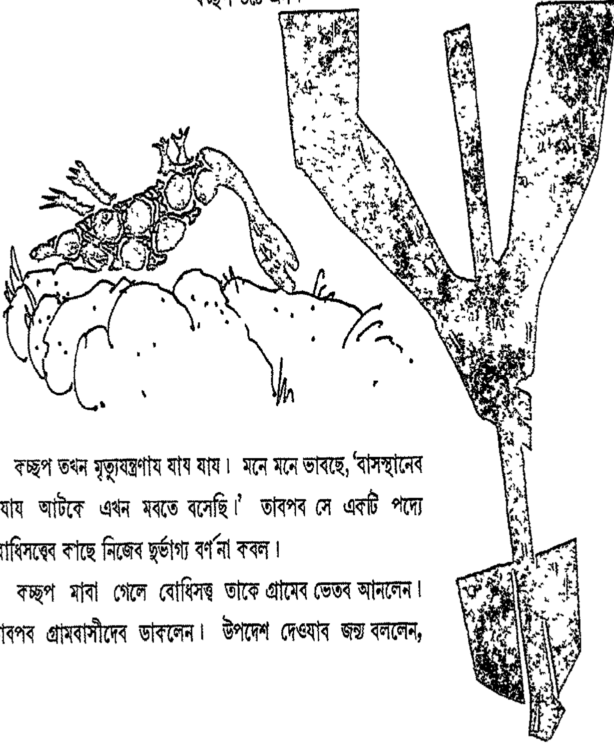
সে বলল, 'বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে ছাড়তে পারব না। এখানে আমি জন্মেছি, এখানেই বড় হয়েছি। আমার বাবা, তার বাবা এখানেই জন্মেছে। আমি মরি তা ভালো, বিল ছেড়ে নড়ছি না।'

সূর্য এর সময় প্রখর হল। দারুণ গ্রীষ্মকাল এল। চরাচর যেন আগুনে পুড়ে যেতে লাগল। তখন ঐ বিলের জলও শুকোতে শুকোতে কাদায় ঠেকল, তারপর কাদা অবধি শুকোতে লাগল।





বোধিসত্ত্ব ঐ বিল থেকে মাটি কেটে নিয়ে যেতেন। তিনি ঠিক যে জায়গাটা থেকে মাটি কাটতেন সেখানটায় বেশ বড় একটা গর্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রাণের দায়ে বেচারা কচ্ছপ সেই গর্তে আশ্রয় নিল। পরের দিন মাটি কাটতে এসে বোধিসত্ত্ব কোদাল চালাতেই কচ্ছপের পিঠ ভেঙ্গে গেল। বোধিসত্ত্ব রোজ প্রথম কোপ মেরে পরে কোদাল দিয়ে মাটি তোলেন, সেই রকম ভাবে তুলতেই কোদালের মাথায় কচ্ছপ উঠে এল।

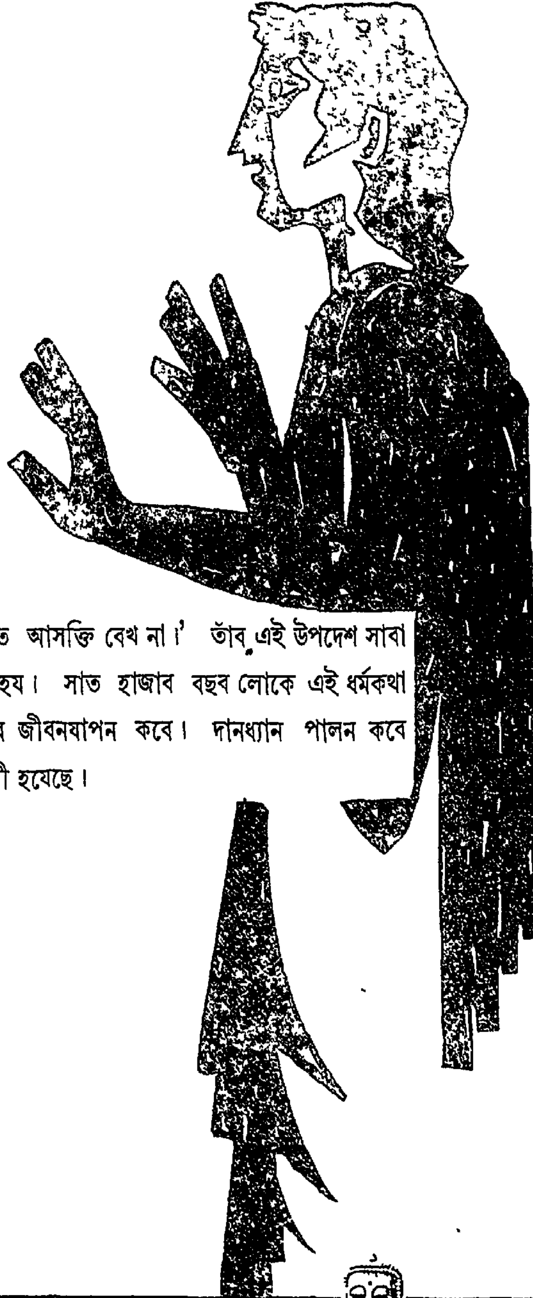


কচ্ছপ তখন মৃত্যুযন্ত্রণায় যায় যায়। মনে মনে ভাবছে, 'বাসস্থানের মায়ায় আটকে এখন মরতে বসেছি।' তারপর সে একটি পদ্যে বোধিসত্ত্বের কাছে নিজের দুর্ভাগ্য বর্ণনা করল।

কচ্ছপ মারা গেলে বোধিসত্ত্ব তাকে গ্রামের ভেতর আনলেন। তারপর গ্রামবাসীদের ডাকলেন। উপদেশ দেওয়ার জন্য বললেন,



'বিলেব জল শুকিয়ে যাবে জেনেও এই কচ্ছপটা বিল ছেড়ে যায় নি। বাসস্থানের মায়ায় আটকা পড়েছিল। তাই আজ এব এই হাল হয়েছে। সাবধান, তোমবা কেউ এই কচ্ছপেব মত কোবো না।



কোন কিছুব প্রতি এত আসক্তি বেখ না।' তাঁব এই উপদেশ সাবা ভাবতবর্ষে প্রচাবিত হয়। সাত হাজাব বছব লোকে এই ধর্মকথা শোনে আব এইভাবে জীবনযাপন কবে। দানধ্যান পালন কবে তাবা সকলেই স্বর্গবাসী হয়েছে।

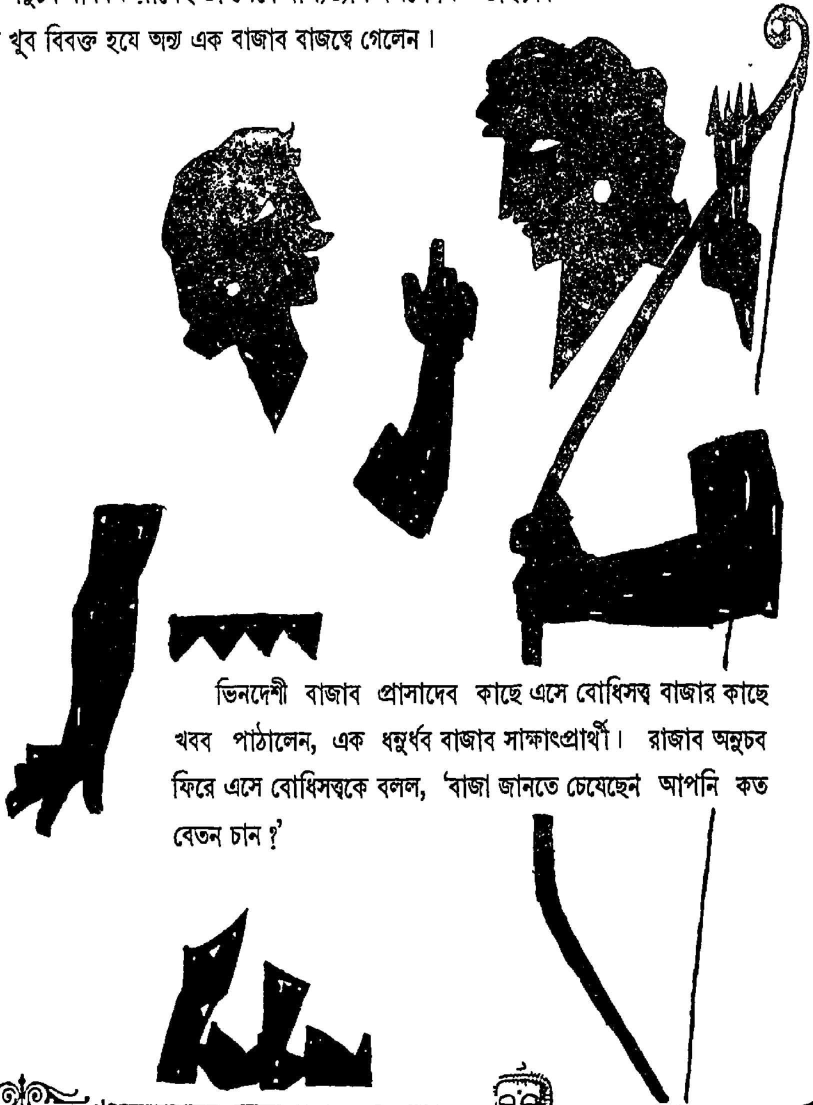
অসদৃশ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবাব ব্রহ্মদত্তেব ছেলে হযে জন্মান। জন্মানোব পব তাঁব নাম বাখা হল 'অসদৃশ কুমাব।' বোধিসত্ত্বেব সাত-আট বছব বযস হলে তাঁব একটি ভাই হল। ব্রহ্মদত্তেব দ্বিতীয ছেলেব নাম বাখা হল 'ব্রহ্মদত্ত কুমাব।'



বোধিসত্ত্বেব বযস ষোল হতেই তিনি তক্ষশিলায গেলেন লেখাপডা শিখতে। সেখানে তিনি আচার্যেব কাছে তিন বেদ আব আঠাবোটি বিদ্যা শিখলেন। এ ছাডা ধনুর্বিদ্যায তাঁব পাণ্ডিত্য আব নৈপুণ্য হল অসাধাবণ। এদিকে বাজা বযসেব ভাবে ক্লান্ত, তাঁব মৃত্যুব সময এগিযে আসছে। অসদৃশ কুমাবকে যুববাজেব আসনে বসিযে বাজা দেহ বাখলেন।

বাজাব মৃত্যুব পব অসদৃশ কুমাব নিজে বাজা না হয়ে ভাইকে সিংহাসনে বসতে অনুবোধ কবলেন। ছোট ভাই বাজত্ব কবতে লাগল। দাদাও বেশ সুখেই দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু নতুন বাজাব অনুচব আব বন্ধুবা তাকে বোঝাতে লাগল অসদৃশ কুমাব গোপনে বাজা হওয়াব চেষ্টা কবছেন। এদেব কুপবামর্শে বাজা একদিন অসদৃশ কুমাবকে গ্রেপ্তাব কবাব জন্য সৈন্য পাঠাল। কিন্তু অসদৃশ কুমাব তাঁব অনুচব মাবফৎ আগেই তা জেনে বাজ্যত্যাগ কবলেন। ভাইয়েব ওপব খুব বিবক্ত হয়ে অন্য এক বাজাব বাজত্বে গেলেন।



ভিনদেশী বাজাব প্রাসাদেব কাছে এসে বোধিসত্ত্ব বাজার কাছে খবব পাঠালেন, এক ধনুর্ধব বাজাব সাক্ষাৎপ্রার্থী। রাজাব অনুচব ফিরে এসে বোধিসত্ত্বকে বলল, 'বাজা জানতে চেয়েছেন আপনি কত বেতন চান?'

'বছরে এক লক্ষ টাকা।'

তখন রাজার আদেশ হল, 'ওকে ভেতরে আসতে বল।'

অসদৃশ কুমার রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন। রাজা তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিই কি সেই ধনুর্ধর?'

অসদৃশ কুমার জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ।'

'ঠিক আছে, তুমি কাজে বহাল হলে।'

এদিকে রাজার আর সব ধনুর্ধররা এতে খুব চটে গেল। 'কোথা থেকে উড়ে এসে লোকটা আমাদের থেকে দ্বিগুণ টাকা পাচ্ছে' এই ছিল তাদের মনোভাব। যাই হোক, রাজা একদিন বাগান বিহারে বেরিয়েছেন। প্রাচীন এক আম গাছের তলায় রাজার জন্য জাজিম পাতা হয়েছে। রাজা সেখানে আধশোয়া হয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ এক থোকা পাকা আম তাঁর নজরে পড়ল। কিন্তু আমগুলো এত উঁচু আর সরু ডালে ঝুলছিল যে গাছে উঠে পেড়ে আনা সম্ভব নয়। রাজা তখন ধনুর্ধরদের ডেকে বললেন, 'তোমরা তীর দিয়ে ঐ আমের থোকা পাড়তে পারবে?'

ধনুর্ধররা বলল, 'দেখুন মহারাজ, কাজটা আমাদের কাছে মোটেই কঠিন নয়। আপনি তো এর আগে অনেকবারই আমাদের তীরন্দাজি দেখেছেন। কিন্তু নতুন যে ধনুর্ধর এসেছে সে তো আমাদের দ্বিগুণ বেতন পায়। একবার তার কাজের বহর দেখতে পেলে মন্দ হতো না।'

রাজা তখন অসদৃশ কুমারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে ধনুর্ধর, তুমি কি ঐ আমের থোকাটা পাড়তে পারবে?' অসদৃশ কুমার বললেন, 'যদি দাঁড়াবার মত জায়গা পাই নিশ্চয়ই পারব।'

'কোথায় দাঁড়াতে চাও?'

'আপনার জাজিমের কাছে।'



রাজা অসদৃশ কুমারের জন্য জায়গা করে দিলেন। বোধিসত্ত্বের ধনুক তাঁর পোশাকের মধ্যে লুকোনো থাকত। তিনি মহারাজকে বললেন, 'এখানে আমার জন্য পর্দা খাটাতে আজ্ঞা দিন।' মহারাজ অনুচরদের সেইমত ব্যবস্থা করতে বললেন। পর্দা খাটানো হলে বোধিসত্ত্ব বেশবাস বদলে ধনুকে বর্শি লাগালেন। তীরে ফলা



লাগালেন। তারপর বেরিয়ে এলেন।

তীর ছোঁড়ার জায়গায় বীরবেশে দাঁড়িয়ে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, তীর যখন ওপর দিকে যাবে তখন আম কাটা যেতে পারে, আবার তীর যখন ফিরে আসবে তখনও আম কাটা যেতে পারে। এখন আপনি বলুন কিভাবে কাটা আপনার পছন্দ।'

রাজা বললেন, 'দেখ বাপু, তীর ওপরে ওঠার সময় আম কাটা হচ্ছে, ও আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু তীর ফিরে আসার সময় আম কাটা পড়েছে এরকম কখনও দেখিনি। তাই তুমি ঐ ভাবেই কাট।'

'মহারাজ, এই তীর অনেক ওপরে উঠবে, একেবারে দেবস্থান পর্যন্ত। তাই নামতে সময় লাগবে। একটু ধৈর্য রাখবেন। তাছাড়া তীর যাওয়ার সময় বৃন্তের মাঝখানে ফুটো করে চলে যাবে, নামার সময় ঐ ফুটো দিয়েই নামবে, তখন আমের থোকাটি সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। এখন দেখুন।'



তীরটি আমের বৃন্ত ফুটো করে চলে গেল। বোধিসত্ত্ব অপেক্ষা করতে লাগলেন। যখন বুঝলেন তীরটি স্বর্গের কাছে পৌঁছেছে তখন আরেকটি তীর ছুঁড়লেন প্রথম তীরকে ফিরিয়ে আনার জন্য। দ্বিতীয় তীর প্রথম তীরের লেজে ধাক্কা দিয়ে নিজে স্বর্গে উঠে গেল। দেবতারা সেই তীরটি ধরে রাখলেন।

প্রথম তীর পড়তে শুরু করেছে বিপুল গর্জনে। আশপাশের লোকজন ভয়ে কাঁপতে লাগল। বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ভয় নেই, যেখানকার তীর ঠিক সেখানেই ফিরবে।' আর সত্যি সেই ফুটো দিয়েই তীরটি নেমে এল, সঙ্গে এক থোকা আম। বোধিসত্ত্ব হাত দিয়ে লুফে নিলেন। মহারাজকে আমের থোকা দিলেন। লোকজন হৈ হৈ করে উঠল।

ওদিকে বোধিসত্ত্ব যখন ভিনদেশী রাজার আতিথ্যে দিব্যি আছেন তখন সাত রাজা তাঁর ভাইয়ের রাজ্য আক্রমণ করল। তাদের কাছে খবর ছিল অসদৃশ কুমার চলে গেছেন, তাই সহজেই রাজ্য জয় করা যাবে। বোধিসত্ত্বের ভাই তখন মহা বিপদে পড়ে দাদার কাছে লোক পাঠাল। তারা এসে বোধিসত্ত্বের পায়ে লুটিয়ে পড়ল।



সব শুনে বোধিসত্ত্ব বাজাব কাছে বিদায নিযে বাবাণসীতে ফিবে এলেন। তাবপব একটি তীবেব ফলায লিখলেন, 'আমি অসদৃশ কুমাব ফিবে এসেছি। এক তীবে তোমাদেব সাতজনেব প্রাণ নেব। যে-যে প্রাণ বাঁচাতে চাও, এক্ষুনি পালাও।' সাত বাজা তখন গোল হযে খেতে বসেছিল। তীবটা গিযে পড়ল তাদেব খাবাবেব থালাব মাঝখানে। তীবেব ফলাব লেখা পড়ে তাবা পড়ি কি মরি কবে



ছুটে পালাল।

এই সাত আক্রমণকাবীকে হটিযে দেওযাব জন্য বোধিসত্ত্ব যে চমৎকাব বাস্তা নেন তাতে বক্তপাত কবতে হল না। এমন কি মশাব পক্ষে যতটা বক্ত খাওযা সম্ভব ততটুকু বক্তপাতও ঘটে নি। যাই হোক, এরপর তিনি তপস্যা কবতে লোকালয ছেড়ে চলে গেলেন।

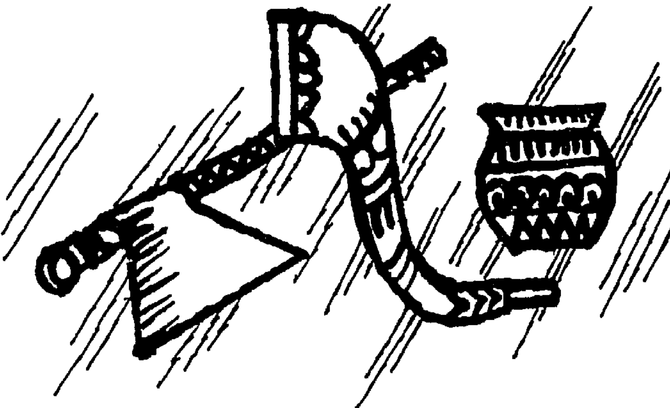
দধিবাহন জাতক



বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে কাশীতে চার ব্রাহ্মণ ছিল। তারা আবার চার ভাই। সংসারধর্ম করতে তাদের ভালো লাগল না। বেদ ও শাস্ত্র পাঠ সেরে তারা তপস্বী হল। হিমালয় অঞ্চলে কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকতে লাগল। সময় হলে বড় ভাই দেহ রাখল। সে দেব-লোকে শক্র হয়ে জন্মাল। দেবলোকে থেকেও সে ভাইদের কথা ভুলতে পারে নি। সপ্তাহে একদিন তাদের খোঁজ নিতে আসত।

শক্র একদিন তার মেজ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এল। সুখ-দুঃখের গল্প করার পর শক্র তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাই, তোর কি দরকার বল, তোকে কিছু একটা দিতে ইচ্ছে করছে।' ঐ তপস্বী তখন ন্যাবা রোগে ভুগছিল। শরীরে বল ছিল না। তাই বন থেকে কাঠ কেটে এনে আগুন জ্বালতে পারত না। সে তাই বলল, 'আমি আগুন চাই।' শক্র তখন তাকে একটি কুঠার দিয়ে বলল, 'তোমার কাঠের দরকার হলে এই কুঠারে চাপড় মেরে বলবে, 'কাঠ কেটে আগুন জ্বালো।' তাহলেই আগুন জ্বাল উঠবে।'

মেজ ভাইকে কুঠার দিয়ে শক্র সেজ ভাইয়ের কাছে গেল। তাকেও জিজ্ঞেস করল, 'ভাই, তোমার কি চাই বল।' এই তপস্বীর কুটিরের পাশ দিয়ে বুনো হাতি যাতায়াত করত। এই হাতিরা তার ওপর খুব অত্যাচার করত। সেজন্য সে বলল, 'দাদা, আপনি আমাকে হাতির হাত থেকে বাঁচান।' শক্র তখন তাকে একটি ভেরী দিল।



আর বলল, 'এই ভেবীর তলায হাত দিলে তোমাব শক্রবা পালাবে। আব উল্টো দিকে হাত দিলে ঐ শক্রবাই তোমাব পবম বন্ধু হবে। তাবা চতুবঙ্গ সেনা হযে তোমাকে ঘিবে দাঁড়াবে।'

সেজ ভাইকে ভেবীটি দিযে শক্র ছোট ভাইযের কাছে গেল। তাকেও জিজ্ঞেস কবল, 'বল তোব কি চাই।' এই তপস্বীও ন্যাবা বোগে ভুগছিল। সে বলল, 'দাদা, আমি দই খেতে চাই।' শক্র তখন ছোট ভাইকে একটা দইযেব ভাঁড় দিল। তাবপব তাকে বলল, 'দবকাব হলে ভাঁড়টা উল্টো কবে ধববি। সঙ্গে সঙ্গে ভাঁড় থেকে দই উপচে পড়ে মহানদী বইতে শুরু কববে।' তাবপব শক্র দেবলোকে চলে গেল।

তাবপব থেকে বড় ভাই কুঠাব দিযে আগুন জ্বালে, মেজ ভাই ভেবী বাজিযে হাতি তাড়ায, আব ছোট ভাই দইযেব ভাঁড় থেকে পেট পুবে দই খায।



যখনকাব কথা হচ্ছে, সেই সময় একটা শুযোব এক বহু পুবনো গ্রামে খাবাবেব খোঁজ কবছিল। হঠাৎ সে একটা আশ্চর্য মণি পেল। মণিটি মুখে তুলে নেওযা মাত্র সে আকাশে উঠে গেল। আকাশে ওড়াব সময সমুদ্রেব মাঝখানে সে একটা দ্বীপ দেখতে পেল। দ্বীপেব সবুজ ঘাস ও জলা জমি দেখে সে বেশ খুশি হযে গেল। ভাবল, 'এবাব থেকে এই দ্বীপেই থাকব।' এই ইচ্ছে কবা মাত্র সে মণিব আশ্চর্য শক্তিতে ঐ দ্বীপে একটি গাছেব তলায নেমে এল।

ঠিক সেই সময়ে কাশীতে এক নিষ্কর্মা লোক ছিল। সংসাবেব কুটোটি পর্যন্ত নবাত না সে। এতে তাব বাবা-মা বিবক্ত হযে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িযে দিল। সে বেচাবা তখন ঘুবতে ঘুবতে এক বন্দবে হাজিব হল। জাহাজে নাবিকদেব চাকবেব কাজ নিল। জাহাজ যখন মাঝ সমুদ্রে তখন তুমুল ঝড় উঠল। ঝড়ে জাহাজ গেল ডুবে। নিষ্কর্মা লোকটি তখন ভাসতে ভাসতে ঐ দ্বীপে গিযে হাজিব।

খিদেয কাতব হযে সে যখন দ্বীপেব মধ্যে বুনো ফলেব খোঁজে ঘুবে বেড়াচ্ছে তখন গাছেব তলায শুযোবটাকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে তাব নজবে পড়ল ঐ আশ্চর্য মণিটি। পা টিপে টিপে গিযে সে



মণিটা হাতে তুলে নিল। মণির আশ্চর্য গুণে সঙ্গে সঙ্গে সে আকাশে উঠতে লাগল। তখন সে মনে মনে ভাবল, 'আগে এই শুয়োরটাকে মেরে পেটের আগুন নিভিয়ে নেওয়া যাক।' এই কথা ভাবা মাত্র সে গাছের ওপরে আস্তে আস্তে নেমে এল। গাছে বসে একটা ডাল ভেঙ্গে শুয়োরের মাথায় ফেলল। এতে শুয়োরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে তাকাতেই শুয়োরটা যখন দেখল মণি নেই, তখন সে পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করল। তারপর গাছের মাথায় লোকটাকে দেখেই সে এক লাফ দিল। গাছে লেগে তার মাথা গেল ভেঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরটা মারা গেল। লোকটি তখন মহানন্দে আগুন জ্বেলে শুয়োরের মাংস পুড়িয়ে পেট ভরে খেল। তারপর মণি হাতে নিয়ে আকাশে উঠে গেল।

উড়তে উড়তে সে চলে এল হিমালয় পাহাড়ের কাছে। তখন সে ঐ তিন তপস্বীর কুটির দেখতে পেল। ভাবল, 'এখানে একটু নামা যাক।' সঙ্গে সঙ্গে সে বড় ভাইয়ের আশ্রমের কাছে নেমে এল। তপস্বীর কাছে দু-তিন দিন থাকল। তপস্বী অতিথির অনেক সেবাযত্ন করল। নিষ্কর্মা লোকটি যখন জানতে পারল এই তপস্বীর কাছে এক যাদু কুঠার আছে তখন সে ঐ তপস্বীকে বলল, 'প্রভু, আপনি আমার এই আশ্চর্য মণির বদলে ঐ কুঠারটা আমাকে দিন।' তপস্বী আকাশে ওড়ার লোভে তাকে কুঠারটি দিয়ে দিল। সে একটু দূরে গিয়েই কুঠারে চাপড় মেরে বলল, 'যা, তপস্বীর মাথা কেটে মণিটা নিয়ে আয়।' কথাটা বলতে যতটুকু সময় লেগেছে তার মধ্যেই কুঠার কাজ হাসিল করে ফিরে এল।

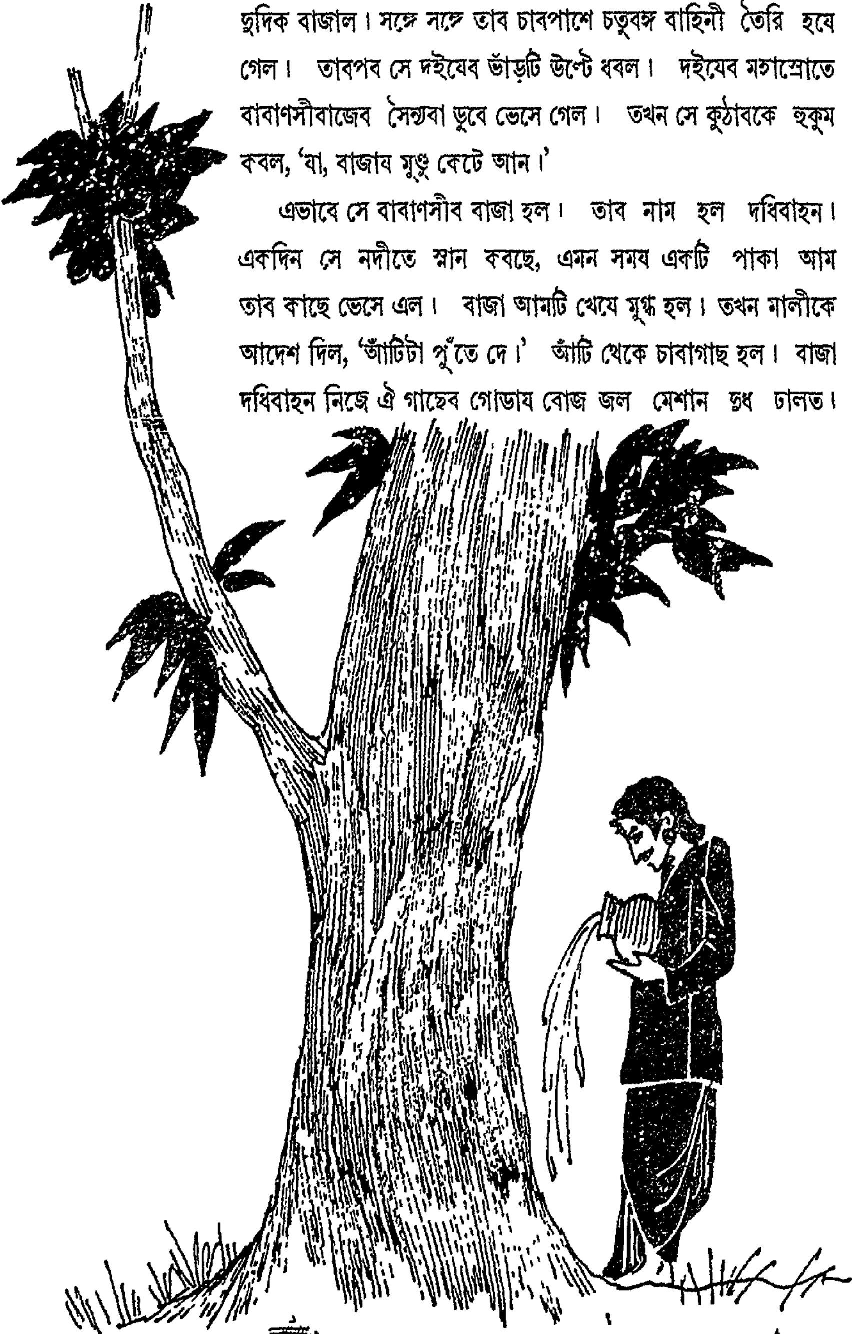


লোকটি এবার কুঠারটি এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে মেজ ভাইয়ের কুটিরে হানা দিল। দু দিনেই তার সঙ্গে ভাবসাব করে ফেলল। ভেরীর আশ্চর্য ক্ষমতা জেনে সে কুঠারের সাহায্যে দ্বিতীয় তপস্বীকেও মেরে ফেলল। এবার আশ্চর্য ভেরীটি তার হল। একই ভাবে দইয়ের ভাঁড়টিও বাগিয়ে নিল।

এর পর সে বারাণসীতে গেল। রাজার কাছে খবর পাঠাল, 'হয় যুদ্ধ কর, নইলে রাজ্য ছেড়ে দাও।' রাজা এই স্পর্ধা দেখে রেগে

আগুন। সৈন্যদের বলল, 'এক্ষুনি লোকটাকে বেঁধে নিয়ে আয়। ওর পাগলামি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।' সৈন্যরা আসছে দেখেই ঐ নিকর্মা ভেরীর দুদিক বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশে চতুরঙ্গ বাহিনী তৈরি হয়ে গেল। তারপর সে দইয়ের ভাঁড়টি উল্টে ধরল। দইয়ের মহাস্রোতে বারাণসীরাজের সৈন্যরা ডুবে ভেসে গেল। তখন সে কুঠারকে হুকুম করল, 'যা, রাজার মুণ্ডু কেটে আন।'

এভাবে সে বারাণসীর রাজা হল। তার নাম হল দধিবাহন। একদিন সে নদীতে স্নান করছে, এমন সময় একটি পাকা আম তার কাছে ভেসে এল। রাজা আমটি খেয়ে মুগ্ধ হল। তখন মালীকে আদেশ দিল, 'আঁটিটা পুঁতে দে।' আঁটি থেকে চারাগাছ হল। রাজা দধিবাহন নিজে ঐ গাছের গোড়ায় রোজ জল মেশান দুধ ঢালত।





একদিন গাছটি বিশাল হয়ে উঠল। প্রচুর ফলন হল।

আমগুলো যেমন মিষ্টি হল তেমনি খোশবাইও ছিল। দধিবাহন আশপাশের রাজাদের ঐ আম ভেট পাঠাত। তবে পাঠানোর আগে আমের আঁটির যেখান থেকে অঙ্কুর জন্মায় সেখানটা কাঁটা দিয়ে ফুটো করে দিত। ফলে আম খাওয়ার পর রাজারা আঁটিগুলো পুঁতলেও তা থেকে গাছ জন্মাত না। রাজারা তখন খোঁজখবর নিতে লাগল কেন আঁটি থেকে আমগাছ জন্মাচ্ছে না। তারপর যখন সব কিছু জানতে পারল তখন এক রাজা তার মালীকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে, দধিবাহনের আমগুলোকে তেতো করে দিতে পারবে?'

'হ্যাঁ মহারাজ, তা পারি।'

'তাহলে এই হাজার টাকা নিয়ে রওনা দাও।'

ঐ মালী বারাণসীতে গিয়ে রাজার কাছে খবর পাঠাল, 'একজন মালী এসেছে দেখা করতে।' দধিবাহন তাকে ডাকলে সে নিজের গুণপনা ব্যাখ্যা করে বলল। দধিবাহন তাকে বাগানের প্রধান মালীর সহকারী করল।

নতুন মালী এসে অকাল-ফল, অকাল-ফুল ফলিয়ে রাজার পেয়ারের লোক হয়ে গেল। প্রধান মালীর চাকরি গেল, নতুন মালীই



প্রধান মালী হল। প্রধান মালী হযেই সে ঐ আম গাছেব কাছে নিম আব গুলঞ্চ লতা লাগিযে দিল। নিমগাছ বড হতে লাগল। আমগাছেব শিকডেব সঙ্গে নিমগাছেব শিকড়, ডালেব সঙ্গে ডাল জড়িযে গেল। গাছেব আমেব মধ্যে তেতো স্বাদ এল। নতুন মালী দেখল তাব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হযেছে। সে তখন চুপি চুপি সবে পডল।

তাবপব দধিবাহন বাগানে গিযে একদিন আম খেযে দেখল আম



তেতো হযে গেছে। মুখে দেওয়া যাচ্ছে না। বোধিসত্ত্ব তখন দধিবাহনেব মন্ত্রী ছিলেন। দধিবাহন বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'মন্ত্রী, বলুন তো আমার সাধের গাছের আম তেতো হল কি কবে?' বোধিসত্ত্ব তখন নিম ও গুলঞ্চ লতার কথা বললেন। বললেন, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নবকবাস ঘটে।' দধিবাহন তখন সমস্ত নিমগাছ তুলে ফেলাব হুকুম দিল। আগেকার মালীকে আবাব ফিবিযে আনল।



শীলানিশংস জাতক

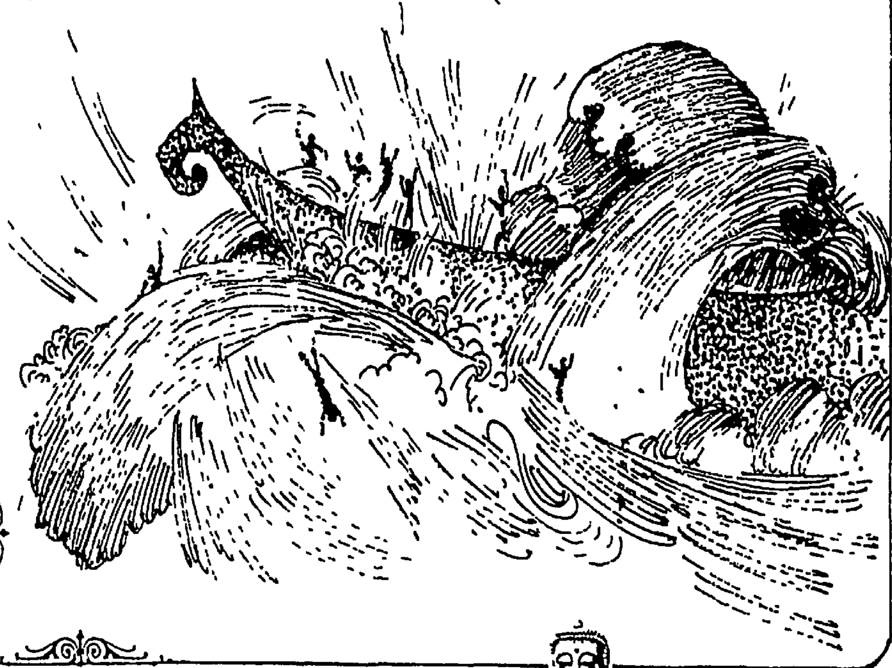
পুরাকালে কাশ্যপের আমলে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক নাপিত জাহাজে চড়ে যাত্রা করে। যাত্রার সময় নাপিতের বউ ঐ ব্রাহ্মণের হাতে স্বামীকে সঁপে দিয়ে বলল, 'প্রভু, সুখ-দুঃখ সব সময়েই আপনি আমার স্বামীর ভার নেবেন।'

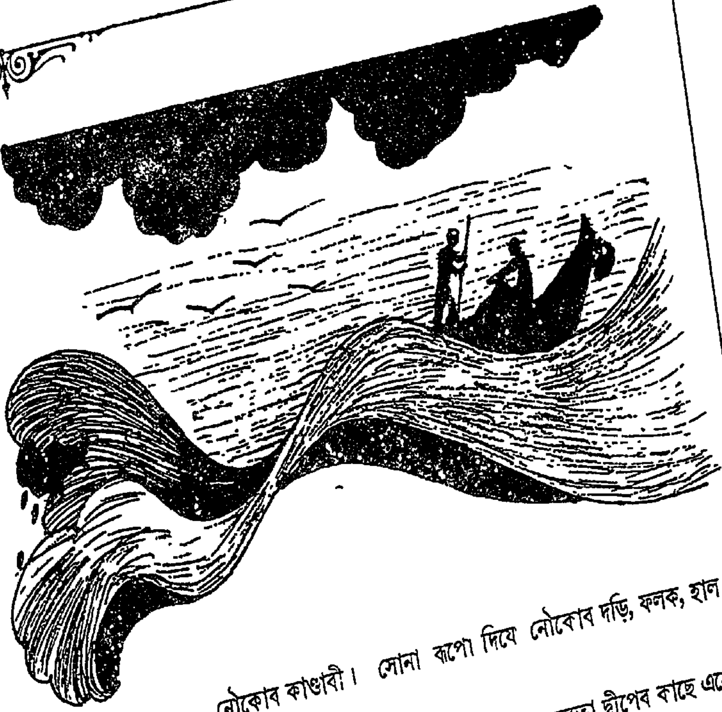
যাত্রা করার সাত দিনের মাথায় জাহাজ গেল ডুবে। ভাঙ্গা জাহাজের পাটাতন ধরে ভাসতে ভাসতে তারা এক দ্বীপে এসে উঠল। নাপিত গোটাকয়েক পাখি শিকার করল। তারপর বেশ যত্ন করে মাংস রান্না করল। খেতে বসার আগে সে ব্রাহ্মণকে ডাকল, 'ঠাকুর, খাবেন আসুন।'

ব্রাহ্মণ বলল, 'আমি খাব না, তুমি খাও।'

মনে মনে তখন ব্রাহ্মণ ভাবছে, 'এখানে যে বিপদে পড়েছি তাতে ঠাকুরের নাম করা ছাড়া রাস্তা নেই।' তারপর শুধু ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করতে লাগল।

ব্রাহ্মণ যখন ভগবানের নাম করছিল তখন ঐ দ্বীপের নাগরাজ নিজের শরীর দিয়ে বিশাল এক নৌকো বানাল। সমুদ্রদেবতা হলেন





নৌকোব কাণ্ডাবী। সোনা রূপো দিয়ে নৌকোব দড়ি, ফলক, হাল তৈবি কবা হল।

তাবপব ঐ আশ্চর্য নৌকো নিয়ে সমুদ্র দেবতা দ্বীপেব কাছে এসে চিৎকাব কবতে লাগলেন, 'তোমবা কেউ জম্বু দ্বীপে যাবে?'

ব্রাহ্মণ বলল, 'আমবা যাব।'

সমুদ্র দেবতা বললেন, 'এস, নৌকোয় ওঠ।'

ব্রাহ্মণ নিজে উঠে নাপিতকে ডাকলে দেবতা বললেন, 'ওকে নেব না।'

ব্রাহ্মণ বলল, 'কেন প্রভু?'

'কাবণ, ও শীল অর্জন কবে নি। এ নৌকো আমি তোমাব জন্যে এনেছি, ওর জন্যে নয়।' তখন ব্রাহ্মণ বলল, 'তাহলে আমাব দান-ধ্যান ও শীল বক্ষাব ফল আমি ওকে দান করলাম।'

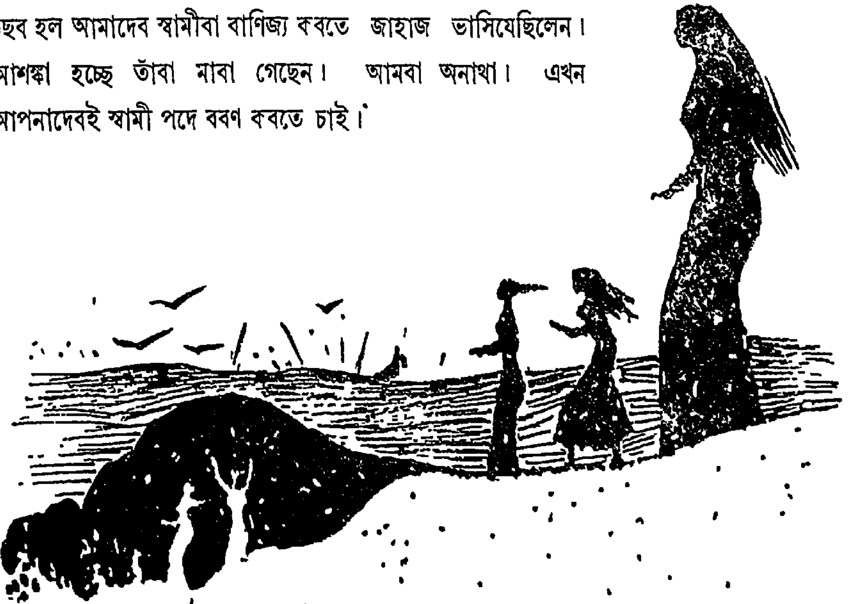
এবপব নাপিতকে নৌকোয় নিতে আব কোন বাধা বইল না। দুজনে বাবাণসীতে পৌঁছল। সমুদ্র দেবতা দুজনকেই কিছু সম্পত্তি দান করলেন। সমুদ্র দেবতা চলে যাওয়ার সময় একটি পদ্য আবৃত্তি কবলেন। তার সারমর্ম হল: সর্বদা পণ্ডিতের সংসর্গে থাকাই শ্রেয়।

বালাহাশ্ব জাতক

অনেককাল আগে তাম্রপর্ণী দ্বীপে শিরীষবস্তু নামে একটি নগর ছিল। সেখানে কোন মানুষ থাকত না। কেবল যক্ষিনীরা থাকত। উপকূলে জাহাজডুবি হলে তাদের মধ্যে উৎসব লেগে যেত। যক্ষিনীরা তখন সেজেগুজে তীরে আসত। তাদের সঙ্গে থাকত দাস-দাসী, ভালো মন্দ খাবার, আর কোলে থাকত শিশু।

ঐ অবস্থায় তারা বিপদগ্রস্ত বণিকদের সামনে হাজির হত। এদিকে মায়া দিয়ে ঐ প্রেত নগরে চাষ-বাস, আর গেরস্থালীর নানারকম চিহ্ন তৈরি করত। তারপর বণিকদের কাছে গিয়ে বলত, 'আপনারা খিদেয় কষ্ট পাচ্ছেন, এই নিন খাবার এনেছি।'

ক্লান্ত বণিকের দল তাদের হাতে খাবার খেয়ে বিশ্রাম করতে থাকলে তারা জিজ্ঞেস করত, 'কোথায় থাকেন? কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন? এখানে কি জন্য এসেছেন?' বণিকরা জবাব দিত, 'জাহাজডুবি হওয়ায় আমরা এখানে এসেছি।' তখন যক্ষিনীরা বলত, 'খুব ভালো কাজ করেছেন এখানে এসে। তিন বছর হল আমাদের স্বামীরা বাণিজ্য করতে জাহাজ ভাসিয়েছিলেন। আশঙ্কা হচ্ছে তাঁরা মারা গেছেন। আমরা অনাথা। এখন আপনাদেরই স্বামী পদে বরণ করতে চাই।'





আবও নানা ছলাকলা দেখিয়ে তাবা বণিকদেব যক্ষনগবে নিয়ে যেত। আগে যাদেব বন্দী কবেছিল তাদেব মধ্যে কেউ বেঁচে থাকলে তাকে তখন মাটিব নিচেব কুঠবিতে বন্ধ করে রাখত। তাবপর বণিকদেব বক্ত চুষে খেত।

একদিন জাহাজডুবি ঘটায পাঁচশ বণিক ঐ নগবেব কাছে এসে পড়ে। যক্ষিনীবা ছলাকলায ভুলিয়ে তাদেব নগবের মধ্যে নিয়ে গেল। বযসে বড যে বণিক তাকে বিয়ে কবল বযস্কা যক্ষিনী আব ছোট বণিককে সব থেকে ছোট যক্ষিনী। এইভাবে পাঁচশ বণিক পাঁচশ যক্ষিনীকে বিয়ে কবল। মাঝ বাতে বড বণিকেব যক্ষিনী বউ নিঃশব্দে ঘব ছেড়ে বেবিয়ে এল। মাটিব তলাব কুঠরিতে গিয়ে এক হতভাগ্যেব বক্ত খেযে ফিবে এল। হঠাৎ ঘুমেব ঘোবে বড বণিকেব হাত যক্ষিনীব গাযে লাগল। বণিক দেখল তাব শবীব ববফেব মত ঠাণ্ডা। বণিক বুঝল এ মানবী নয, বাক্ষসী।

বণিক বুঝল এই পাঁচশ নাবীব কেউই মানবী নয। 'যে করে







হোক এখান থেকে পালাতে হবে’ এই ভেবে পরের দিন সকালেই সে সঙ্গীদের সব খুলে বলল। সব শুনে আড়াইশ বণিক বলল, ‘আমরা এদের বিয়ে করেছি। তাই এদের ছেড়ে পালাতে পারব না।’ বাকি আড়াইশ বণিককে নিয়ে বড় বণিক পালাতে শুরু করল।

যে সময়কার কথা বোধিসত্ত্ব তখন ঘোড়া-জন্ম নিয়েছেন। তাঁর সারা শরীর সাদা। মাথাটি নিকষ কালো, আর অতি সুন্দর কেশরে ঝুলে থাকত। বোধিসত্ত্ব আকাশ পথে যাতায়াত করতেন। হিমবন্ত অঞ্চল থেকে তিনি তাম্রপর্ণী দ্বীপে শালুক খেতে যেতেন। যাতায়াতের সময় তিনি রোজ তিনবার মানুষদের বলতেন, ‘কেউ কি লোকালয়ে যেতে চাও?’ বণিকরা ঐ ধ্বনি শুনতে পেয়ে বলল, ‘প্রভু, আমরা যেতে চাই।’ বোধিসত্ত্ব বললেন, ‘তাহলে আমার পিঠে ওঠ।’ পিঠে জায়গায় কুলোল না বলে কেউ লেজ, কেউ কেশর, কেউ তাঁর পা ধরে ঝুলতে লাগল। তারপর বোধিসত্ত্ব প্রত্যেককে তাদের ঘরে পৌছে দিলেন।

বাকি বণিকদের কি হল? তারা অন্ধ মোহে প্রাণ হারাল। যক্ষিনীরা তাদের রক্ত খেয়ে খিদে মেটাল।

কুরঙ্গমৃগ জাতক



ব্রহ্মদত্তেব আমলে বোধিসত্ত্ব একবাব হবিণ জন্ম নেন। তিনি তখন সবোববেব তীবে বাস কবতেন। ঐ সবোববে এক কচ্ছপ থাকত। আব কাছাকাছি গাছে ছিল এক বক। বক আর কচ্ছপেব সঙ্গে বোধিসত্ত্বেব খুব ভাব। তিন বন্ধুব মধ্যে কখনও ছাড়াছাড়ি হতো না।

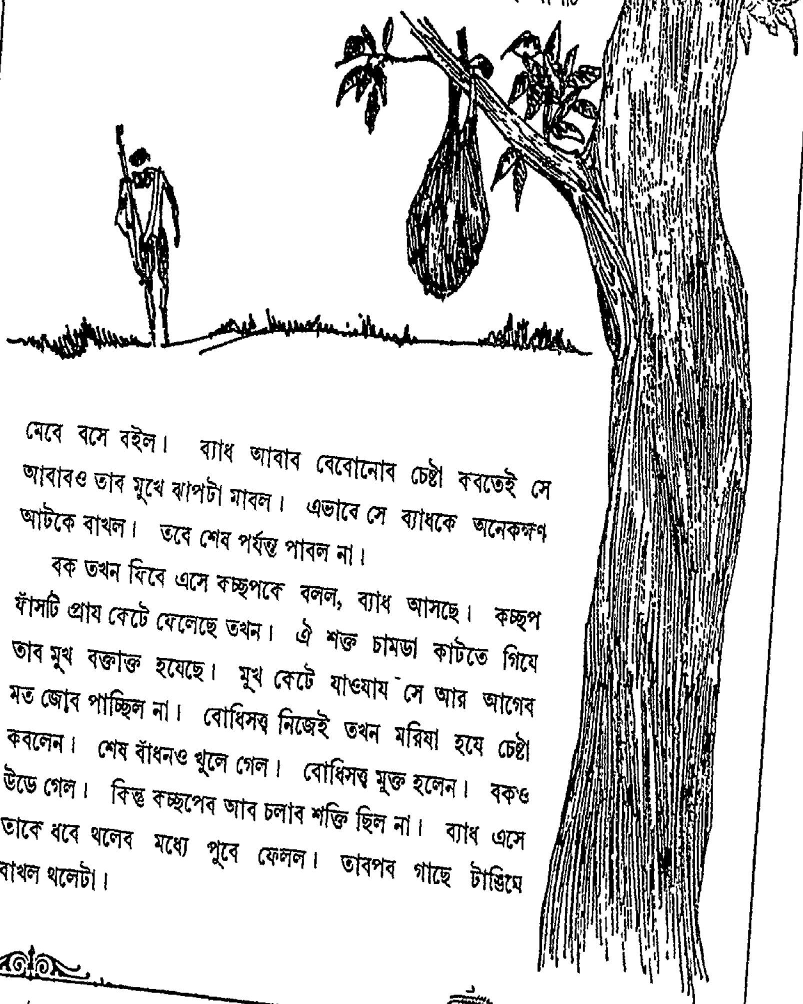
একবাব এক ব্যাধ ঐ বনে বোধিসত্ত্বেব পাযেব ছাপ দেখে ঠিক কবল, 'হরিণটাকে বন্দী কবতে হবে।' খুব শক্ত চামড়া দিয়ে সে একটা ফাঁস বানাল। তাবপব ফাঁসটা সবোববেব তীবে বিছিযে বেখে গেল। বোধিসত্ত্ব চবতে এসে ফাঁদে পা দিলেন। তাবপব হাজাব চেষ্টা কবেও মুক্ত হতে পাবলেন না। তখন তিনি আর্তনাদ কবতে লাগলেন। বোধিসত্ত্বেব আর্ত চিৎকাব শুনে কচ্ছপ আব বক এল।

কচ্ছপ ফাঁস কাটাব দাযিত্ব নিল। আব বক উড়ে গেল ব্যাধেব বাসায। কেননা ঐ শক্ত চামড়া কাটতে ঢেব সময় লাগবে। এব



মধ্যে ব্যাধ এসে পড়লে রক্ষা থাকবে না। তাই ব্যাধকে আটকে রাখার দায়িত্ব পড়ল বকের ওপর।

ভোর হতেই ব্যাধ ধনুক আর অস্ত্র নিয়ে বেরোতে গেল। বক তখন হঠাৎ উড়ে গিয়ে তার মুখে ডানার ঝাপটা মারল। সাতসকালে এই বাধা অমঙ্গলের লক্ষণ। সেজন্য ব্যাধ ভাবল 'একটু বসে যাই।' তারপর সে সামনের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরোবে ঠিক করল। বকও বুঝতে পেরেছিল ব্যাধ এবার পেছনের দরজা দিয়ে বেরোবে। সেজন্যে সে পেছনের দরজার কাছে ঘাপটি



মেরে বসে রইল। ব্যাধ আবার বেরোনোর চেষ্টা করতেই সে আবারও তার মুখে ঝাপটা মারল। এভাবে সে ব্যাধকে অনেকক্ষণ আটকে রাখল। তবে শেষ পর্যন্ত পারল না।

বক তখন ফিরে এসে কচ্ছপকে বলল, ব্যাধ আসছে। কচ্ছপ ফাঁসটি প্রায় কেটে ফেলেছে তখন। ঐ শক্ত চামড়া কাটতে গিয়ে তার মুখ রক্তাক্ত হয়েছে। মুখ কেটে যাওয়ায় সে আর আগের মত জোর পাচ্ছিল না। বোধিসত্ত্ব নিজেই তখন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলেন। শেষ বাঁধনও খুলে গেল। বোধিসত্ত্ব মুক্ত হলেন। বকও উড়ে গেল। কিন্তু কচ্ছপের আর চলার শক্তি ছিল না। ব্যাধ এসে তাকে ধরে থলের মধ্যে পুরে ফেলল। তারপর গাছে টাঙিয়ে রাখল থলেটা।

কিছুদূব গিযে বোধিসত্ত্ব বুঝতে পাবলেন কচ্ছপ ধবা পড়েছে। তখন তিনি ইচ্ছে কবেই ব্যাধকে দেখা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধ তাব পিছু নিল। ব্যাধকে বনেব গভীবে এনে ফেলে বোধিসত্ত্ব মিলিযে গেলেন। ঘুবপথে কচ্ছপেব কাছে এলেন। থলে থেকে কচ্ছপকে বেব কবলেন। তাবপব বক আর কচ্ছপকে বললেন : 'ভাই, তোমাদেব সাহায্যে আমি জীবন ফিবে পেয়েছি। এখন ব্যাধ আসছে তোমাদেব ধবতে। ভাই বক, তুমি তোমার ছেলেমেযেদেব নিয়ে পালাও। ভাই কচ্ছপ, তুমি তাড়াতাড়ি ডালে চলে যাও।'

ব্যাধ ফিবে এসে কাউকে পেল না। তখন থেকে এই তিন বন্ধু সাবা জীবন একসঙ্গে আনন্দে থেকেছে। সময হলে তাদেব পশু জীবন শেষ হল। যে যেমন কাজ কবেছে তাব সেই বকম গতি হল।



অশ্বক জাতক ২৮

সে অনেক কাল আগেব কথা। কাশী বাজ্যেব পোতলি নগবে তখন অশ্বক নামে এক বাজা ছিলেন। বাজাব প্রধান বাণী ছিলেন উর্ববী। উর্ববী ছিলেন অসামান্যা সুন্দবী। বাজা অশ্বক তাঁকে প্রাণেব অধিক ভালবাসতেন।

কিছুদিন পবে হঠাৎ উর্ববীব মৃত্যু হল। এতে বাজা গভীব শোক পেলেন। দিন বাত কাঁদতে লাগলেন। কাজকর্ম, আহাব-বিহাব সমস্তই চুলোয গেল। বাজা উর্ববীব মৃতদেহে নানাবকম আবক মাখিয়ে একটা ডোঙাব মধ্যে বাখলেন। তাবপব সেই ডোঙা নিজেব খাটের তলায বেখে দিনবাত কান্নাকাটি কবতে লাগলেন। এভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল।

বোধিসত্ত্ব তখন হিমবন্ত প্রদেশে বাস কবেন। তপস্যা কবে সিদ্ধিলাভ কবেছেন। একদিন জ্ঞানচক্ষু মেলে গোটা জম্বুদ্বীপ লক্ষ্য কবছিলেন। তখন দেখতে পেলেন, বাজা অশ্বক শোকে মৃতপ্রায। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'এব শোক দূব কবতে হবে।' এই ভেবে তিনি তপস্যাবলে আকাশে উঠলেন। তাবপব বাবাণসীব বাজাব বাগানে এসে সমাধিস্থ হলেন।



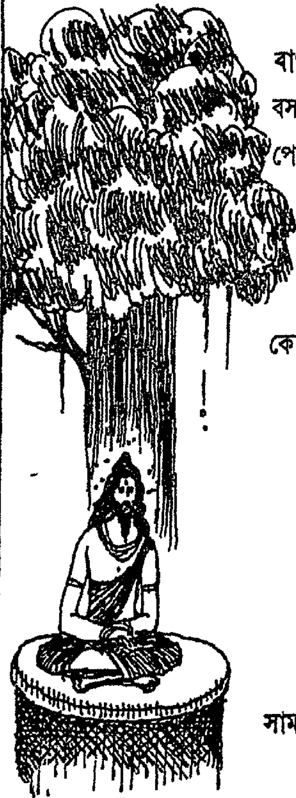
পোতলি নগরের এক ব্রাহ্মণ তখন রাজার বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে বোধিসত্ত্বকে দেখতে পেয়ে তাঁকে প্রণাম করে পাশে বসে পড়ল।

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ভাই, তোমাদের রাজা ধার্মিক তো?'

'হ্যাঁ প্রভু। তবে তাঁর পত্নী মারা যাওয়ার পর তিনি শোকে মৃতপ্রায়। আপনি তাঁকে রক্ষা করুন।'

'দেখ বাপু, তোমাদের রাজার সঙ্গে তো আমার আলাপ নেই। তবে তিনি আমার কাছে এলে আমি তাঁকে বলে দিতে পারি তাঁর স্ত্রী এখন কোথায় জন্ম নিয়েছেন। এমন কি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলিয়ে দিতে পারি।'

'তাহলে প্রভু আমি রাজাকে আনতে চললাম। আমি না ফেরা পর্যন্ত দয়া করে আপনি এখান থেকে কোথাও যাবেন না।'



ব্রাহ্মণ রাজাকে গিয়ে সব কথা বলতে রাজা সঙ্গে সঙ্গে রথে উঠে বাগানের দিকে চললেন। বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে তাঁর এক পাশে বসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভু, আপনি কি সত্যি জানতে পেরেছেন সে এখন কোথায় জন্মেছে।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'হ্যাঁ মহারাজ, জানতে পেরেছি।'

'কোথায় তার পুনর্জন্ম হয়েছে?'

'আপনার স্ত্রীর খুব গুমোর ছিল। সে কর্তব্যে অবহেলা করেছিল। কোন রকম সৎ কাজও সে করে নি।'

'প্রভু, আপনি আমাকে শুধু বলুন সে এখন কোথায় জন্মেছে।'

'সে এই বাগানেই আছে।'

'কোথায় প্রভু?'

'গুবরে পোকা হয়েছে।'

'বিশ্বাস করি না।'

'এক্ষুনি বিশ্বাস হবে। সে কথা বললেই বিশ্বাস হবে।'

বোধিসত্ত্ব তখন বললেন, 'ওহে গুবরে পোকা, একবার রাজার সামনে এস দেখি।' বোধিসত্ত্বের তপস্যার শক্তিকে পোকারা এড়াতে



পারল না। ছুটো গুবরে পোকা এগিয়ে এল। বোধিসত্ত্ব আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে ছুটো পোকা আসছে, এব মধ্যে পেছনের পোকাটা হল আপনাব স্ত্রী উর্ববী।' তবু রাজার বিশ্বাস হচ্ছে না দেখে বোধিসত্ত্ব পোকাটাকে কথা বলাব ক্ষমতা দিলেন। তাবপব ডাকলেন, 'উর্ববী!'

পোকা বলল, 'আজ্ঞা করুন প্রভু!'

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস কবলেন, 'আগেব জন্মে তোমাব নাম কি ছিল?'

পোকা জবাব দিল, 'উর্ববী।'

'এখন তুমি কাকে ভালোবাস, অশ্বকবাজকে না কি ঐ গুববে পোকাটাকে?'

'প্রভু, সে তো পূর্বজন্মের কথা। এখন রাজা আমার কেউ নন। পারলে রাজার বক্ত দিয়ে আমার এ জন্মের স্বামী ঐ পোকাব গা বাঙিয়ে দিতাম।'

সব দেখে শুনে বাজা শোকের নাগপাশ থেকে মুক্ত হলেন। আগে এত কষ্ট পেয়েছেন বলে তাঁর খুব অনুশোচনা হল্। অনুচরদের আদেশ দিলেন খাটের তলা থেকে বাণীর মৃতদেহ বেব করে দাহ করতে। নিজে ডুব দিয়ে স্নান করে এসে নতুন জীবন ফিরে পেলেন। অপ্রমত্ত হয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।



শিশুমার জাতক

বাবাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তেব আমলে বোধিসত্ত্ব একবার বানব জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁব শবীব ছিল বিশাল। আব তাতে হাতিব সমান শক্তি ছিল। গঙ্গার কাছাকাছি এক বনে তিনি বাস কবতেন। তখন গঙ্গার ঐ জাযগায এক কুমিব দম্পতি থাকত।

কুমিবেব বউ বোধিসত্ত্বের ঐ সুন্দব, বিশাল শবীব দেখে ভাবল, 'এব হৃৎপিণ্ডেব মাংস নিশ্চযই খুব সুস্বাদু হবে।' সে তাব স্বামীকে বলল, 'প্রভু, ঐ বানবের হৃৎপিণ্ড খেতে আমাব খুব ইচ্ছে করছে।' শুনে কুমিব বলল, 'দেখ সে থাকে ডাঙ্গায, আমি থাকি জলে, কি কবে ওকে ধবব?' বউ কোন কথা শুনতেই বাজি নয। তাব এক কথা: 'আমি ঐ বানবেব হৃৎপিণ্ড খেতে না পেলে এ জীবন বাখব না।' তখন কুমিব অনেক ভেবে বলল, 'ঠিক আছে, একটা বাস্তা আছে। সে বাস্তায গেলে কাজ হবে।'

বউকে শান্ত কবে কুমির গঙ্গাব পারে বোধিসত্ত্বেব কাছে গেল। কুমিব তাঁকে ডেকে বলল, 'হে বানববাজ! শুধুশুধু গঙ্গাব এ পাবে, এক জাযগায থেকে দিনেব পব দিন বিস্বাদ ফল খাচ্ছেন কেন? ওপাবে বিস্তব আম আব বুনো কাঁঠাল গাছ আছে। ওসব গাছেব ফলও তেমনি সুস্বাদু।'

বোধিসত্ত্ব জবাব দিলেন, 'এ কেমন কথা হে কুমিববাজ! এই বিশাল গঙ্গা আমাব মত স্থলচবেব পক্ষে পেবিযে যাওযা অসম্ভব।'

কুমিব বলল, 'সে কি কথা। আমি আপনাকে বয়ে নিযে যেতে পাবলে ধন্য হব। আমাব পিঠে বসুন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।'

তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বেশ, তাহলে যাওযা যাক।'

কুমিব মাঝ গঙ্গা পর্যন্ত এসে জলে ডুব দিতে গেল। বোধিসত্ত্ব বলে উঠলেন, 'এ কি কবছেন? ডুবিযে মাববেন না কি?'

'তবে তুই কি ভেবেছিলি?'

'কিন্তু কেন?'

'আমাব বউ তোব হৃৎপিণ্ড খাবে।'



'তুমি কি জান না বানবেব হৃৎপিণ্ড তাদেব বুকে থাকে না?'

'তবে কোথায় থাকে?'

'বুকের মধ্যে থাকলে গাছে গাছে লাফালাফি করার সময় হৃৎপিণ্ড ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।'

'তাহলে হৃৎপিণ্ড কোথায় থাকে?'

'ঐ দেখ, ঐ ডুমুব গাছে আমাদেব হৃৎপিণ্ড ঝুলছে।'

'তুমি যদি তোমার হৃৎপিণ্ডটা পেড়ে দাও তাহলে তোমাকে আর মারব না।'

'বেশ, চল।'

বোধিসত্ত্বকে কুমির পাবে নিয়ে গেল। বোধিসত্ত্ব এক লাফে গাছে উঠে গেলেন। গাছেব ডালে বসে কুমিবকে ডেকে বললেন, 'ওবে বোকা কুমিব, তোব শবীরটা যত বড়ই হোক মগজে কিছু নেই। জীবজন্তুর হৃৎপিণ্ড কখনও গাছে থাকে নাকি?'



সোমদত্ত জাতক

একবাব বোধিসত্ত্ব কাশীতে এক ব্রাহ্মণ পবিবাবে জন্ম নেন। বড হযে তিনি তক্ষশিলায় গেলেন। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেন। ফিবে এসে দেখলেন বাড়িব হাল খুব খাবাপ হযেছে। তাঁবা গরীব হযে পড়েছেন। পবিবাবেব শ্রী ফিবিযে আনতে তিনি যত্নবান হলেন। বাবাব কাছে অনুমতি চাইলেন, 'চাকবির খোঁজ কবতে যেতে চাই, আপনি অনুমতি দিন।'

তাবপব তিনি বাবাণসীবাজেব কাছে গেলেন। নিজেব বিদ্যে-বুদ্ধিব পবিচয দিলেন। রাজাব তাঁকে পছন্দ হল। চাকবি পেলেন। শুধু তাই নয়, অচিবেই বাজাব প্রিযপাত্র হযে উঠলেন।

বোধিসত্ত্বের বাবাব চাষেব দুটি বলদ ছিল। হঠাৎ একটা বলদ গেল মবে। তখন তিনি বোধিসত্ত্বেব কাছে গেলেন। বললেন, 'দেখ বাছা, আমাদেব একটা বলদ হঠাৎ মাবা গেছে। চাষ কবা তো মাথায উঠল। তুমি বাজাব কাছে গিযে একটা গোরু চাও।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বাবা, আমি এইমাত্র বাজাব কাছ থেকে আসছি, এক্ষুনি আবাব গিযে গোরু চাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ববং আপনিই যান।'

বৃদ্ধ বললেন, 'তুমি তো জান আমি কত মুখচোরা।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'সে যাই হোক, এ আমি পারব না।'

তখন বৃদ্ধ বললেন, 'তাহলে আমাকে শিখিয়ে-পড়িযে দাও।'

'তা দিচ্ছি।'



বোধিসত্ত্ব তারপর বাবাকে নিয়ে শ্মশানে গেলেন। সেখানে কাছেই ছিল ঘাসের বন। প্রথমে কয়েক আঁটি ঘাস কেটে এনে চারদিকে সাজালেন। তারপর বললেন, 'মনে করুন এই হচ্ছে রাজা, এই হচ্ছে মন্ত্রী, এই হচ্ছে যুবরাজ, আর এই হল সেনাপতি। আপনি রাজসভায় ঢুকেই প্রথমে বলবেন, 'মহারাজের জয় হোক।' তারপর আমি যে কবিতা শিখিয়ে দিচ্ছি সেটা মুখস্থ বলবেন।' এরপর বোধিসত্ত্ব বাবাকে কবিতা মুখস্থ করাতে লাগলেন। কবিতাটির সারমর্ম ছিল এই :

'মহারাজ, আমি দুটো বলদ দিয়ে জমি চষতাম। এখন একটা হঠাৎ মরে গেছে। আপনি যদি আবার জোড়াটি পুরিয়ে দেন বড় মঙ্গল হয়।'

এক বছর ধরে কবিতাটি মুখস্থ করার পর ব্রাহ্মণ বারাণসীতে ফিরে এলেন। বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'বাছা, এখন আমি কবিতাটি নির্ভুল বলতে পারি।' বোধিসত্ত্ব তখন তাঁকে রাজসভায় নিয়ে গেলেন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ব্রাহ্মণটি কে সোমদত্ত?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ইনি আমার পিতা মহারাজ।' রাজা জানতে চাইলেন, 'উনি কি চান?' ব্রাহ্মণ তখন সেই কবিতাটি মুখস্থ বলতে লাগলেন। যদিও শব্দ উল্টো-পাল্টা হওয়ায় তার মানে দাঁড়াল এই :

'মহারাজ, আমি দুটো গোরু নিয়ে চাষ করতাম। হঠাৎ একটা গোরু মারা গেল। আপনার কাছে করজোড়ে মিনতি করছি, জোড়ার বাকিটি আপনি নিন।'

রাজা বুঝলেন ব্রাহ্মণ পদ্য ওলোট পালোট করে ফেলেছেন। তখন তিনি বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি সোমদত্ত, তোমাদের কি অনেক গোরু?' এর জবাবে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, যদি আমাকে দিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই অনেক গোরু আছে।' বোধিসত্ত্বের জবাবে রাজা খুব খুশি হলেন। ব্রাহ্মণকে শুধু গোরু নয়, নিষ্কর জমিও দিলেন।



কূটবাণিজ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবাব বারাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তেব রাজ্যে বিচারক ছিলেন। তখন বাজ্যে এক গ্রামবাসীর সঙ্গে এক নগরবাসীর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাবা দুজনেই বণিক। গ্রামবাসী বণিক নগববাসী বণিকের কাছে পাঁচশটি লাঙ্গলেব ফলা জমা রেখেছিল। নগববাসী বণিক ঐ ফলাগুলো বেমালুম বিক্রি করে দিল। তাবপব যেখানে লাঙ্গলের ফলাগুলো বেখেছিল সেখানে ইঁদুবেব মল-মূত্র ছড়িয়ে বাখল।

একদিন গ্রামবাসী বণিক এসে বলল, 'ভাই, এবার আমাব ফলা-গুলো দাও তো।' ফন্দিবাজ বন্ধুটি তখন বলল, 'ভাই, দুঃখেব কথা আর কি বলব, তোমাব ফলাগুলো সব ইঁদুরে খেযে ফেলেছে।' তাবপব গ্রামবাসী বণিককে প্রমাণ দেখাবাব জন্যে যেখানে ফলাগুলো ছিল সেখানে নিয়ে গেল। মুখ শুকনো করে বলল, 'বিশ্বাস না হয এই দেখ ইঁদুবেব কাণ্ড, ফলাগুলো তো খেযেইছে, উল্টে জাযগাটা পর্যন্ত নষ্ট কবে রেখে গেছে।'

তখন গ্রামবাসী বণিক বলল, 'যাক গে ছাড়, ইঁদুরে খেলে কি আব করা যাবে।' তাবপব স্নান কবতে যাবে বলে সে নগববাসী বন্ধুব ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নদীতে গেল। নদীর কাছাকাছি বাস্তায





আরেক বন্ধুর বাড়িতে ঢুকে ছেলেটাকে ভেতরের ঘরে রেখে দরজায় শিকল তুলে দিল। ঐ বন্ধুকে বলল, 'দেখ, ছেলেটা যেন কোথাও যেতে না পারে।' তারপর স্নান সেরে ফিরে এল। নগরবাসী বণিক তখন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার ছেলেটাকে কোথায় রেখে এলে ভাই?'

'খুবই দুঃখের কথা ভাই।'

'দুঃখের কি আছে?'

'তোমার ছেলেটাকে চিলে নিয়ে গেছে।'

'অত বড় একটা ছেলেকে চিলে নেয় কি করে?'

'বিশ্বাস না হলে কি বলব। আমি কত চিৎকার করলাম, ধরতে গেলাম। কিন্তু চিলটা তাকে নিয়ে চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেল।'

'অসম্ভব। তুমি মিথ্যে কথা বলছ। চিলে ছেলে নিতে পারে কখনও?'

'পারে না বলেই জানতুম। কিন্তু অসম্ভব যদি ঘটেই তখন আমরা আর কি করতে পারি বল।'

নগরবাসী বণিক তখন গ্রামবাসী বণিককে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ দিতে লাগল। আর বলল, 'আমি এক্ষুনি বিচারপতির কাছে যাচ্ছি। আর শোন বদমায়েশ, তোকেও সেখানে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাব।' এই বলে সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। গ্রামবাসী বণিকও তার পিছু পিছু চলল।



নগরবাসী বণিক বোধিসত্ত্বের কাছে গিয়ে নালিশ জানাল, 'ধর্মাবতার! এই বদমায়েশ বণিক আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে স্নান করতে গিয়েছিল। তারপর ফিরে এসে বলছে আমার ছেলেকে নাকি চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে। আপনি এর বিচার করুন।'

বোধিসত্ত্ব তখন গ্রামবাসী বণিককে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে বণিক, আসল ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বল তো?'

গ্রামবাসী বণিক বলল, 'হ্যাঁ ধর্মাবতার, সত্যি এরকম একটা অসম্ভব ব্যাপার ঘটেছে।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'চিলে তো আব একটা ছেলেকে নিয়ে যেতে পাবে না। এ কথা কেউ কখনও শোনে নি।'

গ্রামবাসী বণিক বলল, 'বেশ, তাহলে আপনি বলুন, ইঁদুব এসে লাঙ্গলেব লোহাব ফলা খেয়ে নিয়েছে, এমন কথা কেউ শুনেছে কখনও?'

বোধিসত্ত্ব তখন অনুরোধ কবলেন, 'একটু খুলে বল পুবো ব্যাপাবটা।'

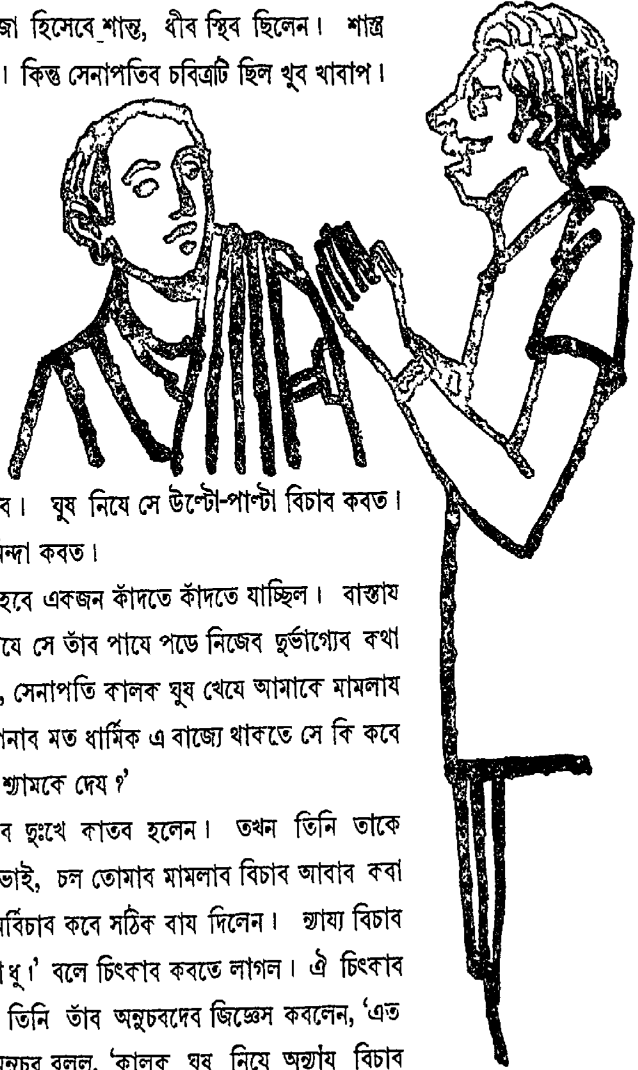
সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বোধিসত্ত্ব বেশ মজা পেলেন। শঠে শাঠ্যং নীতি ব্যবহাব কবেছে গ্রামবাসী বণিক। তাবপব বোধিসত্ত্ব বিচাব কবে বললেন, 'লাঙ্গলেব ফলাব দাম তুমি চুকিয়ে দাও, আব তুমি ওব্ ছেলেটাকে এনে দাও।'



ধর্মধ্বজ জাতক

একদা বারাণসীতে যশঃপানি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর সেনাপতির নাম ছিল কালক। বোধিসত্ত্ব ছিলেন সেই রাজার পুরোহিত। তাঁকে 'ধর্মধ্বজ' বলে ডাকা হত। আর ছত্রপানি নামে এক কারিগর মুকুট-পোষাক ইত্যাদি বানাত।

যশঃপানি নিজে রাজা হিসেবে শান্ত, ধীর স্থির ছিলেন। শাস্ত্র মেনে রাজ্য চালাতেন। কিন্তু সেনাপতির চরিত্রটি ছিল খুব খারাপ।



সে ছিল দারুণ ঘুষখোর। ঘুষ নিয়ে সে উল্টো-পাল্টা বিচার করত। তাছাড়া আড়ালে পরনিন্দা করত।

একদিন মামলায় হেরে একজন কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিল। রাস্তায় বোধিসত্ত্বকে দেখতে পেয়ে সে তাঁর পায়ে পড়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা জানাল। বলল, 'প্রভু, সেনাপতি কালক ঘুষ খেয়ে আমাকে মামলায় হারিয়ে দিয়েছে। আপনার মত ধার্মিক এ রাজ্যে থাকতে সে কি করে ঘুষ খেয়ে রামের টাকা শ্যামকে দেয়?'

বোধিসত্ত্ব লোকটির দুঃখে কাতর হলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, 'ঠিক আছে ভাই, চল তোমার মামলার বিচার আবার করা হবে।' বোধিসত্ত্ব পুনর্বিচার করে সঠিক রায় দিলেন। ন্যায্য বিচার পেয়ে সবাই 'সাধু! সাধু!' বলে চিৎকার করতে লাগল। ঐ চিৎকার রাজার কানে এল। তিনি তাঁর অনুচরদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এত চিৎকার কিসের?' অনুচর বলল, 'কালক ঘুষ নিয়ে অন্যায় বিচার

করেছিল, রাজপুরোহিত পুনরায় বিচার করে রায় দিয়েছেন। তাঁর সুবিচারে সবাই খুশি হয়েছে।'

রাজা এই খবর জানার পর বোধিসত্ত্বকেই বিচারক পদে নিয়োগ করলেন। বোধিসত্ত্বের সুবিচারে রাজ্যময় তাঁর জয়জয়কার পড়ে গেল। সেনাপতি কালক তখন হিংসেয় কাতর হয়ে রাজার কাছে রোজই বোধিসত্ত্বের নামে মিথ্যে অপবাদ দিতে লাগল। রাজা প্রথমটায় তার কথা বিশ্বাস করতেন না। একদিন সে রাজাকে বলল, 'ধর্মধ্বজ এখন জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে রাজা হওয়ার চক্রান্ত করছে।' রাজা এ কথাও বিশ্বাস করলেন না। কালক তখন বলল, 'ঠিক আছে, ধর্মধ্বজ যখন বিচার করতে আসে আপনি তখন একদিন জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাবেন। দেখবেন গোটা রাজ্য তার বশীভূত।'

রাজা একদিন সত্যিই জানলা দিয়ে ধর্মধ্বজের আসার পথে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন, সবাই তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।



'সেনাপতি, এখন উপায়?'

'একে হত্যা করুন মহারাজ।'

'বিনা দোষে প্রাণদণ্ড দেওয়া যায় না।'

'আমি রাস্তা বলে দিচ্ছি।'



'কি রাস্তা?'

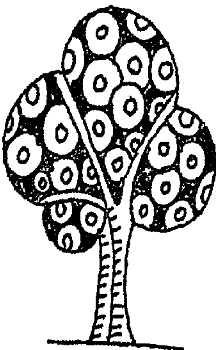
'ওঁকে কোন অসাধ্য কাজ করতে বলুন।'

'তারপর?'

'না পারলে প্রাণদণ্ড দিন।'

'দেখ কালক, ওঁর অসাধ্য কোন কাজ নেই।'

'উর্বর জমিতে গাছ লাগালেও দু-চার বছরের আগে ফল জন্মায় না। পুরোহিতকে ডেকে বলুন, কালই একটা নতুন বাগান চাই। যদি বানাতে না পারে প্রাণ যাবে।'



তখন রাজা বোধিসত্ত্বকে খবর পাঠালেন। বোধিসত্ত্ব এলে বললেন, 'পণ্ডিত, রোজই পুরনো বাগানে বেড়াই, কাল আমি একটা নতুন বাগানে বেড়াতে চাই। তুমি আমার জন্য কাল একটা নতুন বাগান বানাবে। না পারলে কিন্তু তোমার প্রাণ যাবে।' এই অদ্ভুত



আদেশ শুনে বোধিসত্ত্ব বুঝলেন কালকেব পবামর্শেই বাজা এ কাজ কবেছেন। তিনি বাজাকে বললেন, 'মহাবাজ, আমাব সাধ্যে কুলোলে নিশ্চযই কবব।'

বাড়ি ফিবে এসে বোধিসত্ত্ব নিশ্চিন্ত মনে খাবাব খেলেন। তাবপব শুযে শুযে ভাবতে লাগলেন, এবপব কি কবা যায। বোধিসত্ত্বেব বিপদে স্বর্গে শক্র বিচলিত হল। সে আকাশপথে বোধিসত্ত্বেব সামনে এসে বলল, 'পণ্ডিত, কি ভাবছ?'

'আপনি কে প্রভু?'

'আমি শক্র।'

'বাজা আজ বাতেব মধ্যে আমাকে নতুন একটা বাগান বানাতে বলেছেন, তাই ভাবছি।'



'চিন্তা না কবে ঘুমোও। কাল বাগান তৈবি হযে যাবে।'

পবেব দিন বাগান দেখে বোধিসত্ত্ব বাজাকে গিযে বললেন, 'মহাবাজ, বাগান তৈবি, আপনি সেখানে বেড়াতে যেতে পাবেন।' অতীব চমৎকাব সেই বাগান দেখে বাজা একদিকে মুগ্ধ হলেন, অন্যদিকে তাঁব মন খাবাপ হযে গেল। কালকেব সঙ্গে পবামর্শ করে ঠিক কবলেন, আবেকটা অসম্ভব কাজ ওঁকে দেওযা যাক। তখন আবার বোধিসত্ত্বকে বলা হল এক বাতেব মধ্যে সাতবত্নমযী পুকুর বানাতে হবে ঐ বাগানে। শক্র তাও কবে দিল। তখন আদেশ হল 'বাগানেব উপযুক্ত একটি বাড়ি বানাতে হবে।'



এভাবে কোন কিছুতেই যখন বোধিসত্ত্বকে নোযানো গেল না, তখন কালক অনেক ভেবে বাজাকে বলল, 'মহাবাজ, ধর্মধ্বজকে দেবতাবা সাহায্য কবেছেন বলেই সে সব কবে দিতে পাবছে। তাই তাকে এমন কাজ দিতে হবে যা দেবতাবাও কবতে পাবেন না।'

'এ বকম কাজ তুমি কিছু জান?'

'জানি মহাবাজ।'

'কি কাজ?'

'হিংসা, বাগ, ক্রোধ ও স্নেহ জয কবেছে এমন মানুষ, যে নেশার উর্ধ্বে—আপনি বলুন চতুর্গুণধাবী এবকম একজন মালী না হলে



অত সুন্দর বাগান ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে।'

রাজা পুরোহিতকে ডেকে তাই বললেন। না পারলে এবার তাঁর প্রাণ যাবে। বোধিসত্ত্ব জানতেন, এ কাজ শক্রর পক্ষেও সম্ভব নয়। তাই তিনি গৃহত্যাগ করে বনে গেলেন। শক্র বনে এল। সব শুনে বলল, 'একথা ঠিক, এতদিন যা-যা আদেশ হয়েছে তা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু এখনকার আদেশ পালন করা আমার সাধ্যের বাইরে। তবে আমি তোমাকে একজনের খোঁজ দিতে পারি যে চতুর্গুণধারী, আর সে থাকে তোমাদের রাজ্যেই। তার নাম ছত্রপানি।'

বোধিসত্ত্ব তখন ছত্রপানির কাছে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তো চতুর্গুণধারী?' ছত্রপানি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি করে জানলেন?' বোধিসত্ত্ব তখন রাজার আদেশ ও শক্রর ব্যাপার খুলে বললেন। পরে ছত্রপানিকে নিয়ে রাজার সামনে হাজির করিয়ে বললেন, 'মহারাজ, এই লোকটি চতুর্গুণধারী।'

বাজা তখন ছত্রপানিকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'বেশ, তুমি তাহলে হিংসামুক্ত। কিন্তু বল দেখি, কি দেখে তুমি হিংসামুক্ত হলে ?'

ছত্রপানি বলল, 'আগেব জন্মে আমি বাজা ছিলাম, হিংসায নিজেব পণ্ডিত পুবোহিতকে মাবতে গিযেছিলাম। তখন ঐ সাধু পণ্ডিত তত্ত্ব জ্ঞান দিযে আমাব মনকে শান্ত কবেন। তাবপব থেকে আমি হিংসা ত্যাগ কবি।'

বাজা আবাব জিজ্ঞেস কবলেন, 'মদ ছাড়লে কেন ?'

ছত্রপানি বলল, 'বাজা থাকাকালীন আমি বোজ মদ খেতাম। সঙ্গে থাকত মাংস। একবাব বুদ্ধ পূর্ণিমাব দিনে, ঐ দিন পশু হত্যা নিষিদ্ধ বলে বাঁধুনি মাংস বাঁধতে পাবে নি। সে মাংস ছাডা খেতে দিযেছিল। আমি বললাম, মাংস নেই কেন ? সে বলল, আজ পশু-হত্যা নিষিদ্ধ। তখন আমি চূডান্ত মাতাল। সামনে আমাব ছেলে ছিল। তাব ঘাড মটকে বললাম, 'এই নাও, মাংস বেঁধে আন এবাব।' সেই মাংস খেযে যম ঘুম দিলাম। পবেব দিন সকালে যখন ছেলেব খোঁজ কবছি তখন বাণী হাপুস নযনে কাঁদতে লাগল। সব কিছু শুনে সেদিনই মদ খাওযা ছেড়ে দিলাম।'



রাজা তখন জিজ্ঞেস কবলেন, 'স্নেহ জয করলে কিভাবে ?'

ছত্রপানি বলল, 'বাজা হিসাবে পবে আমি পঞ্চশীল মেনে চলতাম, দান-ধ্যান করতাম। ধর্মপথে থাকতাম। তবু অকালে আমার ছেলে মাবা গেল। ছেলেব শোকে খুব কাতব হযে পডলাম। কিন্তু পরে বিচাব কবে বুঝলাম স্নেহ থেকে এই শোক আসছে। আমাব ছেলে অধর্ম কবেছিল বলে মাবা যায। তবু আমি তার শোক ভুলতে পাবছিলাম না। তখন স্নেহ ত্যাগ করে শোককে জয করি।'

রাজাব শেষ প্রশ্ন, 'ক্রোধ জয করলে কিভাবে ?'

ছত্রপানি বলল, 'আগেব এক জন্মে আমি অবক নামে জন্মগ্রহণ কবি। তখন সতেব বছব শুধু মৈত্রী ধ্যান কবেছি। তাতেই আমি ক্রোধহীন হই।

সব শুনে বাজা তাঁব অনুচবদেব ইশারা কবলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাবা কালককে পিটিযে মেবে ফেলল।

তিলমুষ্টি জাতক

বাজা ব্রহ্মদত্ত তাঁব ছেলে ব্রহ্মদত্তকুমাবকে লেখাপডা শেখাব জন্য তক্ষশিলায পাঠালেন। তখনকাব কালে বাজাবা ছেলেদেব লেখাপডা শেখানোব জন্য দূব দেশে পাঠাতেন। কাবণ তাতে সে লোকচবিত্র বোঝাব সুযোগ পাবে, আব কিছুটা কষ্টসহিষ্ণুও হবে। পবে বাজা হলে তাব ওঁইসব সৎ গুণ খুব কাজে লাগবে বলে মনে কবা হতো।

বাজা তো ব্রহ্মদত্তকুমাবকে এক হাজাব টাকা দিযে গুরুগৃহে পাঠালেন। ব্রহ্মদত্তকুমাব যথাসমযে গুরুব কাছে পৌঁছে তাঁকে প্রণাম কবল। আচার্য জিজ্ঞাসা কবলেন, 'বাছা, তুমি কোত্থেকে আসছ?'

'বাবাণসী থেকে প্রভু।'

'তুমি কাব ছেলে?'

'বাবাণসী বাজেব।'





'কি জন্যে এসেছ ?'

'আপনার কাছে লেখাপড়া শিখতে।'

'তুমি কি গুরুদক্ষিণা দিয়ে শিখবে, না কি গুরুশুশ্রূষা করে শিখবে ?'

'গুরুদেব, আমি দক্ষিণা এনেছি।'

তখন দু রকমভাবে গুরুগৃহে বিদ্যা-শিক্ষার পদ্ধতি ছিল। হয় গুরুকে প্রণামী অর্থ দিতে হতোনা হলে গুরুগৃহের নানারকম কাজ করে দিতে হতো। যারা প্রণামী দিয়ে শিখত, গুরুরা তাদের নিজের ছেলে মনে করে বিশেষ যত্ন নিতেন।

যাই হোক, ব্রহ্মদত্তকুমার আচার্যের সহায়তায় বিদ্যার্চর্চা করে চলল। শুভদিন, শুভযোগ দেখে আচার্য তাকে নতুন নতুন পাঠ দিতেন। একদিন ব্রহ্মদত্তকুমার আচার্যের সঙ্গে স্নান করতে যাচ্ছিল। রাস্তায় এক বৃদ্ধা তিলের শাঁস শুকোচ্ছিল। কুমার এক মুঠো শাঁস তুলে মুখে দিল। সেদিন বৃদ্ধা কিছুই বলল না। সে ভাবল বেচারার হয়ত খুব খিদে পেয়েছে। এক মুঠো খেলে আর কি-ই বা ক্ষতি হবে। কুমার তার পরের দিনও এক মুঠো তুলে নিল। এমন কি তৃতীয় দিনেও সে যখন একমুঠো শাঁস তুলে নিল তখন বৃদ্ধা চিৎকার করে রাস্তার লোকদের বলল, 'ভাই, দেখে যাও, এই বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁর শিষ্যদের দিয়ে আমার সর্বস্ব লুট করাচ্ছে।'

এ কথা শুনে আচার্য ফিরে এসে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে মা ?'

'দেখুন পণ্ডিত, আমি এখানে তিল শাঁস শুকোতে দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, তা দেখতে পাচ্ছি।'

'আপনার ছাত্র এখান থেকে পর পর তিন দিন তিন মুঠো তুলে খেল।'

'কেঁদো না মা, তোমার তিলের দাম দিয়ে দিচ্ছি।'

'না, বাবা দাম চাই না, শিষ্যকে এমন শিক্ষা দিন যাতে ভবিষ্যতে এ রকম আর না করে।'

'বেশ, তাই দিচ্ছি।'



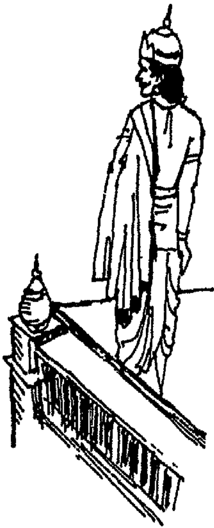
তাবপব আচার্য দুজন শিষ্যকে বললেন ব্রহ্মদত্তকুমাবেব হাত ধরতে। তাবা ওর হাত ধরলে আচার্য লাঠি দিয়ে তিনবার তার পিঠে মাবলেন। কুমাব আচার্যের দিকে বক্তচক্ষু মেলে তাকাল শুধু। আচার্য বুঝলেন কুমাব তাঁব ওপব খুবই বেগে গেছে।

যাই হোক, কুমাব এবপব একদিন বিদ্যাচর্চা শেষ কবল। আচার্যের মাবেব কথা কিন্তু তখনও তাব হৃদযে গেঁথে আছে। সে প্রতিজ্ঞা কবেছিল, বাজা হওযাব পর এই আচার্যকে হত্যা কববে। বাবাণসী ফিরে যাওযাব সময হলে সে আচার্যকে প্রণাম কবল। যাওয়ার সময বলে গেল, 'গুরুদেব, আমি বাজপদ পেলে আপনাকে নিতে লোক পাঠাব, অনুগ্রহ কবে তখন পাযেব ধুলো দেবেন।' আচার্য কুমাবেব শ্রদ্ধা দেখে যেতে বাজি হলেন।

বাবাণসীতে ফিবে গিযে কুমাব বাজা ও বাণীব কাছে জানাল সে কত কি শিখেছে। কিছুদিন পবে রাজা বললেন, 'বাছা, আমাব বযস হযেছে। তুমিও শাস্ত্র শিখেছ। এ আমাব সৌভাগ্য। আমি চাই আমি থাকতে থাকতেই তুমি বাজা হও।' এবপর কুমার বাজা হল।

বাজা হওযাব পবও কুমাব কিন্তু অতীতেব বাগ ভুলতে পাবে নি। অতীতেব সেই মাবেব কথা যখনই মনে পডত, মাথায বক্ত উঠে যেত। আচার্যকে হত্যা করাব সিদ্ধান্ত নিযে সে লোক পাঠাল তাঁকে আনতে।

আচার্য সব বুঝে ভাবলেন কুমাবের বযস এখনও কম, তাই তাব বাগে জল ঢালা যাবে না। আবও কিছুদিন যাক, তাবপব যাব।' এভাবে তিন-চাব বাব তিনি নিমন্ত্রণ ফিবিযে দিলেন। একসময ব্রহ্মদত্ত-কুমাবেব বাজত্বেব অর্ধেক কাল কেটে গেল। আচার্য তখন ভাবলেন 'এবাব একবাব যাওযা যেতে পাবে।'



বাজদ্বাবে পৌঁছে আচার্য খবব পাঠালেন, 'মহারাজকে বল তাঁব আচার্য এসেছেন।' সংবাদ শুনে বাজা সঙ্গে সঙ্গে এক ব্রাহ্মণকে পাঠালেন আচার্যকে সঙ্গে কবে নিযে আসাব জন্য।

আচার্যকে দেখেই বাজাব বাগ আবাব উসকে উঠল। বক্তচক্ষু ঘুবিযে সভাসদদেব বললেন, 'দেখ, এই আচার্য আমার শরীবেব যেখানে বেত মেবেছিলেন আজও সেখানে ব্যথা অনুভব কবি। এঁর



কপালে নির্ঘাৎ মৃত্যু আছে। কপালে মৃত্যু আছে বলেই ইনি আজ এসেছেন।'

আচার্য শান্তভাবে সব শুনে একটি পদ্য আবৃত্তি করলেন। তার মর্মার্থ হল : অন্যায় আচরণকারীকে দমন করার জন্যই রাজারা দণ্ড দেন। এটা রাগ বা অভিমানের ব্যাপার নয়। তাহলেই শাসন হয়।

তারপর ব্যাখ্যা করে বললেন, 'মহারাজ, সেদিন যদি আমি আপনাকে বেত্রাঘাত না করতাম, আস্তে আস্তে আপনি একজন চোর হতেন। বরং আমি বলব সেদিনের ঐ আঘাত আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। আপনি সৎ পথে চলেছেন। যার ফলে আপনার পক্ষে এই রাজসম্মান লাভ সম্ভব হয়েছে।'

কুমার আচার্যের যুক্তি অনুধাবন করতে পারল। সে তখন বারবার ক্ষমা চাইল। আচার্যকে সপরিবারে তক্ষশিলা থেকে তুলে এনে নিজের রাজ্যে সমাদরে রাখল।



সৈন্ধব জাতক

বোধিসত্ত্ব একবাব উত্তবাপথে এক বণিককুলে জন্মান। উত্তবাপথ থেকে সেকালে পাঁচশ ঘোডার ব্যবসাযী বারাণসীতে গিযে ঘোড়া বিক্রি কবত।

একবাব এক ঘোডাব ব্যবসাযী পাঁচশ ঘোড়া নিযে বাবাণসী যাচ্ছিল। বাবাণসীব কাছাকাছি এলে একটা হাট দেখা গেল। অতীতে সেখানে বাস কবত এক বিবাট বণিক। তাব প্রাসাদ ছিল দেখাব মত। কিন্তু যখনকাব কথা হচ্ছে তখন তাব বংশ প্রায লোপ পেযেছে। শুধু এক বৃদ্ধা বেঁচে আছে। সে ঐ প্রাসাদে থাকত। ঘোডার ব্যবসাযী এসে ঐ প্রাসাদেব দু-তিনটে ঘব ভাড়া নিল। সেদিন বাতেই তাব এক আজানেয ঘোডাব বাচ্চা হল। ব্যবসাযী ওখানে দু-তিন দিন থেকে গেল। তাবপব সে বাজাব সঙ্গে দেখা কবতে যাবে বলে তৈবি হল। বৃদ্ধা তখন এসে ভাডা চাইল। ব্যবসায়ী ভাড়া দিতে গেলে বৃদ্ধা বলল, 'তোমাব ঐ ঘোডাব বাচ্চাটা আমাকে দাও, ভাডা থেকে দামটা কেটে নিও।'

বৃদ্ধাব কাছে ঘোডাটি খুব আদবযত্নে বড় হতে লাগল। কিছু দিন পবে বোধিসত্ত্ব পাঁচশ ঘোডা নিযে বাবাণসী যাচ্ছিলেন। যাওয়াব পথে তিনি ঐ বাড়িতে দু-তিন দিন থাকবেন ভাবলেন। কিন্তু তাব ঘোডাগুলো কিছুতেই ঐ বাডিব মধ্যে ঢুকতে চায না। আজানেয



ঘোডাব গন্ধই এব কাবণ। বোধিসত্ত্ব তখন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'মা, এখানে কোন ঘোডা থাকে কি?'

'হ্যাঁ বাছা, একটা বাচ্চা ঘোডা থাকে।'

'সে কোথায়?'

'চডতে গেছে বাবা।'

'কখন ফিববে?'

'এই ফিবল বলে।'

বোধিসত্ত্ব নিজেব ঘোডাগুলোকে বাইবে বেখে অপেক্ষা কবতে লাগলেন। মনে মনে চিন্তা কবে স্থিব কবলেন, সুলক্ষণযুক্ত এই ঘোড়াটিকে বৃদ্ধাব কাছ থেকে ন্যায্য দামে কিনতে হবে। কিছুক্ষণ পবে ঘোডাটি চবে ফিবে এল। সে ঘবে ঢোকাব পব বোধিসত্ত্বেব ঘোডাগুলো আপনা থেকেই ঢুকে পডল। দু-চাব দিন থেকে চলে যাওযাব আগে বোধিসত্ত্ব বৃদ্ধাকে বললেন, 'মা, আপনাকে আমি দাম দিচ্ছি, ঘোডাব বাচ্চাটা আমায দিন।'

'সে কি বাবা। কেউ কি ছেলে বিক্রি কবে?'

'আপনি একে কি খাওযান?'

'ঘাস, ভাত, আব ক্ষুদেব দাউ।'

'আমি একে অনেক ভালো ভালো খাবাব খাওযাব। অনেক সুন্দব জাযগায বাখব। এবাব বলুন।'

'যদি তা হয, তাহলে নিতে পাব।'

বোধিসত্ত্ব ঘোডাব চাব পাযেব আলাদা দাম ধরলেন। লেজ ও মুখেব দাম ধবলেন। সব মিলিযে ষাট হাজাব টাকা তিনি বৃদ্ধাকে দিলেন। তাবপব বৃদ্ধাকে নতুন পোশাক পবিযে ঘোডাটিব সামনে দাঁড করালেন। ঘোড়াটি একবাব বৃদ্ধাব চোখেব দিকে তাকিযে ঝব ঝব কবে কেঁদে ফেলল। বৃদ্ধা তখন ঘোড়াটিব পিঠে হাত বুলিযে বললেন, 'বাছা, আমি অনেকদিন তোকে যা পেবেছি খাইযে বড কবেছি। এবাব তুই এই বণিকেব সঙ্গে যা।'

পবেব দিন বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'পবীক্ষা কবে দেখা যাক এই



আজানেয অশ্ব নিজের শক্তিব ব্যাপাবটা জানে কিনা।' তিনি ঘোড়াটিব জন্য খাবার বানিয়ে বাঁশের টুকরির মধ্যে রাখলেন। ঘোড়া কিন্তু সে খাবার মুখে তুলল না। বোধিসত্ত্ব তখন তাকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'এতদিন অপবেব এঁটোকাটা খেয়েছ, আব এখন এই খাবার মুখে নিতে চাইছ না, ব্যাপাবটা কি?' শুনে ঘোড়া বলল, 'যেখানে আমার জাত কেউ জানে না সেখানে যা দেবে খাব। কিন্তু যেখানে জানে সেখানে তা খেতে পারব না।'

যাই হোক বোধিসত্ত্ব এরপর ওকে রাজদ্বারে নিয়ে এলেন। রাজা





ঐ ঘোড়াটি দেখে পছন্দ কবলেন। জানতে চাইলেন, 'এ কেমন ছুটবে?' বোধিসত্ত্ব তখন ঘোড়াব পিঠে বসে নিমেষের মধ্যে ধুলোব ঝড় তুললেন। তারপব ঘোড়াব পেটে লাল কাপড় বেঁধে ছোটালেন। লোকে শুধু লাল কাপড়টা দেখতে পেল। ঘোড়াকে তিনি জলের ওপব দিযে ছোটালেন, পদ্মপাতাব ওপব দিযে ছোটালেন।

অবশেষে তিনি ঘোড়াব পিঠ থেকে নেমে নিজেব হাতের তালু ছড়িয়ে তুড়ি দিলেন। ঘোড়া চাব পা জোড়া কবে বোধিসত্ত্বের হাতে উঠে এল। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহাবাজ, এই ঘোড়াব বেগ দেখানোব মত জায়গা এ পৃথিবীতে নেই।' রাজা এরপব অর্ধেক বাজত্ব দিযে ঘোড়াটি কিনে নিলেন। তাকে মঙ্গলাশ্ব করলেন।

মান্ধাতৃ জাতক ৫৬

পুবাকালে মহাসম্মত নামে এক বাজা ছিলেন। মহাসম্মতেব ছেলে বোজ। বোজেব ছেলে বববোজ। বববোজেব ছেলে কল্যাণ। কল্যাণেব ছেলে বরকল্যাণ। তাবপব উপষোধ-পোষধ। পোষধেব ছেলে হল মান্ধাতা।

মান্ধাতা তপস্যায় সিদ্ধি লাভ কবেছিল। সে দু হাতে তালি দিয়ে আকাশ থেকে বত্নবৃষ্টি কবাতে পাবত। মান্ধাতাব ছেলেবেলা চলে চুবাশি হাজাব বছব। চুবাশি হাজাব বছব সে যুববাজ ছিল, আব বাজচক্রবর্তী হিসেবে কাটায় আবও চুবাশি হাজাব বছব। ফলে তাব আয়ুব কোন হিসেব ছিল না। যেজন্য তাকে বলা হত 'অসংখ্যেয-পবিমিত জীবন।'

এবকম অলৌকিক ও আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন হওয়া সত্বেও মান্ধাতাব মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিল। সে হঠাৎ লোভ-লালসাব দ্বারা আক্রান্ত হল। শান্ত, ধীব ও স্থিব মান্ধাতাব মধ্যে তখন দেখা দিল অস্থিবতা। অমাত্যবা জিজ্ঞেস কবল, 'প্রভু, আপনাকে উতলা দেখাচ্ছে কেন?'

'দেখ, আমার পুণ্যবলের তুলনায় এ বাজ্যের আয়তন খুবই কম।'

'যথার্থ প্রভু।'

'বল দেখি কোন্ জাযগা সব চেয়ে সুন্দর?'

'দেবলোক, মহারাজ।'





মান্ধাতা তখন রথ সাজিয়ে অনুচরদেব সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে হাজির হল। দেবতাবা তাকে সমাদবে স্বর্গে আমন্ত্রণ কবল। মান্ধাতাকে স্বর্গবাজ্য দান কবল। মান্ধাতা সপাবিষদ সুদীর্ঘকাল সেখানে বাজত্ব কবল। কিন্তু তার লালসা-তৃষ্ণা দূব হল না। মান্ধাতাকে আবার অস্থির দেখাতে লাগল। অমাত্যরা জিজ্ঞেস কবলে মান্ধাতা বলল, 'আচ্ছা, এখানেব থেকেও বমণীয় কোন জায়গা আছে কি ?'

'দেবলোকেব সর্বোচ্চ স্থানই সেই জায়গা, প্রভু।'

আবার বথ সাজানো হল। সেখানে দেববাজ শক্র অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে নিযে মান্ধাতাকে ববণ কবতে এলেন। মান্ধাতাকে শক্র অর্ধেক বাজত্ব দিলেন।

শক্র তিন কোটি ষাট লক্ষ বছব বাঁচাব পব গত হলেন। জন্মাল আরেকজন শক্র। তিনিও দেবরাজ্য শাসন করে লোকান্তরিত হলেন। এভাবে পরপব ছত্রিশ জন শক্রেব জন্ম ও মৃত্যু হল। মান্ধাতা এদেব সবাইকে অতিক্রম করে বেঁচে রইলেন ও দেববাজ্যের অর্ধেক শাসন কবে চললেন। শেষে মান্ধাতার মনে হল, 'স্বর্গের আধখানা পেযে লাভ কি ? শক্রকে শেষ কবে পুরো স্বর্গ দখল করাই ঠিক।' কিন্তু শক্রকে হত্যা কবা তার সাধ্যে কুলোল না।



লালসা তৃষ্ণা তবু তাকে ছাড়ে নি। মান্ধাতার আয়ু তৃষ্ণায় ক্ষীণ হতে লাগল। শরীরে জরা দেখা দিল। এখন সমস্যা হল, স্বর্গে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে না, সেজন্য মান্ধাতা স্বর্গচ্যুত হল। তার শরীর মর্ত্যের এক বাগানে এসে পড়ল।

বাগানের মালি তখন দৌড়ে রাজার কাছে গিয়ে জানাল, 'মান্ধাতা এসেছেন।' রাজবংশের সকলে এল তার সঙ্গে দেখা করতে। বাগানে মান্ধাতার বিছানার ব্যবস্থা করা হল। মান্ধাতার তখন আর ওঠার শক্তিটুকুও নেই।

অমাত্যরা তখন প্রশ্ন করল, 'প্রভু, আমাদের কিছু বলবেন কি?' জবাবে মান্ধাতা বলল, 'জনসাধারণকে আমার হয়ে শুধু এই কথা কটি বোলো। দু হাজার দ্বীপের অধিপতি, রাজচক্রবর্তী যে মান্ধাতা স্বর্গে পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল, ছত্রিশ জন শক্রর জীবনকাল ব্যাপী যে স্বর্গে শাসন করেছিল, সে আজ মৃত্যুমুখে পতিত।'



দূত জাতক

সে অনেক কাল আগেকার কথা। বোধিসত্ত্ব জন্মেছেন বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্তের ছেলে হয়ে। বড় হয়ে যথারীতি তিনি তক্ষশিলায় যান। সেখানে আচার্যের কাছে পড়াশুনো শেষ করে ফিরে এলেন। যথাসময়ে তিনি রাজা হলেন। ব্রহ্মদত্ত তখন আর বেঁচে নেই।

রাজা হওয়ার পর বোধিসত্ত্ব খুব ভোজনবিলাসী হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর নাম হয় 'ভোজন শুদ্ধিক রাজা।' লোকে বলত, বোধিসত্ত্বের একেক খাবারের পেছনে বিস্তর খরচ হতো। প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ হতো এক বেলার খাবার বানাতে।



বোধিসত্ত্ব বাড়ির ভেতরে বসে খেতেন না। রাজদ্বারে রত্নমণ্ডপ তৈরি করা হয়েছিল। আহারের সময় মণ্ডপটি যত্ন করে সাজান হতো। মাথার ওপর থাকত শ্বেতচ্ছত্র। খেতে বসতেন সোনার পালঙ্কে। আর তাকে ঘিরে থাকত ক্ষত্রিয় বংশজাত মেয়েরা। যে থালায় তিনি খেতেন তাও ছিল অতি দুর্মূল্য—লক্ষ টাকা দামের সোনার থালা।

জনসমক্ষে বোধিসত্ত্বের এভাবে আহারের পিছনে একটি উদ্দেশ্য





ছিল। আর তা হল জনসাধারণের পুণ্যবৃদ্ধি। ঐ দেশের লোকেদের মধ্যে তখন এ রকম একটি ধারণা প্রচলিত ছিল, রাজাকে আহার করতে দেখলে পুণ্য হয়।

ঐ দেশে এক মহালোভী ছিল। রাজার ভোজনের এই ঘটা, রান্নার সুগন্ধ, এইসবে সে বেসামাল হয়ে পড়ল। তার দারুণ ইচ্ছে হল রাজার খাবারে ভাগ বসাতে। শেষে সে এক ফন্দি বের করল। একদিন রাজা যখন আহার করছিলেন সে তখন ভিড়ের ভেতর থেকে দু হাত তুলে 'আমি দূত', 'আমি দূত' বলে চিৎকার করতে করতে রাজার দিকে ছুটে গেল।

ঐ দেশের প্রথা অনুসারে কেউ নিজেকে দূত বললে তাকে আটকানো হত না। তাই লোকজন-সেপাই-মন্ত্রী দু পাশে সরে গিয়ে তাকে যাওয়ার রাস্তা করে দিল। সে ছুটে গিয়ে রাজার খাবারের থালা থেকে এক গাল ভাত তুলে মুখে দিল। সৈন্যরা তখন অস্ত্র হাতে ছুটে এল, 'এক্ষুনি এর মাথা কেটে ফেলব।'

বোধিসত্ত্ব হাত তুলে বললেন, 'মেরো না।'

তারপর মহালোভীকে বললেন, 'ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্তে খাও।'

রাজা সে সময় নিজে হাত গুটিয়ে বসে রইলেন। লোকটা

পেটপুরে খেল। বোধিসত্ত্বের নির্দেশে তাকে আবার সুগন্ধি জল আর পান দেওয়া হল। সে খেয়েদেয়ে সুস্থ হয়ে বসল।

এবার বোধিসত্ত্ব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাছা, তুমি বলেছিলে তুমি নাকি দূত। তা তুমি কার দূত হে?'

সে বলল, 'মহারাজ, আমি খিদে তেষ্টার দূত। তারাই আমাকে বলেছে তুমি রাজার কাছে যাও।'

বোধিসত্ত্ব তার কথা শুনে বললেন, 'এ যা বলল তা খুবই সত্যি। প্রাণীমাত্রই উদরের দূত। তারা তেষ্টার জ্বালায় পানীয় খুঁজে বেড়ায়। খিদে-তেষ্টাই তাদের পরিচালক। আর এই জিনিসটা কত সহজে লোকটা দেখিয়ে দিল। ইনি মহাপুরুষ। এমন অসাধারণ কথা, এমন সত্যি কথা আমি এর আগে কখনো শুনিনি।' এরপর বোধিসত্ত্ব লোকটিকে খুব যত্নআত্তি করলেন।



মৃদুপাণি জাতক

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের প্রথম রাণীর গর্ভে ছেলে হয়ে জন্মান। ষোল বছর বয়সের মধ্যে তক্ষশিলার এক আচার্যের কাছ থেকে তিনি সব রকম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ফিরে এলেন। কালক্রমে পিতার যখন মৃত্যু হল তখন বোধিসত্ত্ব সিংহাসনে বসলেন। বারাণসীর রাজা হলেন।

বোধিসত্ত্বের পরমা সুন্দরী এক কন্যা হয়। রাজ-অন্তঃপুরে ঐ কন্যার প্রায় সমবয়স্ক এক ভাগনে ভাই ছিল। বোধিসত্ত্ব সেই ভাগ্নেকে খুব স্নেহ করতেন। একদিন মন্ত্রী ও সভাসদদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে বললেন, 'আমার তো ছেলে নেই। ভাগ্নেই আমার ছেলের মত। আমি ভেবেছি, আমার মেয়ের সঙ্গে ভাগ্নের বিয়ে দেব। আর আমার মৃত্যুর পর সে-ই রাজা হবে।'

কিছুদিন পরে মেয়ে আর ভাগ্নে দুজনেই বড় হয়ে উঠল। তখন বোধিসত্ত্বের চিন্তায় কিছু রদবদল ঘটল। তিনি আবার রাজসভা ডাকলেন। মেয়ের বিয়ে, ভবিষ্যতে কে রাজা হবে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা চলল। বোধিসত্ত্ব এবার বললেন, 'ভাবছি ভাগ্নেকে অন্য জায়গায় বিয়ে দেব, মেয়ের জন্যও অন্য পাত্র খুঁজব। এতে কুটুম্বের সংখ্যা বাড়বে। রাজবংশ বৃদ্ধি পাবে।' সভাসদরাও ভেবে



দেখল আগের চেয়ে এই প্রস্তাবটিই বেশি ভালো। তাই তারাও এতে রাজি হল।

বোধিসত্ত্ব তখন ভাগ্নের জন্য অন্তঃপুরের বাইরে একটা ঘরের ব্যবস্থা করলেন। এবার থেকে ভাগ্নে সেখানেই থাকবে। সে আর অন্তঃপুরে ঢুকতে পারবে না, এই আদেশ দিলেন রাজা।

এদিকে রাজার কন্যা ও ভাগ্নের মধ্যে গভীর প্রণয় জন্মেছিল। তাদের পক্ষে আলাদা থাকা প্রায় অসম্ভব। ভাগ্নে ভাবল, 'দেখি যদি কোনভাবে রাজকুমারীকে অন্তঃপুরের বাইরে আনতে পারি। একটা রাস্তা আছে।' এই ভেবে সে দাই-মাকে ডেকে পাঠাল। তাকে অনেক টাকাপয়সা ঘুষ দিল।

দাই-মা জিজ্ঞেস করল, 'কুমার, আমাকে দিয়ে কি করাতে চাও?'

কুমার বলল, 'রাজকুমারীকে অন্তঃপুরের বাইরে আনতে হবে।'

দাই-মা বলল, 'রাজকুমারীকে কি ব্যাপারটা জানাব?'

কুমার বলল, 'জানাও।'

দাই-মা একদিন রাজকুমারীকে ডেকে বলল, 'এসো মা, তোমার চুল আঁচড়ে দিই।' আঁচড়াতে আঁচড়াতে দাইমা রাজকুমারীর গালে একটু সুড়সুড়ি দিল। কুমারের সঙ্গে খেলার সময় ঠিক এভাবে কুমার সুড়সুড়ি দিত। ফলে রাজকুমারী বুঝতে পারল কুমারের কোন খবর আছে নিশ্চয়ই।

রাজকুমারী দাই-মাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কুমারের কাছে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ মা।'

'সে কি কিছু বলেছে?'

'জানতে চেয়েছে কিভাবে তোমাকে অন্তঃপুরের বাইরে আনা যায়?'

'আমি একটা পদ্য বলছি।'

'বেশ।'

'বুদ্ধিমান হলে সে এই পদ্যের মানে ঠিক বুঝতে পারবে।'

এই বলে রাজকুমারী পদ্যটি দাই-মাকে শোনাল। দাই-মা বারবার



আবৃত্তি করল। তখন রাজকুমারী বলল, 'ঠিক আছে।' দাই-মা বলল, 'আরেকবার শুনে দেখ তো ঠিক বলছি কিনা।'

'নরম হাত
নিপুণ গজ
আঁধার রাত
বৃষ্টিতে কাজ।'

দাই-মা ফিরে গেলে কুমার জিজ্ঞেস করল, 'রাজকুমারী কি বলল?' দাই-মা বলল, 'দেখ কুমার, সে আমাকে একটা পদ্য শিখিয়ে দিয়েছে। বলেছে পদ্যটা তোমাকে বলতে।' এই বলে দাই-মা পদ্যটি আবৃত্তি করল। শুনেই কুমার বুঝতে পারল রাজকুমারীর ইঙ্গিত। দাই-মাকে বলল, 'ঠিক আছে মা, তুমি এসো।'

এরপর কুমারের প্রথম কাজ হল এমন এক বালককে খুঁজে বের করা যার হাতটি খুবই কোমল হবে। বালকটিকে সে নিজের চাকর করল। তাকে এমনভাবে তৈরি করতে লাগল যাতে সে কাজ হাসিল করতে পারে। নিপুণ গজ খুঁজতে কুমারকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। মঙ্গলহস্তীর মাহুতকে ঘুষ দিয়ে বশে আনল। তারপর সে অপেক্ষা করতে লাগল। সঠিক দিনক্ষণ না আসা পর্যন্ত তো অপেক্ষা করতেই হবে।

তারপর একদিন অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাতে সে তৈরি হল। কিন্তু বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সে যেতে পারে না। মাঝ রাতে সত্যি বৃষ্টি শুরু হল। কুমার তখন মঙ্গলহস্তীর পিঠে চড়ে সেই বালক ভৃত্যকে সঙ্গে দিয়ে রাজ-অন্তঃপুরের পাঁচিলের সামনে গেল। সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব মেয়েকে কড়া পাহারায় রেখেছিলেন। মেয়েকে অন্য ঘরে শুতে না দিয়ে নিজের ঘরেই শুইয়ে রাখতেন। ওদিকে রাজকুমারী মাঝ রাত হতেই বুঝল কুমার এতক্ষণে এসে গেছে। বাবাকে সে বলল, 'বাবা, বড্ড গরম লাগছে, আমি স্নান করব।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ঠিক আছে চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি।' তারপর পাঁচিলের পাশে সরোবরের পথের ওপর মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিলেন, কিন্তু তার

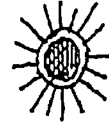


একটা হাত ধরে রইলেন। মেয়ে তখন অন্য হাতটা কুমারের দিকে এগিয়ে দিল। কুমার সেই হাত থেকে সোনার গয়না খুলে বাচ্চা চাকরটার হাতে পরিয়ে দিল, তারপর ছেলেটাকে আস্তে আস্তে পথের ওপর নামিয়ে দিল। রাজকুমারী তখন বাবাকে ঐ বালকের হাতটা দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। এবার সে দ্বিতীয় হাতটি থেকে সমস্ত গয়না খুলে বালকটির হাতে পরিয়ে দিল। তারপর হাতির পিঠে চড়ে পালিয়ে গেল। মেয়ের স্নান হলে বোধিসত্ত্ব তাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। অন্ধকারে গয়নার শব্দে তিনি ভাবলেন মেয়েকে নিয়েই ফিরে যাচ্ছেন। ভোরে তাঁর ভুল ভাঙল। এ থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করলেন: রমণীরা অরক্ষণীয়া। তাদের বন্দী করে রাখা যায় না।





কুরুধর্ম জাতক



পুবাকালে ইন্দ্রপ্রস্থে বাজত্ব কবতেন ধনঞ্জয়। বোধিসত্ত্ব তাব প্রথম ছেলে হযে জন্মান। তক্ষশিলায বিদ্যালাভ, পবে যুববাজ হওযা ইত্যাদিব পব বাবা মাবা গেলে বোধিসত্ত্ব বাজা হলেন। বোধিসত্ত্ব দশ বকমেব বাজধর্ম পালন কবতেন। যথেষ্ট নিষ্ঠাব সঙ্গে তিনি কুরুধর্মও পালন কবতেন। কুরুধর্ম পালন বলতে চবিত্রেব পাঁচটি দিক বজায বাখা বোঝায। বোধিসত্ত্ব, তাঁব মা, ছোট ভাই, পুবোহিত, খাজনা মাপাব সবকাব, সাবথি, বণিক, জমিব মাপ-জোককাবী ও নগব-সুন্দবী—সকলেই কুরুধর্ম পালন কবতেন।



বোধিসত্ত্ব নিজ নগবেব চাবটি প্রবেশপথে চাবটি এবং প্রাসাদেব মধ্যে ছটি, মোট দশটি দানশালা গড়ে তোলেন। বোজ ছ লাখ টাকা এখানে দান কবা হত। তাঁব এই বিপুল দান দেখে গোটা জম্বুদ্বীপ মুগ্ধ হযে গিযেছিল। জম্বুদ্বীপেব আনাচে-কানাচে তাঁব দানেব প্রভাব টেব পাওযা যেত।

তখন কলিঙ্গেব দন্তপুব নগবে বাজত্ব কবছিলেন কলিঙ্গবাজ। একবাব সেখানে সাংঘাতিক খবা দেখা দিল। অনাবৃষ্টিতে বাজ্য জুড়ে আকাল দেখা দিল। দেশেব লোক তিনটি ভযে ভীত হল :

১ খাবাব শেষ হযে যাবে।

২ পানীয জল ফুবিযে যাবে।

৩ মহামাবী দেখা দেবে।

দেশেব লোক এই ঘোব বিপদে বাজাব শবণাপন্ন হল। খিদেব জ্বালায আর্তনাদ কবতে কবতে ছেলেমেযেব হাত ধবে তাবা দন্তপুবে গেল। বাজদ্বাবে সে এক বিপুল জনসমুদ্র।

জানলা দিযে বাজা দুর্দশাগ্রস্থ প্রজাদেব দেখলেন। তাবপব মন্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'এবা আর্তনাদ কবছে কেন?'

মন্ত্রী বলল, 'দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিযেছে মহাবাজ।'

'কেন?'

'বৃষ্টি হযনি বলে।'



'এখন উপায ?'

'যাতে বৃষ্টি হয সেই ব্যবস্থা কবতে হবে।'

'আগেকাব বাজাবা এক্ষেত্রে কি কবত ?'

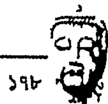
'দান-ধ্যান কবত। এক সপ্তাহ বাজশয্যায না শুয়ে কুশেব বিছানায শুযে থাকত। তাবপব বৃষ্টি হতো।'

'ঠিক আছে, আমিও তাই করব।'

রাজা সব কিছু ঠিকঠাক করলেন। তবু বৃষ্টি হল না। বাজা তখন আবাব মন্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'দেখ, সবই তো করলাম, কিন্তু কোথায় বৃষ্টি। এখন কি কবা যায ?'

'ইন্দ্রপ্রস্থেব বাজা ধনঞ্জয়েব আঞ্জন নামে এক মঙ্গলহস্তী আছে। তাকে নিযে এলে বৃষ্টি হবে।'

'সেই বাজা খুবই শক্তিশালী। কি করে তোমরা তাঁর হাতি আনবে ?'



'মহাবাজ, হাতি আনাব জন্য যুদ্ধ করতে হবে না।'

'তাহলে কি কবে আনবে?'

'তিনি খুবই দানশীল। তাঁব কাছে যে কেউ যে কোন জিনিস চাইলেই তিনি দিয়ে দেন। তিনি শুধু দানেই আসক্ত।'

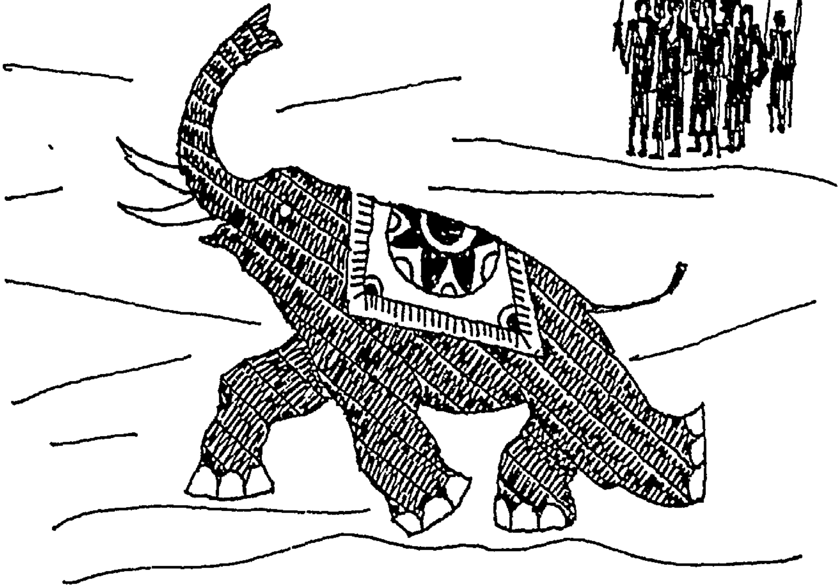
'কে তাঁব কাছে মঙ্গলহস্তী ভিক্ষা কববে?'

'কেন মহাবাজ, আমাদেব ব্রাহ্মণবা কববে।'

বাজা তখন ব্রাহ্মণদেব গ্রামে খবব দিয়ে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আনালেন। তাদেব আদব আপ্যায়ন কবে, পথ খবচা দিয়ে মঙ্গলহস্তী আনতে পাঠালেন। কয়েক দিন কোথাও না থেমে তাবা একসময় ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছল। দানশালাব কাছে এসে তাবা সমস্বরে বলে উঠল, 'মহাবাজেব জয় হোক।'

বোধিসত্ত্ব তখন মঙ্গলহস্তীব পিঠ থেকে নেমে এসে তাদেব জিজ্ঞেস কবলেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ, আপনাবা কি চান?' ব্রাহ্মণবা তখন তাঁকে একটি পদ্য শোনাল। পদ্যটিব সাবমর্ম হল:

'জনশ্রুতি বলে তুমি মহা ধার্মিক। প্রার্থনাকাবী কখনও তোমাব কাছ থেকে খালি হাতে ফিবে গিয়েছে এবকম ঘটে নি। আমরা



এসেছি সুদূর কলিঙ্গ থেকে। অনেক কষ্ট হয়েছে আসতে। খরচও হয়েছে প্রচুর। তোমার কাছে আমাদের প্রার্থনা, মঙ্গলহস্তীটি আমাদের দাও।'

বোধিসত্ত্ব তাদের আশ্বস্ত করলেন, 'মঙ্গলহস্তীর জন্য আপনারা যে কষ্ট করছেন, যত টাকা খরচ করেছেন, তার কোনটাই বিফলে যাবে না। মঙ্গলহস্তীকে সোনার সজ্জায় সাজিয়ে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।' বোধিসত্ত্ব তারপর মঙ্গলহস্তীর কোন অঙ্গ আচরণহীন কিনা খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর তিনবার হাতিকে প্রদক্ষিণ করলেন। সবশেষে ব্রাহ্মণদের হাতে হাতির শুঁড়টা তুলে দিলেন, আরেক হাতে সোনার কলস থেকে সুগন্ধী জল ঢালতে লাগলেন। এভাবে দান-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল।

দুঃখের বিষয় মঙ্গলহস্তী আসার পরও কলিঙ্গরাজের ত্রিসীমানায় এক ফোঁটা বৃষ্টি হল না। রাজা আবার মন্ত্রী, সভাসদ ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন, 'এখন কি হবে? মঙ্গলহস্তী আসা সত্ত্বেও বৃষ্টি হল না কেন?' মন্ত্রী ও সভাসদরা তখন বলল, 'মহারাজ, ধনঞ্জয় কুরুধর্ম পালন করেন, তাই তাঁর রাজ্যে যথাসময়ে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি হয় রাজার গুণেই। হাতি তো একটা পশু মাত্র। তার গুণে কি করে বৃষ্টি হবে?' এ কথা শুনে কলিঙ্গরাজ বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে হাতি ফেরৎ দিয়ে এস, আর ভালভাবে জেনে এস, কি করে কুরুধর্ম পালন করতে হয়।' 'যথা আজ্ঞা' বলে অমাত্যরা রওনা দিল।

কুরুরাজের কাছে গিয়ে মঙ্গলহস্তী ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'মহারাজ, মঙ্গলহস্তীকে নিয়ে গিয়েও আমাদের কোন উপকার হয় নি। এক ফোঁটা বৃষ্টি হল না। লোকমুখে শুনেছি আপনি কুরুধর্ম পালন করেন। আমাদের রাজাও এখন কুরুধর্ম পালনে উৎসাহী। রাজা আমাদের পাঠিয়েছেন আপনার কাছ থেকে কুরুধর্ম বিষয়ে সব কিছু জেনে তা লিখে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখন আপনি আমাদের কুরুধর্ম কি তা ব্যাখ্যা করে বলুন।'



বোধিসত্ত্ব বললেন, 'দেখ, এককালে আমি কুরুধর্ম পালন করতাম ঠিকই। তবে মনে সংশয় ঢুকেছে আমি হয়ত যথাযথভাবে তা



পালন করতে পারি নি। মনে হয় আমার হৃদয়ে কুরুধর্মের আসন টলে গেছে। এই অবস্থায় আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় কুরুধর্ম কি।'

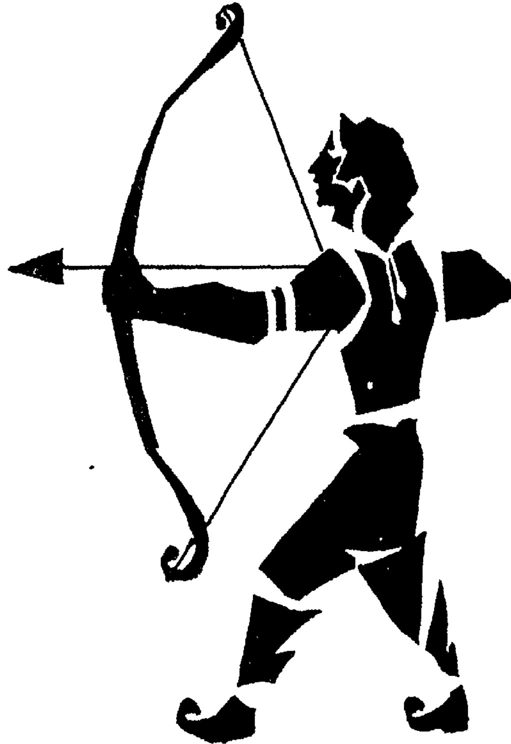
তারপর তিনি একটি ঘটনার কথা বললেন ঃ



মহাবাজ ধনঞ্জযেব কি ঘটেছিল

সেকালে প্রতি তিন বছর অন্তব কার্তিক মাসে একটি উৎসব হত। তাকে 'কার্তিকোৎসব' বলা হত। ঐ উৎসবে যোগ দেওয়ার সময় রাজাবা দেবতাব মত সাজতেন। তারপব তাঁবা যেতেন 'চিত্রবাজ' নামে এক যক্ষেব সামনে। সামনে থেকে যক্ষেব চাবদিকে চিত্রবিচিত্র চাবটি পুষ্প-শব ছুঁড়তেন। ধনঞ্জয় একবাব কার্তিকোৎসবে যোগ দিযে এ বকম চাবটি তীব ছোঁড়েন। একটি তীব পুকুবেব জলে পড়েছিল। সেই তীবটি আব পাওয়া গেল না। তখন বাজার মনে হল তীবটি কোন মাছেব শবীবে লেগেছে। এই সন্দেহ থেকে বাজাব মনে ভয ঢুকল, তিনি ঘাতক হলেন না তো।

কলিঙ্গ দূতদেব কাছে ঘটনাটিব বিববণ দিযে বাজা বললেন, 'তাই আমি কুরুধর্ম পালন কবি কিনা সে বিষযে যোব সন্দেহ দেখা দিযেছে।'





কলিঙ্গবাসীরা বলল, 'কিন্তু মহারাজ, আপনি তো প্রাণীহত্যা করার সংকল্প করেন নি। সংকল্প না থাকলে তো অপরাধ হতে পারে না। আপনি যে কুরুধর্ম পালন করেন তাই আমাদের বলুন। আমরা লিখে নেব।' তারপর রাজা বলে চললেন, কলিঙ্গবাসীরা লিখে নিতে থাকল।

'কাউকে হত্যা কোরো না। দান না করলে সে জিনিস নেবে না। মিথ্যে কথা, মিথ্যা আচরণ করবে না।' এই পর্যন্ত বলার পর রাজা বললেন, 'হয়ত এই সবগুলিই আমার আছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই। তোমরা আমার মার কাছে যাও।'

কলিঙ্গ দূতরা এবার রাজমাতার কাছে গেল। শুনে রাজমাতা বললেন, 'দেখ বাছারা, আমি কুরুধর্ম পালন করতাম ঠিকই, তবে ইদানিং আমারও মনে সংশয় দেখা দিয়েছে, হয়ত আমি ঠিক ভাবে কুরুধর্ম পালন করতে পারি নি।'

রাজমাতা তারপর যে কাহিনীটি বললেন তা হল :

একবার এক রাজা বোধিসত্ত্বকে লক্ষ টাকা দামের চন্দনসার আর হাজার টাকা দামের কাঞ্চনমালা উপহার পাঠিয়েছিল। রাজা সেসব রাজমাতাকে দিয়ে দেন। রাজমাতা আবার তা ছেলের বৌ-দের দিয়ে দিলেন। কিন্তু দেওয়ার সময় তিনি রাজমহিষী, বড়ছেলের বৌ-কে দিলেন হাজার টাকা দামের জিনিসটি। আর ছোট ছেলের বৌ-কে দিলেন লাখ টাকা দামের চন্দনসার। তিনি ভেবে-

ছিলেন ছোট ছেলের বৌ তত বড়লোক নয়, তাই দামী জিনিসটা তাকে দেওয়াটা ঠিক। পরে রাজমাতার মনে হয় বৌ-দের মধ্যে কার অবস্থা ভালো, কার অবস্থা খারাপ সেসব দেখার তার কি দরকার ছিল। কুরুধর্ম অনুসারে বড় বৌ-র সম্মানরক্ষাই তাঁর উচিত ছিল। এরপর থেকে রাজমাতা ভাবতে শুরু করেন যে, তিনি কুরুধর্ম থেকে চ্যুত হয়েছেন। কলিঙ্গ দূতরা সব শুনে বলল, এতে ধর্মচ্যুতি হয়নি। রাজমাতা তখন কুরুধর্ম সম্পর্কে তাদের দু-চার কথা বললেন। তারা সেসব লিখে নিল। কিন্তু রাজমাতা শেষে বললেন, 'কুরুধর্ম পালন করে আমার বড় বৌ। তোমরা তাঁর কাছে যাও।'



রাজমহিষীও কিন্তু একই কথা বললেন, 'আমি নিজের চরিত্রে খুশি নই। সেক্ষেত্রে তোমাদের কি ধর্মকথা শোনাব।' তারপর রাজমহিষী জানালেন, তাঁর মনে একবার খারাপ ইচ্ছে জেগেছিল। শুনে দূতরা বলল, 'তাতে কি? আপনি তো আর ইচ্ছেটাকে কাজে লাগান নি।' যাই হোক রাজমহিষী তারপর কুরুধর্ম সম্পর্কে দু-চার কথা বলে দূতদের বললেন, 'তোমরা আমার দেওরের কাছে যাও।'



রাজার ভাই শোনালেন আরেক কাহিনী। রাজকুমার রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় একটা নিশানা রেখে যেতেন বাইরে। তা দেখে উপরাজের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসত তারা বুঝতে পারত, উপরাজ সেদিন বাইরে আসবেন কিনা। নিশানা দেখে যদি বুঝত বাইরে আসবেন তাহলে তারা রথের কাছেই অপেক্ষা করত। একদিন উপরাজ রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পর প্রবল বৃষ্টি নামে। সে রাতে সে রাজার কাছেই থেকে যায়। অথচ বাইরে নিশানা ছিল বেরিয়ে আসার। লোক তার জন্য সারা রাত বৃষ্টিতে ভিজে অপেক্ষা করেছে। এরপর উপরাজের ধারণা হয় সে কুরুধর্ম ঠিক ভাবে পালন করতে পারছে না।

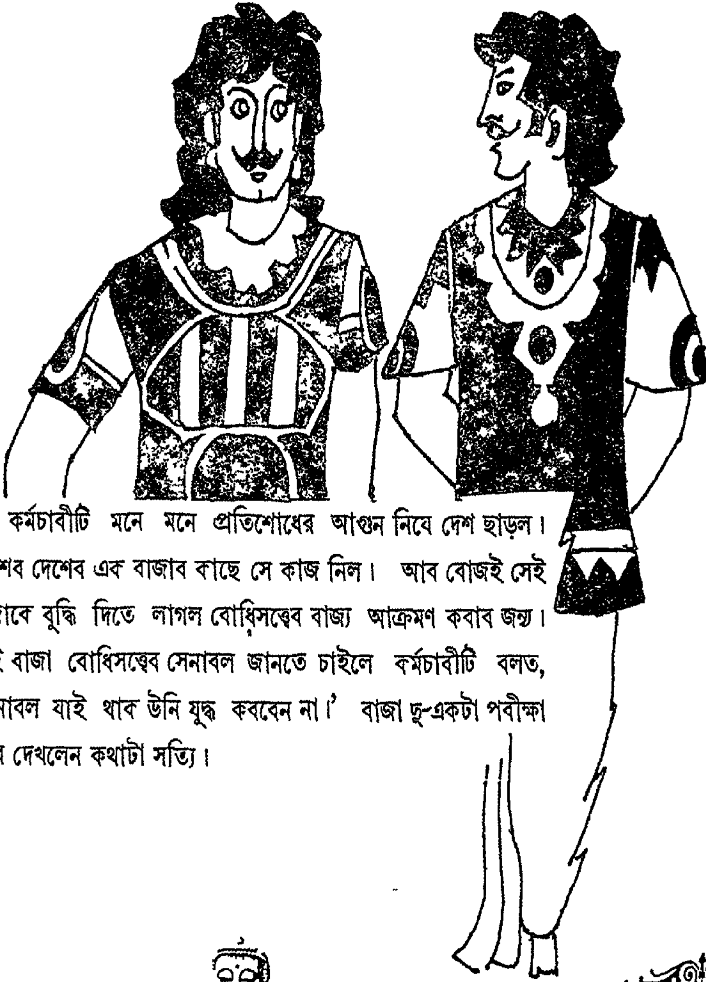
এভাবে কলিঙ্গ দূতরা রাজপুরোহিত, অমাত্য, সারথি, শ্রেষ্ঠী—সকলের সঙ্গে দেখা করল একে একে। সকলেই অপরের কথা বলল। সকলেই বলল, তারা সঠিকভাবে কুরুধর্ম পালন করতে পারে নি। এভাবে এগারো জনের কাছে ধর্মকথা শুনে তারা দন্তপুরে ফিরে এল। কলিঙ্গরাজকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল। রাজাও কুরুধর্ম পালন করতে শুরু করলে দেশে বৃষ্টি শুরু হল। দেশ আবার শস্যশ্যামলা হল।



শ্রেয়ো জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার ব্রহ্মদত্তের কুমার হিসাবে জন্ম নেন। যথাসময়ে লেখাপড়া, অস্ত্রচর্চা সমস্তই আয়ত্ত করলেন। ব্রহ্মদত্তের মৃত্যুর পর তিনি রাজা হলেন। সযত্নে রাজধর্ম পালন করতে লাগলেন।

একবার বোধিসত্ত্বের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এক গর্হিত কাজ করে। বোধিসত্ত্বের কানে কথাটা গেল। তখন তিনি ভালো করে খোঁজখবর নিলেন। দেখলেন অভিযোগটা সত্যি। তখন কর্মচারীকে দেশ থেকে নির্বাসন দিলেন।



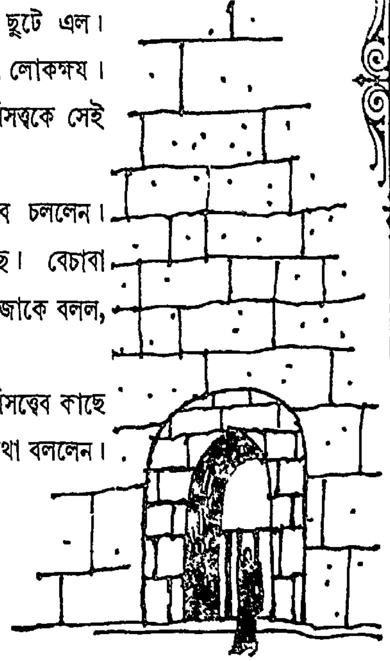
কর্মচারীটি মনে মনে প্রতিশোধের আগুন নিয়ে দেশ ছাড়ল। পাশের দেশের এক রাজার কাছে সে কাজ নিল। আর রোজই সেই রাজাকে বুদ্ধি দিতে লাগল বোধিসত্ত্বের রাজ্য আক্রমণ করার জন্য। সেই রাজা বোধিসত্ত্বের সেনাবল জানতে চাইলে কর্মচারীটি বলত, 'সেনাবল যাই থাক উনি যুদ্ধ করবেন না।' রাজা দু-একটা পরীক্ষা করে দেখলেন কথাটা সত্যি।



একদিন তিনি সত্যি সত্যি বোধিসত্ত্বের রাজ্য আক্রমণ করলেন। বোধিসত্ত্ব সভাসদদের কাছে খবরটা পেলেন। সেনাপতি ছুটে এল। কিন্তু রাজা যুদ্ধ করতে বারণ করলেন। যুদ্ধ মানেই মৃত্যু, লোকক্ষয়। বোধিসত্ত্ব তা চান না। ফল যা হবার তাই হল। বোধিসত্ত্বকে সেই রাজা বন্দী করে কয়েদখানায় রাখল।

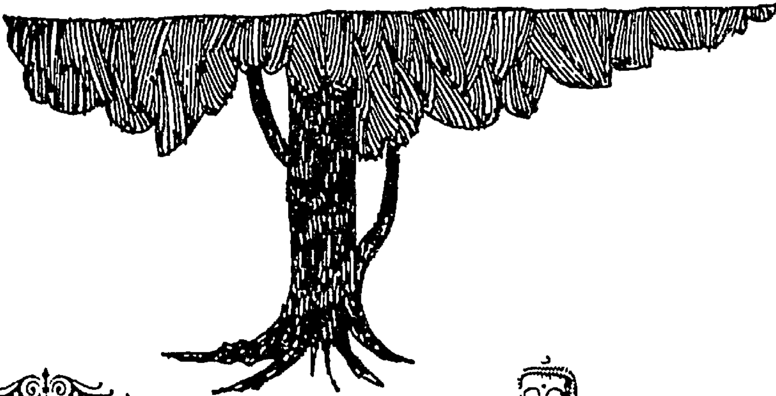
বোধিসত্ত্ব কিন্তু সেখানে বসেও মৈত্রীর কথা ভেবে চললেন। হঠাৎ দেখা গেল সেই রাজার শরীর আগুনে জ্বলে যাচ্ছে। বেচারা যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল। রাজার এক অনুচর রাজাকে বলল, 'ধার্মিক রাজাকে আক্রমণ করাতেই হয়ত ওটা হচ্ছে।'

রাজা তখন কয়েদখানার দরজা খুলে দিলেন। বোধিসত্ত্বের কাছে মাফ চাইলেন। বোধিসত্ত্ব তাকে মৈত্রী সম্পর্কে দু-চার কথা বললেন। যুদ্ধ ত্যাগ করতে বললেন।



বর্ধকি শূকর জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার বৃক্ষ দেবতারূপে জন্ম নেন। বারাণসীর কাছে তখন ছুতোরদের একটি গ্রাম ছিল। এক ছুতোর একবার বনে কাঠ কাটতে গিয়ে দেখল একটা শুয়োর গর্তে পড়ে আছে। ছুতোরের



একটু মাযা হল। সে শুয়োরটাকে বাড়িতে নিযে এল। ছুতোবের বাড়িতে ভালমন্দ খেয়ে শুযোরেব দশাসই চেহাবা হল।

ছুতোবেব কাজকর্মে শুযোবটা সাহায্য কবত। মুখে করে কাঠ বযে আনত। যন্ত্রপাতি এগিযে দিত। শুযোবেব অত সুন্দব চেহাবা দেখে ছুতোব ভাবল লোকালযে থাকলে যে কেউ একদিন শুযোবটাকে জবাই কবে ফেলতে পাবে, তাব চেযে বরং বনেব জীবকে বনেই ছেড়ে দিযে আসি। যেমন ভাবা তেমনি কাজ।

বনেব মধ্যে নিজের পছন্দমত একটা জাযগা খুঁজতে লাগল সেই বিশাল শুযোর। এমন সময এক পাল শুযোবেব সঙ্গে তার দেখা হযে গেল।



নবাগত শুযোব অন্য শুযোরদেব দেখে বলল, 'এত সুন্দর জাযগা। খাবাবেব অভাব নেই। তবু তোমাদেব শবীবে মাংস নেই কেন?'

'এখানে একটা বাঘ আছে।'

'তাতে কি?'

'সে এসে বোজ একটা কবে শুযোব মেবে ফেলে।'

'তোমরা এতগুলো শুযোব একটা বাঘেব সঙ্গে পাব না?'

'আমাদেব গাযে অত জোব নেই।'

'আচ্ছা আমি দেখছি।'



নবাগত শুয়োর অন্যদের একটা ব্যাপারে রাজি করাল। তারা তার কথামত চলবে। এবার রোজ সে শুয়োরদের যুদ্ধকৌশল শেখানো শুরু করল। চারদিক দেখেশুনে ঠিক করে ফেলল কোন জায়গায় বাঘের সঙ্গে লড়াই হবে। শুয়োররা কোথায় থাকবে। কিভাবে লড়বে। শক্তিশালী শুয়োরদের সামনে রেখে সে বেশ শক্ত একটা দেয়াল খাড়া করল। সামনে বিশাল গর্ত খুঁড়ে রাখল সবাই মিলে।

সব কাজ যখন শেষ হল তখন সূর্য উঠেছে। বাঘ দেখল শুয়োররা আজ ভয় পাচ্ছে না। সে কটমট করে তাকাল। নবাগত শুয়োর অন্য শুয়োরদের বলল, 'তোমরাও ঐ ভাবে তাকাও।' শুয়োররাও বাঘকে রক্তচক্ষু দেখাল। বাঘ গর্জন করল। শুয়োররাও সবাই একসঙ্গে গর্জন করল।

বাঘ এতে একটু ঘাবড়ে গেল। ঐ বনে এক বদমায়েশ সাধু থাকত। বাঘ তাকে শিকারের ভাগ দিত। বাঘ সাধুর কাছে গিয়ে বলল, 'প্রভু, শুয়োররা আজ আমাকেই ভয় দেখাচ্ছে।' সাধু বলল,



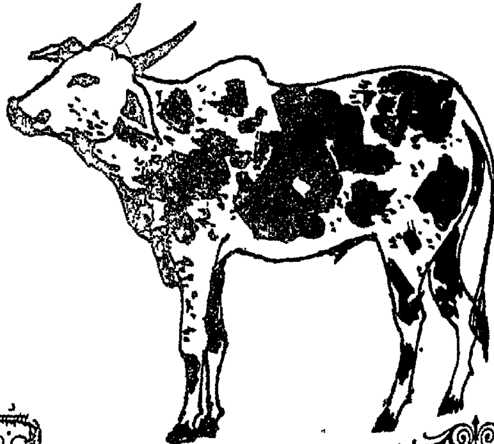
'তোমার চোখের ভুল। তুমি হলে পশুদের সেরা। তুমি একবার আক্রমণ করলেই ওরা ভয়ে পালাবে।'

বাঘ মনে জোব এনে লাফ দিল শুযোরের পালেব ওপর। শুয়োবেব পাল সামান্য সবে গেল। বাঘ পড়ল গর্তে। তারপব আব কি। সব শুযোর মিলে গোত্তা মেবেই বাঘকে শেষ করল। নবাগত শুযোব অবশ্য এতেই রণে ভঙ্গ দিল না। সে বলল, 'চল, দুষ্ট সাধুটাকেও শেষ কবি।' সাধুটাব যে কি হাল হয়েছিল তা নিশ্চয়ই আব বলার দবকাব নেই।

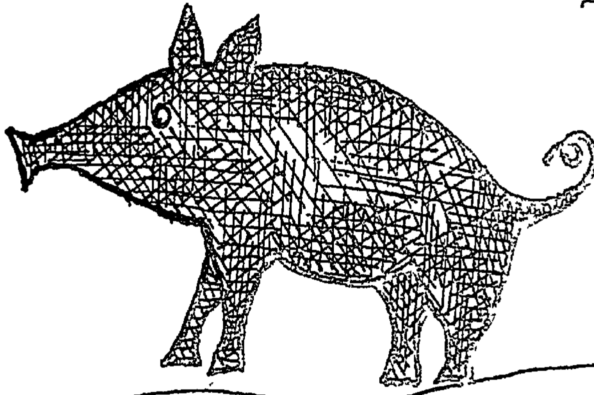


শালুক জাতক

বোধিসত্ত্ব একবাব গোরু হযে জন্মান। তখন তাঁব নাম হয মহালোহিত। তাঁব ছোট ভাইযেব নাম ছিল চুল্ললোহিত। তাঁবা থাকতেন এক গেবস্থেব বাড়িতে। ঐ গেবস্থেব একটি বিবাহ-যোগ্যা মেযে ছিল। এক সময গেবস্থেব মেয়েব বিয়ে পাকা হল।





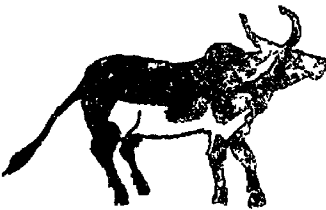


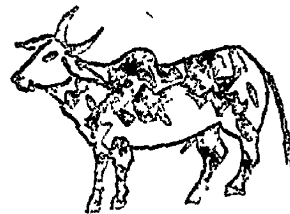
গেবস্থেব বাড়িতে শালুক নামে একটা শুযোব ছিল। শুযোবটা ছিল বেশ মোটাসোটা। গেবস্থ ঠিক কবল বিযেব দিন ঐ শুযোবটাকে মেবে ববযাত্রীদেব খাওযাবে। যাতে শুযোব আবও মোটা হয সেজন্য গেবস্থ তাকে ভালোমন্দ খেতে দিতে লাগল।

চুল্ললোহিত শুযোবেব খাবাবেব ঘটা দেখে তাব দাদাকে বলল, 'দাদা, আমবা দুজনে এই গেবস্থেব কত কাজ কবছি। আমবা আছি বলে গেবস্থ খেতে পাচ্ছে। এই শুযোবটা তাব কোন কাজই লাগে না। অথচ ও আমাদেব কখনও ভালমন্দ খেতে দেয় না। এদিকে দেখ শুযোবটাকে কত যত্ন কবে খাওযাচ্ছে।'

শুনে মহালোহিত বললেন, 'ভাই, তুমি তো জান না গেবস্থ শুযোবকে কেন যত্ন কবছে। ওব দিন ফুবিযে এসেছে। বিযেব দিন গেবস্থ একে জবাই কববে। সেজন্যই ওকে মোটা বানাচ্ছে। শুযোবটাকে হিংসে কোবো না।'

দিন কযেক পবে বিযেব দিন এসে গেল। শুযোবটাকে সেদিন সত্যিই জবাই কবা হল। চুল্ললোহিত সব দেখেশুনে বলল, 'আমাদেব ভুসিই বেঁচে থাক, কি বল দাদা।'





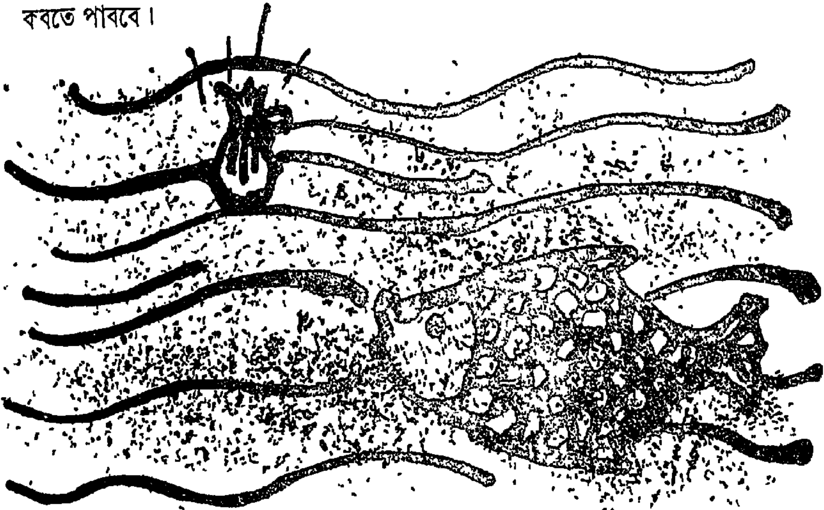
মৎস্যদান জাতক

পুবাকালে ব্রহ্মদত্তেব আমলে বোধিসত্ত্ব একবাব এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ কবেন। যথাসময়ে বোধিসত্ত্ব বড হলেন। পেশাগত কাজকর্মে মন দিলেন। সম্পত্তি বৃদ্ধি কবলেন।

বোধিসত্ত্বেব এক ছোট ভাই ছিল। এক সময বোধিসত্ত্বেব বাবা-মা গত হলেন। দু ভাই একবাব বাবাব প্রাপ্য টাকা আদায় কবার জন্য এক গ্রামে যান। সেখানে এক হাজাব টাকা পেলেন। বাড়িতে ফেরাব পথে নদীর ঘাটে বসে দুজনে খেলেন। গাছেব পাতা কেটে থালা বানিযে তাঁবা সেই থালায খেলেন। এটোকাটা নদীতে ফেলে দিলেন। মাছেরা এটো খেল। আব বোধিসত্ত্ব এই দানের ফল নদী দেবতাকে দিয়ে দিলেন। নদী দেবতা ঐ দানেব পুণ্যফল পেযে খুবই খুশি হলেন। বুঝতে পাবলেন বোধিসত্ত্বই তাঁকে এই পুণ্যফল দান কবেছেন।



বোধিসত্ত্বের ছোট ভাই একটু চোর-স্বভাবের। সে ভাবছিল কি করে বোধিসত্ত্বকে ফাঁকি দিয়ে হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া যায়। ভেবে ভেবে সে একটা ফন্দি বের করল। টাকার থলেটার মত দেখতে আরেকটা থলে বানাল সে। তারপর সেই থলেটা পাথরকুচি দিয়ে বোঝাই করল। মনে মনে ভেবে রাখল নদী পার হওয়ার সময় পাথরকুচির থলেটা নদীতে ফেলে দেবে। বোধিসত্ত্ব তাহলে ভাববেন টাকাটাই জলে পড়ল। সে তখন অনায়াসে হাজার টাকা আত্মসাৎ করতে পারবে।



নৌকোয় উঠে সে ঠিক তাই করতে গেল। কিন্তু ভুল করে টাকার থলেটাই নদীতে ফেলে দিল। পাথরকুচির থলেটা নিজের কাছে রেখে দিল। ভাবল এটাই টাকার থলে। টাকার থলে জলে পড়ে যাওয়ায় বোধিসত্ত্ব কিন্তু খুব একটা দুঃখ করলেন না। বললেন, 'যা গেছে তা গেছে, দুঃখ করে আর কি হবে।'

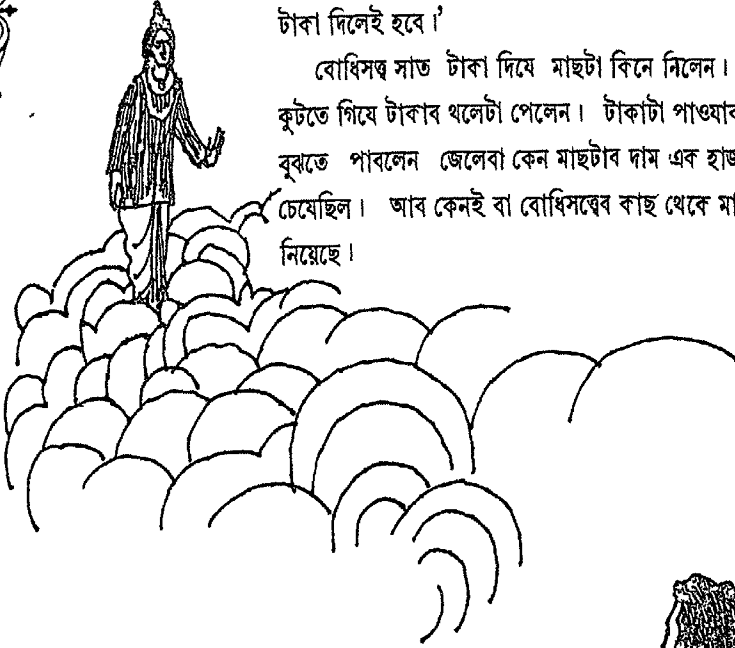
কিন্তু নদী দেবতা ভাবলেন লোকটা আমার উপকার করেছে। আমার উচিত ওর উপকার করা। তিনি তখন এক বিশাল মাছকে বললেন ঐ থলেটা খেয়ে ফেলতে। মাছ তাই করল।

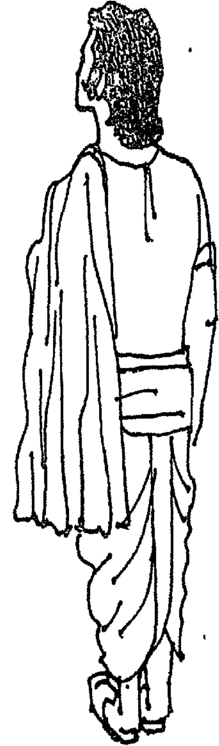
ছোট ভাই বাড়িতে ফিরে এসে থলে খুলে দুঃখে কপাল চাপড়াতে লাগল। ওদিকে পরের দিন সকালেই সেই মাছটা জেলেদের হাতে ধরা পড়ল। জেলেরা মাছের দাম হাঁকল এক হাজার সাত টাকা।

ঐ দামে কেউই মাছ কিনতে রাজি হল না।

শেষে তারা বোধিসত্ত্বের কাছে এসে বলল, 'মহাশয়, মাছটার দাম অন্যদের কাছে এক হাজার সাত টাকা চেয়েছি। আপনি নিলে সাত টাকা দিলেই হবে।'

বোধিসত্ত্ব সাত টাকা দিয়ে মাছটা কিনে নিলেন। তাঁর স্ত্রী মাছ কুটতে গিয়ে টাকার থলেটা পেলেন। টাকাটা পাওয়ার পর বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলেন জেলেরা কেন মাছটার দাম এক হাজার সাত টাকা চেয়েছিল। আর কেনই বা বোধিসত্ত্বের কাছ থেকে মাত্র সাত টাকা নিয়েছে।





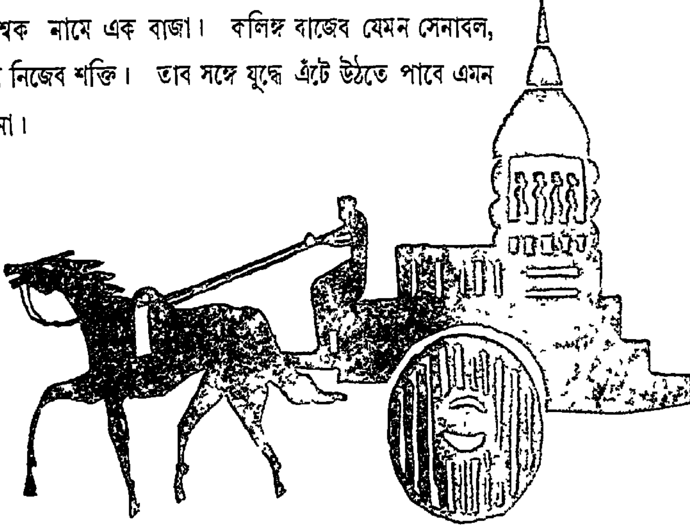
কিন্তু বোধিসত্ত্ব যে জিনিসটা বুঝতে পারছিলেন না, তা হল হারানো টাকার থলে কোন্ অদৃশ্য কারণে তিনি ফিরে পেলেন। বোধিসত্ত্ব যখন এ কথা ভাবছেন, তখন নদী দেবতা আকাশপথে বোধিসত্ত্বকে দেখা দিলেন। ছোট ভাইয়ের কীর্তি ফাঁস করে দিলেন। বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'তোমার ওই চোর ভাইটাকে এক পয়সাও দিও না।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তা হয় না। ছোট ভাইয়ের পাওনা টাকা আমি ঠকাতে পারব না। সে ভুল করেছে বলে আমি ভুল করতে পারি না।'



খুল্লকলিঙ্গ জাতক

পুরাকালে কলিঙ্গরাজ্যের দন্তপুরে কালিঙ্গ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। ঠিক সেই সময় অশ্বক রাজ্যের পোতলি নগরে রাজত্ব করতেন অশ্বক নামে এক রাজা। কলিঙ্গ রাজের যেমন সেনাবল, তেমনি তার নিজের শক্তি। তার সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারে এমন কেউ ছিল না।



কালিঙ্গের একবার যুদ্ধ করবার ইচ্ছা খুব প্রবল হয়ে উঠল। সে তার অমাত্যদের জিজ্ঞেস করল, 'বল তো কার সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়। আমার সমকক্ষ তো কাউকেই দেখছি না।' তখন অমাত্যরা বলল, 'মহারাজ, এক কাজ করুন। আপনার চার মেয়েই সুন্দরী। তাদের রথে বসিয়ে দেশ ভ্রমণে পাঠান। যে রাজা তাদের নিজের অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে চাইবে আমরা তার সঙ্গেই যুদ্ধ করব।'

কলিঙ্গরাজ তাই করল। কিন্তু গোটা জম্বুদ্বীপে কেউই



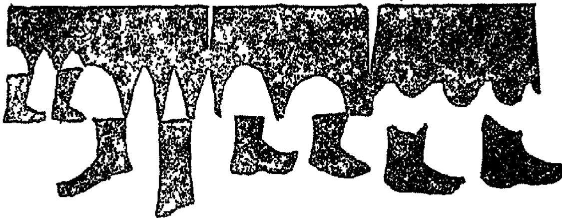
কলিঙ্গরাজার মেয়েদের স্পর্শও করল না। বরং তারা উপহার পাঠিয়ে ভয়ে ভয়ে তাদের বিদায় দিল। শেষে রাজকন্যারা পোতলি নগরে এল।





অশ্বক রাজার এক সুপণ্ডিত অমাত্য ছিল। তার নাম নন্দীসেন। নন্দীসেন রাজকন্যাদের আসতে দেখে ভাবল কলিঙ্গ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে এমন একজন রাজাও কি জম্বুদ্বীপে নেই? জম্বুদ্বীপের পক্ষে এ এক কলঙ্কের কথা। নন্দীসেন নগরের দরজা খোলার হুকুম দিল। রাজকন্যাদের সে রাজার কাছে নিয়ে এল। অশ্বক রাজাকে সে বলল, 'মহারাজ, আপনি এই চার কন্যাকে বিবাহ করুন, যুদ্ধের দায়িত্ব আমার।' অশ্বক রাজা তাই করল। দূতদের বলে দিল, 'যাও কলিঙ্গরাজকে বল, আমি তার চার কন্যাকে রাজমহিষী করেছি।'

কলিঙ্গরাজ যুদ্ধসাজে রওনা দিল। খবর পেয়ে নন্দীসেন কলিঙ্গ রাজকে একটি চিঠি পাঠাল, 'যুদ্ধ হবে দুই রাজ্যের সীমানার কাছে। আপনি আপনার রাজ্যের সীমানায় থাকুন।'



বোধিসত্ত্ব এই সময় দুই বাজ্যেব সীমানায একটি কুঁড়েঘবে থাকতেন। তপস্যা কবে দিন কাটাতেন। কলিঙ্গবাজ মনে মনে ভাবল তপস্বীবা অনেক কিছু জানেন। প্রথমে ওকে জিজ্ঞেস কবে নেওয়া ভাল যে এই যুদ্ধে কে জিতবে। কালিঙ্গ বোধিসত্ত্বেব কাছে ছদ্মবেশে গেল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আজ আমি বলতে পাবব না। তবে আপনি কাল যদি আসেন জানতে পাববেন। কেননা কাল দেববাজ শক্র এখানে আসবেন। তিনি সবই জানেন।'

পবেব দিন কালিঙ্গ এলে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এ যুদ্ধে কলিঙ্গের জয় হবে। সেজন্য আগেই কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দেবে।' কলিঙ্গবাজ কিন্তু জিজ্ঞেস কবল না কি কি লক্ষণ দেখা দেবে। জয় হবে শুনেই সে খুশি হযে ফিবে গেল। আব কথাটা চাউড কবে দিল।

অশ্বক বাজাব কানে ঐ সংবাদ এল। অশ্বক তখন নন্দীসেনকে বলল, 'এ কি শুনছি নন্দীসেন?' নন্দীসেন বলল, 'দেখুন মহাবাজ, যুদ্ধে জয়-পবাজযেব কথা কেউ বলতে পাবে না। ও কথা ভাবাব দবকাব নেই।'

নন্দীসেন তাবপব অশ্বক বাজাব এক হাজাব বাছাই করা বীব সেনাকে নিযে পাহাডেব ওপব উঠল। তাবপব তাদের জিজ্ঞেস কবল, 'তোমরা কি মহাবাজের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত?'



হ্যাঁ প্রভু।

তাহলে এখুনি খাদে লাফ দাও।

তারা লাফ দিতে গেলে নন্দীসেন তাদের আটকাল। বলল, 'যুদ্ধক্ষেত্রে এভাবে লড়াই কোরো, তাহলেই হবে।'

নন্দীসেন বোধিসত্ত্বের কাছে গিয়ে জানতে পেরেছিল যুদ্ধে কলিঙ্গ-রাজ জিতবে। সে তখন জিজ্ঞেস করেছিল, 'তার লক্ষণ হিসেবে কি দেখা যাবে?' বোধিসত্ত্ব বলেছিলেন, 'কলিঙ্গ রাজার রক্ষাকর্তা হবে একটি সাদা ষাঁড়, আর অশ্বক রাজার রক্ষাকর্তা হবে কালো ষাঁড়। এই দুটি ষাঁড়ে লড়াই হবে। কালো ষাঁড় হেরে যাবে।'

যুদ্ধ শুরু হলে কলিঙ্গ রাজার সেনারা অবহেলায় লড়ছিল। ক্রমে তাদের দম ফুরিয়ে গেল। অশ্বক রাজার সেনাদের হাতে তারা প্রাণ দিতে লাগল। কিন্তু তখনই ঐ ষাঁড় দুটি দেখা দিল। তারা লড়াই শুরু করল। কালো ষাঁড় সাদা ষাঁড়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। নন্দীসেন তখন সেই হাজার সেনাকে আদেশ করল সাদা ষাঁড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। মুহূর্তের মধ্যে সাদা ষাঁড় মারা পড়ল। কলিঙ্গরাজ রণে ভঙ্গ দিল।

পালাবার সময় কলিঙ্গরাজ বোধিসত্ত্বকে কটু কথা বলে গেল। পরে বোধিসত্ত্ব শক্রকে ধরলেন। 'দেবতারা কি মিথ্যা কথা বলেন?', জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে। শক্র জবাব দিলেন, 'দেবতারা বীরের পক্ষে থাকেন। অশ্বকরাজ বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিল, তাই তার জয় হয়েছে।'





মহাশ্বারোহ জাতক

বোধিসত্ত্ব তখন বারাণসীর রাজা। রাজা হিসেবে তিনি সুবিবেচক ও ন্যায়পরায়ণ। একবার রাজ্যের সীমানার কাছে প্রজারা বিদ্রোহ করল। বোধিসত্ত্ব সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের দমন করতে গেলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁর হার হল। তখন তিনি পালাতে লাগলেন। পালাতে পালাতে সীমানার কাছে এক গ্রামে এলেন।

সেই গ্রামে কয়েক ঘর রাজভক্ত প্রজা বাস করত। তারা তখন সকাল বেলায় গ্রামের নানা কাজে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় সুসজ্জিত রাজাকে দেখতে পেল তারা।

রাজপুরুষের বেশবাস দেখে অনেকেই পালিয়ে গেল। কিন্তু



একজন ফিবে গেল না। সে এসে বাজাকে জিজ্ঞেস কবল, 'শুনেছি বাজা সীমান্ত অঞ্চলে এসেছেন। তুমি কে? বাজভক্ত, না বিদ্রোহী?'

আমি বাজভক্ত।

তাহলে আমাব সঙ্গে এস।

সে রাজাকে ঘবে নিযে গেল। নিজেব স্ত্রীকে বলল, 'আমার বন্ধুব পা ধুইযে দাও।' তাবপব সে বাজাকে নিজে সামর্থ্য অনুসাবে খেতে দিল। নিজের হাতে বিছানা করে শুতে দিল। রাজাব ঘোড়ার যত্নআত্তি কবল।

তিন-চাব দিন পবে রাজা চলে গেলেন। যাবাব সময সেই গ্রাম-বাসীকে বলে গেলেন, 'আমাব নাম মহাশ্বাবোহ। যদি কখনও নগবে যাও দ্বুযাবীকে বোলো আমি মহাশ্বাবোহেব বাড়ি যাব। সে তোমাকে আমাব বাড়িতে নিযে আসবে।'

বাজাব সৈন্যবা এতদিন নগবেব বাইবে বাজাব জন্য অপেক্ষা কবছিল। এখন সবাই মিলে নগবে প্রবেশ কবল। প্রবেশ কবাব সময বাজা দ্বুযাবীকে বলে গেলেন, 'কোন লোক যদি এসে বলে আমি মহাশ্বাবোহের বাড়ি যাব, তাকে আমাব কাছে পৌঁছে দিও।'

তবু সেই গ্রামবাসী এল না। বাজা তখন ঐ গ্রামেব খাজনা বাড়িয়ে দিলেন। তাতেও সেই গ্রামবাসী এল না। বাজা আবও দু-তিন বাব খাজনা বাড়ালেন। কিন্তু কোন ফল হল না।



ওদিকে গ্রামবাসীবা সেই অতিথিপবাযণ, বাজভক্ত প্রজাকে ধবল, 'আপনি বাজার কাছে যান। যেদিন মহাশ্বাবোহ ফিরে গেলেন তাবপব থেকে আমবা খাজনায জর্জবিত হচ্ছি। আপনি ব্যবস্থা করুন।' বাজভক্ত প্রজা তখন বলল, 'খালি হাতে আমি যেতে পাবব না।'

তখন সবাই মিলে চাঁদা তুলে রাজাব স্ত্রীব জন্য পোশাক, অলঙ্কাব তৈরি কবল। অনেক মণ্ডা মিঠাই দিল। সেইসব নিযে ঐ প্রজা নগবে এসে দ্বুযারীকে বলল, 'মহাশ্বাবোহেব বাড়িতে যাব।'

দ্বুযাবী বাজাব কাছে খবব পাঠাল। বাজা বললেন, 'ওঁকে সসম্মানে নিযে এস।'

তাবপব বাজমহিষীকে বললেন, 'বন্ধুব পা ধুইযে দাও।' মোট



কথা, বাজা ঐ বন্ধুব খুব যত্নআত্তি ক্বলেন। শুধু তাই নয়, পুত্রকন্যা সমেত এসে নগবে থাকাব ব্যবস্থা কবে দিলেন। তাদেব মধ্যে গভীব সখ্যতা জন্মাল। দুজনে প্রায় এক হয়ে বাজ্য পালন কবতে লাগলেন।

বাজা নতুন বন্ধুকে খাতিব কবায অমাত্যদেব কেউ কেউ চটে গেল। একদিন তাবা বাজপুত্রকে বলল, 'বাজকুমাব, আপনি নিশ্চযই শুনেছেন বাজা এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে কি খাতিব কবছেন। রাজা তাকে অর্ধেক বাজত্ব দিয়েছেন। আমাদেব নির্দেশ দিয়েছেন তাঁব বন্ধু ও বন্ধুব সন্তানদেব সম্মান দেখাতে। এতে আমবা খুবই লজ্জিত। আমবা জানি না লোকটা বাজাব এমন কি মহা উপকাব কবেছে। আপনি বাজাকে সতর্ক করুন।'

বাজকুমাব অমাত্যদেব সঙ্গে একমত হল। সে বাজাকে গিযে বলল, 'মহাবাজ, এ আপনি কি কবছেন?' বাজা তখন বললেন, 'বৎস, তুমি কি জান যুদ্ধে হেবে গিযে আমি যে কদিন অজ্ঞাতবাসী হযে ছিলাম, তখন আমি কোথায ছিলাম?'

না।

আমি এব কাছেই ছিলাম।

তাতে কি?

লোকটি তখন আমাব অনেক উপকাব কবেছে।

তাবপব বাজা কুমাবকে শিক্ষা দিলেন, 'দেখ বৎস, যে দানেব অযোগ্য লোককে দান কবে সে যেমন ভুল কবে, তেমনি যে দানেব যোগ্য তাকে দান না কবাটাও ভুল। এ ভুল যে কববে সে বিপদের দিনে কোন বন্ধু পাবে না।'

শীলমীমাংসা জাতক



পুৰাকালে বোধিসত্ত্ব একবাব ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। বযসকালে বাবাণসীব এক পণ্ডিতেব কাছে বিদ্যাচর্চা শুরু কবলেন। আচার্যেব পাঁচশ ছাত্র ছিল। বোধিসত্ত্ব ছিলেন ছাত্রদেব মধ্যে সেবা।

আচার্যেব একটি মেযে ছিল। সে বড় হযেছে। আচার্য ভাবলেন, মেযেব এবাব বিযে দেওযা দবকাব। তাবপব ভাবলেন শিষ্যদের মধ্যে যাব চবিত্র সেবা তাকে জামাই কবাই ঠিক।

তাবপব তিনি শিষ্যদেব ডেকে বললেন, 'শোন বাছারা, আমাব মেযে তো বড হয়েছে, এবাব তাব বিযে দেব। কিন্তু বিযে দিতে গেলে পোশাক-আশাক-গয়না দবকাব। তোমবা যে যা পাব নিযে



এস। তবে যাই আন না কেন, কোন প্রাণী যেন তা দেখতে না পায়। সকলেব চোখ এড়িয়ে আনতে হবে।'

শিষ্যবা বাজি হয়ে বেবিয়ে গেল। একে একে অনেকে অনেক জিনিস নিয়ে এল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব কিছুই আনলেন না। ওদিকে অন্য শিষ্যদেব আনা জিনিসপত্র প্রত্যেকেব নামে নামে আলাদা কবে বাখা আছে। বোধিসত্ত্বেব নামে কিছুই জমা পড়ে নি।

আচার্য একদিন বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'বাছা, সবাই তো তাদেব সামর্থ্যমত যা পেবেছে এনেছে। কই, তুমি তো কিছুই আনলে না?'

না, গুরুদেব।

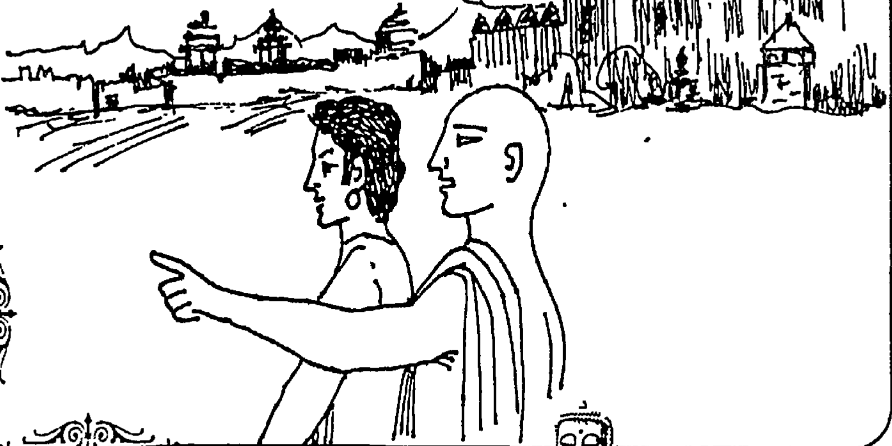
কেন?

আমি পাবি নি।

কেন পাবলে না?

বোধিসত্ত্ব তখন ব্যাখ্যা কবে বললেন, 'গুরুদেব, আপনি বলেছেন লুকিয়ে আনতে। মানে চুবি কবতে। কিন্তু পাপ কাজেব সাক্ষী তো থাকবেই। মানুষ দেখতে না পাক অন্য প্রাণী দেখবে। এমন কি তাবাও যদি না দেখতে পায তবে যে আনবে সে তো দেখবেই। সেজন্য আমি পাবি নি।'

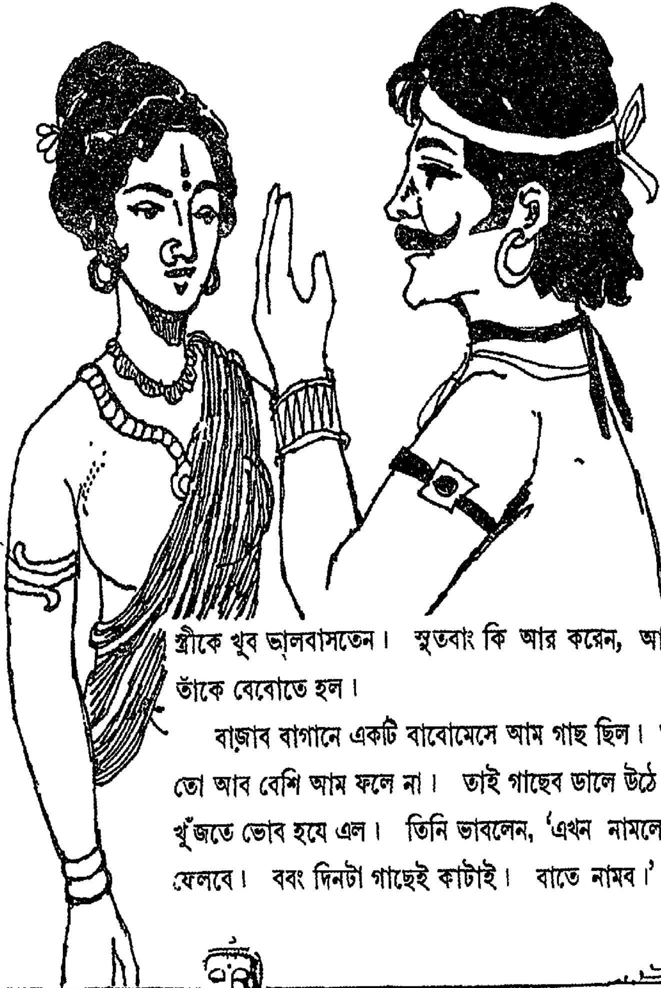
শুনে আচার্য খুব খুশি হলেন। তিনি বুঝলেন যে চবিত্রবান পাত্র তিনি খুঁজছিলেন বোধিসত্ত্বই সেই ব্যক্তি। তাবপব তিনি শিষ্যদেব সব জিনিসপত্র ফিবিয়ে দিলেন। মেয়েকে স্বর্ণালঙ্কাবে সাজিয়ে বোধিসত্ত্বেব কাছে সমস্ত দান কবলেন।



শবক জাতক

একবাব বোধিসত্ত্ব চণ্ডাল জন্ম নেন। যথাবয়সে বিবাহ কবেন। একদিন বোধিসত্ত্বের স্ত্রী বলল, 'স্বামী, আমাব খুব আম খেতে ইচ্ছা কবছে।'

তখন আমেব সময় নয়। বোধিসত্ত্ব স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি আম-জাতীয় অন্য কোন ফল খাও, কেননা এখন তো আব আমেব সময় নয়। আম এখন কোথায় পাব।' কিন্তু তাঁব স্ত্রী এতে আশ্বস্ত হল না। ববং সে বলতে লাগল, 'আম না পেলে আমি বাঁচব না।' বোধিসত্ত্ব তাঁব



স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন। সুতবাং কি আর করেন, আমেব খোঁজে তাঁকে বেবোতে হল।

বাজাব বাগানে একটি বাবোমেসে আম গাছ ছিল। তবে অসময়ে তো আব বেশি আম ফলে না। তাই গাছেব ডালে উঠে আম খুঁজতে খুঁজতে ভোব হয়ে এল। তিনি ভাবলেন, 'এখন নামলে সবাই ধরে ফেলবে। ববং দিনটা গাছেই কাটাই। বাতে নামব।'



সকালবেলা রাজা আর তাঁর পুরোহিত এলেন। রাজা বসলেন গাছের গুঁড়িতে উঁচু আসনে, আর পুরোহিত বসলেন নিচু আসনে। তা দেখে বোধিসত্ত্বের খুব খারাপ লাগল। এই অধর্ম দেখতে না পেরে তিনি নেমে এলেন।

রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আমি অধর্ম করেছি, কিন্তু আপনারা দুজনও অধর্ম করছেন।' রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?' তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'গুরু নিম্নাসনে আর শিষ্য যদি উচ্চাসনে বসে তাহলে অধর্ম হয় না?' পুরোহিতও স্বীকার করলেন কথাটা।

রাজা তখন বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়ের জাত কি?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি চণ্ডাল।' রাজা তখন বললেন, 'তুমি উঁচু জাতের হলে এই রাজ্য তোমায় দান করতাম। তবে যাই হোক এখন থেকে এ রাজ্যে আমি দিনের রাজা। আর তুমি হলে রাতের রাজা।'

ক্ষান্তিবাদী জাতক

পুবাকালে বাবাণসীতে কলাবু নামে এক বাজা বাজত্ব কবতেন। বোধিসত্ত্ব তখন সৎ বংশে জন্ম নেন। তাঁব নাম ছিল কুণ্ডল কুমাব। সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে যথাবযসে তিনি বিবাহ কবেন। তাঁর মা-বাবা একসময়ে গত হলেন। বোধিসত্ত্ব তখন ভাবলেন, 'এত ঐশ্বর্য রেখে ওঁবা চলে গেলেন। একদিন আমাকেও এভাবে চলে যেতে হবে।'

তিনি তখন যোগ্য ব্যক্তিদেব মধ্যে সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে তপস্বী হলেন। তাবপব দীর্ঘকাল হিমালয অঞ্চলে থেকে তপস্যা কবলেন। একবাব তাঁব নুন ফুবিযে যাওযায তিনি বারাণসীতে এলেন। বাবাণসীবাজ কলাবুব বাগানে বিশ্রাম ও ধ্যান করতে লাগলেন।



সেই সময় রাজার সেনাপতি তাঁকে দেখতে পায়। সেনাপতি বোধিসত্ত্বের চালচলনে মুগ্ধ হয়। সে তাকে নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এল। যত্ন করে খাওয়াল। আর এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল যে বোধিসত্ত্ব বেশ কিছুকাল রাজার বাগানে থাকবেন।

রাজা কলাবু একদিন প্রচুর মদ খেয়ে নেশাগ্রস্থ হলেন। দাস-দাসী-নর্তকীদের নিয়ে তিনি বাগানে এলেন। এক সুন্দরী রমণীর কোলে কলাবু শুয়ে থাকলেন, আর অন্য নর্তকীরা নাচতে লাগল। রাজা কলাবু এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। নর্তকীরা তখন নাচতে নাচতে ক্লান্ত। তারা পরস্পরকে বলল, 'রাজা ঘুমোচ্ছেন, এই বেলা আমরা বাগানটা ঘুরে দেখি।'

ঘুরতে ঘুরতে তারা ধ্যানমগ্ন বোধিসত্ত্বকে দেখতে পেল। তারা বলাবলি করল, 'আমরা এই সুযোগে তপস্বীর কাছে কিছু ধর্মকথা শুনি।' তারা বোধিসত্ত্বকে ঘিরে বসল। বোধিসত্ত্ব ধর্মকথা বলতে লাগলেন।

ওদিকে রাজা কলাবু ঘুম ভেঙে নর্তকীদের দেখতে না পেয়ে রাগে কাঁপতে লাগলেন। তিনি বোধিসত্ত্বের দিকে খাঁড়া হাতে ছুটে এলেন। নর্তকীরা রাজাকে নিরস্ত করল। রাজা ধরেই নিয়েছিলেন বোধিসত্ত্ব এক ভণ্ড তপস্বী। তিনি বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোন মতাবলম্বী?'

আমি ক্ষান্তবাদী।

ক্ষান্ত কাকে বলে?

মনের অ-ক্রুদ্ধ ভাবকে।

এখনই দেখা যাবে।



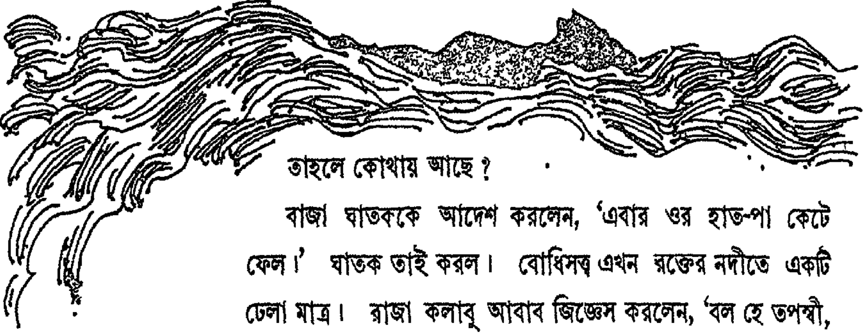
রাজা কলাবু তখন ঘাতককে ডাকিয়ে আনলেন। ঘাতক এসে জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজের কি আজ্ঞা।' রাজা বললেন, 'এই ভণ্ড তপস্বীকে কাঁটার চাবুক দিয়ে সামনে-পেছনে দু হাজার ঘা লাগাও।' ঘাতক তাই করল। বোধিসত্ত্বের গায়ের চামড়া ফেটে মাংস উঠে এল। সারা শরীর দিয়ে রক্ত বইতে লাগল।

ওহে ভণ্ড তাপস, এখন বল তুমি কোন্ বাদী?

আজ্ঞে, ক্ষান্তিবাদী।

এখনও?

ভেবেছেন ক্ষান্তি চামড়া-মাংসয় থাকে? তা নয়।



তাহলে কোথায় আছে?

রাজা ঘাতককে আদেশ করলেন, 'এবার ওর হাত-পা কেটে ফেল।' ঘাতক তাই করল। বোধিসত্ত্ব এখন রক্তের নদীতে একটি ঢেলা মাত্র। রাজা কলাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বল হে তপস্বী, এখন তুমি কোন্ বাদী?'

ক্ষান্তিবাদী।

এখনও?

ভেবেছেন ক্ষান্তি হাত-পায়ে থাকে? তা নয়, হৃদয়ে আছে।

রাজা এবার হুকুম করলেন তপস্বীর নাক-কান কেটে ফেলতে। ঘাতক যথা আজ্ঞা কাজ করল। রক্তের স্রোত বইতে লাগল। কলাবু তপস্বীকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার বল, তুমি কোন্ বাদী?'

ক্ষান্তিবাদী মহারাজ।

রাজা তখন লোকজনসমেত চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, 'বেশ, তোমার ক্ষান্তিসমেত এবার মৃত্যুর দরজা দিয়ে অদৃশ্য হও।'

রাজাকে বেশি দূর যেতে হল না। কয়েক পা হাঁটার পর ভয়ঙ্কর আগুন তাকে টেনে নিয়ে গেল অনন্ত নরকে। সেনাপতি এসে বোধিসত্ত্বকে বলল, 'প্রভু, আপনার কোপদৃষ্টি রাজার ওপর পড়ুক, কিন্তু এ রাজ্যের যেন কোন ক্ষতি না হয়।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'কোপদৃষ্টির হাত থেকে আমি মুক্ত হয়েছি, ক্রোধ আমার দ্বারা অসম্ভব।' সেদিন তিনিও ঐ বাগানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

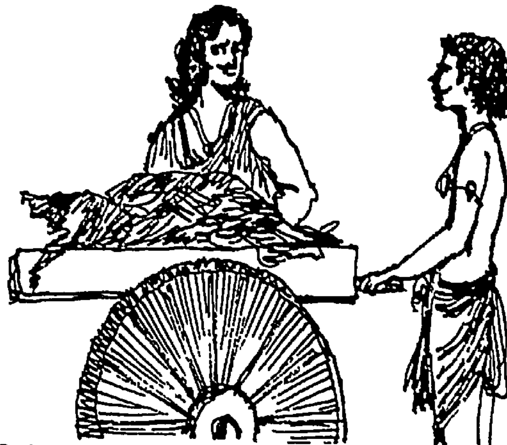


মাংস জাতক

ব্রহ্মদত্তেব আমলে বোধিসত্ত্ব একবাব বণিককুলে জন্মান। এক দিন এক ব্যাধ বনে গিয়ে শিকাব কবে প্রচুর হরিণের মাংস পায়। ঐ হবিণেব মাংস নিয়ে সে বাজাবে যাচ্ছিল।

তখন বাবাণসীব চার বণিকের চার ছেলে এক বাস্তাব মোড়ে বসে গল্পগুজব কবছিল। ঠিক তখনই ব্যাধ মাংসেব গাডি নিয়ে সেলাম দিয়ে যাচ্ছিল। এক বন্ধু প্রস্তাব কবল, ব্যাধেব কাছ থেকে খানিকটা মাংস আদায় কবা যাক। সবাই এক বাক্যে রাজি হল।

প্রথম বণিকের ছেলে ব্যাধের কাছে গিয়ে বলল, 'এই ব্যাটা ব্যাধ,



এক টুকরো মাংস দেখি।' শুনে ব্যাধ বলল, 'লোকেব কাছে কিছু চাইতে হলে একটু মিষ্টি ভাষায় কথা বলতে হয়। যাই হোক তুমি যে বকম চেয়েছ সে বকম মাংস পাবে।' এই বলে ব্যাধ তাকে এক টুকবো চর্বি দিল।

প্রথম বণিকেব ছেলে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। অন্যান্য বণিকেব ছেলেবা তাকে জিজ্ঞাসা কবে জেনে নিল সে ব্যাধকে কি বলেছে। দ্বিতীয় বণিকেব ছেলে ব্যাধকে মিষ্টি কবে বলল, 'দাদা, এক টুকবা মাংস দাও না।' শুনে ব্যাধ বলল, 'লোকে বলে ভাই হচ্ছে মানুষেব অঙ্গতুল্য। তুমি যখন ভাই বললে তখন তুমি হবিণেব হাতেব মাংস নিয়ে যাও।'



এবাব তৃতীয বণিকেব ছেলে দ্বিতীযেব কাছ থেকে সব শুনে নিল। সে ব্যাধকে গিযে বলল, 'বাবা, এক টুকবা মাংস দাও না।' শুনে ব্যাধ বলল, 'লোকে সন্তানকে হৃদযেব তুল্য ভাবে, তাই তোমাকে হবিণেব হৃৎপিণ্ড দিলাম।'

চতুর্থ বণিকেব ছেলে ব্যাধকে বলল, 'বন্ধু, এক টুকবো মাংস দেবে?' শুনে ব্যাধ বলল, 'দেব বই কি। বন্ধুকে অদেয কিছু নেই। তাব জন্য সর্বস্ব দেওযা যায। এই গাডিব সমস্ত মাংস তোমাব হল। এখন তুমি তোমাব ঠিকানা বল, আমি পৌঁছে দিযে আসি।'

চতুর্থ বণিকেব ছেলেকে সঙ্গে নিযে ব্যাধ তার বাড়িতে গেল। বণিকের ছেলেও তাব স্ত্রীকে ডেকে এনে ব্যাধকে যত্ন কবতে বলল। ভবিষ্যতে সে ব্যাধকে নগবেব মধ্যে নিজেব বাডিব পাশে একটা বাডি বানিযে দিল। যতদিন তাবা জীবিত ছিল পবস্পবেব বন্ধুত্বে কোন দিন ফাটল ধরে নি।

ব্যাধও শিকাব কবা ছেড়ে দিয়ে ভদ্র জীবিকা বেছে নিল।





শশ জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার খরগোশ হয়ে জন্মান। থাকতেন এক বনে। সেখানে পাহাড় আর নদী ছিল। আর দূরে ছিল একটি ছোট্ট গ্রাম।

বোধিসত্ত্ব একা নন। তাঁর তিন বন্ধু ছিল—বানর, উদবিড়াল আর শিয়াল। বোধিসত্ত্ব বন্ধুদের ধর্মকথা শোনাতেন। তারা খুব মন দিয়ে সেসব শুনত।

একদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলেন পরের দিন পূর্ণিমা। ঐদিন উপোস করে বিকালে দান-ধ্যান করলে পুণ্য হবে। বন্ধুদের সে কথা বললেন। বন্ধুরা এক বাক্যে রাজি হল।

পরের দিন সকালে উদবিড়াল নদীর দিকে গেল। সেখানে এক জেলে মাছ ধরছিল। সে সাতটি মাছ ধরে বালির তলায় চাপা দিয়ে রেখে আবার মাছ ধরতে নদীতে নেমে গেল। উদবিড়াল বালি খুঁড়ে সাতটি মাছ বের করল। তারপর তিনবার চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'মাছগুলো কার?' কেউ কোন জবাব দিল না। সে তখন মাছগুলো এনে নিজের বাসায় রেখে দিল। আর শুয়ে শুয়ে ধর্মকথা ভাবতে লাগল।

এইভাবে শিয়াল যোগাড় করল এক হাঁড়ি দই। বানর বন থেকে কয়েকটা পাকা আম নিয়ে এল। তারপর তিনজনই বিকেলের অপেক্ষায় শুয়ে রইল। মনে মনে ধর্মকথা ভাবতে লাগল।



বোধিসত্ত্ব কিন্তু ভাবলেন অন্য কথা। প্রথমত তিনি ঘাস খান। কোন ব্রাহ্মণই ঘাস খাবে না। আবার অন্য কোন প্রাণীকে ধরে এনে দিতে হলে অপর জীব হত্যা করা হয়। সেজন্য তিনি বাসায় শুয়ে রইলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, 'আমি এমন দান করব যা আগে কেউ করে নি।'

বোধিসত্ত্ব মনে মনে যা ভাবছেন তা জেনে দেবরাজের শক্রর আসন টলে উঠল। কেননা বোধিসত্ত্ব ঠিক করেছেন তিনি নিজেকেই প্রার্থীর কাছে ভোজ্য দ্রব্য হিসেবে তুলে ধরবেন।

শক্র ভাবলেন, 'একটু যাচাই করে দেখতে হয়।' শক্র তখন ব্রাহ্মণ সেজে বোধিসত্ত্ব ও তাঁর বন্ধুদের কাছে গেলেন একে একে। শিয়াল, উদবিড়াল আর বানর ব্রাহ্মণকে নিজের নিজের খাবার ধরে দিতে চাইল। কিন্তু শক্র বললেন, 'থাক, থাক। কাল সকালে এসে খাব।'

শক্ররূপী ব্রাহ্মণ তারপর বোধিসত্ত্বের কাছে গেলেন। সরাসরি বললেন,

ব্রাহ্মণকে খেতে দাও।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

বলে বোধিসত্ত্ব শক্রকে অনুরোধ করলেন আগুন জ্বালাতে। শক্র



বললেন, 'কেন?' বোধিসত্ত্ব তখন বললেন, 'আমি এমন দান করব যা এর আগে কেউ করেনি। তুমি ব্রাহ্মণ, প্রাণী হত্যা করবে না। তাই তোমাকে আগুন জ্বালাতে বলেছি। তুমি আগুন জ্বালালে আমি সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে শেষ করব। তখন তুমি খিদে মেটাও।'

শক্র আগুন জ্বাললেন। বোধিসত্ত্ব প্রথমে গা ঝাড়া দিলেন। যাতে তাঁর গায়ে কোন পোকামাকড় থাকলে ঝরে পড়ে। কেননা নইলে প্রাণী হত্যার দোষ হবে। তারপর বোধিসত্ত্ব আগুনে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু দেখলেন, আগুন ঠাণ্ডা। তার লোমগুলো ঠাণ্ডা পরশ পাচ্ছে।

ব্রাহ্মণরূপী শক্রকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠাকুর, আগুন জলের মত কেন?'

শক্র হাসলেন। বললেন, 'তোমার গুণের কথা সসাগরা পৃথিবী জানুক।' তারপর পর্বত নিংড়ে সাদা রস বের করলেন। সেই সাদা রস দিয়ে চাঁদের চারপাশে খরগোশের চিহ্ন এঁকে দিলেন।

তারপর বোধিসত্ত্ব বন্ধুদের সঙ্গে অনেকদিন সুখে শান্তিতে রইলেন। ধর্মকর্ম করলেন। যথাসময়ে সকলে গত হল।



দদ্দভ জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সিংহকুলে জন্ম নেন। বড় হয়ে তিনি বনেই বাস করতেন। সেই বনের পশ্চিমে সমুদ্রের তীরে এক বন ছিল। সেখানে অনেক বেল আর তাল গাছ ছিল।

বেল গাছের তলায় একটা তাল গাছের চারা গজিয়েছিল। একটা খরগোশ ঐ তালগাছের তলায় বাসা বানিয়ে থাকত। একদিন খরগোশ নিজের বাসায় শুয়ে ভাবছিল, পৃথিবীটা যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে যাব কোথায়? ঠিক তখুনি তাল গাছের ওপর থেকে একটা পাকা বেল পড়ল।

'তাই তো, পৃথিবীটা যে ফেটেই গেল।'

এক লাফ দিয়ে খরগোশ ছুটে পালাতে লাগল। খরগোশকে পড়ি কি মরি করে ছুটতে দেখে আর একটা খরগোশ জিজ্ঞেস করল, 'পালাচ্ছ কেন ভাই?' প্রথম খরগোশ বলল, 'পৃথিবী ধ্বংস হয়েছে। পালাও।' শুনে সে-ও প্রথম খরগোশের পিছন পিছন ছুটতে লাগল। এভাবে একপাল খরগোশ প্রাণের দায়ে ছুটে চলল।

হাজার হাজার খরগোশকে ছুটতে দেখে এক হরিণও জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার ভাই, তোমরা ছুটছ কেন?' খরগোশের পাল



প্রথম খরগোশের কথাটাই আবার বলল। শুনে হরিণ তাদের সঙ্গে যোগ দিল। একটা হরিণকে দেখে ক্রমে হাজার হাজার হরিণ সেই মিছিলে ঢুকে পড়ল।

শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে বনের প্রায় সমস্ত জন্তুই ছুটে চলেছে। বোধিসত্ত্ব জন্তুর দলকে পালাতে দেখে এর কারণ জানতে চাইলেন। উত্তর শুনে তিনি ভাবলেন, 'নিশ্চয়ই এরা কোন অদ্ভুত শব্দ শুনে ভয় পেয়েছে, আজগুবি কোন ভয়ে ছুটছে। এদের বাঁচাতে হবে।'

বোধিসত্ত্ব তখন তাদের একে একে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে বলেছে পৃথিবী ধ্বংস হয়েছে?' পশুরা এ কথার জবাবে একে অন্যকে দেখাতে লাগল। শেষে পাওয়া গেল ঐ প্রথম খরগোশটিকে। সে স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, আমি বলেছি।'

তুমি জানলে কি করে?

নিজের চোখে দেখেছি।

কোথায় দেখলে?

সমুদ্রতীরে।



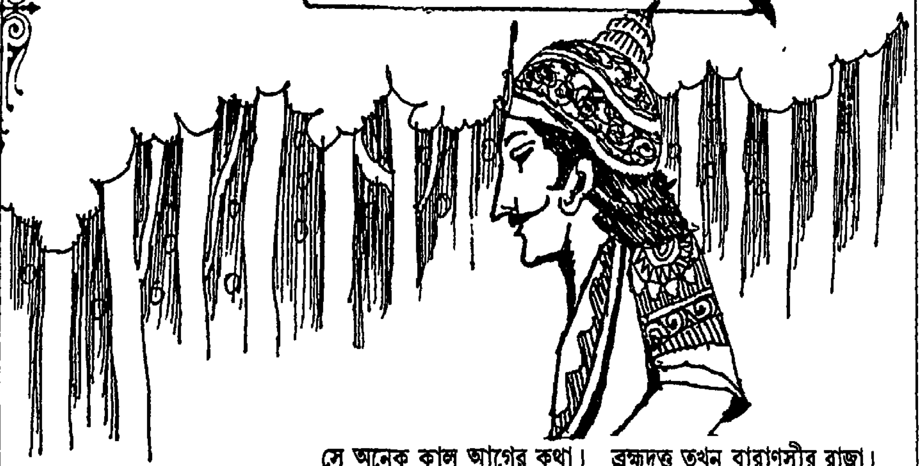
তারপর খরগোশ বলল, 'আমি তাল গাছের চারার তলায় শুয়ে ভাবছিলাম পৃথিবী যদি ধ্বংস হয় তাহলে কোথায় যাব। এমন সময় পৃথিবী ধ্বংসের শব্দ শুনতে পেলাম।' বোধিসত্ত্ব তখন পশুদের একটু অপেক্ষা করতে বললেন। খরগোশকে বললেন, 'চল, তোমার সেই তালচারার কাছে।' অন্যান্য পশুদের বললেন, 'আমি দেখে আসি সত্যি পৃথিবী ধ্বংস হয়েছে কিনা।'

বোধিসত্ত্ব খরগোশকে পিঠে নিয়ে তিন লাফে সেই গাছের কাছে গেলেন। খরগোশকে বললেন, 'এবার নেমে জায়গাটা দেখাও।' খরগোশ দূর থেকে আঙুল দিয়ে দেখাল। বোধিসত্ত্ব সেখানে গিয়ে দেখলেন তালগাছের কচি পাতা ছিঁড়ে একটা পাকা বেল সেখানে পড়ে আছে।



বেলটা হাতে করে এনে তিনি খরগোশকে বললেন, 'তুমি এই বেল পড়ার শব্দ শুনেছ।' তারপর পশুদের কাছে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনাটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বললেন। পশুদেরও ধড়ে প্রাণ এল।

রাজাববাদ জাতক



সে অনেক কাল আগের কথা। ব্রহ্মদত্ত তখন বারাণসীর রাজা। বোধিসত্ত্ব সে সময়ে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। বয়সকালে তিনি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেন। সংসারে তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। তপস্বী হয়ে তিনি হিমালয়ে একটি চমৎকাব জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে থাকতে লাগলেন। ধ্যান ছাড়া অন্য কাজে তাঁব মন নেই।

ঠিক সেই সময়ে এক বাজাব মনে সংশয় দেখা দিল। তিনি ভাবলেন, 'খুঁজে দেখতে হবে কেউ আমাব বিরূপ সমালোচনা কবে কিনা।' রাজা খোঁজ নিতে শুরু কবলেন। প্রথমেই রাজপুবীর লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ কবলেন। কিন্তু সেখানে তাঁব একজন সমালোচকও খুঁজে পেলেন না। বাজপুরীব বাইরে বা নগবেও পাওয়া গেল না। রাজা তখন গ্রাম গ্রামান্তবে ছদ্মবেশে ঘুবে দেখবেন ঠিক করলেন। কিন্তু কোথাও নিজের নিন্দুক খুঁজে পেলেন না। একেবারে শেষে রাজা হিমালয় প্রদেশে গেলেন।

ঘুবতে ঘুরতে রাজা বোধিসত্ত্বেব আশ্রমেব কাছে এলেন। বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে পাশে বসলেন।

বোধিসত্ত্ব তখন পাকা বটফল দিয়ে খিদে মেটাচ্ছিলেন। তিনি রাজাকে কয়েকটি বটফল দিয়ে বললেন, 'বাজা, আপনি এই বটফলগুলো খান।' ফলগুলো খেয়ে রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন।



প্রভু, বটফল এত মিষ্টি হল কি করে ?

রাজা পুণ্যাত্মা, তাই ফল এত মধুর।

আচ্ছা প্রভু, রাজা পুণ্যাত্মা না হলে কি ফলের মিষ্টত্ব চলে যায় ?

হ্যাঁ, রাজা।

রাজা বোধিসত্ত্বকে নিজের পরিচয় দিলেন না। ফিরে এসে তাঁর ইচ্ছে হল তপস্বীর কথা পরখ করে দেখার। সেজন্য তিনি ন্যায় ও ধর্মবিরুদ্ধ কাজ শুরু করলেন। কিছুদিন পরে আবার বোধিসত্ত্বের আশ্রমে গেলেন।

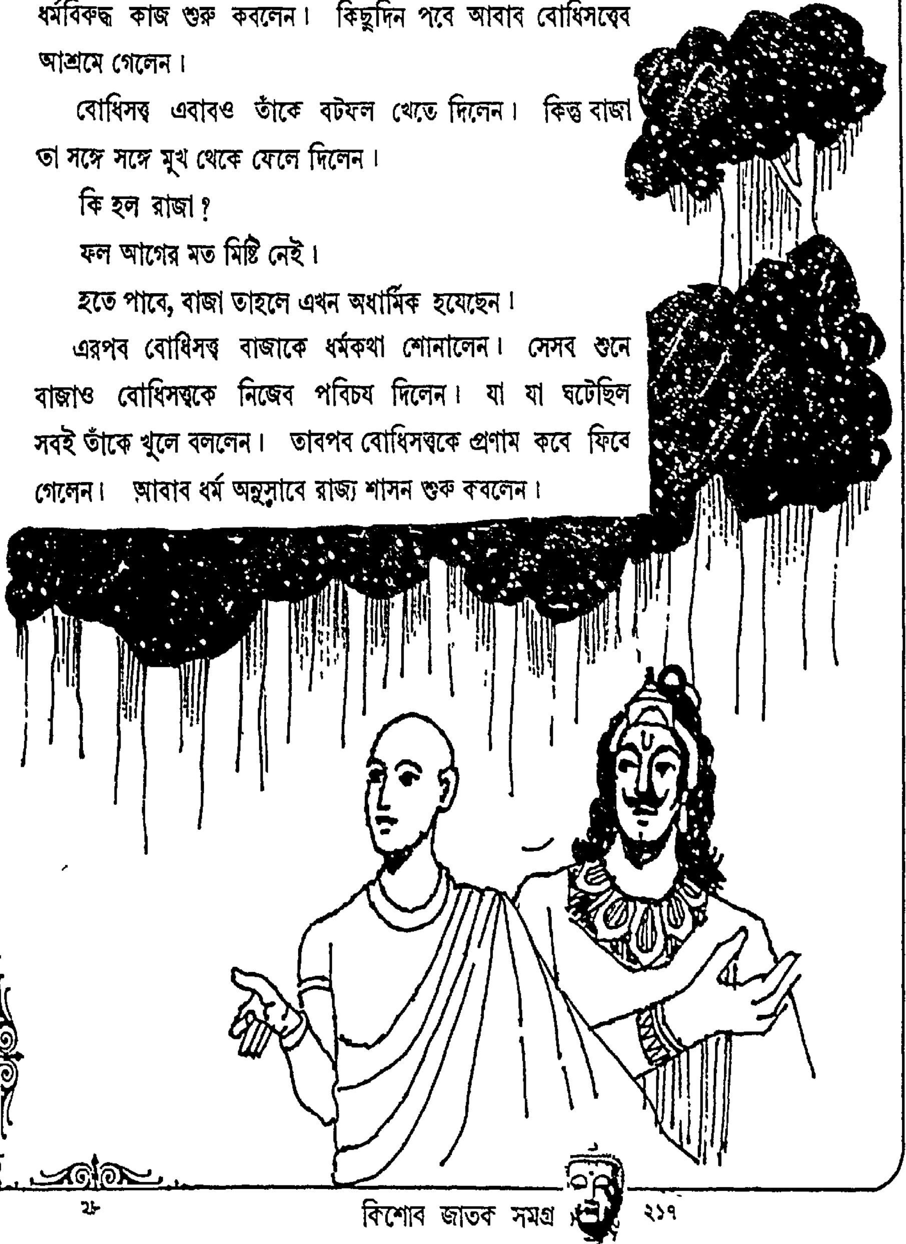
বোধিসত্ত্ব এবারও তাঁকে বটফল খেতে দিলেন। কিন্তু রাজা তা সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে ফেলে দিলেন।

কি হল রাজা ?

ফল আগের মত মিষ্টি নেই।

হতে পারে, রাজা তাহলে এখন অধার্মিক হয়েছেন।

এরপর বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্মকথা শোনালেন। সেসব শুনে রাজাও বোধিসত্ত্বকে নিজের পরিচয় দিলেন। যা যা ঘটেছিল সবই তাঁকে খুলে বললেন। তারপর বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে ফিরে গেলেন। আবার ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন শুরু করলেন।



তূষ জাতক

একবাব বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিযে তক্ষশিলায় এক বিখ্যাত আচার্য হন। বাজকুমারদেব তিনি শিল্প শিক্ষা দিতেন। বারাণসী-বাজের এক ছেলে বোধিসত্ত্বেব কাছে শিল্প শিক্ষা কবতে এল। বোধিসত্ত্ব তাকে তিনটি বেদ এবং সমস্ত শিল্প বিষযে শিক্ষা দিলেন।

যথাসময়ে বাজকুমাব ঘবে ফিবতে চাইল। সে আচার্যেব কাছে বিদায় নিযে গেল। বোধিসত্ত্ব অঙ্গবিদ্যায নিপুণ ছিলেন। রাজ-কুমাবেব শবীব দেখে বোধিসত্ত্ব তাব ভবিষ্যৎ বিপদ টেব পেলেন। বুঝলেন, বাজকুমারের ছেলেই বাজকুমাবকে হত্যা কবাব চেষ্টা করবে। মনে মনে ভাবলেন, 'যে কবে হোক এই বিপদ দূব কবতে হবে।'

বোধিসত্ত্ব তখন বাজকুমাবকে তিনটি কথা শিখিয়ে দিলেন। বললেন, 'তোমাব ছেলেব যেদিন ষোল বছব বয়স পূর্ণ হবে তখন খেতে বসে প্রথম কথাটি বলবে। বাজসভায় লোকে তোমাব সঙ্গে যখন দেখা কবতে আসবে তখন দ্বিতীয় কথাটি বলবে। প্রাসাদেব সিঁড়ি বেয়ে উঠে তৃতীয কথা আর শোবাব ঘরে পৌঁছে চতুর্থ কথাটি বলবে। তাহলে কোন বিপদ হবে না।'

ঐ বাজকুমাব একদিন রাজা হল। একদিন তাব ছেলেব বযসও ষোল পূর্ণ হল। বাজা একদিন বাগানে বেড়াতে যাচ্ছেন, ছেলেব সেদিনই হঠাৎ মনে হল, 'বাজাব কত ঐশ্বর্য। কিন্তু বাজা মারা গেলে তবে আমি রাজা হব। ততদিনে আমি বুড়ো হযে যাব। তার চেযে বাজাকে মেবে ফেলাই ভাল।'

পবে চাকববাকবদেব সঙ্গে বাজকুমার এ নিযে আলোচনা কবল। তাবাও বলল, 'ঠিক কথা।' তাবা ঠিক কবল বিষ দিয়ে রাজাকে মারতে হবে। কুমার নিজেই ঐ দায়িত্ব নিল। বাজাব খাবারে বিষ মেশানোব জন্য সে একদিন তৈবি হল।

রাজার থালায ভাত দেওয়া মাত্র রাজা প্রথম কথাটা বললেন, 'তূষ আর ভাতের স্বাদ ইঁদুর খুব ভালো জানে, অন্ধকার রাতেও তারা তূষ





আব ভাত আলাদা কবে নিয়ে খেতে পাবে।' শুনে কুমাব ভাবল, 'বিষ দিলেই হয়েছিল আব কি, বাজা তো আগে ইঁদুবকে খাইয়ে তাবপব নিজে খেত।' ভয়ে সে আব বিষ মেশাতে পাবল না।

আবাব পবামর্শ শুরু হল। এবাব ঠিক কবা হল বাজসভায় বাজকুমাব খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে। বাজা অন্যমনস্ক হলেই সে বাজাকে হত্যা কববে। কুমাব সেই সুযোগেব অপেক্ষায় আছে। এমন সময় বাজা দ্বিতীয় কথাটি জোবে জোবে বলে উঠলেন: 'সঙ্গীদেব সঙ্গে কি ফন্দি কবেছিস' আমি জানি। জানি এখনই বা কেন তুই দাঁড়িয়ে আছিস।'

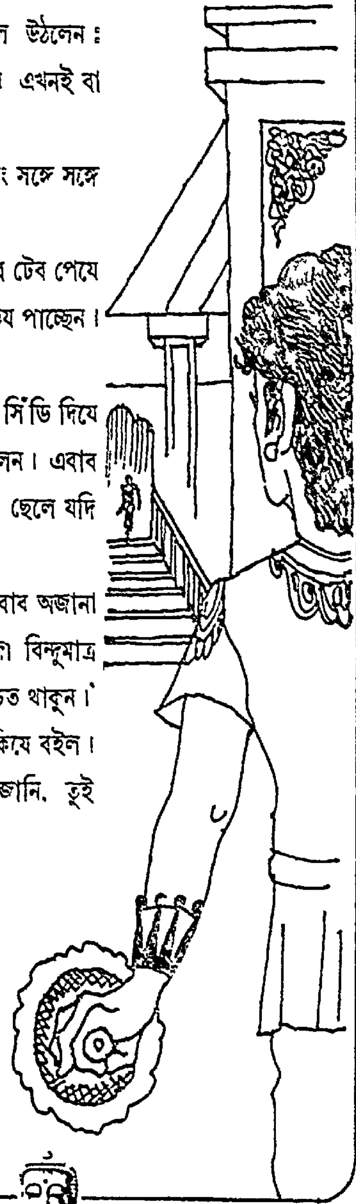
শুনে কুমাব ভাবল, 'এই বে ধবা পড়ে গেছি।' সুতবাং সঙ্গে সঙ্গে সে গা ঢাকা দিল।

কুমাব এবাব তাব সঙ্গীদেব বলল, 'ভাই, বাবা সব টেব পেয়ে গেছেন।' সঙ্গীবা বলল, 'কক্ষনো না, আপনি মিছেমিছি ভয় পাচ্ছেন। প্রাসাদে ওঠাব সময় বাজাকে শেষ করুন।'

কুমাব আবাব খড়্গ হাতে লুকিয়ে বইল। বাজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। প্রাসাদেব কাছাকাছি পৌঁছে বাজা থামলেন। এবাব তিনি তৃতীয় কথাটি বিড়বিড় কবে বললেন: 'নিজের ছেলে যদি আমাব শত্রু হয় তাহলে তাকে তক্ষুনি শেষ কবা দবকাব।'

কুমাব এবাব একেবাবে হাড়ে হাড়ে বুঝে গেল, বাবাব অজানা কিছুই নেই। কিন্তু সঙ্গীবা বলল, 'দেখুন কুমাব, বাজা বিন্দুমাত্র জানলে আপনাকে কখন কয়েদখানায় দিতেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন।'

এবাব কুমাব বাজাব খাটেব তলায় খড়্গ হাতে লুকিয়ে বইল। শুতে যাওয়াব আগে বাজা চতুর্থ বাক্যটি বললেন: 'জানি, তুই খাটেব নিচে লুকিয়ে আছিস।'



এবার কুমার ভাবল, 'যদি না বেরিয়ে আসি তাহলে আমার প্রাণ যাবে।'

কুমার বেরিয়ে এসে রাজার পা জড়িয়ে ধরল। কিন্তু পাপের শাস্তি তাকে পেতেই হবে। রাজা তাকে কারাদণ্ড দিলেন। রাজা বুঝতে পারলেন কেন আচার্য ঐ চারটি কথা তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন করে রাজা একদিন গত হলেন। কুমারও কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেল। সিংহাসনে বসল।

বাবেরু জাতক



বাবাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ব একবাব ময়ূর হয়ে জন্মান। বয়সকালে তিনি খুব সুন্দব হয়েছিলেন। বাস করতেন এক বনে।

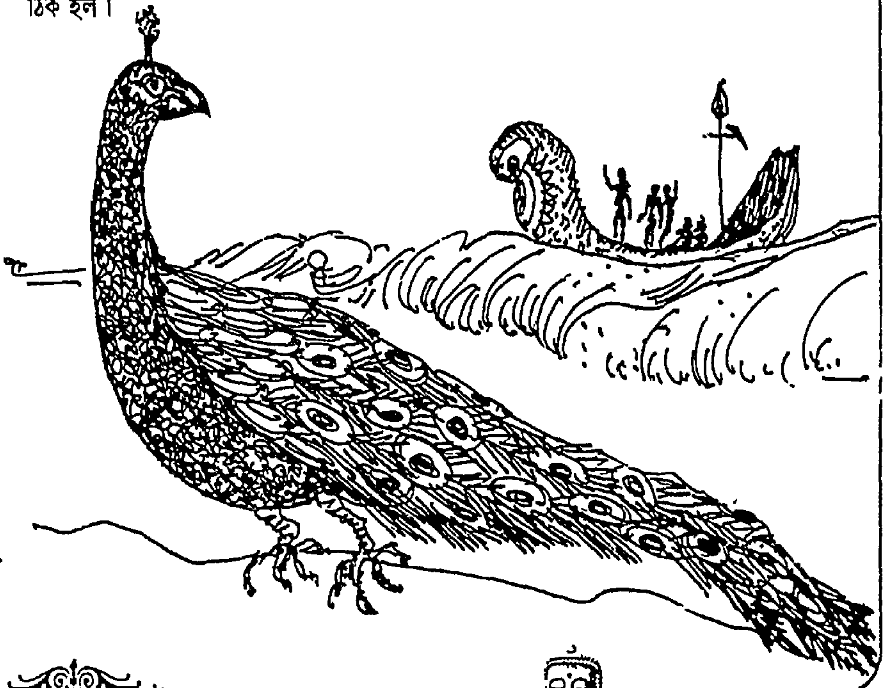
সেই সময় কযেকজন ব্যবসাযী নৌকোয কবে যাচ্ছিল। তাদেব নৌকোয ছিল একটা কাক। তাকে 'দিশা কাক' বলা হত। কেননা বাস্তা হাবালে ঐ কাক দিক ঠিক কবে দিত।

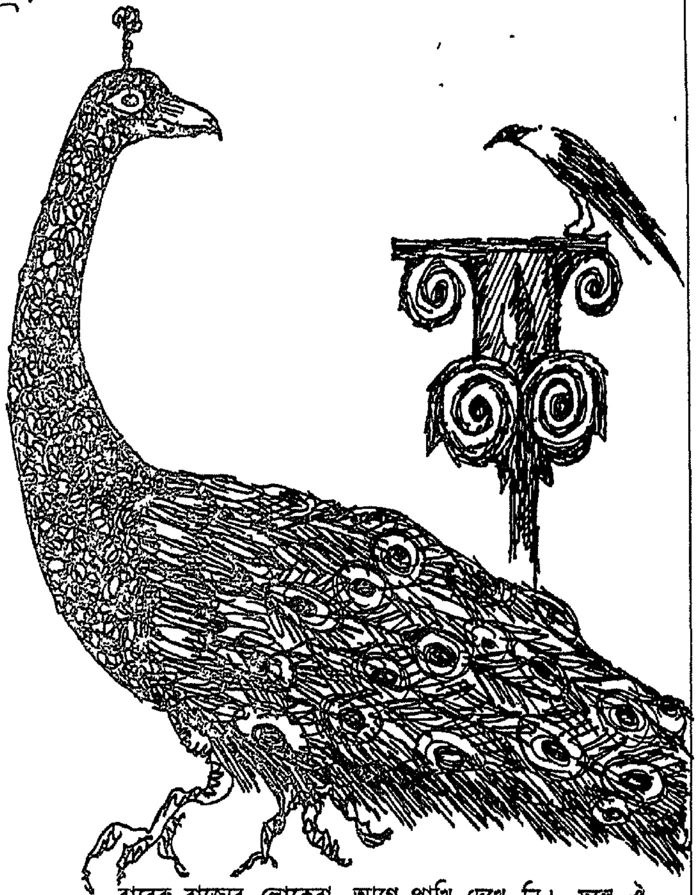
ব্যবসাযীব দল নৌকো নিযে বাবেরু বাজ্যে এল। তখন বাবেরু রাজ্যে কোন পাখি ছিল না। ঐ বাজ্যেব লোকেবা ব্যবসাযীব নৌকোব ওপব কাকটাকে দেখে মুগ্ধ হযে গেল।

কি সুন্দব বঙ।

চোখদুটো কি সুন্দব!

তাবা এইসব বলাবলি কবতে লাগল। তাবপব তাবা ব্যবসাযীদেব কাছে এসে বলল, 'এই পাখিটা আমাদেব দিন।' ব্যবসাযীবা বলল, 'ন্যায্য দাম পেলে দেব।' অনেক দবাদবি কবে একশ টাকা দাম ঠিক হল।





বারেক রাজ্যের লোকেরা আগে পাখি দেখে নি। ফলে ঐ কাকের যত্নের কোন সীমা থাকল না। স্বভাবে বিন্দুমাত্র গুণ না থাকা সত্ত্বেও কাক পরম সুখ ভোগ করতে লাগল।

পরের বার বারেরু রাজ্যে যাওয়ার সময় সেই ব্যবসায়ীর দল সঙ্গে একটা ময়ূর নিয়ে গেল। তারা ময়ূরটাকে এমন শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছিল যে তুড়ি দিলেই সে গান করত।

বারেরু রাজ্যের লোকেরা আবার নৌকো দেখতে এল। সুশিক্ষিত ময়ূরকে দেখে তারা আগের বারের চেয়ে বেশি মুগ্ধ হল। যে কোন দামে তারা ময়ূরটা কিনে নিতে চাইল। হাজার টাকা দাম উঠল।

ময়ূর নিয়ে বারেরু রাজ্যের লোকেরা মেতে উঠল। তার যত্ন-আত্তির কোন সীমা রইল না। ওদিকে কাকের যত্ন উঠে গেল।

নীতি ঃ প্রকৃত গুণীকে পেলে কে আর গুণহীনের সমাদর করে।



সন্ধিভেদ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের ছেলে হয়ে জন্মান। যথাসময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা থেকে সব রকম শাস্ত্র শিখে এলেন। এদিকে ব্রহ্মদত্তও গত হলেন। বোধিসত্ত্ব ধর্মপথে থেকে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।



ঠিক সেই সময়ে রাজার গোশালার প্রধান কর্মচারী বনের মধ্যে যে গোশালা আছে তা দেখতে গিয়েছিল। ফেরার সময় সে ভুল করে একটা গোরুকে বনে ফেলে আসে। গোরুটি ছিল গর্ভিনী। সেই গোরুর সঙ্গে এক সিংহীর খুব ভাব হল। সিংহীও তখন গর্ভিনী।

কিছুদিন পরে দেখা গেল সিংহী এক সিংহ প্রসব করেছে। আর গোরুটি প্রসব করেছে ষাঁড়। সে যাই হোক, এই বাচ্চাদুটোর মধ্যেও খুব বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। তারা পরস্পরের ছায়া হয়ে থাকত।

কিছুদিন পরে এক কাঠুরে বনে গিয়ে এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেল। ফিরে এসে সে রাজার সঙ্গে দেখা করল। বোধিসত্ত্ব তখন ঐ কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, বনে আশ্চর্য কিছু দেখলে কি?'

হ্যাঁ, মহারাজ।

কি দেখলে?

সিংহ আর ষাঁড়ের বন্ধুত্ব।

শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'যতদিন এরা দুজন বন্ধুভাবে থাকবে ততদিন কোন বিপদ দেখা দেবে না। কিন্তু তৃতীয় কোন প্রাণী এদের সঙ্গে সখ্যতা পাতালেই বিপদ দেখা দেবে। তুমি তো ভাই প্রায়ই বনে যাও, যদি দেখ এদের সঙ্গে আর কেউ যোগ দিয়েছে তাহলে আমাকে জানাতে ভুলে যেও না।' কাঠুরে 'যে আজ্ঞে' বলে চলে গেল।

ওদিকে কাঠুরে বারাণসীতে চলে যাওয়ার পর এক শিয়াল সিংহ আর ষাঁড়ের খিদমত করতে শুরু করে। শিয়াল মনে মনে ভাবত, কত জন্তুর মাংস খেয়েছি, কিন্তু সিংহ কিংবা ষাঁড়ের মাংস কখনও খাই নি।

শিয়াল ষাঁড়ের কাছে সিংহের নিন্দা, আর সিংহের কাছে ষাঁড়ের

নিন্দা শুরু করল। দুই বন্ধুর মন গেল বিষিয়ে। ঠিক সেই সময় কাঠুরে বনে এসেছিল। সে শিয়ালকে ওদের সঙ্গে দেখে রাজার কাছে ফিরে গেল। রাজা সব শুনে বললেন, 'আমরা গিয়ে হয়ত দেখব ষাঁড় আর সিংহ দুজনেই মরে পড়ে আছে।'

সত্যিই তাই হল। বোধিসত্ত্ব বনে গিয়ে দেখলেন ষাঁড় আর সিংহ মরে পড়ে আছে। ধূর্ত শিয়াল মহানন্দে একবার ষাঁড়ের মাংস, একবার সিংহের মাংস খাচ্ছে!

কাকবতী জাতক

সে অনেক দিন আগেকাব কথা। ব্রহ্মদত্ত তখন বাবাণসীব বাজা। বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্তেব ছেলে হযে জন্মালেন। বযসকালে তাঁব শিক্ষাদীক্ষা সাবা হল। এক সময বাজা গত হলে বোধিসত্ত্ব সিংহাসনে বসলেন।

তখন বোধিসত্ত্বেব স্ত্রী কাকবতী নামে এক অপূর্ব সুন্দবী নাবী। পাশেব দেশেব এক বাজা বোধিসত্ত্বেব সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিযেছিল। তাব নাম সুপর্ণবাজ। সে প্রাযই এসে বোধিসত্ত্বেব সঙ্গে পাশ খেলত।

সুপর্ণবাজ কাকবতীব রূপ ও গুণে মুগ্ধ হল। সে ভাবল, কোন বকমে কাকবতীকে নিজেব বাজপুবীতে আনতে পাবলে তবেই শান্তি।

একদিন সুযোগ জুটে গেল। সুপর্ণবাজ কাকবতীকে চুবি কবে নিযে গেল। তাকে নিযে সোজা গিযে উঠল সুপর্ণলোকে।

ওদিকে বোধিসত্ত্ব কাকবতীকে দেখতে না পেযে কাতব হলেন। অনেক খোঁজখবব কবেও কাকবতীব সন্ধান পেলেন না। বোধিসত্ত্বেব সভায গন্ধর্ব নামে এক নটকুবেব ছিল। তিনি গন্ধর্বকে বললেন, যে ভাবে পাব কাকবতীব খোঁজ এনে দাও।



সুপর্ণবাজেব ছিল এক অলৌকিক যান। সেই যানে কবে সে কাকবতীকে নিযে এক বনে এসে উঠেছিল। গন্ধর্ব সুপর্ণবাজেব বনে যায। কাকবতীকে দেখে ফিবে আসে। পবে যখন সুপর্ণবাজ আবাব পাশা খেলতে এল, তখন গন্ধর্ব ছড়া কেটে বলল, 'বাকবতীব খোঁজ পেযেছি আব সেখান থেকে ফিবেও আসতে পেবেছি। তবে ভাগ্যে তোমাব অলৌকিক যানটি ছিল নইলে ফিবতে পাবতাম না।'

শুনে সুপর্ণবাজ মর্মাহত হল। কাকবতীকে বোধিসত্ত্বেব কাছে ফিবিযে দিল। কিন্তু নিজে পাশা খেলতে আসা বন্ধ কবে দিল।

অননুশোচীয় জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ব একবার ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নেন। যথাবয়সে তিনি তক্ষশিলায় গেলেন লেখাপড়া শিখতে। শাস্ত্র শিখে ফিরেও এলেন এক সময়। বোধিসত্বের বাবা-মা তখন ঠিক করলেন



ছেলের বিয়ে দেবেন।

বোধিসত্ত্ব তাতে রাজি নন। তাঁর ইচ্ছে তপস্বী হবো। গৃহ ধর্ম পালন করায় তাঁর মন ছিল না। কিন্তু বাবা-মা নাছোড়বান্দা। বোধিসত্ত্ব তখন এক ফন্দি করলেন। তিনি একটি সুন্দর সোনার প্রতিমা তৈরি করালেন। তারপর বাবা-মাকে বললেন, 'এই প্রতিমার মত সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গেলে তবেই বিয়ে করব।'

বোধিসত্বের বাবা-মা তখন ঐ সোনার প্রতিমাকে একটা গাড়িতে বসিয়ে লোকজন সঙ্গে দিয়ে দেশ ঘুরতে পাঠালেন। যেখানে ঐ রকম মেয়ে পাওয়া যাবে সেখানে পছন্দ করা হবে।

ঠিক সেই সময় কাশী রাজ্যের একটি গ্রামে এক দেবী এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিল। তার নাম রাখা হয়েছিল সম্মিতভাষিণী। সোনার প্রতিমা নিয়ে গাড়িটি কাশী রাজ্যের ঐ গ্রামে এল। গ্রামবাসীরা সোনার প্রতিমাকে দেখে সম্মিতভাষিণী বলে মনে করল। তারা বলাবলি করতে লাগল, 'ওহে, এই গাড়িটায় সম্মিতভাষিণী রয়েছে। দেখ, দেখ।'

গাড়ির লোকজন সঙ্গে সঙ্গে সম্মিতভাষিণীর খোঁজখবর নিল।



তার বাবা-মাকে সব কথা জানাল। সম্মিতভাবিণীও তার বাবা-মাকে বলেছিল, 'আমি বিয়ে করব না, তপস্বিনী হব।' তার বাবা-মা সে কথা শুনে খুব দুঃখ পায়। সোনার প্রতিমা নিয়ে লোকজন তাদের বাড়িতে এলে তারা বিয়েতে রাজি হল। সম্মিতভাষিণীকেও রাজি করাল।

যাই হোক দুজনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর বোধিসত্ত্ব ও সম্মিতভাষিণী ভাইবোনের মতই জীবন কাটাতে লাগলেন। দুজনই ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন। এক সময় দুজনেরই বাবা-মা গত হলেন। বোধিসত্ত্ব তখন সম্মিতভাষিণীকে বললেন, 'দেখ, সংসারে আমার মন নেই। যা বিষয়-আসয় আছে তোমার সারা জীবন খুব ভালো ভাবেই চলে যাবে, আমি সন্ন্যাসী হব।' সম্মিত-ভাবিণী বলল, 'প্রভু, আমিও আপনার সঙ্গী হব, সংসারে আমারও মতি নেই।'

তারপর তারা দুজন দু হাতে সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিল। এক কাপড়ে গৃহত্যাগ করে চলে গেল হিমালয় অঞ্চলে। সেখানে জপ-তপ করে দিন কাটাতে লাগল।

একবার দুজনে নুন আর টকজাতীয় জিনিস যোগাড় করতে বারাণসীতে এলেন। বারাণসী রাজার বাগানে তাঁরা থাকতে লাগলেন। হঠাৎ সম্মিতভাষিণীর রক্ত আমাশয় দেখা দিল। ওষুধপথ্য না থাকায় বেচারা কাহিল হয়ে পড়ল। বোধিসত্ত্ব একদিন তাকে কাঁধে করে নগরে ভিক্ষে করতে এলেন।

এক ধর্মশালায় সম্মিতভাষিণীকে শুইয়ে রেখে তিনি ভিক্ষে করতে রওনা হলেন। একটু পরেই সম্মিতভাবিণী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। সম্মিতভাবিণীর দেবীর মত রূপ দেখে পথচারী লোক-জন তার মৃতদেহ ঘিরে দাঁড়াল। নানারকম জল্পনাকল্পনা করতে করতে বলল, 'এই সোনার প্রতিমা কার স্ত্রী, কার কন্যা? সে এমন বেঘোরে মরে আছে কেন?'

বোধিসত্ত্ব ভিক্ষাশেষে ফিরে এসে ঐ দৃশ্য দেখে শুধু বললেন, 'জীবন অনিত্য।' তারপর ভিক্ষে করে আনা ফলমূল ওখানে বসেই খেতে



শুরু করলেন।

মৃতদেহের পাশে ভিড় করে কত লোকজন। তারা এতে অবাক হল। তারা জিজ্ঞাসা করল, 'হে তপস্বী, মৃতা আপনার কেউ হন কি?'

যখন বেঁচে ছিলেন, তখন ইনি আমার স্ত্রী ছিলেন।

আপনি কাঁদছেন না কেন?

যতকাল বেঁচে ছিলেন ততক্ষণ আমার ছিলেন, এখন তো উনি আমার নন।

তাই কাঁদছেন না?

হ্যাঁ।

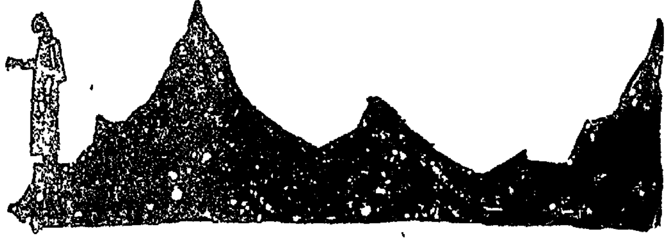
তারপর তিনি সবাইকে অনেক ধর্মকথা শোনালেন।



কারণ্ডিক জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নেন। তক্ষশিলার আচার্যের কাছে লেখাপড়া শিখে সুপণ্ডিত হলেন। তিনি আচার্যের প্রধান শিষ্যও হন।

এই আচার্য হাতের কাছে যাকে পেতেন তাকেই ধর্ম শিক্ষা দিতেন। চরিত্র ভালো করতে বলতেন। বেশির ভাগ লোকই তাঁর কথা কানে নিত না। এরকম বলতে বলতে আচার্য একদিন হতাশ হয়ে কয়েকজন গ্রামবাসীকে বললেন, 'লোকজন ভারি অদ্ভুত, কেউই



প্রায় ভাল হতে চায় না।'

আপনারও ত্রুটি আছে।

কি রকম?

আপনি পাত্রপাত্রী নির্বাচন করেন না।

ধর্মকথা সবাই শুনতে পাবে।

ঠিকই, কিন্তু পালন করতে পারে না।

আচার্য কিন্তু তাদের কথায় কান দিলেন না। তিনি আগের মতই সবাইকে ধর্মকথা বলে চললেন।

একদিন এক ব্রাহ্মণ ভোজনের নেমন্তন্ন ছিল। আচার্যের সঙ্গে কারণ্ডিকরূপী বোধিসত্ত্বকেও নেমন্তন্ন করা হয়েছে। কিন্তু আচার্য ঠিক করলেন তিনি যাবেন না। শিষ্যদের ডেকে বললেন, 'কারণ্ডিক, তুমি তোমার পাঁচশ গুরুভাইকে নিয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাও।'

বোধিসত্ত্ব রওনা হলেন। নেমন্তন্ন সেরে ফেরার পথে বিশাল এক খাদ পড়ল। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'আচার্যকে শিক্ষা দেওয়ার ভালো



ব্যবস্থা রয়েছে দেখছি।' তখন তিনি পাশের পাহাড় থেকে টুকরো পাথর এনে সেই খাদে ফেলতে লাগলেন।

অন্য শিষ্যরা কিছুক্ষণ দেখার পর কারণ্ডিককে বলল, 'গুরুভাই, এবার চলুন।' বোধিসত্ত্ব তাদের কথায় কান দিলেন না। যেমন পাথর ছুঁড়ছিলেন তেমনি ছুঁড়েই চললেন।

শিষ্যরা তখন আচার্যকে খবর দিল। আচার্য এসে বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'কি করছ কারণ্ডিক?'

গর্ত বোঁজাচ্ছি।

এই বিশাল গর্ত?

হ্যাঁ প্রভু।

পারবে না। তুমি তোমার আয়ু শেষ করলেও গর্ত বোঁজাতে পারবে না।

বোধিসত্ত্ব তখন আচার্যকে বললেন, 'প্রভু, আপনি যদি পৃথিবীর সব লোককে ধার্মিক করার চেষ্টা করতে পারেন, তাহলে আমিই বা কেন পৃথিবীর সব গর্তগুলো বুঁজিয়ে হাতের চেটোর মত সমান করতে পারব না?'

এবার আচার্য নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বললেন, 'কারণ্ডিক, তোমার শিক্ষা আমি জীবনে ভুলব না।'



লটুকা জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার হাতি হয়ে জন্মান। বয়স-কালে তিনি দেখতে খুব সুন্দর হন। তাঁর শরীরও তেমনি বলশালী হয়ে ওঠে। আশি হাজার হাতির তিনি দলপতি হন। হিমালয় অঞ্চল ছিল তাঁর বিচরণক্ষেত্র।



একদিন একটি ছোট পাখি হাতিদের চারণভূমিতে কয়েকটি ডিম প্রসব করল। কিছুদিন পরে ডিম ভেঙ্গে পাখির কচি কচি বাচ্চা বের হল। কিন্তু তখনও তারা উড়তে শেখে নি। এমন সময় আশি হাজার হাতি নিয়ে বোধিসত্ত্ব সেই চারণভূমিতে এলেন।

হাতিদের আসতে দেখে পাখিদের মা বেজায় ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল বাচ্চাদের বাঁচানোর একটাই রাস্তা আছে। দলপতির কাছে সন্তানদের প্রাণ ভিক্ষা করতে হবে। এই ভেবে পাখিটি ডানা তুলে করজোড়ে বোধিসত্ত্বের কাছে প্রার্থনা করল : প্রভু, আমার সন্তানদের জীবন রক্ষা করুন!

বোধিসত্ত্ব হাতিদের নির্দেশ দিলেন তারা যেন পাখির ছানাদের না মেরে ফেলে।

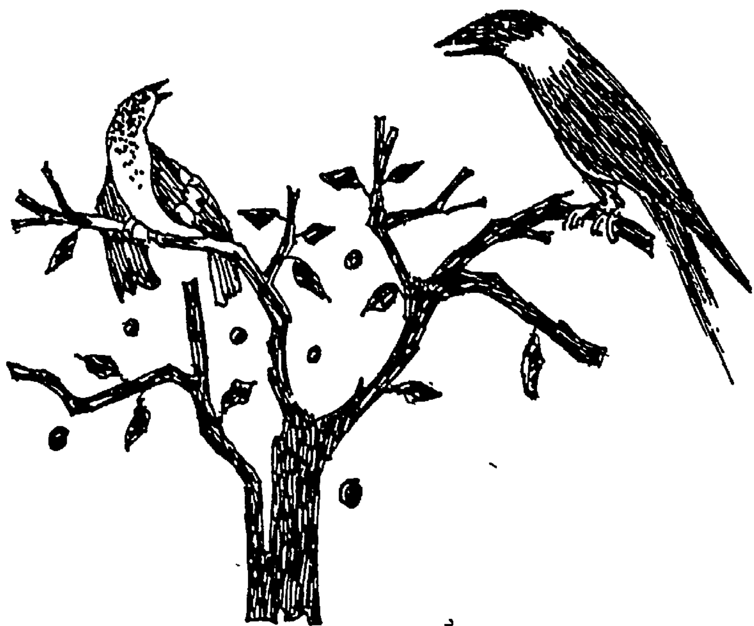


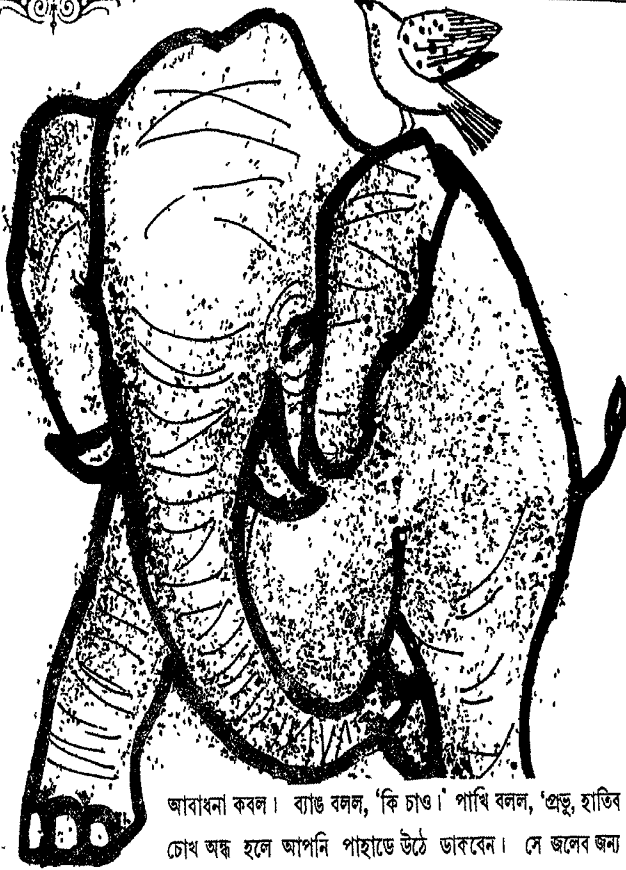
বোধিসত্ত্ব তখন চার পা ফাঁক করে পাখির বাচ্চাগুলোকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। সব হাতি চলে গেলে তিনি পাখিটিকে বললেন : 'দেখ, এরপর আরেকটি হাতি একা আসবে। তার হাত থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না। তুমি যেমন আমার কাছে প্রার্থনা করেছ সে রকম তার কাছেও কোরো।'

কিছুক্ষণ পরে সেই মত্ত হাতি এল। সে কিন্তু পাখির প্রার্থনায় কানই দিল না। উল্টে পাখির বাচ্চাগুলোকে পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলল।

পাখিটি তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, 'ও ভাবছে গায়ের জোরই সব, আমি বুদ্ধির জোরে ওকে শেষ করব।'

তারপর পাখিটি এক কাকের সেবা শুরু করল। কাক সন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি চাও?' পাখি বলল, 'প্রভু, মত্ত হাতির চোখদুটো আপনাকে উপড়ে নিতে হবে।' কাক রাজি হল। তারপর পাখিটি এক নীল মাছির শরণাপন্ন হল। নীল মাছিও জানতে চাইল 'তুমি কি চাও?' 'প্রভু, কাক হাতির চোখ উপড়ে নিলে আপনি সেই অক্ষিকোটরে ডিম পাড়বেন', পাখি বলল। এরপর পাখি এক ব্যাঙের





আরাধনা করল। ব্যাঙ বলল, 'কি চাও।' পাখি বলল, 'প্রভু, হাতির চোখ অন্ধ হলে আপনি পাহাড়ে উঠে ডাকবেন। সে জলের জন্য পাহাড়ে এলে আপনি খাদের ধারে চলে যাবেন। সেখান থেকে ডাকবেন।'

কাক একদিন সত্যিই হাতিটার চোখ খুবলে নিল। নীল মাছি তার চোখে ডিম পাড়ল। ডিম থেকে পোকা জন্মাল। পোকারা হাতির চোখ কুরে কুরে খেতে লাগল। হাতি পাগলের মত ছুটছে তখন। এই সময় ব্যাঙের ডাক শুনে সে জল খাবার জন্য পাহাড়ে উঠে এল। ব্যাঙ খাদের ধারে সরে গেল। হাতিও সেদিকে ছুটল। তারপর খাদে পড়ে প্রাণ দিল।

পাখিটি তখন হাতির পিঠে বসে নাচতে লাগল।

নীতিকথা : বুদ্ধির জোরের কাছে গায়ের জোর হার মানে।



সুবর্ণমৃগ জাতক



ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার হরিণকুলে জন্ম নেন। বোধিসত্ত্বের আকৃতি খুবই সুন্দর হয়েছিল। তাঁর গায়ের রঙ ছিল সোনার মত। সেজন্য তাকে সোনার হরিণ বলা হতো।

সোনার হরিণের স্ত্রীও খুব সুন্দর ছিল। তাঁরা দুজনে একসঙ্গে মহানন্দে বনে ঘুরে বেড়াত। বোধিসত্ত্বের সঙ্গে সব সময় আশি হাজার হরিণের একটি দল থাকত। তিনি ছিলেন তাদের দলপতি।

একদিন এক ব্যাধ বনের মধ্যে ফাঁদ পেতে রেখেছিল। সোনার হরিণরূপী বোধিসত্ত্ব সেই ফাঁদে পা দিলেন। ফাঁদ ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসবার জন্য তিনি খুবই চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু যত চেষ্টা করেন ততই ফাঁদে জড়িয়ে যেতে লাগলেন। শেষে জালের দড়ি-দড়া তার মাংস-চামড়া কেটে হাড় অবধি বসে গেল।

ফাঁদে পড়লে সব হরিণ যেমন ডাক ছাড়ে, বোধিসত্ত্ব তখন সেই রকম ডাক ছাড়তে আরম্ভ করলেন। তাঁর স্ত্রী ঐ ডাক শুনে বুঝল বোধিসত্ত্ব বিপদে পড়েছেন।

সে ফাঁদের কাছে ছুটে এসে বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি মহান শক্তিধর, তবু কেন ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসতে পারছ না।'

দেখ, আমি অনেক চেষ্টা করেছি।

আরেকটু করে দেখ।

লাভ নেই। আমার শক্তি ফুরিয়ে এসেছে।

বোধিসত্ত্বের স্ত্রী তখন তাঁকে অভয় দিল, 'তুমি ভয় পেও না। যে ভাবে হোক আমি তোমাকে বাঁচাব। ব্যাধের কাছে আমি প্রাণী হত্যা না করতে বলব। বলব তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে যাক।'

এদিকে ব্যাধ তখন ছুরি নিয়ে আসছিল। সে ফাঁদের সামনে এসে থমকে গেল। এমন দৃশ্য সে কখনও দেখে নি। একটি হরিণ ফাঁদে পড়েছে, আর ফাঁদের বাইরে বসে আরেকটি হরিণ তার শুশ্রূষা করছে।

ব্যাধ সামনে এলে হরিণী তার সামনে করজোড়ে দাঁড়াল। বলল, 'আপনি আমাকে নিয়ে যান। কিন্তু ফাঁদে বন্দী ঐ মহান হরিণকে ছেড়ে দিন। সে আশি হাজার হরিণের দলপতি ও রক্ষক। তাছাড়া ইনি আমার স্বামী।'

ব্যাধের হৃদয় গলে গেল। মানুষের মধ্যে যে প্রেম সে দেখতে পায় না হরিণীর মধ্যে তা দেখে সে অভিভূত হল। বোধিসত্ত্বও তখন ব্যাধকে বনের মধ্য থেকে একটি বিশাল মণি তুলে এনে দিলেন। বললেন, 'আপনি আর প্রাণী হত্যা করবেন না। এই মণি বিক্রি করে আপনার সাত পুরুষ স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারবে।'





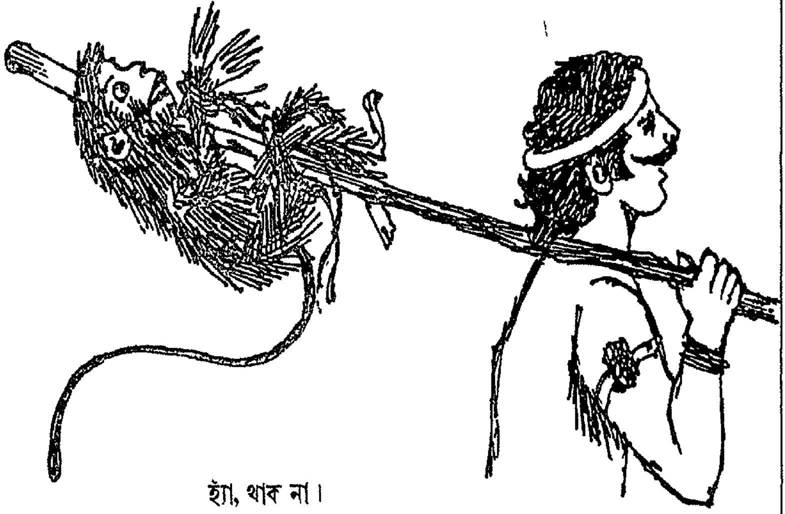
অহিতুণ্ডিক জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার এক ধনী গৃহস্থের পরিবারে জন্মান। তাঁর কাজ হল ধানের ব্যবসা করা।

সেই সময়ে এক সাপুড়ে একটা বানরকে ধরে। তারপর বানরটিকে খেলা শেখায়। সাপুড়ে বানরটাকে বিষ প্রতিরোধক ওষুধ খাইয়ে এমনভাবে তৈরি করে নিল যে সাপের সঙ্গে বানরটা অনায়াসে খেলা করত। লড়াই করত। বানর আর সাপের খেলা দেখিয়ে সাপুড়ে বেশ দু পয়সা রোজগার করে নিত।

একদিন শোনা গেল বারাণসীতে বড় একটা উৎসব হবে। সাপুড়ের ইচ্ছা হল মেলায় গিয়ে একটু মজা করে আসে। সে বানরটাকে নিয়ে বোধিসত্ত্বের কাছে গেল।

ভাই, দু-চারদিন বানরটাকে একটু রাখবে?



হ্যাঁ, থাক না।

তবে দেখো, তাব খাওয়া-দাওয়াব যেন কোন অসুবিধা না হয।

তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

বোধিসত্ত্ব খুব যত্নআত্তি কবলেন। সাপুড়ে একদিন মেলা থেকে মত্ত হয়ে ফিবে এল। সাপুড়ের গলা শুনেই বানবটা ছুটে এল। সাপুড়ে নেশাব ঘোবে বানবটাকে লাঠি দিয়ে ঠেঙ্গাল। তাবপব বেঁধে নিয়ে চলল এক বাগানে। সেখানে বানবটাকে বেঁধে বেখে নিজে একটা আম গাছেব তলায ঘুমিয়ে পড়ল।

বানবটা অনেক চেষ্টা কবে বাঁধন ছিঁড়ে গাছে উঠে গেল। আম পেড়ে খেতে লাগল। আম খেযে সে সাপুড়েব মাথায আঁঠি ছুঁড়ে মাবল। সাপুড়েব ঘুম গেল ভেঙে। তখন সে খুব বুদ্ধি কবে বানবকে ভোলাবাব জন্য বলল, 'আয বাবা, নেমে আয়। তোব চাঁদমুখ দেখি।'

শুনে বানব নামতে লাগল। তাবপব বলল, 'কিছুক্ষণ আগে তুমি আমাকে লাঠি পেটা কবেছ। এখন আবাব বলছ আমাব মুখ চাঁদেব মত। বানবেব মুখ চাঁদেব মত বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। যাই হোক আমি এখন পেট ভবে আম খাই। আব তুমি নিজেব জাযগায ফিবে গিয়ে মনেব সুখে থাক।'

এই বলে বানব বনেব মধ্যে চলে গেল।



শারিক জাতক



বোধিসত্ত্ব একবার এক গ্রামে এক গেরস্থের বাড়িতে জন্ম নেন। বালক বয়সে তিনি গ্রামের কাছে এক বিশাল বটগাছের তলায় খেলা করতেন। সঙ্গে থাকত গ্রামের ছেলেমেয়েরা।

একদিন এক বৈদ্য (গ্রামের ডাক্তার) গ্রামে কোন রোগী না পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঐ বটগাছের তলায় চলে আসে। গাছের তলায় বসে সে জিরিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখল, বটগাছের ডালে একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। বৈদ্য ভাবল, 'এই বাচ্চাগুলোর কোন একটাকে যদি সাপে কাটে তাহলে চিকিৎসা করে দু পয়সা কামানো যেতে পারে।'

এই ভেবে সে বোধিসত্ত্বকে ডেকে বলল, 'কি হে, তুমি কি



শালিক ভালবাস?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'খুব'। তখন বৈদ্য বলল, 'পেলে ধরবে?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'হ্যাঁ।' বৈদ্য তখন গাছের ডালটা দেখিয়ে বলল, 'ঐ দেখ, ওখানে একটা শালিক ছানা আছে।'

বোধিসত্ত্ব গাছে উঠলেন। কিন্তু কাছে যেতেই সাপটা ফণা তুলল। বোধিসত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে সাপের মাথা চেপে ধরে যেখানে বৈদ্য বসেছিল সেখানে ছুঁড়ে দিলেন। সাপটি বৈদ্যের গলায় ছোবল দিল। বৈদ্য সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

গ্রামের লোকজন জড় হল। বোধিসত্ত্ব তখন সবাইকে বললেন কি হয়েছিল। তারপর ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য বললেন:

'শালিক বলে বেউটে সাপ বাচ্চাদের ধরাতে গিয়ে বৈদ্য নিজের প্রাণ দিয়েছে। দুষ্ট বুদ্ধি দিয়ে অপরের ক্ষতি করতে চাইলে তার ফল এই হয়।'



শ্বেতকেতু জাতক

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব ছিলেন এক সুপণ্ডিত আচার্য। তাঁর কাছে পাঁচশ ব্রাহ্মণ সন্তান বেদ পড়তে আসত। এই পাঁচশ জনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল শ্বেতকেতু। শ্বেতকেতুর জাত-পাত নিয়ে খুব গর্ব ছিল। নিজে উঁচু ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিল বলেই হয়ত এ ব্যাপারে তার গুমোর ছিল।

গুরুভাইদের সঙ্গে শ্বেতকেতু একদিন বারাণসী নগরের বাইরে গিয়েছিল। ফেরার সময় দেখল সামনে এক চণ্ডাল বসেছে। শ্বেতকেতু তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে হে?' চণ্ডাল জবাব দিল, 'আমি চণ্ডাল।'

শ্বেতকেতু ভাবল, 'চণ্ডাল তো আগে আগে চলেছে, ওর গায়ে লেগে বাতাস অশুচি হচ্ছে, পরে সেই বাতাস আমার গায়ে লেগে আমাকেও অশুচি করছে।' সেজন্য শ্বেতকেতু চিৎকার করে উঠল, 'বেটা পাজি চণ্ডাল, রাস্তা ছাড়। তোর মুখ দেখলে অযাত্রা।' এই বলে সে ছুটে চণ্ডালের সামনে চলে গেল। আগে আগে হাঁটতে লাগল।

চণ্ডালও ছাড়ার পাত্র নয়। সে-ও ছুটে সামনে চলে গেল। চিৎকার করল, 'মর ব্যাটা!'

চণ্ডাল॥ তুমি কে হে বাপু?



শ্বেতকেতু ॥ ব্রাহ্মণ কুমার।

চণ্ডাল ॥ তাহলে তো শাস্ত্র জান।

শ্বেতকেতু ॥ জানি বৈকি।

চণ্ডাল ॥ তাহলে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে নিশ্চয়ই।

শ্বেতকেতু ॥ নিশ্চয়ই।

চণ্ডাল তখন শ্বেতকেতুর সঙ্গী বালকদের ডেকে বলল, 'দেখ, এ বলছে আমার কথার জবাব দিতে পারবে। যদি জবাব দিতে পারে আমি রাস্তা ছেড়ে দেব। না পারলে কিন্তু আমার দু পায়ের ফাঁক দিয়ে ওকে গলে যেতে হবে।'

চণ্ডাল ॥ ব্রাহ্মণ কুমার, দিক বললে কি বোঝায়?

শ্বেতকেতু ॥ দিক মানে তো পূর্ব পশ্চিম এই সব

চণ্ডাল ॥ তুমি জান না।

এই বলে চণ্ডাল শ্বেতকেতুকে জোর করে ধরে নিজের দু পায়ের ফাঁকের মধ্যে চেপে ধরল।

শিষ্যরা ফিরে এসে বোধিসত্ত্বকে সব জানাল। বোধিসত্ত্ব শ্বেতকেতুকে ডেকে বললেন, 'দেখ বাছা, ঐ চণ্ডাল পণ্ডিত। সে তোমাকে কোন সাধারণ দিকের কথা জিজ্ঞেস করে নি। সে জিজ্ঞেস করেছে অন্য দিকের কথা। বাবা-মা হল পূর্ব দিক, দক্ষিণ দিক হল আচার্যের দিক, সু-গৃহস্থ হল উত্তম দিক, যাঁর কাছে থাকলে অপার আনন্দ লাভ করা যায় সে হল শ্রেষ্ঠ দিক।'



শ্বেতকেতু তখন রাগে জ্বলছে। সে অপমান ভুলতে পারছে না। তাই ঠিক করল, 'আমি আর এখানে থাকব না।' সে তখন তক্ষশিলায় চলে গেল। সেখানে এক পণ্ডিতের কাছে নানা বিষয়ে পড়াশুনো করল।

তারপর সে একা একা নানা জায়গায় ঘুরে নানা সম্প্রদায় ও পণ্ডিতের কাছে অনেক কিছু শিখল। শেষ পর্যন্ত তপস্বী হল। একবার এক গ্রামে গিয়ে সে পাঁচশ তপস্বীর দেখা পেল। তাদের কাছে গিয়ে শ্বেতকেতু অনেক কিছু শিখল।

একদিন ঐ পাঁচশ তপস্বীকে সঙ্গে নিয়ে শ্বেতকেতু বারাণসীর

বাজদববাবে গেল। বাজা তপস্বীদেব দেখে খুব খুশি হলেন। তাদেব থাকার জন্য নিজেব বাগান ছেড়ে দিলেন। বাজা একদিন তপস্বীদেব যত্নআত্তি কবে খাওযালেন। তাবপর বললেন, 'আজ আপনাদেব



কাছে যাব।'

শ্বেতকেতু তপস্বীদের বলল, 'দেখ, আজ বাজা আসবেন। তোমবা নানাবকম ভেল্কি আব তপস্যা দেখিযে বাজাকে খুশি কববে। তাহলে জীবনে তোমাদেব কোন কিছুব অভাব হবে না।'

বিকেলে বাজা এসে তপস্বীদেব নানাবকম ভেল্কি দেখে মুগ্ধ হযে গেলেন। বাজাব সঙ্গে ছিল বাজাব পুবোহিত। বাজা পুবোহিতকে বললেন, 'এঁবা সত্যি মহান। কত শাস্ত্র পডেছেন।'

মহাবাজ, শুধু শাস্ত্র পডলেই সব হয না।

কেন?

পাপে লিপ্ত থাকলে শাস্ত্রে কি হবে?

শ্বেতকেতু দেখল এই পুবোহিতটাব জন্যই সব পণ্ড হল। বাজা আব আমাব মত তপস্বীদেব পছন্দ কবছেন না। সব কিছুব জন্য দাযী এই পুবোহিত। এইসব ভেবে শ্বেতকেতু একদিন পুরোহিতেব সঙ্গে শাস্ত্র নিযে তর্ক করতে গেল।

শ্বেতকেতু॥ শাস্ত্র না জানলে সত্য জানা যায না।

পুবোহিত॥ কিন্তু চবিত্র?

শ্বেতকেতু॥ সংযম চবিত্র এসব সত্যেবই লক্ষণ।

পুবোহিত॥ দেখ শাস্ত্র কীর্তি দেয, শান্তি দেয না।

শ্বেতকেতু॥ তাহলে শান্তি কে দেয?

পুবোহিত॥ চবিত্র আব সংযম।

শ্বেতকেতু হাব মানল। রাজা ঐ তপস্বীদেব গৃহী হতে বললেন। সৈন্যবাহিনীতে তাদেব কাজ দেওযা হল।

দরীমুখ জাতক

অনেককাল আগে রাজগৃহ নগরে মগধরাজ রাজত্ব করতেন। বোধিসত্ত্ব তখন মগধরাজের বড় ছেলে হয়ে জন্মান। বোধিসত্ত্বের নাম রাখা হল ব্রহ্মদত্তকুমার।

ব্রহ্মদত্তকুমার যেদিন জন্মান ঠিক সেই দিনই রাজপুরোহিতেরও একটি ছেলে জন্মায়। পুরোহিতের ছেলের মুখটি খুব সুন্দর হয়েছিল। তার নাম রাখা হল দরীমুখ।

দুজনেই রাজবাড়িতে থেকে বড় হতে লাগল। দুজনের মধ্যে খুব



ভাবও হল। একজন আরেকজনকে ছেড়ে থাকতে পারে না। যথা বয়সে দুজনে তক্ষশিলায় গেল লেখাপড়া শিখতে। সেখানে নানা বিষয়ে পণ্ডিত হয়ে তারা আরও জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে তারা বারাণসীতে এল। মন্দিরে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকালে ভিক্ষে করতে বেরোল। এক গৃহস্থের বাড়িতে সেদিন শাস্ত্রপাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। কুমাররা সেই বাড়িতে গেলে বাড়ির লোকজন তাদের ব্রাহ্মণ মনে করে ভেতরে নিয়ে গেল।

বোধিসত্ত্বকে বসতে দিল শুদ্ধ সাদা আসনে। আর দরীমুখকে বসাল লাল কম্বলের ওপর। দরীমুখ এ থেকে টের পেল সেদিনই তার বন্ধু বারাণসীর রাজা হবে এবং সে নিজে হবে তার সেনাপতি।

তারা রাজার বাগানে ফিরে এসে জপতপ শুরু করল। এ ঘটনার

সাতদিন আগে বারাণসীরাজের মৃত্যু হয়েছে। রাজপুরোহিত শেষকৃত্য করেছেন। রাজার কোন ছেলে ছিল না। সেজন্য পুরোহিত সুসজ্জিত রথ সাতদিন ধরে বের করেছেন। রথ নিজে রাজা খুঁজে নেবে বলে।

যাই হোক, সেই রথ এসে রাজার বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাজকেরা বাজনা বাজাতে লাগল। দরীমুখ বুঝল তার বন্ধু এবার রাজা হবে। কিন্তু ভাবল, 'আমার আর ঘরসংসার করার মানে হয় না।' তাই বোধিসত্ত্বকে না জানিয়েই সে লুকিয়ে পড়ল।

রাজপুরোহিত ঘুমন্ত বোধিসত্ত্বের পা দেখে বুঝলেন, লোকটা সামান্য নয়। কিন্তু বোধিসত্ত্বের মতিগতি তিনি জানেন না। সেটা পরখ করার জন্য রাজকদের বললেন, 'জোরে বাজাও।'

বোধিসত্ত্বের ঘুম ভেঙ্গে গেল। এইসব কাণ্ডে বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। একসময় পুরোহিত তাঁকে সব কিছু খুলে বললেন। বোধিসত্ত্ব তখন রথে উঠলেন।

পুরোহিত বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'প্রভু, এ রাজ্য আপনার। এখন আপনি দায়িত্ব নিন।' বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, 'রাজা কি কোন ছেলে রেখে গিয়েছেন?' পুরোহিত বলল, 'না।' বোধিসত্ত্ব তখন রাজা হতে সম্মত হলেন।

ওদিকে বোধিসত্ত্ব চলে যাওয়ার পর রাজার বাগান জনহীন হল। দরীমুখ তখন তপস্যায় বসল। একটু পরে দরীমুখের কোলের ওপর



একটা শুকনো পাতা ঝড়ে পড়ল। শুকনো পাতাটি হাতে নিয়ে দরীমুখ ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে উপলব্ধি করল, শুধু এই পাতাই নয়, সমস্ত পদার্থই ক্ষয়ের বশীভূত। সব কিছুই একদিন বিনষ্ট হয়।

এই অবধি ভাবা মাত্র দরীমুখের শরীর ও মন থেকে সংসারী মানুষের সমস্ত চিহ্ন মিলিয়ে গেল। কিন্তু শরীর ও মনে সে প্রবল তপস্যাবল অনুভব করল। সে হিমালয়ের পাদমূলে এক গুহায় চলে গেল।

ওদিকে বোধিসত্ত্ব যথাসময়ে বিষয়সুখ ভোগ করতে লাগলেন। এক এক করে চল্লিশ বছর কেটে গেল। এর মধ্যে একবারের জন্যও তিনি বন্ধু দরীমুখের কথা ভাবেন নি। ঠিক চল্লিশ বছর পরে বন্ধুর কথা তাঁর মনে এল।

বোধিসত্ত্ব বন্ধুকে দেখার জন্য উদগ্রীব হলেন। কর্মচারীদের নানা দিকে পাঠালেন দরীমুখের খোঁজ করতে। কিন্তু একে একে সবাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

বোধিসত্ত্ব যখন দরীমুখের কথা ভাবছিলেন, তখন তপস্যাবলে দরীমুখও তা জানতে পারল। বন্ধুকে শিক্ষা দেবার জন্য সে তখুনি বারাণসীরাজের বাগানে এল। একদিন বাগানে দরীমুখকে দেখে এক প্রহরী তার পরিচয় জানতে চাইল। দরীমুখ নিজের নাম বলল। প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে বোধিসত্ত্বকে খবর পাঠাল।

বোধিসত্ত্ব এসে দরীমুখের পায়ের কাছে বসে সঠিক ধর্মকথা শুনলেন। দরীমুখ তাঁকে খুব অনুরোধ করল বিষয়-বিষ ত্যাগ করে ধর্মকর্ম করতে। কিন্তু বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি বিষয়ের দাস হয়ে গেছি। বিষয় ছাড়লে মরে যাব।' দরীমুখ আরও বহু ধর্মকথা বলে ইচ্ছাশক্তিতে আকাশে উঠে হিমালয়ের দিকে যাত্রা করল।

তারপর বোধিসত্ত্ব পোশাক আসাক খুলে ফেলে সামান্য চিরবস্ত্র ধারণ করে বললেন, 'আমার অনেক বয়স হয়েছে, আমিও তপস্যা করতে চললাম।'



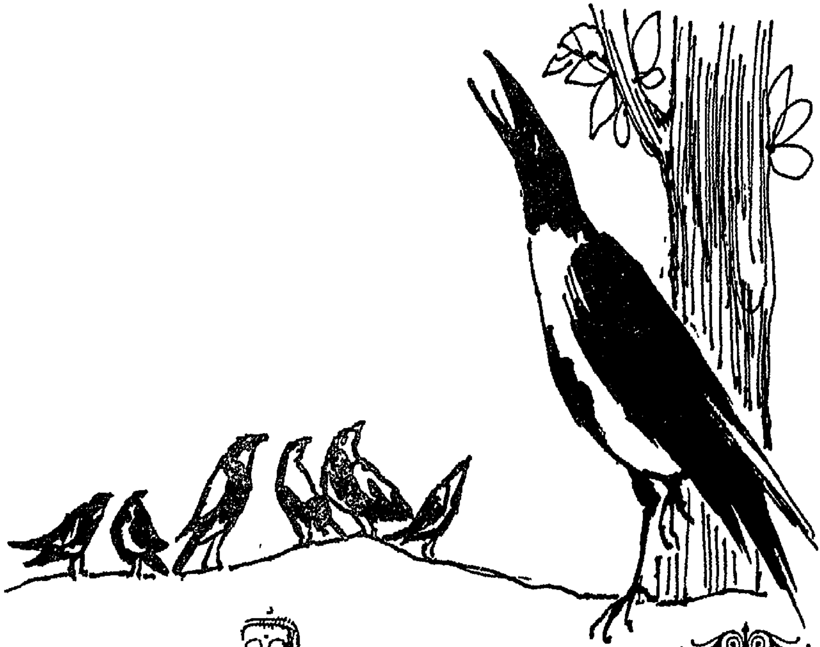
ধর্মধ্বজ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার পাখি হয়ে জন্মান। তখন তিনি পাখিদের সঙ্গে এক দ্বীপে বাস করতেন।

একবার কাশীর কয়েকজন বণিক নৌকো করে সমুদ্রে যাচ্ছিল। মাঝপথে নৌকো ডুবে গেল। ঐ নৌকোয় একটা কাক ছিল। সে নিজের চেষ্টায় দ্বীপে এসে উঠল। কাক দ্বীপে এসে দেখল দ্বীপটিতে শুধু পাখি আর পাখি।

তখন সে ফন্দি করল পাখির ডিম আর পাখির ছানা খেয়ে মজায় দিন কাটাবে। এই ভেবে সে পাখি আর পাখির ছানায় বোঝাই একটা গাছের তলায় গেল। সেখানে এক-ঠেঙে হয়ে, মুখ ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রইল।

পাখিরা খানিকক্ষণ তা দেখল। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'কাকটা তো আচার্য!' তখন তিনি কাকের সঙ্গে আলাপ করলেন। কাক বলল, 'আমি এক-ঠেঙে হয়েআছি কেননা এই পৃথিবী আমার দু পায়ের ভর সহ্য করতে পারবে না। আর হাঁ করে বাতাস খাচ্ছি। আমি প্রাণী বধ করি না, তরুলতাও খাই না। বাতাস খেয়ে বেঁচে থাকি।'





সমস্ত পাখি তখন কাককে ঘিরে ধরল। তাকে ধার্মিক ভেবে তার হাতে নিজেদের শাবক আর ডিমগুলো রক্ষার ভার দিয়ে চড়তে বেরোল। প্রথমদিন ফিরে এসে দেখল, ডিম আর শাবক কমে গেছে। রোজই এরকম ঘটতে থাকল। বোধিসত্ত্বকে তারা ঘটনাটার কথা জানাল।

তখন বোধিসত্ত্ব হিসেব করে দেখলেন কাক আসার পর থেকেই এ রকম ঘটছে। তারপর একদিন তিনি চড়তে যাবার ছুতো করে কিছু দূর উড়ে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন কাকটা বেজায় আনন্দে পাখির ডিম আর ছানাগুলোকে খাচ্ছে।

বোধিসত্ত্ব কিছুই বললেন না। সব পাখি ফিরে এলে গোপনে তাদের সবাইকে সব বৃত্তান্ত জানালেন। তখন সবাই মিলে কাকটাকে থেঁৎলে মেরে ফেলল।

নীতিকথা ঃ অন্যায় করলে শাস্তি পেতেই হবে।



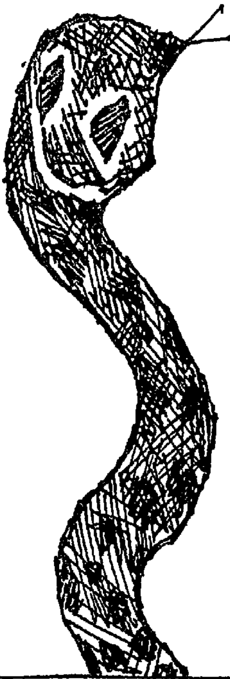
খরপুত্র জাতক

বারাণসীতে একসময় সেনক রাজা রাজত্ব করতেন। বোধিসত্ত্ব তখন শক্র ছিলেন। মানে, দেবতা। একবার সেনক নিজের বাগানে. বেড়াতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ শুনতে পেলেন, গ্রামের ছেলেরা নাকি একটা সাপকে মারতে চেষ্টা করছে। শুনে সেনক তাঁর কর্মচারীদের বললেন, ছেলেগুলোকে ঠেকাও। সাপটাকে চলে যেতে দাও।'

ছেলেগুলোর হাত থেকে নিস্তার পেয়ে সাপ চলে গেল।

মুক্ত ঐ সাপটি কিন্তু সামান্য সাপ ছিল না। সে ছিল স্বয়ং নাগরাজ। প্রাণ ফিরে পেয়ে নাগরাজ সেনকের ওপর খুব খুশি হলেন। রাতে রাজার ঘরে নাগরাজ এলেন। সেনককে তিনি অনেক ধনরত্ন দিলেন। আর বললেন, 'রাজা, তোমার দয়াতেই আমি বেঁচেছি। তোমার সঙ্গে আমার চিরদিন বন্ধুত্ব থাকবে।'

নাগরাজ তারপর রাজা সেনকের দরবারে নাচার জন্য এক নাগিনীকে পাঠালেন। রাজার হাতে নাগকন্যাকে তুলে দিয়ে নাগরাজ বলে গেলেন, 'এ হল নাগকন্যা। এখন যেমন একে মানুষীরূপে দেখছ সব সময় এর কিন্তু এই রূপ থাকবে না। ইচ্ছে করলেই সে আবার নাগকন্যা হয়ে যেতে পারবে। তোমাকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, তার জোরে এ যেখানেই যাক তুমি তাকে দেখতে পাবে।'



তারপর থেকে নাগিনী নাচগান করে রাজাকে খুশি করত। একদিন পাতালের এক বিষধর সাপকে দেখে নাগকন্যার খুব নাচতে ইচ্ছে করল। সে রাজাকে ছেড়ে ঐ সাপের কাছে চলে গেল। রাজা সেনক নাগকন্যাকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে মনে মনে মন্ত্রটা আওড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলেন নাগিনী ঐ নাগের সঙ্গে নাচছে। রাজার খুব রাগ হল। লাঠি দিয়ে নাগিনীর পিঠে দু-একবার মারলেন।

নাগিনী তখন পাতালে গিয়ে নাগরাজকে দেখাল সেনক রাজা তাকে কিভাবে মেরেছেন। নাগরাজ তা শুনে খুবই চটে গেলেন। কয়েকটা বিষধর সাপকে বললেন রাজার ঘরে যেতে। রাতে রাজা





• যখন ঘুমোবেন বিষধর সাপরা তখন রাজাকে দংশন করবে।

রাতে রাজা রাণীকে বললেন, 'নাগকন্যা আজ একটা কাণ্ড করেছে। নাগরাজ তাকে আমার কাছে দিয়ে দিলেও সে একটা বিষধর সাপের সঙ্গে নাচার লোভ সামলাতে পারে নি। দেখে আমার রাগ হল। হাতের লাঠি দিয়ে তাকে খুব মারলাম। তারপর থেকে তাকে আর দেখতে পাচ্ছি না। হয়ত সে নাগরাজকে গিয়ে সত্যি-মিথ্যে অনেক কিছু বলেছে। এখন কি হয় দেখ।'

বিষধর সাপরা রাজার মুখে এই কথা শুনে নাগরাজের কাছে ফিরে গেল। নাগরাজ সব শুনে নিজে এলেন সেনকের সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করে তাঁকে বললেন কি ভুল তিনি করতে যাচ্ছিলেন। তারপর বললেন, 'রাজা, আমি তোমাকে এমন এক মন্ত্র শেখাব যার বলে তুমি জীবজগতের সমস্ত প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারবে। কিন্তু সেই মন্ত্র তুমি কাউকে শেখাতে পারবে না। শেখালেই তুমি আগুনে পুড়ে মারা যাবে।'

যাই হোক রাজা সেনক নাগরাজের কাছ থেকে সেই গোপন মন্ত্র শিখে নিলেন। একদিন রাজা মধু দিয়ে রুটি খাচ্ছিলেন। পাশে রাণী বসে আছেন। দু-এক ফোঁটা মধু পড়েছিল মেঝেতে। রাজা দেখলেন একটা পিঁপড়ে চিৎকার করতে করতে মধুর দিকে ছুটে আসছে: 'ওরে রাজার মধুর হাঁড়ি ভেঙে গেছে। কে কত খাবি আয়।' শুনে রাজা হাসছিলেন। রাণী জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, হাসছেন কেন?' রাজা কোন জবাব দিলেন না।



খাওয়ার পর রাজা বিশ্রাম করছেন। পাশে রাণী বসে আছেন। এমন সময় রাজা দেখলেন একটা মৌমাছি আরেকটা মৌমাছিকে বলছে, 'চল, আমরা একটু বাগানে ঘুরে বেড়াই।' শুনে সেই মৌমাছিটা বলল, 'একটু পরে রাজাকে চন্দন আর সুগন্ধী মাখান হবে। তখন মাটিতে সুগন্ধীর গুঁড়ো পড়বে। আমরা দুজনে ঐ গুঁড়ো মেখে বেড়াতে যাব, কেমন।' ওদের এই কথা শুনে রাজা আবার হাসলেন। রাণী বললেন, 'মহারাজ, হাসছেন কেন?' রাজা বললেন, 'এমনি, কিছু নয়।' রাণী তখন বললেন, 'মহারাজ আমার কাছে কিছু লুকোতে চাইছেন।

আমি কি এতই ভাগ্যহীনা হলাম যে আপনার মনের কথা জানতে পারব না?' রাজা তবু মুখ খুললেন না। রাতে খাওয়ার সময় আবার একটা পিঁপড়ে তার সঙ্গীকে ডেকে বলল, 'ঐ দেখ রাজার ভাঁড়ার ভেঙ্গে পড়েছে। কত ভাত, খাওয়ার লোক নেই।' আসলে রাজার থালার পাশে দু-একটা ভাত পড়েছিল মাত্র। ফলে রাজা আবার হেসে ফেললেন। রাণী এবার নাছোড়বান্দা।

মহারাজ, আপনি বলবেন কি বলবেন না।

কিছু নয়, তেমন কিছু নয়।

আপনি যদি না বলেন

বেশ বলছি, শোন।

রাজা তখন মন্ত্রের কথা বললেন। বললেন পোকামাকড়ের এইসব কথা শুনেই রাজার হাসি পেয়েছে। রাণী তখন বায়না জুড়ে দিলেন



আমাকে শেখাও।

ও কথা বোলো না।

কেন?

তাহলে আমাব মৃত্যু হবে।

আমি জানি না।

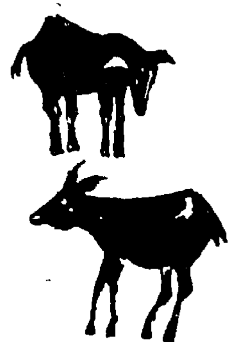
আমাব মৃত্যু হবে, তবু শিখবে?

শেষ পর্যন্ত বাজা বাজি হলেন। দেববাজ শক্র সেনক বাজাব এই ভযঙ্কব ইচ্ছে টেব পেযে ভাবলেন, 'বাজাকে আমি ছাড়া কেউ বাঁচাতে পাববে না।' অসুব কন্যা সুজাকে সঙ্গে নিযে শক্র মর্ত্যে এলেন। সুজা আব শক্র দুজনে ছাগল সেজে বাজাব সামনে এলেন।

বাজা তখন বথে চডে বাগানে বেডাতে যাচ্ছিলেন। ছাগলরূপী শক্র আব সুজাকে চিনতে না পাবলেও ছাগলদুটিকে বাজা দেখতে পেলেন। কিন্তু আব কেউ তাদেব দেখতে পেল না, একমাত্র বাজাব সৈন্ধব গর্দভ ছাড়া।

ছাগলদুটো বাজাব বথেব সামনে এসে বিশ্রি গুঁতোগুঁতি শুরু কবে দিল। তা দেখে বাজবথেব সৈন্ধব গর্দভ বলল, 'ছাগল বোকা জানতাম, কিন্তু বথেব সামনে গুঁতোগুঁতি কবে প্রাণ দেয, এত বোকা বলে জানতাম না।'

শুনে ছাগলরূপী শক্র বললেন, 'আব বড়াই কবো না। দডি দিযে বেঁধে বাখে, তবু ছাড়া পেলে পালাও না। ওই জন্যই লোকে গাধা বলে। তুই তো মূর্খ বটেই। তবে বাজা যে বথে চডে বসেছে সে আবো মূর্খ।' গাধা তাতে বলল, 'আমাকে মূর্খ বলছিস তাতে আপত্তি নেই, গাধাদেব সবাই মূর্খ বলে। কিন্তু কোন্ সাহসে তুই বাজাকে মূর্খ বলিস?' এ কথা শুনে ছাগরূপী শক্র বললেন, 'এই মূর্খ বাজা বৌ-কে মন্ত্র শেখাবে বলছে। অথচ ও মাবা গেলে বাণী কি আব এব বৌ থাকবে?'



বাজা ছাগরূপী শক্রব কথায হুঁশ ফিবে পেলেন। তিনি শক্রব পবিচয জানতে চাইলেন। শক্র সব কথা খুলে বললেন।

বাজা ফিবে এসে বাণীকে বললেন, 'মন্ত্র শিখবে তো সব আযোজন কবে ফেল।' বাণী বলল, 'কি কি আযোজন মহাবাজ?' 'কসাইকে

ডাকিয়ে আন। মন্ত্র শেখাব আগে একশ ঘা চাবুক খেতে হবে', রাজা বলল। শুনে রাণী সেই ব্যবস্থাই করল। কিন্তু দু-চার ঘা চাবুক খেতেই রাণী বলল, 'মহারাজ, ছেড়ে দিন, আমি শিখব না।' রাজা বললেন, 'তা কি হয়, আমি মারা যাব জেনেও তুমি মন্ত্র শিখতে চেয়েছিলে, তোমাকে শিখতেই হবে।' চাবুকে চাবুকে রাণীর পিঠের চামড়া উঠে গেল।

সে আর জীবনে কখনও মন্ত্র শিখতে চায় নি।



সুতনু জাতক

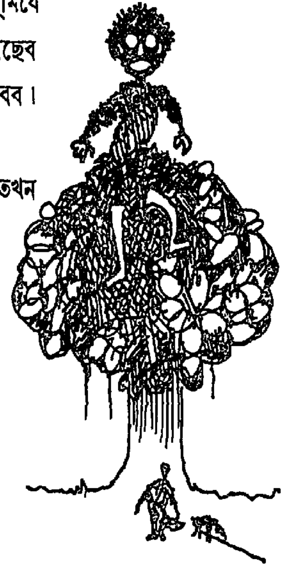


ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার খুব গরীবঘরে জন্ম নেন। বোধিসত্ত্বের নাম রাখা হল সুতনু। বড় হয়ে সুতনু মজুর খেটে বাবা-মাকে খাওয়াতেন। বাবা মারা গেলে সুতনু মাকে নিয়ে থাকতেন।

বারাণসীর রাজার শিকারের খুব নেশা ছিল। একবার বহু লোক-লস্কর নিয়ে রাজা শিকারে গিয়েছেন। একটা হরিণকে তাড়া করে রাজা তীর ছুঁড়লেন। হরিণটা ছিল চালাক। সে এমনভাবে পড়ে গেল যেন তীরবিদ্ধ হয়েছে। রাজা তীরধনুক রেখে ধরতে যেতেই হরিণ সঙ্গে সঙ্গে উঠে পালাতে লাগল। রাজার অনুচর এ রকম মজার কাণ্ড দেখে হাসি সামলাতে পারল না। রাজা তাতে খুবই অপমান বোধ করলেন। তিনি হরিণের পেছনে তাড়া করে চললেন।

ছুটতে ছুটতে রাজা হরিণের নাগাল পেলেন। খড়গ দিয়ে হরিণকে দু টুকরো করে ফেললেন। তারপর বাঁকে করে জল নেওয়ার মত হরিণের দেহটা লাঠির দু পাশে বেঁধে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চললেন। অনেকটা হাঁটার পর রাজা খুব অবসন্ন হয়ে পড়লেন।

সামনেই একটা বটগাছ ছিল। রাজা বটের ছায়ায় বসে জিরিয়ে নিতে লাগলেন। ক্লান্তিতে তাঁর চোখ বুঁজে এল। রাজা ঘুমিয়ে পড়লেন। ঐ বটগাছে মহাদেব নামে এক যক্ষ জন্মেছিল। ঐ গাছের ছায়ায় যে আসত তাকেই খাওয়ার অধিকার ছিল মহাদেবের। বৈশ্রবন মহাদেবকে এই বর দিয়েছিলেন।



রাজা ঘুম থেকে উঠে যখন চলে যেতে উদ্যত হয়েছেন, তখন মহাদেব তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

দাঁড়াও।

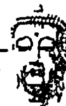
কেন?

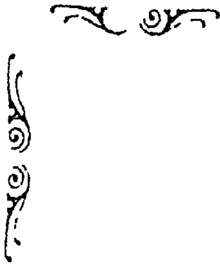
তুমি আমার খাবার।

তুমি কে?

আমি যক্ষ, এই গাছে থাকি।

যক্ষ আরও বলল, 'এই গাছের ছায়ায় যে আসবে তার নিস্তার







নেই।' রাজা প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও পরে বুদ্ধি করে বললেন, 'তুমি কি শুধু আজকের খাবারটা নিয়েই চিন্তিত, নাকি রোজই খেতে চাও?'

পেলে তো রোজই খাই।

তাহলে আজ হরিণের মাংস খাও।

তারপর?

আমি রোজ তোমাকে খাদ্য পাঠাব।

তুমি কে?

বারাণসীর রাজা।

খাবার না পাঠালে কিন্তু তোমাকে খেয়ে আসব।

রাজা তো নিজের প্রাণ নিয়ে ফিরলেন। কিন্তু এখন কি উপায়। অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, কয়েদখানা থেকে রোজ একজন করে কয়েদীকে পাঠানো হবে। বন্দীরা জানত না যে তারা যক্ষের কাছে যাচ্ছে। তারা ভাত-তরকারি নিয়ে বনে যেত। আর যক্ষ তাদের খেয়ে ফেলত।

এভাবে কয়েদখানা খালি হয়ে গেল। আর লোক পাওয়া যাচ্ছে না। রাজার অমাত্য বলল, 'প্রভু, চিন্তা করবেন না, প্রাণের আশার থেকেও লোকের ধনের আশা অনেক বেশি।' অমাত্যর পরামর্শ অনুসারে হাতির মাথায় হাজার টাকার থলে রেখে ভেরী বাজিয়ে ঘোষণা করা হল, যে যক্ষের জন্য খাবার নিয়ে যাবে ঐ হাজার টাকা সে পাবে।





সুতনু ভাবলেন, 'আমরা গরীব, মার কত কষ্ট। আমি এই টাকাটা নিলে মার দুঃখ ঘোচে।' শুনে তাঁর মা কেঁদে ভাসাল। কিন্তু সুতনু রাজার কাছে গেলেন। বললেন, 'মহারাজ, আমি যাব।'

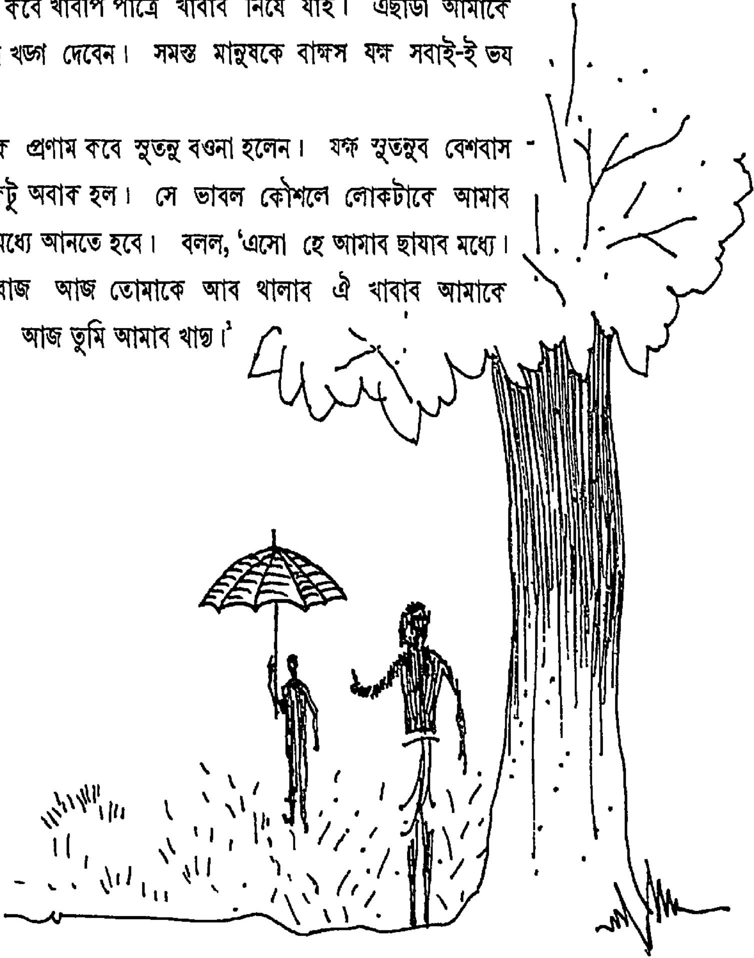
তোমার কি কি চাই বল।

পাদুকা, রাজছত্র, সোনার থালা।

রাজা জানতে চাইলেন, 'কেন, এগুলো দিয়ে কি করবে?'

সুতনু বললেন, 'মহারাজ, আমি খড়ম পায়ে দিলে যক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়েছি বলতে পারবে না। মাথায় ছাতা থাকলে ঐ আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছি তাও বলতে পারবে না। আর শাস্ত্র জানা প্রাজ্ঞ হয়ে কি করে খারাপ পাত্রে খাবার নিয়ে যাই। এছাড়া আমাকে আপনার খড়্গ দেবেন। সমস্ত মানুষকে রাক্ষস যক্ষ সবাই-ই ভয় পায়।'

মাকে প্রণাম করে সুতনু রওনা হলেন। যক্ষ সুতনুর বেশবাস দেখে একটু অবাক হল। সে ভাবল কৌশলে লোকটাকে আমার ছায়ার মধ্যে আনতে হবে। বলল, 'এসো হে আমার ছায়ার মধ্যে। বারাণসীরাজ আজ তোমাকে আর থালার ঐ খাবার আমাকে দিয়েছে। আজ তুমি আমার খাদ্য।'





সুতনু বললেন, 'খেতে পার। কিন্তু এতে তোমাবই ক্ষতি হবে। এবপব প্রাণেব ভযে আব কেউই তোমাব খাবাব বযে আনবে না।'

যক্ষ সুতনুব কথাব মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেল। সে বলল, 'ঠিকই বলেছ, তোমাকে আমি খাব না। খাবাব দাবাব বেখে তুমি ফিবে যাও। তোমার মা কাঁদছে।'

সুতনু কিন্তু এতে থামলেন না। যক্ষকে বোঝালেন, 'পাপেব ফলে তুমি যক্ষ হয়ে জন্মেছ। এ জন্মে পুণ্য কর্ম না কবে যদি প্রাণীহত্যা কবে যাও তোমাব উদ্ধাব নেই। তাব চেয়ে তুমি শীল ব্রত গ্রহণ কব। আমাব সঙ্গে চল। নগবদ্বাবে থাকবে। শুদ্ধ জীবন কাটাবে।'

সুতনুব সঙ্গে যক্ষ নগবদ্বাবে এল। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বাজা দেখতে এলেন। যক্ষ যাতে রোজ ভালো খাবাব পায সে ব্যবস্থা করে বাজা সুতনুকে নিজেব সেনাপতি কবলেন।



মনোজ জাতক

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব একবার সিংহ হয়ে জন্মান। বয়সকালে তিনি এক সিংহীকে বিয়ে করলেন। তাদের দুটি সন্তান হল। একটি সিংহ, অপরটি সিংহী।

বোধিসত্ত্ব ছেলের নাম রাখলেন মনোজ। মনোজ দিনে দিনে বড় হল। ওদিকে বোধিসত্ত্ব আর তাঁর স্ত্রীর ক্রমে বয়স হল। এখন তাঁরা শিকার করতে যেতে পারেন না। মনোজ শিকার করে আনে। মনোজও এক সিংহীকে বিয়ে করল। পরিবারে এখন পাঁচজন। মনোজই এই পাঁচজনকে খাওয়ায়।

মনোজ একদিন চরতে গিয়ে দেখল একটা শিয়াল মাটিতে পেট



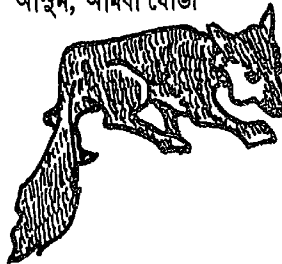
দিয়ে শুয়ে পড়ে আছে। মনোজ জিজ্ঞেস করল, 'কি হে বন্ধু!' শিয়াল তখন বলল, 'প্রভু, আমি আপনার সেবা করতে চাই।' মনোজ শিয়ালকে নিজের গুহায় এল। তাকে দেখে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বাছা, শিয়ালরা খুব ধূর্ত আর খারাপ হয়। তাদের সংস্রবে থেকো না।'

এদিকে শিয়াল একদিন মনে মনে ভাবল, 'অনেক জীবজন্তুর মাংস খেয়েছি কিন্তু কোনদিন ঘোড়ার মাংস খাই নি।' তারপর থেকে শিয়াল মনোজকে প্রায়ই বলতে লাগল, 'প্রভু আসুন, আমরা ঘোড়া ধরে খাই।'

ঘোড়া কোথায় পাব?

বারাণসীর নদীর তীরে।

কি করে?



সেখানে রাজার ঘোড়া জল খেতে আসে।

মনোজ একদিন তাই করল। বোধিসত্ত্ব কিন্তু ঘোড়ার মাংস খেয়ে



মনোজকে বললেন, 'বাছা, সিংহ ঘোড়াব মাংস খায না, খেলে বেশিদিন বাঁচে না। তুমি আর ঘোড়া শিকাব কবো না।'

মনোজ বাবাব কথায় কান দিল না। সে বোজই ঘোড়া শিকাব করতে লাগল। বাবাণসীবাজ ভাবলেন, 'কি কবে সিংহকে ধবা যায?' মন্ত্রীব পরামর্শে বিশাল একটা পাঁচিল তুলে তাব ভেতবে ঘোড়াকে বাখাব ব্যবস্থা কবা হল। এক দক্ষ তীবন্দাজকে নিয়োগ করা হল সিংহকে মাবাব জন্য। তীবন্দাজ পাঁচিলেব অনেক ওপরে মাচা বেঁধে বসে বইল।

মনোজ লাফ দিযে পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘোড়া শিকাব করতে ঢুকল। তীবন্দাজ জানত শিকাব কবতে আসাব সময সিংহ এত তাড়াতাড়ি যাবে যে তখন তীব না ছোঁড়াই ভালো। সে অপেক্ষা কবতে লাগল। ঘোড়া শিকাব কবে ঐ ভাবি জন্তুটাকে পিঠে ফেলে ফিবে যাওয়াব সময় মনোজ খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। তীবন্দাজ তখন এক মোক্ষম তীবে তাব গলা বিঁধে ফেলল। মনোজ আর্তনাদ করে উঠল। শিয়াল কিছুটা দূরে অপেক্ষা কবছিল। সে বুঝল সিংহ বিপদে পড়েছে। নিঃশব্দে সে সরে পড়ল। মনোজ গুহা পর্যন্ত ফিবে এল কোন বকমে। তারপর প্রাণত্যাগ করল।

নীতিকথা ঃ সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নবকবাস।

সূচী জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার কাশীরাজ্যে কামারকুলে জন্মান। বয়সকালে তিনি কামারের কাজ এত ভাল শিখেছিলেন যে তাঁর তুল্য কামার সেই গ্রামে আর একজনও ছিল না। বোধিসত্ত্ব যে গ্রামে থাকতেন তার কিছু দূরে আরেকটি কামার-গ্রাম ছিল। সেখানে এক হাজার ঘর কামার থাকত। তাদের মধ্যে যে সেরা কামার সে রাজবাড়ির কাজ করত। সে খুব ধনী ছিল।

রাজ-কর্মকারের একটি মেয়ে ছিল। সে যেমন সুন্দর, তেমন গুণের আধার। তার রূপগুণের প্রশংসা আশপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। বোধিসত্ত্ব ঐ কুমারীর প্রশংসা শুনে ভাবলেন, 'বিয়ে করলে এ রকম মেয়েকেই বিয়ে করা উচিত। কিন্তু রাজ-কর্মকার যার-তার সঙ্গে তো আর মেয়ের বিয়ে দেবে না। আমাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে সে মুগ্ধ হয়ে যায়।'

বোধিসত্ত্ব তখন এক অতি সূক্ষ্ম অথচ দারুণ শক্ত একটি সূঁচ বানালেন দীর্ঘদিন ধরে। ঐ সূঁচটিকে রাখলেন একটা কোষের মধ্যে। সেই কোষটির জন্য তৈরি করলেন আরকটি কোষ। এভাবে সাতটি কোষ তৈরি করলেন। কিন্তু দেখলে মনে হত কোন কোষ নেই, একটি সূঁচই কেবল আছে। আবার সূঁচটি এমন হালকা যে জলে ফেলে দিলে ভাসে।

তারপর তিনি কোষের মধ্যে রাখা সূঁচটি নিয়ে সেই কামার গ্রামে গেলেন। সেখানে হাঁক পাড়তে লাগলেন, 'সূঁচ নেবে গো, ভালো সূঁচ।'



গ্রামের একজনও সূঁচ সম্পর্কে কোন কৌতূহল দেখাল না। বোধিসত্ত্ব তখন রাজ-কর্মকারের বাড়ির কাছে গিয়ে হাঁক পাড়লেন।

কর্মকারের মেয়ে ঐ সুমধুর স্বর শুনে বেরিয়ে এল, 'কে গো তুমি? কি চাও?'

সূঁচ বিক্রি করতে এসেছি।

এমন আশ্চর্য কথা শুনি নি।

কেন?

কামাবেব গ্রামে কখনও সূঁচ বিক্রি হয ?

যদি ওস্তাদ কামাব থাকে নিশ্চযই হয।

বাজ কর্মকাব দু-একটা কথা শুনতে পেযেছিল। সে মেযেকে ডাকল, 'কাব সঙ্গে কথা বলছিস ?'

ভিনদেশী কামাব।

কি চায ?

কামাব-গ্রামে সূঁচ বিক্রি কবতে চায।

সে কি কথা !

হ্যাঁ বলছে, ওস্তাদ কামাব কেউ থাকলে সে বুঝবে।

শুনে বাজ-কর্মকাব বোধিসত্ত্বকে ডাবল। ভাবল, 'দেখা যাক, যুবক এমন কি কাবিগবি কবেছে।'

যাই হোক অত সূক্ষ্ম সাতটি কোব ও কোবেব মধ্যে যে একটা সূঁচ আছে বাজ-কর্মকাব নিজেও তা ধবতে পাবে নি। বোধিসত্ত্ব ঐ সূঁচ দিযে লোহা ফুটো কবে দিলেন। বাজ-কর্মকাব খুশি হযে নিজেই মেযেকে তাঁব হাতে সম্প্রদান কবল।



আশঙ্কা জাতক

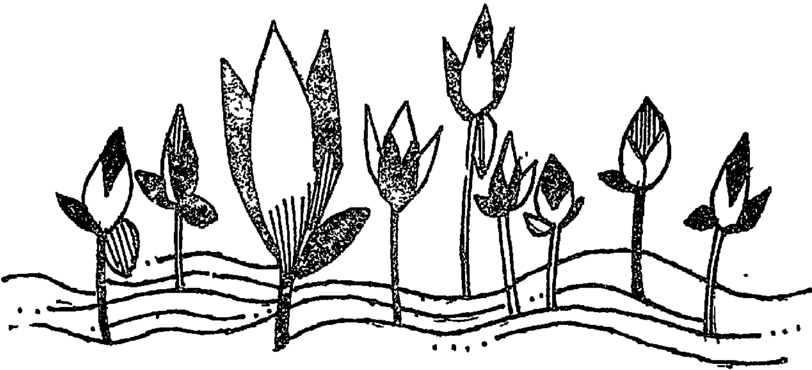


বোধিসত্ত্ব একবার কাশীগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। লেখাপড়া শিখে এক সময় পণ্ডিত হলেন। কিন্তু গৃহধর্মে রইলেন না। তপস্বী হয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন। বনের ফুলমূল খেয়ে জীবনধারণ করতেন।

তখন স্বর্গ থেকে এক দেবী এক পদ্মের গর্ভে মেয়ে হয়ে জন্মান। সরোবরে সব পদ্ম ফুটে পড়ে যায়, কিন্তু ঐ দেবী যে পদ্মে আছেন তার কোন লয়ক্ষয় নেই। পদ্মটি রোজই বিকশিত হয়ে থাকে। বোধিসত্ত্ব এই দৃশ্য দেখে অবাক হলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, 'একবার দেখতে হয়।' পদ্মের কাছে গিয়ে ঐ দেবকন্যাকে পেলেন। মেয়েটিকে বোধিসত্ত্ব নিজের কন্যা হিসেবে গ্রহণ করলেন। যত্ন করে বড় করতে লাগলেন।

একদিন মেয়ের বয়স ষোল হল। দেখতে যেমন সুন্দরী, তেমনি রূপবতী হল। শক্র একদিন বোধিসত্ত্বকে পুজো করতে এসে মেয়েটিকে দেখতে পেলেন। শক্র জানতে চাইলেন, 'মেয়েটি কে?' বোধিসত্ত্ব সব খুলে বলে শক্রকে অনুরোধ করলেন, 'শূন্যে এর জন্য একটি প্রাসাদ বানিয়ে দাও। ভালো খাবার আর সজ্জাও দিও আমার মেয়েকে।'

একবার এক কাঠুরে বোধিসত্ত্বের কাছে মেয়েটিকে দেখতে পায়। মেয়েটি তখন বোধিসত্ত্বের পরিচর্যা করছিল। কাঠুরে বোধিসত্ত্বকে



জিজ্ঞেস করল, 'প্রভু, এই মেয়েটি কে?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এটি আমার মেয়ে।'

কাঠুরে নগরে ফিরে গেল। সে ভাবল এই আশ্চর্য সংবাদ বারাণসীরাজকে দিলে তিনি খুশি হবেন। রাজা তার মুখে ঐ পরমা সুন্দরী কন্যার বৃত্তান্ত শুনে নিজেই বনে এলেন। বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'হে তাপস, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

যদি আমার মেয়ের নাম বলতে পার তবে বিয়ে হবে।

সে আর এমন কি কঠিন কাজ?

বেশ, তবে বল। বলতে পারলে বিয়ে দেব।

রাজা বহু চেষ্টা করে অনেকগুলো নাম বললেন, কিন্তু মিলল না। রাজা এভাবে এক বছর ঐ পরমা সুন্দরী কন্যাকে পাওয়ার জন্য বহু নাম খুঁজে বললেন। শেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে চাইলেন। কন্যা তখন সেই শূন্যের প্রাসাদের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'রাজা, চলে গেলে আমার মত মেয়ে আর কোথাও পাবেন না।'

কন্যা আরো বলল, 'আশার জিনিস পাওয়ার জন্য অতীতে লোকে কত বছরই না চেষ্টা করেছে। আর আপনি মাত্র এক বছরেই অধৈর্য হচ্ছেন?'

রাজা ভাবলেন, 'ঠিক, আরেকটু চেষ্টা করা যাক।' আবার এক বছর গেল, কিন্তু রাজা পারলেন না।

এবার তিনি ঠিক করলেন, 'রাজ্য নষ্ট হচ্ছে, আমি বরং চলে যাই।' এবারও কন্যা এসে নিজের রূপ ও গুণে মুগ্ধ করে তাঁকে আটকে রাখল।



মেয়েটি বলল, 'রাজা, আপনি মাত্র তিন বছরেই ধৈর্যহারা হলেন?'

রাজা বললেন, 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে। খাবার-দাবারও ফুরিয়ে এসেছে।'

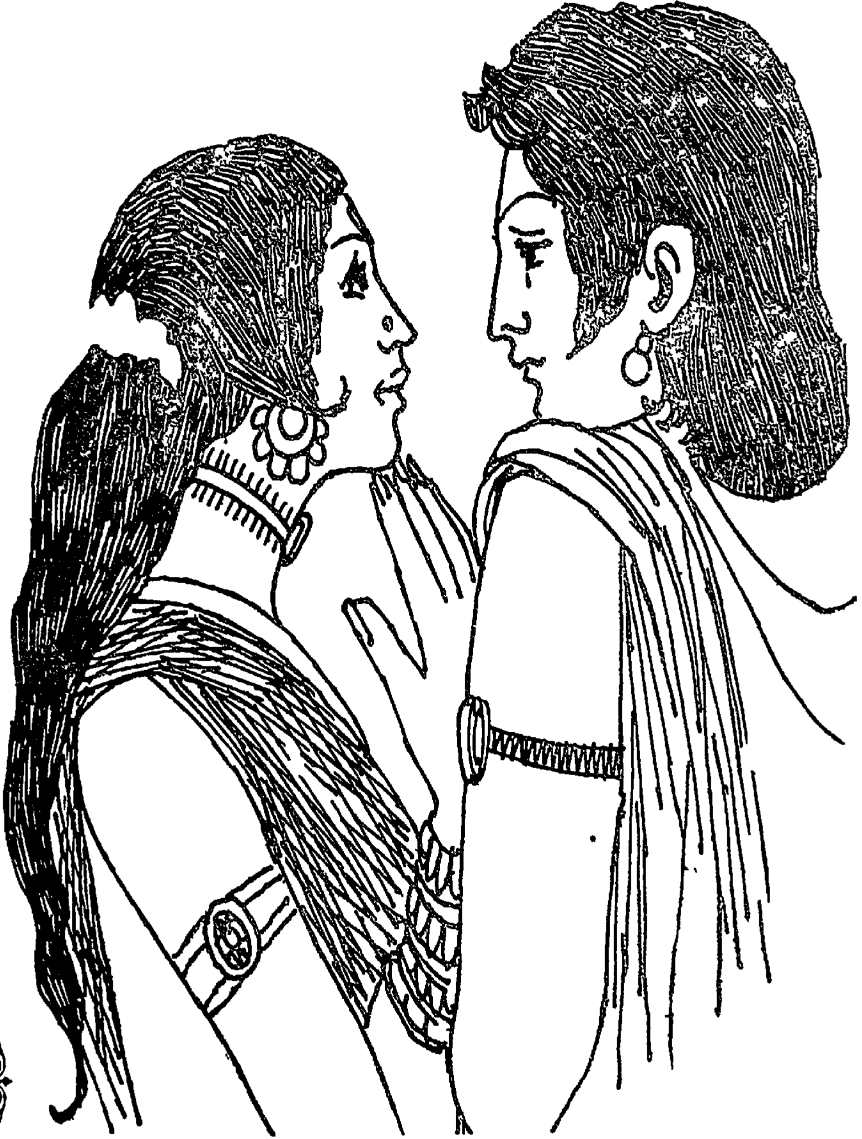
কন্যা তখন বলল, 'মহারাজ, এই মাত্র আপনি আমার নাম বলেছেন। আপনি তো চিনে ফেলেছেন।'

রাজা তখন বোধিসত্ত্বের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনার মেয়ের

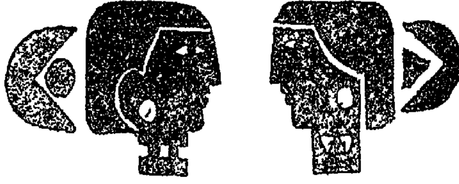


নাম আশঙ্কা।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'যখন মেযেব নাম বলতে পেবেছ তখন মেযে তোমাব হল'। তুমি একে ধর্মপত্নী কর।'

রাজা আশঙ্কাকুমাবীকে নিযে বাবাণসীতে ফিবে গেলেন। সুখে দিন কাটিযে, সুশিক্ষিত ছেলেমেযে বেখে বাজা ও আশঙ্কাকুমাবী দুজনেই একদিন গত হল।



শ্রীকালকর্ণী জাতক



সে অনেককাল আগের কথা। বারাণসীর রাজা তখন ব্রহ্মদত্ত। সেই সময় বোধিসত্ত্ব ছিলেন বণিক। দান-ধ্যান করতেন। বোধিসত্ত্ব একাই যে এ সব পুণ্য কর্ম করতেন তা নয়। তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, চাকরবাকর সবাই ধর্মপথে চলত। এজন্য তাঁদের বাড়ির নাম হয় 'শুচি পরিবার।'

বোধিসত্ত্ব একদিন ভাবলেন, 'অতিথি এলে তো আমার ঘরেই তাঁকে থাকতে দিই। এখন অতিথির চরিত্র যদি আমার চেয়ে শুদ্ধাচারী হয় তাহলে তাঁকে তো এখানে থাকতে দেওয়া ঠিক নয়।' এই ভেবে তিনি বৈঠকখানায় নতুন খাট তোষক পেতে রাখলেন।

ঠিক তখন স্বর্গে বিরূপাক্ষের মেয়ে কালকর্ণী আর ধৃতরাষ্ট্রের মেয়ে শ্রী সাঁতার কাটার জন্য এক হ্রদের কাছে গেল। হ্রদের সামনে পৌঁছে দুজনের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল কে আগে স্নান করবে তা নিয়ে। কালকর্ণী বলল, 'আমি জগৎ শাসন করি, আমিই আগে স্নান করব।' শ্রী বলল, 'মহাজনদের আমিই ঐশ্বর্য দিয়ে থাকি, সুতরাং আমিই আগে স্নান করব।'

কিছুতেই নিষ্পত্তি হচ্ছে না দেখে তারা ধৃতরাষ্ট্র ও বিরূপাক্ষের কাছে গেল। ধৃতরাষ্ট্র আর বিরূপাক্ষ দুজনেই বললেন বৈশ্রবনের কাছে যেতে। কিন্তু বৈশ্রবনও এর মীমাংসা করতে পারলেন না। তখন তারা শক্রের কাছে গেল।

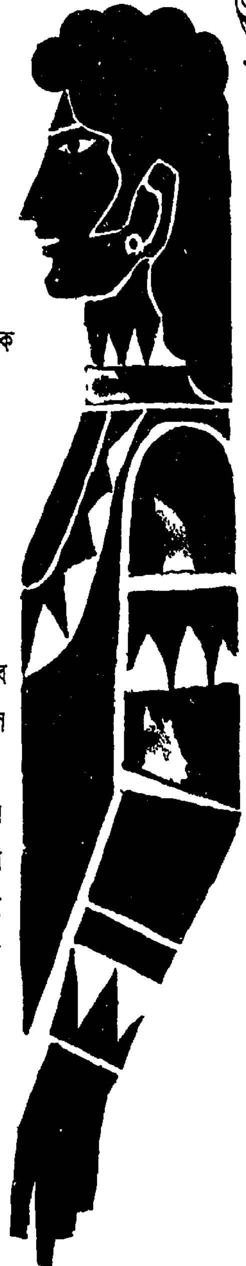
শক্র ভাবলেন, 'এরা আমারই দুই অনুচরের মেয়ে, তাই আমার বিচার করা উচিত নয়।' তিনি তাদের বললেন, 'বারাণসীতে শুচি-পরিবার নামে এক বণিক পরিবার আছে। তোমরা তার কাছে যাও। তার ঘরে একটি নতুন শয্যা আছে অতিথিদের জন্য। যে সেই শয্যায়



আগে জাযগা পাবে সে-ই আগে স্নান কববে।'

কালকর্ণী সঙ্গে সঙ্গে নীল কাপড পবে, সাবা গাযে নীল বং মেখে, নীল মণিবত্নেব গযনা পড়ে শুচি পবিবাব বণিকেব বাড়িব কাছে এসে শূন্যে সংস্থান কবতে লাগল। তাব নীল মালা ফেলতে লাগল বণিকেব





বাড়িতে। মাঝবাতে এই কাণ্ড দেখে বোধিসত্ত্ব বেবিযে এলেন। এক নজবে তাঁর কালকর্ণীকে পছন্দ হল না। মনে হল কুচ্ছিত দেখতে।

ওখানে কে হে তুমি, বসে আছ?

আমি বিরূপাক্ষেব মেযে কালকর্ণী।

কি চাও?

তোমাব কাছে আশ্রয চাইছি।

আগে তোমাব স্বভাব চরিত্র জানি একটু, তাবপব দেখা যাবে।

কালকর্ণী নিজেব সম্পর্কে বলতে লাগল, 'বদবাগী, নিন্দুক ও নিষ্ঠুব লোকেবা আমাব খুব প্রিয।' শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তাহলে এখানে তোমাব জাযগা হবে না।'

কালকর্ণী চলে গেলে স্ত্রী এল। সোনাব ববণ কাপড, সোনাব অলঙ্কাবে সুসজ্জিতা হযে এল। তাকে দেখে বোধিসত্ত্ব তাব পবিচয জানতে চাইলেন। স্ত্রী বলল, 'আমি ধৃতবাষ্ট্রেব মেযে স্ত্রী। তোমাব কাছে আশ্রয চাই।' শুনে বোধিসত্ত্ব কালকর্ণীকে যেমন জিজ্ঞেস কবেছিলেন তেমনি স্ত্রীকেও বললেন, 'তোমাব স্বভাব চবিত্র না জেনে আমি থাকতে দিতে পাবি না।'

স্ত্রী বলল, 'সৎ, পবিশ্রমী, অনিন্দুক, বন্ধুবৎসল ও বিনযী লোকেবাই আমাব প্রিয।'

বোধিসত্ত্ব স্ত্রীকে আমন্ত্রণ কবে ঘবে নিযে এলেন। সেই নতুন শয্যায স্ত্রীকে শযন কবতে দিলেন।



সুবর্ণ কর্কট জাতক

অনেককাল আগে রাজগৃহের পূর্ব দিকে শালিন্দী নামে একটি গ্রাম ছিল। গ্রামটি ব্রাহ্মণদের। বোধিসত্ত্ব সেখানে এক চাষী ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। গ্রামের পূর্ব দিকে তিনি অনেকটা জমিতে চাষ করতেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব চাকরবাকর সঙ্গে নিয়ে চাষ করতে গেছেন। লোকজনকে হাল দিতে বলে নিজে হাত মুখ ধোয়ার জন্য একটা ডোবার কাছে গেলেন। ডোবায় সোনালি রঙের একটি কাঁকড়া থাকত। তার স্বভাবটিও খুব সুন্দর। কাঁকড়াটি বোধিসত্ত্বের কাছে চলে এল। বোধিসত্ত্ব তাকে তুলে নিয়ে কাপড়ের মধ্যে রেখে দিলেন।



কাজ শেষ করে ঘরে ফেরার সময় আবার কাঁকড়াটাকে ডোবায় ছেড়ে দিলেন। এ রকম রোজই চলতে লাগল। ফলে দুজনের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব জন্মাল।

বোধিসত্ত্বের চোখদুটি ছিল খুব সুন্দর। যখন তিনি চারাগাছ দেখতে ক্ষেতে আসতেন তখন এক কাকের বৌ তাঁর চোখদুটো দেখত। শেষে সে তার স্বামী কাককে বলল, 'ঐ ব্রাহ্মণের চোখদুটো আমাকে এনে দাও।' কাক বলল, 'কি করে আনব, অসম্ভব। তা ছাড়া ব্রাহ্মণের চোখ দিয়ে তুমি কি করবে?' কাকের বৌ বলল, 'ঐ চোখদুটো খাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়েছে আমার। চোখ না পেলে আমি মারা যাব।' কাক বলল, 'এ আমি পারব না।'

জানি তুমি পারবে না।

তাহলে?

তালগাছের ঐ কেউটে সাপকে বল।



সে কেন আমাব কথা শুনবে ?

ওকে খুশি কবো।

সেই থেকে কাক কেউটেব ভজনা শুরু কবে দিল। একদিন কেউটে জিজ্ঞেস কবল, 'তুমি কি চাও ?' কাক বলল, 'ঐ ব্রাহ্মণেব চোখ।' কেউটে বলল, 'ঠিক আছে, চিন্তা করো না।'

কয়েকদিন পবে কেউটে জমিব আলেব পাশে লুকিয়ে বইল। বোধিসত্ত্ব এসে প্রথমে ডোবায় হাত-মুখ ধুলেন, তাবপব কাঁকডাকে কোচবে নিলেন। তাবপব ক্ষেতেব দিকে চললেন।

কেউটে ব্রাহ্মণকে আসতে দেখে বিদ্যুৎগতিতে গিয়ে তাঁব পায়ে কামড দিল। ব্রাহ্মণ মাটিতে পডে গেলেন। সাপ ঝোপে লুকিয়ে পডল। বোধিসত্ত্ব পডে যাওয়া মাত্র কাঁকডা বেবিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে কাকও উডে এল। কাক এসে বোধিসত্ত্বেব চোখেব কোটবে ঠোঁট লাগাল, কাঁকডাও সঙ্গে সঙ্গে কাকেব গলা কামডে দিল। কাক বিপদে পডে সাপকে ডাকতে লাগল। সাপ ফণা তুলে ছুটে এলে কাঁকডা আবেক দাঁডা দিয়ে তাব গলাও চেপে ধবল।

সাপ তখন জিজ্ঞেস কবল, 'ওহে কাঁকডা, তুমি তো কাক বা সাপেব মাংস খাও না। তাহলে ওদেব মাবতে চাও কেন ?' কাঁকডা বলল, 'ওই ব্রাহ্মণ আমাব বন্ধু। তোমবা ষডযন্ত্র কবে এঁকে মেবেছ, সেই জন্যই তোমাদেব শেষ কবব।'

সাপ তখন কাঁকডাকে ফাঁকি দেওয়াব জন্য বলল, 'আমাকে ছেডে দাও, দেখি একে বাঁচাতে পাবি কিনা।' কাঁকডা বলল, 'একেবাবে ছেডে দেব না। ঢিলে দিচ্ছি, আগে বিষ তোল, পবে ছেডে দেব।'

সাপ বোধিসত্ত্বেব বিষ তুলে ফেলল। কিন্তু কাঁকডা বলল, 'এবা আমাব বন্ধুব শত্রু। সুযোগ পেলেই বন্ধুকে শেষ কববে।' এই ভেবে সে ছুবিব মত দাঁতেব জোবে দুটোকেই শেষ কবল।







শক্তুভস্ত্রা জাতক



একবার বারাণসীতে জনক নামে এক রাজা ছিল। জনকের আমলে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। তখন তাঁর নাম হয় সেনক। যথাসময়ে সেনক আচার্যের কাছে শাস্ত্র শিখে সুপণ্ডিত হলেন। তারপর বারাণসীতে ফিরে জনক রাজার সঙ্গে দেখা করলেন। রাজা সেনককে অমাত্য পদে নিয়োগ করলেন।

সেই সময় এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বেরিয়ে এক হাজার টাকা পায়। ব্রাহ্মণ ঐ টাকা আরেক ব্রাহ্মণের কাছে জমা রেখে আবার ভিক্ষায় বেরিয়ে যায়। কিন্তু যার কাছে সে জমা রাখল সেই ব্রাহ্মণ টাকাগুলো সব খরচ করে ফেলল। ব্রাহ্মণ ফিরে এলে টাকা শোধ করতে না পেরে নিজের মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিয়ে দিয়ে দিল।

এদিকে ব্রাহ্মণের বৌ ছিল অন্য এক ব্রাহ্মণের বাগদত্তা। সে সেই ভাবী স্বামীকে খুব ভালবাসত। বিয়ের পরেও তার কথা সে ভুলতে পারল না। ওদিকে ব্রাহ্মণ বাড়িতে থাকলে তাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করা যাচ্ছে না। সেজন্য ব্রাহ্মণের বৌ একদিন অসুখের ভান করে শুয়ে রইল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে তোমার?' ব্রাহ্মণী বলল, 'শরীর খারাপ। তোমার সংসারের এত কাজ আমি পেরে উঠি না। ঝি রাখ একটা।'



আমি গবীব ব্রাহ্মণ।

তাতে কি ?

টাকা কোথায়, কি বাখব ?

ভিক্ষে কবতে যাও দেশে দেশে।

ব্রাহ্মণীব পবামর্শমত ব্রাহ্মণ নানা দেশে ভিক্ষা কবতে গেল। ভিক্ষে কবে ব্রাহ্মণ সাতশ টাকা পেল। একদিন সে ঘবে ফেবাব পথ ধবল। হাঁটতে হাঁটতে খিদেয ক্লান্ত হযে ব্রাহ্মণ ছাতুব থলে খুলে ছাতু খেল। তারপব থলেব মুখ বন্ধ কবে সামনেব এক পুকুরে জল খেতে গেল। একটা কেউটে সাপ ছাতুব লোভে ঐ থলেব ভেতব ঢুকে পডল। ব্রাহ্মণ ফিবে এসে ভালো কবে না দেখেই থলেব মুখ বেঁধে ফেলল। আবাব হাঁটা শুরু কবল।

বাস্তায এক বৃক্ষ দেবতা গাছেব মধ্যে লুকিযে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ব্রাহ্মণ, তুমি যদি মাঝ বাস্তায জিবোতে যাও তাহলে নিজে মববে। আব যদি আজই বাডিতে যাও তাহলে তোমাব বৌ মববে।'

শুনে ব্রাহ্মণ খুব ভয পেযে গেল। দুশ্চিন্তায সে কাহিল হযে পডল। পথে দেখল বহু লোক পুণ্য তিথিতে ধর্মকথা শোনাব জন্য জনক বাজাব অমাত্য সেনক পণ্ডিতেব কাছে চলেছে। ব্রাহ্মণ ভাবল, 'সেনক পণ্ডিতেব খুব নামডাক আছে। দেখি তিনি যদি আমাব দুশ্চিন্তা দূব করতে পাবেন।'

সেনকেব কাছে ব্রাহ্মণও চলল। তখন সেনককে ঘিবে আছে নগরবাসী অসংখ্য মানুষ। সেনক তাদেব ধর্মকথা বলছেন। হঠাৎ সেনকেব চোখ গেল ব্রাহ্মণেব দিকে। তিনি ব্রাহ্মণেব কাছে জানতে চাইলেন, 'তুমি এত শোকার্ত হচ্ছ কেন ?'

তাবপব সব শুনে বললেন, 'তোমাব ছাতুব থলেব মধ্যে কালসাপ ঢুকেছে।' ব্রাহ্মণ থলেটা ফাঁকা জাযগায বাখল। এক সাপুডে সাপটাকে ধবে বনে ছেড়ে দিযে এল। তাবপব সেনকেব সঙ্গে ব্রাহ্মণের এই রকম কথাবার্তা হল :

তোমাকে দূর দেশে ভিক্ষে করতে কে পাঠাল ?

আমার বৌ।



তোমাব বৌ তোমাকে ভালবাসে না।

সে কি প্রভু!

সে আর একজনকে ভালোবাসে। তুমি টাকা নিয়ে বাড়িতে ঢুকো না।

ব্রাহ্মণ বাড়িব কাছাকাছি একটা জায়গায় টাকা লুকিয়ে রেখে বাড়িতে ঢুকল। ব্রাহ্মণীব বন্ধুটি তখন ঘবেই ছিল। ব্রাহ্মণকে আসতে দেখে ব্রাহ্মণী তাকে লুকিয়ে বাখল। ব্রাহ্মণী দেখল থলেব মধ্যে টাকাকড়ি নেই। সে তখন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস কবল, 'টাকাকড়ি কিছু পাও নি?' ব্রাহ্মণ তখন তাকে বলল, 'পেযেছি, তবে ঐ পেঁপে গাছেব তলায় বেখে এসেছি।'

পবেব দিন পেঁপে গাছেব তলাটা খুঁড়ে ব্রাহ্মণ টাকা পেল না। সে আবাব সেনকেব কাছে গেল। সেনক জিজ্ঞেস কবলেন, 'টাকা কোথায় বেখেছ কাউকে বলেছিলে কি?'

হ্যাঁ প্রভু।

কাকে বলেছিলে?

ব্রাহ্মণীকে।

তাহলে সে তাব বন্ধুকে বলে দিয়েছে। বন্ধুটি টাকা নিযে গিয়েছে।

এখন উপাব কি প্রভু?

তুমি ব্রাহ্মণীকে বল সাত ব্রাহ্মণ খাওযাতে।



ব্রাহ্মণ তাই বলল। সেনক তাকে টাকা দিয়েছিলেন খবচ বাবদ। ব্রাহ্মণী সাত ব্রাহ্মণকে নেমন্তন্ন কবল। প্রায় দিনেব শেষে ব্রাহ্মণ বলল, 'কাল ছ'জনকে বল।' এভাবে শেষ পর্যন্ত বলল, 'কাল শুধু একজনকেই বলবে।' শেষেব দিন ব্রাহ্মণীব সেই বন্ধুটিই কেবল খেতে এল।

ব্রাহ্মণ সেনককে গিযে সব বৃত্তান্ত জানালেন। সেনক তখন পবপব সাতদিন যে ব্রাহ্মণ খেযেছে তাকে ডাকিযে আনালেন। জিজ্ঞেস কবলেন, 'তুমি এই ব্রাহ্মণেব টাকা চুবি কবেছ?'

না প্রভু।

সত্যি কথা বল।

না প্রভু।

দেখ, আমি সেনক পণ্ডিত।

আমি নিই নি প্রভু।

বেশ, তাহলে এক্ষুনি ফল পাবে।

সেনকেব ধমকে কাজ হল। সে টাকাটা এনে দিল। স্বীকাব কবল, সে চুবি করেছিল। সেনক ব্রাহ্মণীকে শাস্তি দিলেন। আব সেই চোরকে দিলেন নির্বাসন।



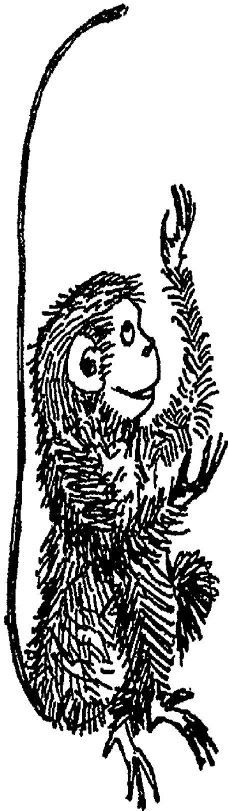
কপি জাতক ৭৫

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব বানরকুলে জন্মেছিলেন। পাঁচশ বানরের তিনি নেতা ছিলেন। থাকতেন রাজার বাগানে। দেবদত্তও তখন বানর জন্ম নিয়েছিল। তার সঙ্গেও পাঁচশ বানর থাকত।

রাজার পুরোহিত একদিন বাগানে গিয়ে স্নান করে গলায় মালা দিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন। এমন সময় একটা দুষ্টু বানর পুরোহিতের মাথায় বিষ্ঠা ত্যাগ করল। পুরোহিত দেখার জন্য ওপর দিকে তাকাতে বানর তাঁর মুখেও মলত্যাগ করল।

পুরোহিত খুবই রেগে গেলেন। তিনি আবার স্নান করে 'বানরদের বংশ লোপ করব' ভাবতে ভাবতে ফিরে গেলেন।

অন্য বানরেরা বোধিসত্ত্বকে জানাল কি ঘটেছে। বোধিসত্ত্ব তখন তাঁর অনুচরদের বললেন, 'এই জায়গা এখন শত্রুপুরী, আমরা এখানে থাকলে মরতে হবে। চল, বনে যাই।' বোধিসত্ত্বের অনুচররা তাঁর সঙ্গে বনে গেল। কিন্তু অন্য দল ভাবল, 'দেখাই যাক না পুরোহিত কি করেন।'



রাজবাড়ির এক দাসী ধান ভানছিল। ধান ভেনে রোদে শুকোতে দিয়েছিল। এমন সময় একটা ছাগল এসে ধান খেতে শুরু করল। দাসী তখন জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে ছাগলকে মারল। এতে ছাগলের সারা শরীর দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। ছাগল হাতিশালের খড়ের ঘেরার গায়ে পিঠ ঘষে আগুন নেভাতে গেল। এতে হাতিশালে আগুন লেগে হাতিদের গায়ে ফোস্কা পড়ল। ফোস্কা থেকে ঘা হল। এই ঘা আর কিছুতেই সারে না।

রাজা তখন পুরোহিতকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভু, আপনি কি জানেন, কি ওষুধ দিলে হাতিদের ঘা শুকোবে?' পুরোহিত বললেন, 'জানি।'

তাহলে বলুন দয়া করে।

বানরের মাংসের মলমে।



সে কোথায পাব ?

কেন, আপনাব বাগানেই তো শত শত বানব আছে।

তারপব বানব নিধন শুরু হল। সব বানব মাবা পডল। শুধু একটা বানব তীর খেযেও কোন বকমে পালিযে গেল। সে বোধি-সত্ত্বেব কাছে এসে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

বোধিসত্ত্ব তখন ঐ বানবকে দেখিযে সবাইকে শিক্ষা দিলেন। বললেন, 'দেখ, এই বানবেব মতই অন্যান্য বানবদেব দশা হযেছে। আমবা বেঁচে গেলাম শুধু শত্রুপুবী ত্যাগ কবেছি বলে। যে মুর্খ শুধু সে-ই শত্রুপুবীতে থাকে। পবিণামে মাবা যায।'



মহাকপি জাতক



পুবাকালে বাবাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তেব আমলে বোধিসত্ত্ব একবার বানবকুলে জন্ম নেন। আশি হাজাব বানবেব তিনিই বাজা। থাকেন হিমালয অঞ্চলে। সেখানে গঙ্গার ধাবে একটি আম গাছ ছিল। তাতে প্রচুব আম হত।

ওই আমগাছেব একটা ডাল ছিল গঙ্গার দিকে। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'এই ডালে আম পাকলে বানবদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না।' সেজন্য তিনি ঐ ডালেব আম পাকাব আগেই বানবদেব বলতেন খেযে ফেলতে। একবাব কিভাবে যেন একটা আম থেকে যায়।

যথাসময়ে সেই আমটি পাকল। তাবপব একদিন নদীব জলে খসে পডল। পাকা আমটি ভাসতে ভাসতে চলে এল বারাণসীবাজের স্নানেব ঘাটে। বাজা আমটি পেযে ভাবলেন, 'এটা কি ফল।' সবাইকে জিজ্ঞেস কবেন, কেউ বলতে পাবে না। শেযে অমাত্যবা বলল, 'বনবাসীবা বলতে পারবে।' তখন এক বনবাসীকে ডেকে আনা হল। সে বলল, 'মহাবাজ, এ হল মধুব আম ফল।'

বাজা সেই আম কেটে প্রথমে বনবাসীকে এক টুকরো খেতে দিলেন। তাবপব নিজে খেলেন এবং মহিষীদেব খাওয়ালেন। আম খেযে বাজাব খুবই ভাল লাগল। আবো খাওয়ার ইচ্ছে হল।

বনবাসী, আম গাছ কোথায় আছে ?



হিমালয়ে।

তুমি চেন?

হ্যাঁ।

দেখাতে পারবে?

পারব মহারাজ।

বনবাসীকে সঙ্গে নিয়ে রাজা সৈন্যসামন্তসমেত হিমালয়ের দিকে রওনা হলেন। অনেকদিন ধরে যেতে লাগলেন। পথ আর ফুরোয় না। শেষে বনবাসী বলল, 'মহারাজ, ঐ যে আম গাছ।'

রাজা তখন তাঁর নৌবহর তীরে বাঁধলেন। অল্প কিছু লোক নিয়ে হেঁটে হেঁটে আমগাছটির তলায় এল। গাছের তলায় সুন্দর বিছানা পাতা হল। সেই বিছানায় বসে রাজা পাকা আম খেলেন। তারপর সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝ রাতে যখন সবাই ঘুমোচ্ছে তখন বানররাজ তাঁর দলবল নিয়ে গাছে আম খেতে এলেন। ডালে ডাল লাগিয়ে বানররা আম খেতে লাগল। ফলে দু-চারটে পাকা আম রাজার গায়ে এসে পড়ল। রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে বানরদের কাণ্ড দেখে রাজা তীরন্দাজদের ডাকলেন।

বানরের দলকে দেখতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ মহারাজ।

গাছটার এরা সর্বনাশ করছে?

হ্যাঁ।

সব আম শেষ করে দিল?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ।

এরা যখন ফিরে যাবে তখন সব কটাকে শেষ করা চাই।

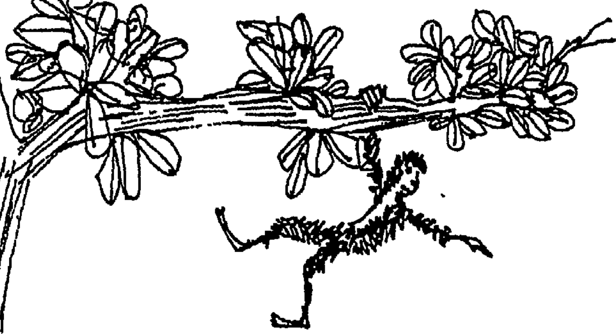
যথা আজ্ঞা।



তীরন্দাজরা তখন তীরধনুক নিয়ে গাছটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। তা দেখে বানররা ভয়ে কাঁপতে লাগল। বানররাজকে জানাল, 'প্রভু, সর্বনাশ হয়েছে, এরা আমাদের মেরে ফেলবে।' বানররাজ বললেন, 'কোন ভয় নেই, আমি বাঁচাব।'

তাবপব বোধিসত্ত্ব গঙ্গাব দিকের ডালে গেলেন। সেখান থেকে এক লাফে গঙ্গাব ওপাবে বেতবনে পড়লেন। একবার পেছন ফিবে তাকিয়ে মনে মনে আন্দাজ কবে নিলেন কত দূব লাফিয়ে এলেন। তাবপর প্রায় ততখানি লম্বা একটা বেত গাছ কোমরে বেঁধে আবার লাফ দিলেন। বানররাজ গাছের মূল ডালে পড়তে পারলেন না। গঙ্গার ওপর ঝুলন্ত শাখা ধরে ঝুলতে লাগলেন, আর বানরদের হাত নেড়ে ইশারা কবলেন। বানররা তাঁর পিঠে ভর দিয়ে বেত বেয়ে ওপারে চলে গেল। দেবদত্তও তখন বানব ছিল। কিন্তু সে যাওয়ার সময বোধিসত্ত্বের পিঠে এমন আঘাত করে গেল যে তাঁর হৃৎপিণ্ড ফেটে যাওয়ার মত হল।

সবাই চলে গেলেও বানররাজের আর নড়বার শক্তি নেই।



তিনি গাছেই রয়ে গেলেন। বাজা জেগে ছিলেন। সব কিছু নিজেব চোখে দেখে তিনি স্তম্ভিত হলেন। মনে মনে ভাবলেন, 'মানুষ তাব স্বজাতির জন্য যা না কবে, ওই সামান্য বানর তা-ই করল।'

সকালবেলা রাজা লোক লাগিয়ে বানররাজকে সযত্নে নামিযে আনলেন। তার পিঠে ওষুধ লাগিযে দিলেন। সুন্দর সুন্দর খাবার খেতে দিলেন। তারপর বানরবাজের পাযের কাছে বসে বললেন, 'আপনি সামান্য বানর নন। যা কবলেন অবিশ্বাস্য।'

এ আমার কর্তব্য।

কেন?

আমি বাজা, ওবা আমার প্রজা।

নিজেব জীবন তুচ্ছ কবেও?



বাজার কাছে প্রজাব মঙ্গল সাধনই বড় কর্তব্য।

এভাবে বাজা বানররাজেব কাছে রাজধর্ম বিষয়ে শিক্ষা লাভ কবলেন। কিছুক্ষণ পবে বানবরাজ দেহত্যাগ করলেন। রাজা খুব ঘটা কবে বানববাজের দাহ ও পাবলৌকিক কাজ সমাধা করলেন। তারপব বানবরাজের অস্থি নগরীতে নিযে এলেন। সেই অস্থি স্থাপন কবে বিশাল এক চৈত্য গড়া হল। বাজা সেখানে প্রতিদিন অর্ঘ্য দিতে যেতেন।

কুম্ভকার জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার কুমার বংশে জন্ম নেন। বড় হয়ে যথাসময়ে তিনি ঘর সংসার শুরু করেন। তাঁর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হল। এ ঘটনা বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ের।

কলিঙ্গরাজ্যে দন্তপুর নগরে তখন কুকণ্ডু নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন রাজা কুকণ্ডু অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়ে বাগানে গেলেন। সেখানে একটি বিশাল আমগাছ ছিল। তাতে এত ফল ধরেছিল যে গাছটি ফলের ভারে নত হয়ে ছিল। রাজা হাতির পিঠে বসেই হাত দিয়ে কিছু আম পেড়ে নিলেন। রাজার দেখাদেখি তাঁর লোকজনও আম পাড়তে লাগল। সকলে মিলে গাছের সমস্ত আম পেড়েছিল। শুধু তাই নয়, তাদের দাপটে অত সুন্দর গাছটার শ্রী পর্যন্ত নষ্ট হল।



সাবাদিন বাগানে ঘুবে বেবিয়ে ফেবাব সময় বাজা কুরুণ্ডু আবার আম গাছটাকে দেখলেন। এখন আব তাব আগেব সেই শ্যামল শোভা নেই। একটু দূবেই একটা বাঁজা আমগাছ ছিল। রাজা দেখলেন সেই গাছটিব কোন ক্ষতি হয় নি। ববং তাকেই এখন সুন্দব দেখাচ্ছে। এই দৃশ্য বাজাব কাছে এক দারুণ তত্ত্বজ্ঞান বয়ে আনল।

বাজা সিদ্ধান্ত কবলেন, গার্হস্থ্য জীবনও ফলদায়ী বৃক্ষেব মত। যে ধনবান ভয় তাবই। নির্ধনেব কোন ভয় নেই। বাজা সেই বিনষ্ট গাছেব মূলে বসে ধ্যান কবতে লাগলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, 'আব গার্হস্থ্য জীবনে ফিবে যাব না।'

বাজাব অনুচববা তাব খোঁজ কবতে কবতে সেখানে হাজিব হল। তাবা বাজাকে ফিবে যেতে বলল। বাজা বললেন, 'আমি তপস্বী হয়েছি।'

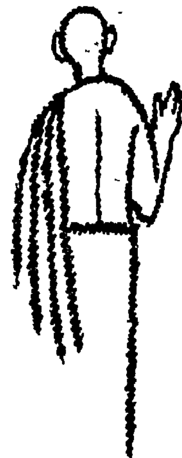
কিন্তু আপনাব মধ্যে তপস্বীব চিহ্নমাত্র নেই।

তপস্বীব চিহ্ন কি বকম?

মুণ্ডিত মস্তক, পীত বস্ত্রধাবী হোন।

বাজা তখন তাঁব হাতটি একবাব মাথায় বুলিয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁব মাথা থেকে সমস্ত চুল গায়ে পড়ল। নিজেব পোশাকে হাত বোলালেন। সঙ্গে সঙ্গে পোশাকটিও পীতবস্ত্র হল। বাজা মুহূর্তেব মধ্যে শূন্যে উঠে গেলেন। মধ্য আকাশে বসে অনুচবদেব ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দিলেন।

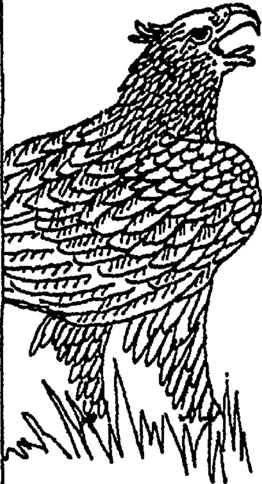
গান্ধাব বাজ্যে তক্ষশিলা নামে একটি নগব ছিল। সেখানে নগগজি নামে এক বাজা ছিলেন। একদিন নগগজি প্রাসাদে গিয়ে পালঙ্কেব মধ্যে আধশোয়া হয়ে আবাম কবতে কবতে দেখতে পেলেন দূবে এক পবিচারিকা বাটনা বাঁটছে। তার দু হাতে অনেকগুলি বালা। বালাগুলোব সংঘর্ষ হচ্ছে বলে শব্দ উঠছে। কাজের সুবিধেব জন্য পবিচাবিকা বালাগুলোকে ঠেলে সবিয়ে দিচ্ছিল। তখন আব শব্দ হচ্ছিল না। কিন্তু যেই তাবা পবস্পবেব কাছাকাছি আসছে তখনি সংঘর্ষ হচ্ছে, আব ঝঙ্কাবও শোনা যাচ্ছে।



এই দৃশ্য দেখে বাজা ভাবলেন আমি ঐ রকম এক বলযের (বালাব) মত হব। অন্য লোককে শাসন না করে, নিজেকে শাসন কবব। আত্ম-শাসনে মন দেব। বাজা এই সিদ্ধান্ত ভুললেন না। সত্যি সত্যি রাজ্য ত্যাগ করলেন। আগের গল্পটিতে যা ঘটেছে, এ গল্পেও তাই ঘটল। রাজা তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ কবলেন।

বিদেহ রাজ্যের মিথিলা নগরে নিমি নামে এক রাজা থাকতেন। একদিন সকালবেলা বাজা জলখাবাব খেয়ে জানালার ধারে বসেছিলেন। এমন সময় দেখলেন একটা বাজপাখি মাংসের দোকান থেকে একটুকরো মাংস ছোঁ মেবে নিয়ে উড়ে চলে গেল। তার পিছু পিছু ধাওয়া করে গেল আরো অনেকগুলো বাজপাখি। তারা প্রথম পাখিটাকে ঠোকরাতে শুরু করল। সে প্রাণ বাঁচাতে মাংসের টুকরোটা ফেলে দিল। আবেকটা বাজ যেই সেই মাংসেব টুকবো তুলে নিযেছে তখন অন্যান্য পাখি তাকেই আক্রমণ করল। এভাবে অনেক পাখিই পালা কবে আহত হল।

রাজা পাখিদেব এই কাণ্ড দেখে মনে মনে ভাবলেন, মাংসেব টুকরোটাই বিপদের মূল, যে সেটা ত্যাগ করছে সে-ই নিরাপদ হচ্ছে। যে গ্রহণ করছে তাকেই কষ্ট পেতে হচ্ছে। রাজা দিব্যচক্ষুতে দেখতে পেলেন সংসাব-বাজত্ব সবই ঐ মাংসেব টুকরো। যে এব মধ্যে থাকবে তাব কষ্টেব শেষ নেই। বাজা এই তত্ত্বজ্ঞানেই ডুবে বইলেন। সংসার ত্যাগ কবে প্রব্রজ্যা নিলেন।



উত্তব পাঞ্চাল বাজ্যে কাম্পিল্য নামে একটি নগব ছিল। সেখানকাব বাজাব নাম দুর্মুখ। একদিন বাজা সকালবেলা জলখাবাব খেযে অনুচবদেব সঙ্গে নিযে জানালাব ধাবে বসে গল্পগুজব কবছিলেন। এমন সময় দেখলেন গোশালা থেকে একটা ষাঁড় ছুটে যাচ্ছে, তাকে তাড়া কবছে আবেকটা ষাঁড়। ষাঁড় দুটো লড়াই করে চোখেব সামনে মরে গেল।

বাজা এই দৃশ্য দেখে এক তত্ত্বজ্ঞান লাভ কবলেন। হিংসার অর্থ বিনাশ। সংসাব হিংসামুক্ত নয়। সুতবাং সংসারে থাকা মানেই হিংসার মধ্যে থাকা। বাজা সংসার ত্যাগ কবলেন। তপস্বী হয়ে বাকি

জীবন কাটাতে লাগলেন।

এই চার তপস্বী একবার নন্দমূল গুহা থেকে বেরিয়ে তপস্যাবলে সকালে উড়ে চলে এলেন সেই গ্রামে যেখানে বোধিসত্ত্ব থাকতেন। তারা বোধিসত্ত্বের বাড়িতে এসে ভিক্ষা চাইলেন। বোধিসত্ত্ব তপস্বীদের ভিক্ষা দিলেন। তাঁদের যত্নআত্তি করলেন। আর জানতে চাইলেন, কিভাবে তাঁরা তপস্বী হলেন। তপস্বীদের বিবরণ শুনে তিনি ভাবলেন, এঁরা রাজা হয়েও যখন রাজত্ব ত্যাগ করে তপস্বী হতে পেরেছেন তখন মজুর খেটেই জীবিকা নির্বাহ করে আমিই বা সময় নষ্ট করি কেন?

বোধিসত্ত্ব তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি ছেলে দুটিকে বড় কর। আমি আর সংসারে থাকতে চাই না। আমি তপস্বী হব।' কিন্তু এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রী বলল, 'স্বামী, আমারও সংসারধর্মে বাসনা নেই।' বোধিসত্ত্ব তখন আর কোন কথা বললেন না। ওদিকে তাঁর স্ত্রী জল আনার অছিলায় কলসী নিয়ে বেরিয়ে গেল। তপস্বীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সে তপস্বিনী হল।

বোধিসত্ত্ব অনেকটা সময় অপেক্ষা করেও যখন দেখলেন স্ত্রী

ফিবছে না, তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। কিন্তু ছেলে দুটিকে ছেড়ে যাওয়া অনুচিত মনে কবলেন। ক্রমে ছেলেদুটি বড় হল। বোধিসত্ত্ব তখন ইচ্ছে কবে একেক দিন একেক্ বকম ভাবে ভাত রান্না কবতেন। কোনদিন ভাত আলুনি কবতেন। কোনদিন বা গলিয়ে ফেলতেন। ছেলেবা ভাত খেয়ে বলত, 'বাবা, ভাতে আজ নুন হয়নি।' 'আজ বড্ড ফুটে গেছে।' বোধিসত্ত্ব বুঝলেন, 'এবা বুঝতে শিখেছে, এখন নিজেদেব বক্ষা কবতে পাববে।' তিনিও এবার তপস্বী হলেন।

পবে একবাব তাঁব সঙ্গে এক তপস্বিনীব দেখা হয। তপস্বিনী তাঁকে বলে, 'মহাবাজ, আপনি কি ছেলেদুটোকে মেবে ফেলেছেন।' বোধিসত্ত্ব তখন তাকে যা যা ঘটেছে খুলে বললেন। তারপর এ কথাও বললেন, 'অধ্যাত্ম-সুখের জন্য ঐ শিশুদেব ত্যাগ কবা ঠিক হয নি।' এব পব তাঁদেব দুজনেব মধ্যে আর কখনও কথা হয় নি।

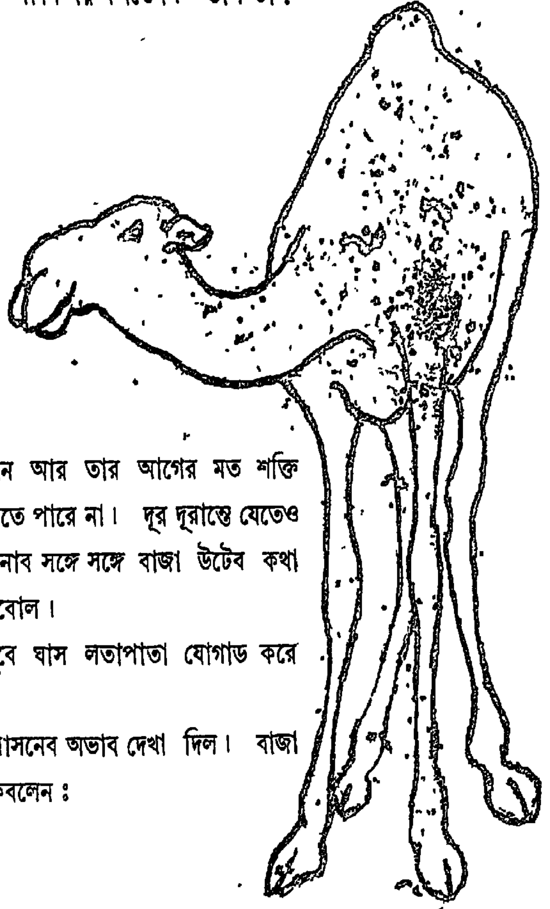


উট জাতক



অনেককাল আগে বারাণসীতে দৃঢ়ধর্মা নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব ছিলেন তাঁর অমাত্য।

রাজার একটি দারুণ শক্তিশালী উট ছিল। যুদ্ধের সময় সে শত্রুশিবিরে ঢুকে শিবির তছনছ করে দিত। রাজার চিঠি গলায় বেঁধে নিয়ে দূর দূরান্তে যেত। আবার রাজার জন্য চিঠি বয়ে আনত। রাজা উটটাকে খুব ভালবাসতেন। আদর যত্ন করতেন। ভাল ভাল



খাবার খেতে দিতেন।

ক্রমে উটের বয়স হল। এখন আর তার আগের মত শক্তি নেই। শত্রুর সঙ্গে সে লড়াই করতে পারে না। দূর দূরান্তে যেতেও সে অক্ষম। উটের প্রয়োজন ফুরনোর সঙ্গে সঙ্গে রাজা উটের কথা ভুলে গেলেন। উটেরও সুদিন ফুরোল।

উটটি তখন থেকে বনে বনে ঘুরে ঘাস লতাপাতা যোগাড় করে খায়। মনের দুঃখে থাকে।

একদিন রাজবাড়িতে মাটির বাসনের অভাব দেখা দিল। রাজা কুমোরকে ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

মাটির বাসন দিচ্ছ না কেন ?

মহাশয়, গোবর পাচ্ছি না।

কেন ?

গোবর আনার জন্য অনেকটা দূর যেতে হবে।



তা যাওনা কেন?

গাড়িতে যাওযাব মত গোরু নেই।

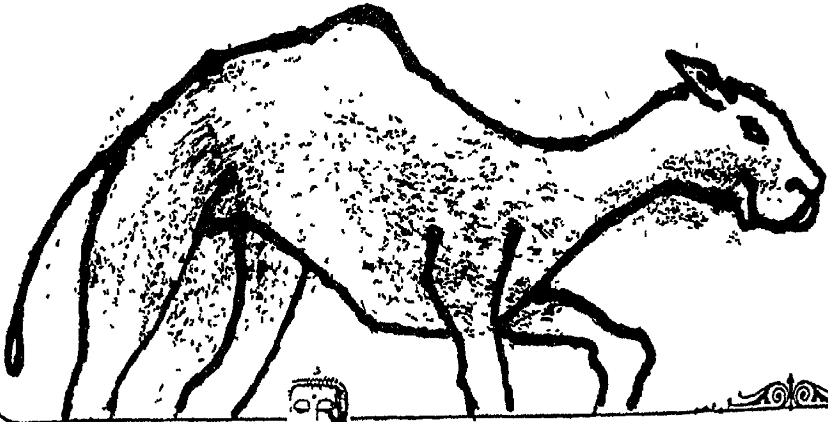
তখন বাজার আবাব সেই উটের কথা মনে পড়ল। অনুচবদেব বললেন, 'সেই উটটা কোথায়? ওটাকে ধবে আন।' অনুচব উটটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল। বাজা কুমোবকে সেই উটটা দান করলেন।

বেচাবা উটের আবো দুর্দিন এল। তাব শক্তি নেই, অথচ খাটতে হচ্ছে খুব। এ রকম সময়ে একদিন সে দেখল বোধিসত্ত্ব আসছেন। উট তাঁব পাযেব কাছে শুয়ে পড়ল। তাবপব বলল, 'প্রভু, আপনি তো জানেন এককালে আমি মহাবাজের কত কাজ করেছি, কিন্তু এখন আমার অবস্থা দেখুন। আপনি দয়া করে রাজাকে অতীতেব কথা স্মবণ কবিযে দিন। এমন করুন যাতে বুড়ো বযসে আমি একটু আবামে থাকতে পারি।'

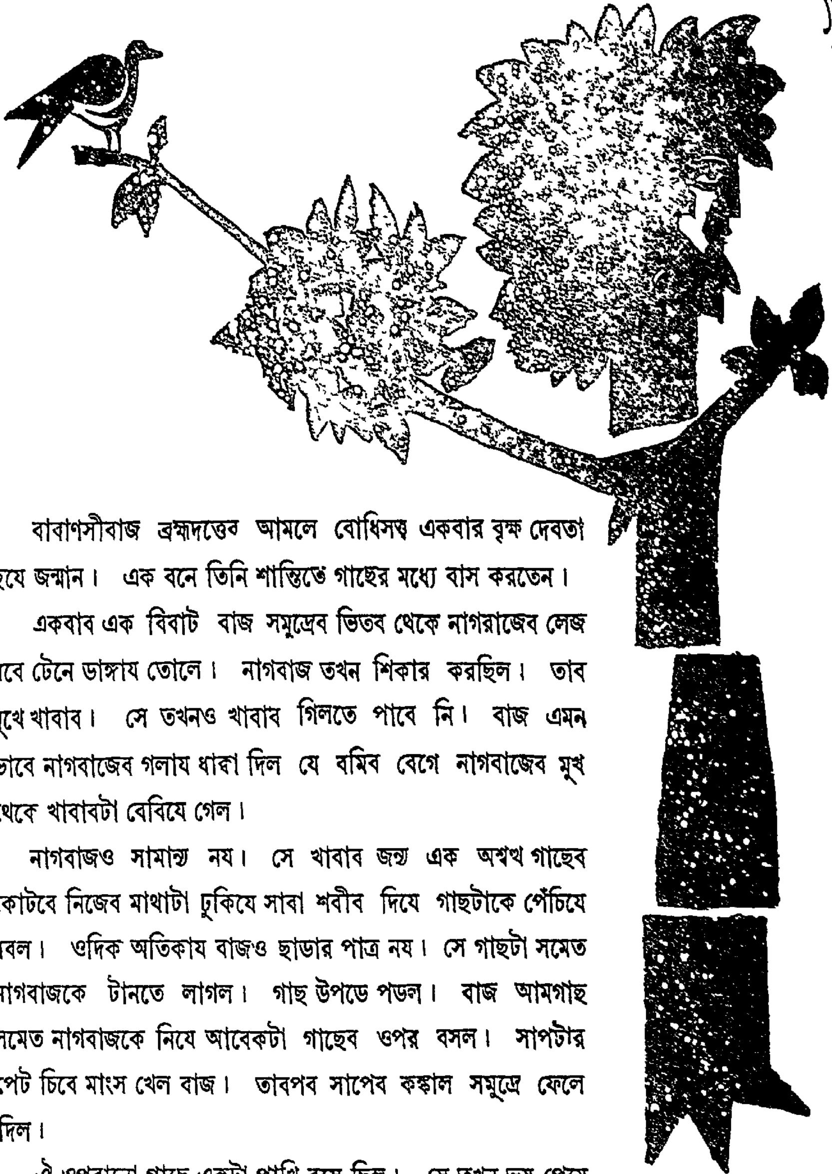
বোধিসত্ত্ব রাজসভায় এসে বাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আমাদের সেই চমৎকার উটটি কোথায গেল।' রাজা বললেন, 'ওটা কুমোরকে দিয়ে দিযেছি।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজেব নিশ্চযই মনে আছে সেবাব উটটি শত্রু শিবিব তছনছ কবেছিল। আবেকবার সে-ই মুখে করে আপনার জন্য একঠি চিঠি এনেছিল, রাজা বললেন, 'বিলক্ষণ মনে আছে।' বোধিসত্ত্ব তখন বললেন, 'না মহারাজ, আপনার মনে নেই।' রাজা অবাক হযে জানতে চাইলেন, 'কেন এ কথা বলছেন।'

বোধিসত্ত্ব তখন উটের কথা রাজাকে বললেন। অনুরোধ করলেন উটটিকে যত্ন করতে।

এরপব উটটির বুড়ো বযস বেশ আরামেই কেটেছিল।



গাছ জাতক



বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার বৃক্ষ দেবতা হয়ে জন্মান। এক বনে তিনি শান্তিতে গাছের মধ্যে বাস করতেন।

একবার এক বিরাট বাজ সমুদ্রের ভিতর থেকে নাগরাজের লেজ ধরে টেনে ডাঙ্গায় তোলে। নাগরাজ তখন শিকার করছিল। তার মুখে খাবার। সে তখনও খাবার গিলতে পারে নি। বাজ এমন ভাবে নাগরাজের গলায় ধাক্কা দিল যে রমির বেগে নাগরাজের মুখ থেকে খাবারটা বেরিয়ে গেল।

নাগরাজও সামান্য নয়। সে খাবার জন্য এক অশ্বথ গাছের কোটরে নিজের মাথাটা ঢুকিয়ে সারা শরীর দিয়ে গাছটাকে পেঁচিয়ে ধরল। ওদিক অতিকায় বাজও ছাড়ার পাত্র নয়। সে গাছটা সমেত নাগরাজকে টানতে লাগল। গাছ উপড়ে পড়ল। বাজ আমগাছ সমেত নাগরাজকে নিয়ে আরেকটা গাছের ওপর বসল। সাপটার পেট চিরে মাংস খেল বাজ। তারপর সাপের কঙ্কাল সমুদ্রে ফেলে দিল।

ঐ ওপরানো গাছে একটা পাখি বসে ছিল। সে তখন ভয় পেয়ে

পাশের একটা গাছে গিয়ে বসল। পাখিটা গাছে বসায় গাছ খুব ভয় পেল। কেননা পাখিটা অশ্বত্থ ফল খেয়েছে। এখন যদি পাখিটা গাছে বসে মলত্যাগ করে তাহলে এই গাছেই পরগাছা হিসেবে অশ্বত্থ জন্মাবে। যার পরিণামে গাছটা মারা পড়বে ভয়ে গাছটা কাঁপতে লাগল।

গাছটাকে কাঁপতে দেখে বাজ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কাঁপছ কেন?'

ভয়ে।

কিসের ভয়?

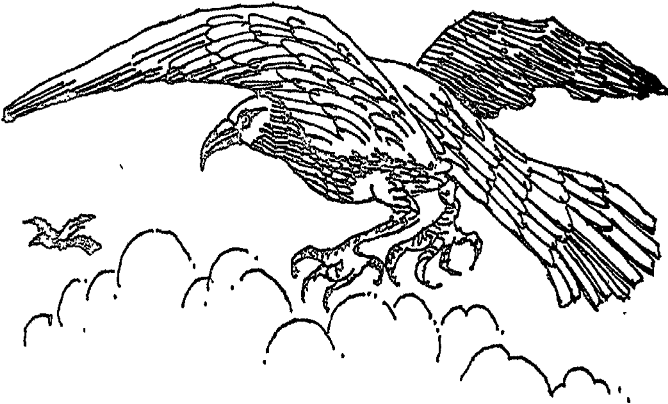
এই পাখিটা যদি মলত্যাগ করে।

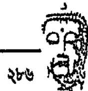
তা থেকে অশ্বত্থ জন্মাবে বলে?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে, আমি পাখিটাকে তাড়াচ্ছি।

এই বলে বাজ পাখিটাকে তাড়া করল। পাখি সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল। বৃক্ষদেবতা বোধিসত্ত্বও বিপন্মুক্ত হলেন। বাজ তখন বোধিসত্ত্বের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করল।







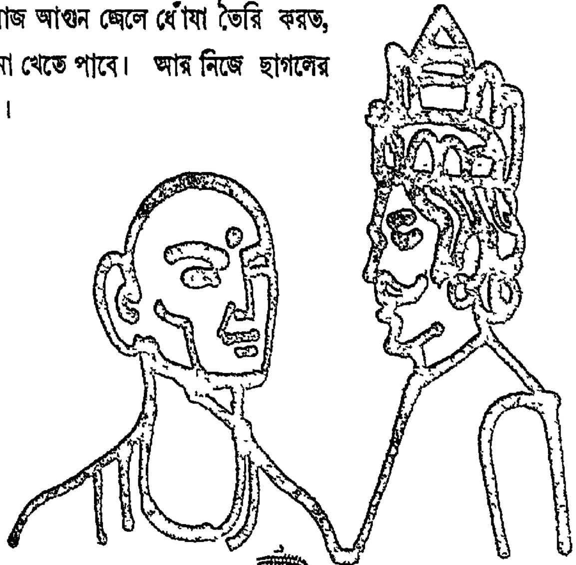
ধোঁয়া জাতক

অনেককাল আগে কুরুরাজ্যের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে যুধিষ্ঠিরের বংশের এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম ধনঞ্জয়। বোধিসত্ত্ব তখন ঐ রাজ্যে জন্ম নেন। বয়সকালে সুপণ্ডিত হয়ে তিনি রাজা ধনঞ্জয়ের পুরোহিত হন। তখন তাঁর নাম হয় বিদুর পণ্ডিত।

রাজা ধনঞ্জয় নিজের সৈন্যদের তেমন খাতির করতেন না। কিন্তু বাইরে থেকে যারা আসত তাদের খুব খাতির করতেন। একদিন দূরের গ্রামবাসীরা বিদ্রোহ করল। বিদ্রোহ দমন করার জন্য রাজা সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু সৈন্যরা যুদ্ধ করল না। বাইরে থেকে যারা এসেছিল তারাও রাজার হয়ে যুদ্ধ করল না। রাজার নিজের সৈন্যরা ভাবল, 'বাইরে থেকে আসা রাজার পেয়ারের লোকেরা লড়াই করুক।' আবার বহিরাগতরা ভাবল, 'আমাদের কি দরকার, রাজার সৈন্যরা লড়ুক।'

ফলে রাজা গেলেন হেরে। তখন রাজা ভাবলেন, কেন এমন হল, বিদুর পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক। রাজা বিদুরকে জিজ্ঞেস করায় বিদুর তাঁকে একটি গল্প বললেন। গল্পটি এ রকম :

ধূমকারি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। এক পাল ছাগল নিয়ে সে বনের মধ্যে থাকত। রোজ রোজ আগুন জ্বেলে ধোঁয়া তৈরি করত, যাতে হিংস্র পশুরা ছাগলদের না খেতে পারে। আর নিজে ছাগলের দুধ দিয়ে ক্ষীর তৈরি করে খেত।

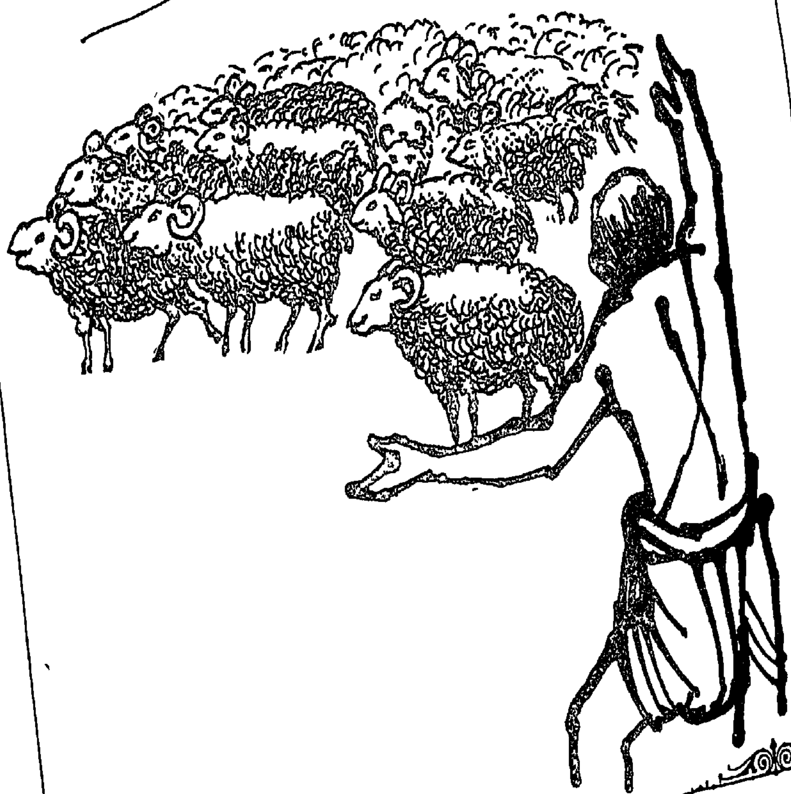




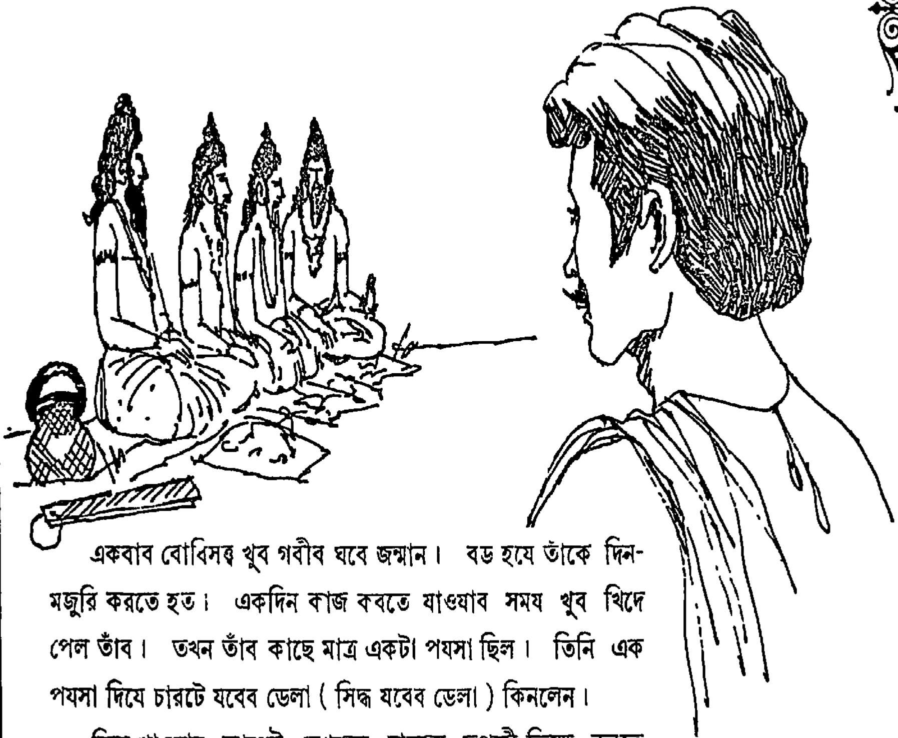
একদিন কতকগুলো সাদা ভেড়া দেখে ব্রাহ্মণেব খুব পছন্দ হল। সে ভেড়াগুলোকে খাতিব কবতে শুরু কবল। ছাগলদের কথা একদম ভুলে গেল। এভাবে দিন যেতে লাগল।

ভেড়াগুলো ছিল বুনো। আর তাদের বাসস্থান হল হিমালয়। শীতকালে ঐ বন ছেড়ে এক রাতে ভেড়ার পাল হিমালয়ে ফিরে গেল।

ওদিকে ততদিনে ছাগলেব পাল নষ্ট হযেছে। ব্রাহ্মণ খুবই দুঃখ পেল। এভাবে প্রকৃত বন্ধুকে অনাদব ও অচেনা লোককে খাতির কবে আনাব ফলেই তার কষ্ট বেড়েছে।



যব জাতক



একবার বোধিসত্ত্ব খুব গরীব ঘরে জন্মান। বড় হয়ে তাঁকে দিন-মজুরি করতে হত। একদিন কাজ করতে যাওয়ার সময় খুব খিদে পেল তাঁর। তখন তাঁর কাছে মাত্র একটা পয়সা ছিল। তিনি এক পয়সা দিয়ে চারটে যবের ডেলা (সিদ্ধ যবের ডেলা) কিনলেন।

কিন্তু খাওয়ার আগেই দেখলেন চারজন তপস্বী ভিক্ষে করতে বসেছেন। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, এই মহাপুরুষদের যদি আমি যব পিণ্ড খেতে দিই তাহলে আমার মঙ্গল হবে। হয়ত ভবিষ্যৎ-জন্মে আমাকে আর গরীব ঘরে জন্মাতে হবে না।

চার তপস্বীকে খুব সমাদর করে তিনি বসালেন। তারপর শ্রদ্ধাভরে তাঁদের যব পিণ্ড খেতে দিলেন। তপস্বীরা তাঁর ব্যবহারে খুবই তৃপ্ত হলেন। তাঁরা তাঁকে বর দিলেন। তারপর আকাশপথে ফিরে গেলেন।

বোধিসত্ত্ব অতি কষ্টে সেই দরিদ্র জীবন কাটালেন। কিন্তু সর্বক্ষণ তাঁর মনে পড়ত ঐ চার তপস্বীর কথা। ভাবতেন, পরজন্মে তাঁর জীবন সুন্দর হবে। এসব বিষয় মনে মনে ভাবতে ভাবতে তাঁর দরিদ্র জন্ম একদিন শেষ হল।

পবজন্মে বোধিসত্ত্ব বাজপবিবাবে বাজাব ছেলে হযে জন্মান। তখন তাঁর নাম হল প্রযদেত্তকুমাব।

বাজা হয়ে বোধিসত্ত্ব কোশল বাজাব মেয়েকে বিয়ে করলেন। তাঁব বাজ্যে শান্তিব অন্ত নেই, সম্পদেব শেষ নেই। বাজ্যের এই শ্রী, নিজেব সৌভাগ্য ইত্যাদি লক্ষ্য ববলেই বোধিসত্ত্বেব পূর্বজন্মেব কথা মনে পড়ে যেত। সেই তপস্বীদেব কথা মনে পড়ত। তাঁদের যব খেতে দিযেছিলেন বলেই আজ তাঁব এত সম্পদ। এইসব ভাবতে ভাবতে বোধিসত্ত্ব একটা পদ্য বলতেন।

বাণী প্রাযই এই পদ্যটা শুনত, কিন্তু তাব মানে বুঝতে পাবত না। বাণীব ওপব খুশি হযে বোধিসত্ত্ব একদিন তাকে একটা উপহাব দিতে



চাইলেন। রাণী তখন বলল, 'প্রভু, আমাব অন্য কোন উপহাব চাই না, আপনাব ঐ পদ্যটার মানে আমাকে বুঝিয়ে দিন।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ঠিক আছে বলব। তবে একা তোমাকে নয়, রাজসভায় সকলেব সামনে বলব।'

সকলেব সামনে বাজসভায় বসে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি আগেব জন্মে নিতান্ত গরীব ছিলাম। একবাব চারজন তপস্বীকে নিজের মুখের খাবাব যবেব ডেলা তুলে দিযেছিলাম। তাঁদের আশীর্বাদেই আমি আজ বাজা হযেছি। পদ্যটিব সাব কথা হল এই।' শুনে রাণীও সর্বসমক্ষে বলল, 'আমিও গবীব ঘবে জন্মেছিলাম আগের জন্মে। কিন্তু তপস্বীদের তুষ্ট কবেছিলাম, তাই আজ রাণী হয়েছি।'

এরপর তাঁবা একযোগে দান-ধ্যানে মন দিলেন। নিয়মবিধি মেনে বাজ্য পরিচালনা কবলেন। কালক্রমে তাঁদের জীবন অন্ত হলে তাঁরা স্বর্গে গেলেন।



অষ্টশব্দ জাতক

পুরাকালে একবার বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। বয়সকালে শাস্ত্র শিক্ষা ভালভাবে শেষ করলেন। তারপর তাঁর বাবা-মার মৃত্যু হল। তাঁরা অনেক সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। বোধিসত্ত্ব সমস্ত সম্পত্তি দানব্রত পালন করে শেষ করলেন। তারপর হিমালয় অঞ্চলে তপস্যা করতে চলে গেলেন। সেখানে দীর্ঘকাল তপস্যার পর তিনি টক আর নুন যোগাড় করার জন্য আবার বারাণসীতে এলেন।

বারাণসীরাজ একদিন পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। তখন ভোর হয়ে আসছে। রাজা তখন পর পর আটটি শব্দ শুনতে পেলেন—প্রথমে একটা বক, তারপর কাক, তারপর ঘুন, পোষা কোকিল, পোষা হরিণ, বানর এবং সপ্তম শব্দটি পোষা কিন্নরের। অষ্টম শব্দটি এক তপস্বীর।

এতগুলি শব্দ শুনে রাজা অমঙ্গলের ভয়ে কাতর হলেন। পরের দিনই রাজপুরোহিতকে ডেকে সব খুলে বললেন। পুরোহিত বিচার করে বলল, 'মহারাজ, সামনে বিপদ আসছে।'

কি করব তাহলে?

ভয় নেই, যজ্ঞ করতে হবে।



কিসের যজ্ঞ?

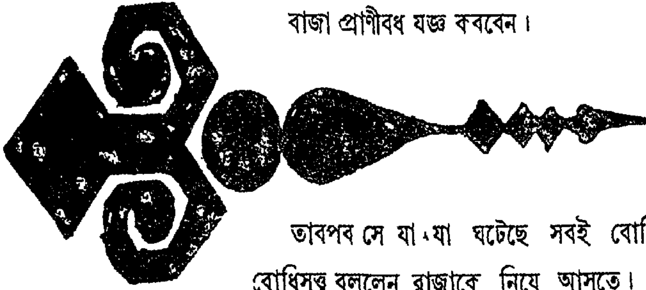
সর্বচতুষ্ক যজ্ঞ।

ঐ রাজ্যে এক তরুণ ব্রাহ্মণ ছিল। সে সর্বচতুষ্ক যজ্ঞের কথা শুনে আতঙ্কিত হল। কেননা তাতে অকারণে প্রাণী বধ করা হয়। সে পুরোহিতদের অনেক অনুরোধ করল, 'এতগুলো প্রাণীকে অযথা বধ করবেন না।' পুরোহিত বলল, 'দেখ, এই যজ্ঞে যদি বিপদ না-ও কাটে আমরা অন্তত দুদিন পেট ভরে মাংস খেতে পারব।'

তরুণ ব্রাহ্মণ তখন দুঃখিত মনে ফিরে চলল। সে সত্যিকারের ধার্মিক তপস্বীর খোঁজ করতে লাগল। রাজার বাগানে সে বোধিসত্ত্বের দেখা পেল। তরুণ ব্রাহ্মণ তাঁকে অনুরোধ করল: 'প্রভু, আপনি প্রাণীদের রক্ষা করুন।'

কি হয়েছে বাবা?

রাজা প্রাণীবধ যজ্ঞ করবেন।



তারপর সে যা-যা ঘটেছে সবই বোধিসত্ত্বকে খুলে বলল। বোধিসত্ত্ব বললেন রাজাকে নিয়ে আসতে। তিনি রাজাকে বলে দেবেন আট রকম শব্দের আসল মানে কি।

তরুণ ব্রাহ্মণ রাজাকে খবর দিতেই রাজা ছুটে এলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁকে বললেন, 'এতে আপনার কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। বরং আমি বলছি এতে আপনার মঙ্গল হবে।'

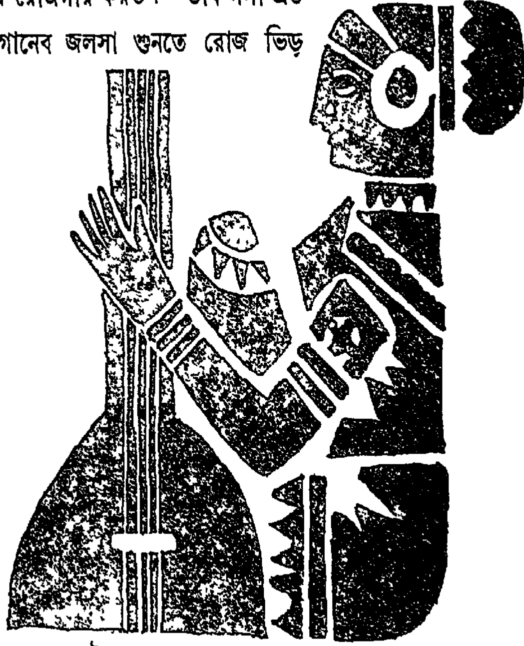
বোধিসত্ত্ব তখন বললেন বক শব্দ করেছে খিদেয়, কাক শব্দ করেছে হস্তিশালায় মাহুতের অত্যাচারে, ঘুনকীটটা বুড়ো হয়েছে—তার খাওয়ার শক্তি পর্যন্ত নেই, সে শব্দ করেছে কাঠে বন্দী আছে বলে, কোকিলটি বনে যেতে চায়, বানর, কিন্নর এরাও মুক্তি চায়। শেষ শব্দটি এক তপস্বীর, মুক্তির আনন্দে তিনি শব্দ করেছেন।

রাজা পশুপাখিদের মুক্ত করে দিলেন। বোধিসত্ত্বের কাছে ধর্মকথা শুনলেন। প্রাণী হত্যা বন্ধ করে দিলেন।



সুলসা জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে সুলসা নামে এক সুন্দরী গায়িকা ছিল বারাণসীতে। সে গান গেয়ে রোজগার করত। তার গলা এত সুরেলা ছিল যে সুলসার বাড়িতে গানের জলসা শুনতে রোজ ভিড়



হতো। সুলসা একেক রাতে হাজার হাজার টাকা আয় করত।

সেই সময় বারাণসীতে দারুণ শক্তিশালী এক চোর ছিল। তার নাম শক্তুক। শক্তুকের চুরির ঠেলায় রাজ্যের লোক অস্থির হয়ে পড়ল। তারা রাজার কাছে রোজ নালিশ করতে লাগল। ব্রহ্মদত্ত তখন নগরের চারদিকে কড়া পাহারা বসালেন। শক্তুক ধরা পড়ল।

বিচারে ঠিক হল এই চোরকে ফাঁসি দেওয়া হবে। শক্তুককে যখন জল্লাদ বেঁধে নিয়ে চলেছে সুলসা জানলা দিয়ে তাকে দেখতে পেল। শক্তুকের অত সুন্দর শরীর দেখে সুলসার মায়া হল। সে ভাবল, 'আহা, বেচারার এত সুন্দর শরীর এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে।' সুলসা ঠিক করল যেভাবে হোক চোরটাকে বাঁচাবে। সে তখন জল্লাদকে ঘুস দিয়ে এমন ব্যবস্থা করল যে শক্তুক রক্ষা পেল।

এরপর থেকে ঐ চোর সুলসার বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকতে

লাগল। সুলসা তাকে ভাল খাবাব-দাবাব পোশাক-আসাব দিযে খুবই যত্ন কবল। কিন্তু শক্তুক ভাবল, 'আব এখানে নয। কিন্তু এখান থেকে খালি হাতে গেলে না খেযে মবতে হবে।' সে তখন ফন্দি কবল সুলসার গয়না টাকাকড়ি চুবি কববে।

শক্তুক একদিন সুলসাকে বলল, 'আমাকে একটু যেতে হবে। আমি মানত কবেছিলাম বৃক্ষ দেবতাব পুজো দেব।' সুলসা বাযনা ধরল সে-ও যাবে। তারপর সুলসা প্রচুব গযনা পবে শক্তুকেব সঙ্গে বওনা দিল। লোকজন ও পুজোব নৈবেদ্য ইত্যাদি নিযে তাবা এক বনের কাছে গেল। তাবপব শক্তুক বলল, 'লোকজনেব আমাব আব দরকাব নেই। ওবা ওখানে থাকুক। পুজো দিতে আমবা পাহাড়ে উঠি চল।'

পাহাড়ে উঠে শক্তুক ভিন্ন মূর্তি ধাবণ কবল। সে বলল, 'সুলসা, পুজোটুজো বাজে কথা। আমি তোমাকে খুন কবব বলেই এখানে এনেছি।' সুলসা খুব তার হাত-পা ধবল। কিন্তু শক্তুকেব সেই এক কথা। তখন সুলসা বলল, 'মবার আগে আমি তোমাকে চাবদিক থেকে প্রণাম কবে নিই তাহলে। আমি তো তোমাকে ভাল-বেসেছি। তুমি বাসো আব না বাসো।'

এই বলে সে শক্তুককে প্রণাম কবতে শুরু কবল। সামনে আর দু পাশে প্রণাম সারা হলে সে পেছন দিকে গেল। আগেই দেখে রেখেছিল সামনে আছে বিশাল খাদ। প্রণাম কবার অছিলায়



সে শক্তুককে সে প্রাণপণে ধাক্কা দিল। শক্তুক খাদে গিয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

সুলসাকে একা ফিরে আসতে দেখে তার লোকজন জিজ্ঞেস করল, 'প্রভু, শক্তুক কোথায়।' এর জবাবে সুলসা বলল, 'ওর কথা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না।'



সুমঙ্গল জাতক

অতীতকালে একবাব বোধিসত্ত্ব বারাণসীবাজ হন। তখন সুমঙ্গল নামে তাঁব এক সাথী ছিল।

একদিন হিমালয় অঞ্চল থেকে এক তাপস এলেন বারাণসীতে। রাজা তাঁকে দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি তাপসকে অনুরোধ করলেন রাজার বাগানে থেকে যেতে। বিশেষ করে যতদিন বাবাণসীতে থাকবেন। তাপস বাজি হল। তাপস সেই বনে থাকেন। বাজাব বাড়িতে গিযে খেযে আসেন। সুমঙ্গলেব সঙ্গে তাঁব বেশ ভাব হল।

একদিন তাপস সুমঙ্গলকে বললেন, 'বৎস, আমি অমুক গ্রামে যাচ্ছি। বাজাকে বোলো, দিন কযেক পবে ফিবব।' তাপস চলে গেলেন। তাব পব কিছুদিন বাদে ফিবেও এলেন। ফিবে এসে ধ্যানে বসলেন।

ঐদিন সুমঙ্গলেব বাড়িতে কযেকজন অতিথি এসেছে। সে শিকাব কবতে বনে ঢুকেছে। বনেব মধ্যে তাপসকে দেখে তাব মনে হল ওটা বুঝি হরিণ। সে তীব ছুঁড়ল। তীববিদ্ধ হয়ে তাপস মারা গেলেন। সুমঙ্গল তাঁর কাছে ক্ষমা চাইল। তাপস বলল, 'তুমি জেনেশুনে ছোড় নি, তাই তোমাব কোন দোষ নেই।' এই বলে তাপস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সুমঙ্গল কিন্তু এতে খুবই ঘাবড়ে গেল। সে জানত তাপসেব মৃত্যুর জন্য বাজা তাকে ক্ষমা করবেন না। সে তাই দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দিল।





বছব খানেক পবে বাজাব এক অমাত্যের সঙ্গে সুমঙ্গলেব দেখা হল। সুমঙ্গল তাকে বলল, 'তুমি বাজাব কাছে আমাব কথা উত্থাপন কবে বাজাব মনোভাব শোনাব চেষ্টা করো।' অমাত্য ফিবে এসে রাজার কাছে সুমঙ্গলেব কথা তুলল। রাজা কোন উচ্চবাচ্যকবলেন না।



আবও এক বছব কেটে গেল। দ্বিতীয় বছবেব শেষে সুমঙ্গল সপবিবাবে নগবে এল। অমাত্য তাকে বলল, 'বাজাব মন এখন নবম হযেছে।' সুমঙ্গল তখন বাজাব সঙ্গে দেখা কবল। বাজা তাকে ডেকে জানতে চাইলেন, 'তুমি তাপসকে হত্যা কবেছিলে কেন?' সুমঙ্গল বলল, 'প্রভু, এটা চোখেব ভুলেব ব্যাপাব। তাপসকে দূব থেকে আমি হরিণ মনে কবেছিলাম।' বাজা তখন তাকে বললেন, 'তাহলে তুমি নির্ভযে এ দেশেই থাক।'

সব দেখেশুনে অমাত্যবা বাজাব কাছে জানতে চাইল, 'মহাবাজ তাহলে প্রথম দু বছব সুমঙ্গলেব কথা তুললেও কেন আপনি কিছু বললেন না?'

বাজা বললেন, 'দেখ, বাজাদেব পক্ষে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয় প্রথমে বাগের বদলে আমি বিবাগ হই। পবে মন নবম হওযায সুমঙ্গলকে ডাকিযে আনাই।' বাজাব ধৈর্য ও ক্ষমাগুণ দেখে প্রজাবা ধন্য ধন্য কবতে লাগল।

গঙ্গমাল জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বারাণসীতে একটি গৃহস্থ পরিবার ছিল। পরিবারের কর্তা ধর্মকর্ম করত। সে তিথিনক্ষত্র দেখে উপোস করত। এমন কি তার পরিবারের চাকরবাকররা পর্যন্ত উপোস করত সেইসব পুণ্যতিথিতে।

নগরে একদিন উৎসব ঘোষণা করা হল। কর্তা সবাইকে ডেকে বলে দিল, আজ পোষধের দিন। তাড়াতাড়ি সকালে খেয়ে নিও। পরে উপোস করতে হবে।

বোধিসত্ত্ব তখন দিনমজুর হয়ে জন্মেছিলেন। ঐ পরিবারেই কাজ করতেন। সেদিন তাঁর কাজ থেকে ফিরতে অনেক দেরি হল ফলে খাবার পেলেন না। উনি শুনলেন, সেদিন পোষধ। তখন তিনি ঠিক করলেন উপোস করবেন। দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকায় বোধিসত্ত্ব মরণাপন্ন হলেন। ঠিক তখন বারাণসীরাজ রাজকীয় সাজে বোধিসত্ত্বের চোখের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। মৃত্যুকালে বোধিসত্ত্বের ইচ্ছে হয়েছিল রাজা হওয়ার।

পোষধ পালন করেছিলেন বলে বোধিসত্ত্বের অতৃপ্ত বাসনা পর জন্মে পূর্ণ হল। তিনি ব্রহ্মদত্তের ছেলে হয়ে জন্মালেন। তখন তাঁর নাম



হল উদযকুমাব। বযসকালে বাজ্য লাভ কবাব পবও বোধিসত্ত্ব কিন্তু পূর্বজন্মেব কথা ভোলেন নি। তিনি অর্ধেক পোষধ পালন কবে এই ফল পেযেছেন বলে একটি গান গাইতেন মাঝে মাঝে: 'সামান্য কাজ কবে এ ফল পেলাম।'

একদিন নগবে আবাব একটা উৎসবেব দিন এসে পডল। তখন এক মজুব অনেক কষ্ট কবে আধ পযসা জমিযেছিল। তাব বৌ বলল, 'চল, আমবা ঐ আধ পযসায সহজ একটু আনন্দ কবব।' লোকটি ঐ আধ পযসা অনেক কষ্টে এক পাঁজা ইটেব মধ্যে লুকিযে বেখেছিল। সে তক্ষুনি সেটা আনতে চলল। দাৰুণ গ্রীষ্মেব চাপ তখন। গ্রীষ্মেব দাপটে মাটি গবম হযে উঠেছে। এ বকম অবস্থায তাকে এভাবে উন্মাদেব মত ছুটতে দেখে বাজা তাকে ডাকিযে আনালেন।



বাজা॥ তুমি কোথায যাচ্ছিলে?

লোকটা॥ আমাব আধ পযসা আনতে।

বাজা॥ কোত্থেকে?

লোকটা॥ ঐ ইটেব পাঁজাব ভেতব থেকে।

বাজা॥ কেন?

লোকটা॥ আজ উৎসবে আমি আব আমাব বৌ আনন্দ কবব।

বাজা॥ ছেডে দাও, অত কষ্ট কবতে হবে না। আমি তোমাকে এক টাকা দিচ্ছি।

লোকটা॥ তা-ও যাব।

বাজা॥ দশ টাকা পেলে?

লোকটা॥ তা-ও আধ পয়সা ছাডব না।

বাজা তাকে অর্ধেক বাজত্ব দিযে ঐ কাজ থেকে নিবৃত্ত কবলেন।

লোকে ঐ লোকটাকে আধ পযসাব বাজা বলত। দুই বাজাব খুব ভাব। একদিন বোধিসত্ত্ব আধ পযসাব বাজার কোলে মাথা দিযে ঘুমোচ্ছেন। তখন আধ পযসাব বাজা ভাবল, 'এ লোকটা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন আমি পুবো বাজা হতে পাবব না। একে শেষ কবি।' আবাব পব মুহূর্তে তাব মনে হল, 'এই বাজা আমাব এত উপকাব

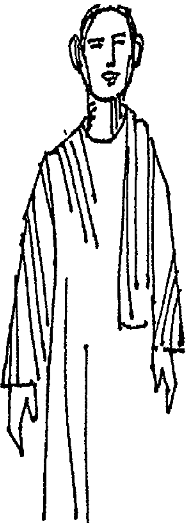
কবল,-আব আমি কিনা তাকে হত্যা কবতে চাইছি। ধিক! ধিক!'

শেষ পর্যন্ত আধ পয়সার রাজা বোধিসত্ত্বকে ডেকে নিজেব মনেব সব কথা খুলে বলল। বোধিসত্ত্ব তখন তাকে সম্পূর্ণ বাজত্ব দিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু সে বলল, 'না বন্ধু, বিষযবহ্নি নিভবে না। আমি ভক্ষাজ্ঞানের তপস্বী হব।'

রাজা এবাব তাঁব গানেব সাথে আর একটি লাইন যোগ কবলেন :
'অল্প কাজ কবে আমি পেয়েছি এ ফল—কিন্তু যে তপস্বী হল সে আমার চেযেও বেশি ফল পেল।'

বাজাব স্ত্রীব ঐ গানেব মানে জানাব খুব ইচ্ছে হল। কিন্তু উপায় নেই। বাজাব চুল কাটত গঙ্গাজল নামে এক নাপিত। সে প্রথমে চুল কেটে তাবপব সন্না দিযে বাজাব পাকা চুল তুলত। এতে বাজার খুব ভাল লাগত। বাজাব স্ত্রী গঙ্গাজলকে ডেকে বলল, 'দেখ, তুমি প্রথমে পাকা চুল তুলে বাজাব আবাম দিয়ে তাবপব তাঁর চুল কেটে দিও। বাজা এতে খুশি হবে। তোমাকে পুবস্কাব দিতে চাইবেন। তখন তুমি অন্য কোন পুবস্কাব না নিযে গানটাব মানে জানতে চাইবে।'

গঙ্গাজলকে বাণী যা বলল সে ঠিক সেই বকম কবল। বাজাও তাকে পুবস্কাব দিতে চাইলেন। কিন্তু সে গানেব মানে জানতে চাইল। গানেব মানে বলতে বাজাব লজ্জা হচ্ছিল। গঙ্গাজল নাছোড়বান্দা হওয়ায় বাজাকে শেষ পর্যন্ত বলতেই হল।



গঙ্গাজল তখন ভাবল, মাত্র অর্ধেক পোষধ পালন কবে যদি বাজা হওয়া যায় তাহলে বিষযেব আব কি-ই বা মূল্য। তাব চেযে ববং তপস্যায় আত্মনিযোগ কবা উচিত। গঙ্গাজল সত্যিই তপস্বী হযে চলে গেল। অনেকদিন পবে সাধুবেশে এসে গঙ্গাজল উদয়বাজকে 'তুমি' সম্বোধন কবে। এতে বাজাব অমাত্য থেকে শুরু কবে স্ত্রী পর্যন্ত সবাই বেগে যায়। নিচু জাতেব লোকেব এত বড় স্পর্ধা।

উদযবাজ তখন সবাইকে শান্ত কবে বললেন, 'উনি জ্ঞানেব দ্বাবা জাত নস্যাৎ কবেছেন। জ্ঞানেব কাছে উঁচুনিচু বলে কিছুই নেই। এঁকে প্রণাম করুন সবাই।'



চেদি জাতক

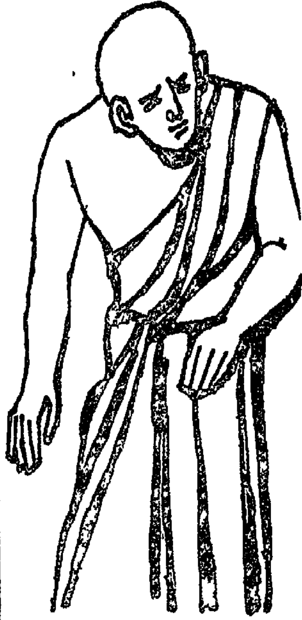


পুরাকালে মহাসম্মত নামে এক রাজা ছিলেন। মহাসম্মতের.আয়ুর কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। তাঁর ছেলেব নাম বোজ, রোজের ছেলে বররোজ, ববরোজের ছেলে কল্যাণ, কল্যাণের ছেলে বরকল্যাণ, বরকল্যাণেব ছেলে পোষধ। আবার পোষধের ছেলে মান্ধাতা, মান্ধাতার ছেলে বরমান্ধাতা--এভাবে নামের কোন শেষ ছিল না।



ববমান্ধাতাব ছেলে চব, চরেব ছেলে উপচব। উপচবকে অপচবও বলা হত। অপচব চেদি বাজ্যে [illegible] [illegible]। তাঁব তপস্যাবল ছিল অসাধাবণ। আকাশপথে বিচবণ কবতে পারতেন। চেদি বাজাব শরীব থেকে চন্দনেব গন্ধ পাওযা যেত।

চেদি বাজাব পুবোহিতেব নাম কপিল। কপিলের ছোট ভাই কোবকলম্ব বাজাব সঙ্গে একই আচার্যেব কাছে পড়াশুনো করেন, ফলে দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব ছিল। বাজা মনে মনে ঠিক করেছিলেন, রাজত্ব পেলে কোরকম্বলকে পুবোহিত করবেন।



কিন্তু কপিলকে বাজা কোন দিনই সে কথা বলতে পাবলেন না। কপিলও দেখলেন রাজাব পুবোহিত বাজার সমবযসী কেউ হলেই ভাল হয। তখন তিনি ঠিক কবলেন, ছেলেকে প্রধান পুবোহিত পদ দিযে তিনি নিজে তপস্যায় ডুবে থাকবেন। তাবপর বাজাকে নিজেব ইচ্ছাব কথা জানালেন। বাজাও তাতে বাদ সাধলেন না। পুরোহিতের ছেলে রাজপুবোহিত হল। আব পুবোহিত নিজে তপস্যাব্রত নিলেন, যদিও তিনি গৃহত্যাগ কবলেন না। এই ঘটনা জানাব পব কোবকলম্ব পুবোহিতের ওপব খুব বেগে গেল। সে ভাবল, 'যেভাবে হোক পুবোহিতকে শিক্ষা দিতে হবে।'

বাজা একদিন কোবকলম্বেব সঙ্গে গল্প কবতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি তুমিই পুবোহিতেব কাজ কব?'



না, মহাবাজ।

তবে কে করেন?

কেন, আমার দাদা।

তিনি যে তপস্যাব্রত নিয়েছেন?

হ্যাঁ, তবে তাঁর হয়ে তাঁব ছেলেই এ কাজ কবছে।

কেন, তুমিই কব না এ কাজ।

না মহাবাজ, ব্রহ্মানুকুলে বড় ভাই-ই এ কাজ করে আসছেন।

তাহলে আমি তোমাকে বড় কবে দেব।

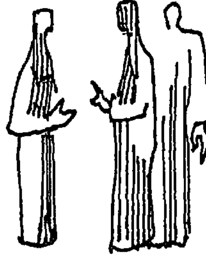
কিভাবে কববেন?

মিথ্যে কথা বলে।



আপনি কি জানেন না বড়দা তাহলে তপস্যাগুণে আপনার ক্ষতি করবে?

সাত দিনের মধ্যে কি করি তুমি দেখ।



খবরটা নগরে রটে গেল। সবাই শুনল আগামী সাত দিনের মধ্যে রাজা বড় ভাইকে ছোট ভাই করবেন, ছোট ভাইকে বড় করবেন। লোকজন শুনে অবাক। তারা ভাবতে লাগল রাজা কি করে এ রকম আশ্চর্য ব্যাপার ঘটাবেন। যে সময়ের কথা হচ্ছে, সেটা সত্যযুগ। লোকে তখন মিথ্যা কথা কাকে বলে জানত না।

লোকমুখে এইসব খবর শুনে কপিল পুরোহিতের ছেলে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, রাজা নাকি মিথ্যে কথা বলে কাকাকে বড় আর আপনাকে ছোট করবেন।' কপিল বললেন, 'দেখ, রাজা মিথ্যে বলেও পুরোহিত পদ কেড়ে নিতে পারবেন না। তা উনি কবে কাজটা করবেন?' কপিলের ছেলে বলল, 'আজ থেকে সাত দিন পরে।' কপিল বললেন, 'ঠিক আছে। সাত দিন পরে তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিও।'



সাত দিনের দিন রাজ্যের লোক ভেঙ্গে পড়ল। তারা সবাই এসেছে 'মিথ্যে কথা' নামে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখতে। রাজসভায় লোক ধরছে না। রাজা সেজেগুজে আকাশপথে এসে শূন্যে বসলেন। কপিল পুরোহিতও এসে শূন্যে বসলেন। প্রথম কথা বললেন কপিল।

রাজা, আপনি মিথ্যে কথা বলে বড় ভাইয়ের পদ ছোট ভাইকে দেবেন ঠিক করেছেন, এ কথা কি সত্যি?

হ্যাঁ আচার্য।

কিন্তু রাজা, মিথ্যা বললে ধর্মহানি হয়।

সে যাই হোক, কোরকলম্ব বড় আর আপনি হলেন ছোট।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর

শরীর থেকে চন্দন গন্ধ উঠে গেল। তার বদলে নোংরা পচা গন্ধ উঠতে লাগল। কপিল তখন বললেন, 'মহারাজ, ভয় পাবেন না, আপনি সত্য কথা বলুন। তাহলে আবার আগেকার অবস্থা ফিরে পাবেন।' কিন্তু রাজা আবারও বললেন, 'আপনি ছোট ভাই, আর কোরকলম্বই বড় ভাই।' বলা মাত্র মাটিতে গর্ত হয়ে গেল। রাজার পা দুটি মাটিতে পুঁতে গেল। এভাবে কপিল তাঁকে বার বার জিজ্ঞেস করলেন। রাজা বার বারই মিথ্যে কথা বললেন। রাজা মোট ছ-বার মিথ্যে কথা বললেন। পাতাল থেকে জ্বলন্ত আগুন উঠে এল। ঐ আগুন রাজাকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলল।

পদকুশল মানব জাতক



বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের মহিষী একবার মিথ্যে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, 'আমি যদি অমুকটা করে থাকি তবে যেন ঘোড়ামুখো রাক্ষসী হয়ে জন্মাই।' এই মিথ্যে প্রতিজ্ঞার ফলে পরজন্মে রাণী সত্যি সত্যি ঘোড়ামুখী রাক্ষসী হয়ে জন্মালেন।

ঘোড়ামুখী রাক্ষসী থাকত এক পাহাড়ের কাছে। তিন বছর বৈশ্রবনের সেবা করেছিল বলে সে বর পায় ঐ অঞ্চলের ত্রিশ যোজন এলাকার মধ্যে কোন লোককে পেলে, সে রাক্ষসীর খাদ্য হবে।

একদিন রূপবান এক ব্রাহ্মণ অনেক লোকজন নিয়ে ঐ পাহাড়ের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখে রাক্ষসী বেজায় খুশি। ভাবল পেট পুরে খাওয়া যাবে। কিন্তু রাক্ষসী ধরার আগে ব্রাহ্মণের লোকজন পালিয়ে গেল। রাক্ষসী ব্রাহ্মণকে ধরে ফেলল। ব্রাহ্মণকে সে পিঠে করে গুহায় নিয়ে এল। গুহায় ফিরে ব্রাহ্মণের সুন্দর চেহারা দেখে রাক্ষসীর মন নরম হল। ভাবল, একা একা থাকি। এই ব্রাহ্মণকে বিয়ে করলে ভাল সঙ্গী পাওয়া যায়। প্রাণের দায়ে ব্রাহ্মণ রাজি হল। এরপর রাক্ষসী পথিকদের খেয়ে ফেলত, আর পথিকদের চাল-ডাল এনে দিত ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণ নিজে রান্না করে খেত। কিন্তু রাক্ষসী তাকে বাইরে যেতে দিত না। ব্রাহ্মণ যদি পালিয়ে যায় এই ভয়ে শিকার করতে যাওয়ার সময় সে গুহার মুখে ভারি পাথর চাপা দিয়ে যেত।



বোধিসত্ত্ব একদিন ঐ বাক্ষসীব গর্ভে জন্ম নিলেন। বাক্ষসী পুত্র-স্নেহে অন্ধ। বেশ আদবযত্নেব মধ্যেই বোধিসত্ত্ব বড হতে লাগলেন। একদিন বাক্ষসী বাইবে গেলে বোধিসত্ত্ব বাবাকে বাইবে নিযে এলেন। বাক্ষসী যিবে এসে বুঝল পাথর সবানো হযেছিল। সে জিজ্ঞাসা কবল, 'পাথবটা কে সবিযেছিল?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি সবিযে-ছিলাম মা, দিবাবাত গুহাব মধ্যে থাকতে ভাল লাগে নাকি?'

কিছুদিন পবে বোধিসত্ত্ব বাবাকে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'আচ্ছা বাবা, মাকে দেখতে এক বকম, তোমাকে দেখতে আবেক রকম কেন?' ব্রাহ্মণ ছেলেকে তখন সব কথা খুলে বললেন। সব শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তাহলে আমবা কেন বাক্ষসীব কাছে থাকি। আমবা মানুষ, মানুষেব সঙ্গেই থাকব। চল, এখান থেকে পালাই।'

এবপব তিনি দুবাব বাপকে সঙ্গে নিযে পালাতে চেষ্টা কবলেন।



কিন্তু দুবাবই বোধিসত্ত্ব ধবা পডে গেলেন। নেহাৎ বাক্ষসী ছেলেকে খুব ভালবাসত তাই সে কিছু বলল না। তখন বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, বাক্ষসদেব চবার জাযগা মাপা থাকে, তাব বাইবে তাবা কাউকে খেতে পাবে না। কাযদা কবে মাব এলাকাব সীমা জেনে নিতে হবে।

একদিন তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, তুমি মরে গেলে এই এলাকা তো আমার হবে।'

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

তাহলে এলাকাটা আমার জানা দরকার।

ঠিকই তো। বলছি, শুনে নাও।

রাক্ষসী বোধিসত্ত্বকে বলে গেল উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে তার এলাকার সীমা কোথায় কোথায়। বোধিসত্ত্ব দেখলেন নদীর দিকটাই সংক্ষিপ্ত। একবার নদীতে পা দিতে পারলে রাক্ষসী আর কিছুই করতে পারবে না।



দু-তিন দিন পরে রাক্ষসী শিকার করতে বেরিয়ে গেলে বোধিসত্ত্ব বাবাকে কাঁধে নিয়ে বাতাসের বেগে ছুটে চললেন। যে করে হোক রাক্ষসীর এলাকার বাইরে যেতে হবে। রাক্ষসীও পেছন পেছন ছুটে আসতে লাগল। ততক্ষণে বোধিসত্ত্ব বাবাকে নিয়ে কোনক্রমে নদীতে নেমে পড়েছেন। রাক্ষসী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল : আয় বাবা, ফিরে আয়। কি তোদের দুঃখ বল!

বোধিসত্ত্ব বললেন : মা, আমরা মানুষ। আমাদের মানুষের কাছে যেতে দাও।

অনেকবার ডাকাডাকি করেও যখন তাঁরা ফিরলেন না তখন রাক্ষসী বলল, 'দেখ বাছা, যাবিই যখন একটা কথা শুনে যা। মানুষের দেশ সহজ নয়। সেখানে নিজের খাবারটা জোগাড় করতে গেলে কোন না কোন বিদ্যে জানা থাকা চাই। তুই তো মানুষদের কোন বিদ্যেই জানিস না। আমি চিন্তামণি নামে একটা বিদ্যা জানি। তুই ঐ মন্ত্রটা জলে দাঁড়িয়ে শিখে নে। এই বিদ্যে দিয়ে এক বছর আগে যে মানুষ চলে গেছে তার পায়ের দাগ দেখতে পাওয়া যায়।'



বোধিসত্ত্ব রাক্ষসী মার কাছ থেকে মন্ত্রটি শিখে নিলেন। মন্ত্র শেখানোর পর রাক্ষসী শোকে বুকে চাপড় মারতে লাগল। পুত্রশোকে ঐখানেই মারা গেল। বাবাকে নিয়ে বোধিসত্ত্ব ফিরে এলেন। রাক্ষসীর মরদেহ দাহ করলেন। তারপর লোকালয়ের দিকে রওনা হলেন।



এরপর বোধিসত্ত্ব তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বারাণসীতে এলেন। বারাণসীরাজকে খবর পাঠালেন পদকুশল নামে এক ব্যক্তি রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী। রাজা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, বার বছর আগেও কোন জিনিস চুরি গিয়ে থাকলে আমি চোর এবং চুরি যাওয়া জিনিস বের করতে পারি।' রাজা বললেন, 'বেশ, তাহলে তুমি আমার এখানে চাকরি কর।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'কিন্তু মহারাজ, আমার মজুরি প্রতিদিন হাজার টাকা।' রাজা বললেন, 'বেশ, তাই পাবে।'

এভাবে কিছুদিন কাটলে রাজার পুরোহিত রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, এই ছেলেটাকে আমরা এত টাকা দিচ্ছি, কিন্তু সে ঠিক কি বিদ্যা জানে তা পরীক্ষা করা হয় নি। একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।' রাজারও প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না।



তখন রাজা এবং পুরোহিত দুজনে রত্নরক্ষকদের না জানিয়ে কিছু দামী রত্ন প্রাসাদ থেকে নামালেন। অন্ধকারে তিনবার রাজবাড়িটা ঘুরলেন। পাঁচিলে উঠলেন, পাঁচিল থেকে নামলেন। তারপর রাজবাড়ির পুকুরটা তিনবার পাক খেয়ে পুকুরের মধ্যে সব রত্ন যত্ন করে পুঁতে রাখলেন।

পরের দিন রটে গেল রাজবাড়ি থেকে অনেক মূল্যবান রত্ন চুরি গেছে। রাজা বোধিসত্ত্বকে ডেকে বললেন, 'বাছা, এবার তোমার ক্ষমতা দেখাও। কাল রাতে রাজকোষ থেকে রত্ন চুরি হয়েছে শুনেছ নিশ্চয়ই।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এক্ষুনি চোর ধরে দিচ্ছি, সবে তো গতকাল চুরি হয়েছে। বার বছর আগে চুরি হলেও আমি চোরের পায়ের দাগ খুঁজে বের করতে পারতাম।'



প্রথমে বোধিসত্ত্ব মনে মনে তাঁর রাক্ষসী মাকে প্রণাম করলেন। তারপর মন্ত্র পাঠ করে কাজ শুরু করে দিলেন। রাজকোষের সামনে একটু দেখেই বললেন, 'মহারাজ, দুজন চোরের পায়ের ছাপ দেখছি।' তারপর ঐ পায়ের ছাপ অনুকরণ করে রাজা ও রাজার পুরোহিতের শোবার ঘরে ঢুকলেন। তারপর সেখান থেকে গেলেন রাজকোষের কাছে। তারপর নিচে নেমে এসে রাজবাড়িকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন। মোট কথা, রাজা এবং রাজপুরোহিত যেভাবে যা করেছিলেন বোধিসত্ত্ব সেইসব জিনিস করে শেষ পর্যন্ত রত্নগুলো পুকুর থেকে তুলে

আনলেন। রাজা এতে কিছুটা মুগ্ধ হলেও তখন তাঁকে পরীক্ষা করার নেশায় পেয়েছে। বললেন, 'কই বাপু, চোর ধরলে না।'

মহারাজ, আপনি তো বস্তুগুলো ফেরৎ পেলেন।

চোরকে ধর এবার।

আর চোরকে ধরে কি করবেন?

সেটাই তোমার কাজ, চোর ধরা।

বোধিসত্ত্ব তখন রাজাকে একে একে অনেকগুলো গল্প বললেন।

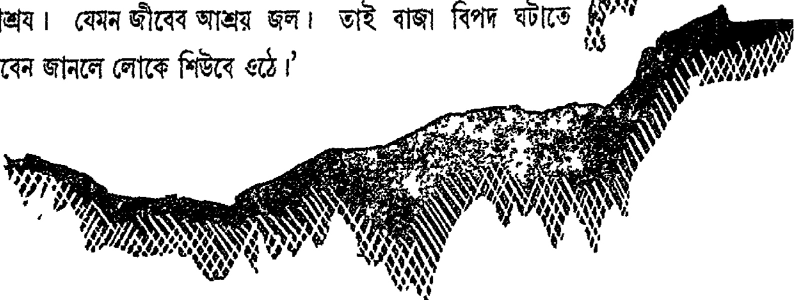


প্রথম গল্প:



এক গায়ক তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বারাণসীতে গান করতে গিয়েছিল। সেখানে গান করে গায়ক অনেক টাকা পেল। নদীপথে ফিরে আসার সময় তারা জলে পড়ে যায়। গায়কের গলার সঙ্গে মহাবীণা বাঁধা ছিল। বীণার জল ঢুকে গায়ক ডুবতে লাগল। তার স্ত্রী কোন মতে সাঁতরে নদী পেরিয়ে গেল। তারপর তার মনে হল গায়কের কাছে দু-একখানা গান যদি শিখে নিই তাহলে টাকার অভাব হবে না। সে গায়ককে বলল, 'স্বামী, আপনি তো ডুবে গেছেন, এদিকে আমি কি করে বাঁচি। আপনি মৃত্যুর আগে আমাকে একটা গান শেখান।' এর জবাবে তার স্বামী বলল, 'দেখ, যে জলের আর এক জীবন, সে-ই এখন আমার জীবন শেষ করে দিচ্ছে। এ রকম অবস্থায় আমি কি করে তোমাকে গান শেখাই।'

গল্পটি বলা হলে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, রাজারাই মানুষের আশ্রয়। যেমন জীবের আশ্রয় জল। তাই রাজা বিপদ ঘটাতে পারেন জানলে লোকে শিউরে ওঠে।'



দ্বিতীয় গল্প :

এক কুমোর মাটির ভাঁড় বানাত। সে এক জায়গায় গর্ত করে মাটি নিয়ে আসত। একবার বর্ষাকালে ওপরের মাটি ধসে পড়ল। কুমোর তখন মরতে মরতে ভাবল এই ধরিত্রীই সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করে আছে। আর এখন সে-ই আমার শেষ জীবন করতে চাইছে। ধরিত্রী যেমন জীবের রক্ষাকর্তা, রাজাও তেমনি মানুষের রক্ষাকর্তা। বোধিসত্ত্ব বললেন, 'সুতরাং রাজা বিপথগামী হলে প্রজাদের ভয়ের শেষ থাকে না।'

তৃতীয় গল্প :

এই বারাণসী নগরেই একজনের ঘরে আগুন লেগেছিল। সে তার প্রতিবেশী একজনকে বলে ঘরের মধ্যে ঢুকল জিনিসপত্র বের করে আনতে। কিন্তু ঘরের ভেতরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আগুনে পুড়ে সে মারা গেল।



বোধিসত্ত্ব রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, এখন দেখলেন তো যে আগুনে ভাত রান্না হয়, যে আগুন রক্ষক, সেই আগুনেই বেচারা প্রাণ হারাল। ঠিক তেমনি প্রজাদের যিনি রক্ষক যদি তিনিই অন্যায় কাজ করেন তাহলে আর উপায় থাকে না।'

রাজা শুনে বললেন 'বাপু, তুমি হেঁয়ালি ছেড়ে স্পষ্ট কথায় আমাকে বল কে চোর।'

বোধিসত্ত্ব তখন আরও দুটো গল্প বললেন।



চতুর্থ গল্প :

এই নগরেই একটা লোক খুব বেশি খেয়ে ফেলেছিল। অথচ তার পেটে অত শক্তি নেই যে বাড়তি খাবার হজম করে। তখন তার অজীর্ণ রোগ হল। বেচারা সেই রোগে মারা গেল।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এখন দেখুন, শত সহস্র মানুষ যা থেকে পুষ্টি লাভ করে, সেই খাবারই লোকটির মৃত্যুর কারণ হল। এবার বুঝলেন তো?'

রাজা আবার বললেন : 'এসব শুনতে চাই না। কে চোর সেই কথাটা বল।'



পঞ্চম গল্প :

এই নগরেই একবার সাংঘাতিক ঝড় হয়েছিল। একজন ঝড়ে পড়ে যায়। তার হাত-পা ভেঙ্গে গেল। সে তখন বিলাপ করতে করতে লাগল এই বলে—গ্রীষ্মে যখন পৃথিবী আর মানুষ পুড়ে যাচ্ছে তখন ঝড় আসে বৃষ্টির সংবাদ নিয়ে। সে জীবন দান করে। জীবন-দাতাই যদি জীবনহানি করে তাহলে কে আর বাঁচবে?



ষষ্ঠ গল্প :

কাশী রাজ্যের এক গ্রামে এক দম্পতি থাকত। আর থাকত দম্পতিটির দুজনেরই মা। চার জনের সংসার। বৌ-টি শাশুড়িকে খুন করার জন্য স্বামীর কাছে শাশুড়ির নামে অনেক নিন্দে করল। শেষে ঠিক হল যেহেতু দুজনেরই মা এক ঘরে শোয়, সেজন্য স্বামীটির মার খাটে শিকল বাঁধা থাকবে। রাতে খাটশুদ্ধ তুলে নিয়ে সেই বৃদ্ধাকে নদীতে ফেলে দেবে। কুমিররা তার সদগতি করবে।

স্বামীটি ফন্দি করে বৌর মার খাটে শিকল বেঁধে রাখল। ফলে পরের দিন বৌ-টি দেখল শাশুড়ি যেমন ছিল তেমনি আছে, নিজের মা-কেই সে শেষ করেছে।

আবার ষড়যন্ত্র করল সে। এবার স্বামীকে বাধ্য করল মাঝ রাতে খাটিয়া শুদ্ধ বুড়িকে তুলে নিতে। কিন্তু শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল তারা দাহ্য বস্তু কিছুই আনে নি। তখন দুজনেই আবার ঘরে ফিরে গেল।

ওদিকে শাশুড়ি হঠাৎ জেগে উঠে শ্মশান দেখে ব্যাপারটা খানিক আন্দাজ করতে পারল। বুড়ি তখন শ্মশানে একটা লাশ খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে নিজে পাশের এক গুহায় আত্মগোপন করে রইল।



ছেলে-ছেলের বৌ ফিরে এসে মরা লাশটাকে বুড়ি ভেবে দাহ করল। বুড়ি নিজের চোখে সেসব দেখল। বৃদ্ধা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছে সেখানে এক চোর অনেক মণিমাণিক্য রেখে গিয়েছিল। বুড়ি সেসব নিয়ে পরের দিন বাড়ি ফিরল। বৌ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঐসব মণিমাণিক্য কোথায় পেলেন?' বৃদ্ধা ফন্দি করে বলল, 'তোমার দয়ায় মা। আমাকে তুমি পুড়িয়ে দিয়েছিলে। জ্যান্ত মানুষকে পোড়ালে সে মরে না, উল্টে সোনাদানা পায়।' সে কথা শুনি বৌ নিজে সোনার লোভে শ্মশানে গিয়ে শুয়ে রইল। স্বামীকে বলল, আগুন লাগাতে।



'মহাবাজ, বুঝতেই পাবছেন সেই বৌটি আব বাঁচে নি।'

পরেব দিন ছেলে জিজ্ঞেস কবল, 'মা, বৌ কোথায গেল?' বৃদ্ধা বলল, 'ওরে বদমাইস, মবলে কেউ যেবে?' তাবপর মনে মনে ভাবল, ছেলেকে জোর কবে বিযে দিযে ঘবে বৌ আনালাম তাব আশ্রযে থাকব বলে। আব সে কিনা আমাকেই মারতে চায!

এত গল্প শুনেও বাজা নাছোডবান্দা। তখন বোধিসত্ত্ব প্রজাদেব ডেকে বললেন, 'ভাই। এই বাজা আব তার পুরোহিত বাজকোষের অর্থ চুবি কবেছিল। তোমবা বিচাব কব।' মুহূর্তের মধ্যে প্রজাবা বাজা আব পুবোহিতকে শেষ কবল।



মিত্রবন্দিক জাতক



কাশ্যপেব আমলে এক ধনী ব্যবসাযীব একটি ছেলে ছিল। তার নাম মিত্রবন্দিক। মিত্রবন্দিকেব বাবা-মা ছিলেন ধর্মপরায়ণ ও সৎ চরিত্রের মানুষ। তাঁরা উপোস করতেন, দান-ধ্যান করতেন। মিত্র-বন্দিকেব স্বভাবটি কিন্তু একেবাবে উল্টো।

এক সময মিত্রবন্দিকেব বাবা মাবা গেলেন। তখন তার মা-ই সম্পত্তি দেখাশোনা কবতেন। মা যতই ভাল ভাল কথা বলুন, নিয়মনিষ্ঠাব সঙ্গে চলতে বলুন, সেসব কথা মিত্রবন্দিকেব মনে ধরত না। একদিন মা-ছেলেতে কথাবার্তা হল:

বাবা, আজ মহাপোষধ।

সে আবাব কি?

আজ পুণ্যদিন।

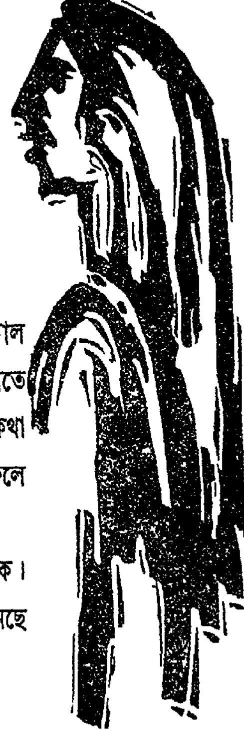
তা আমি কি করব?

তুমি উপোস কর, মঠে যাও। ধর্মকথা শোন।

কেন?

ফিরে এলে তোমাকে এক হাজার টাকা দেব।





টাকার লোভে মিত্রবন্দিক রাজি হল। জলখাবার খেয়ে সকাল বেলাতেই সে মঠে গেল। সারাটা দিন সেখানে কাটাল। রাতে ধর্মকথা হবে। মিত্রবন্দিক মঠ ছেড়ে পালাল, কারণ তা না হলে ধর্মকথা তার কানে ঢুকবে। ধর্মকথা সে একেবারেই পছন্দ করে না। ফলে সে মঠ ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে ঘুমিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিল।

সকাল বেলায় মিত্রবন্দিককে ফিরে আসতে দেখে মা অবাক। সে একা আসছে। মা ভেবেছিল, যে তপস্বীর কাছে ধর্মকথা শুনেছে ভোরবেলা তাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে।

কথক মশাইকে সঙ্গে করে আনলি না?

কেন, তাকে দিয়ে কি হবে?

মা তখন আর তর্কাতর্কি না করে মিত্রবন্দিককে খেতে দিল। খাবার সামনে পড়ে আছে কিন্তু মিত্রবন্দিক মুখে তুলছে না দেখে মা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'খাচ্ছিস না কেন?' তখন মিত্রবন্দিক বলল, 'আগে টাকাটা দাও।'

টাকার থলেটা পাওয়ার পর মিত্রবন্দিক খাওয়া শেষ করল। তারপর ঐ টাকা নিয়ে বাণিজ্য করতে যাবে ঠিক করল। নৌকো বানাতে দিল। মা অনেকবার বলল, 'কি দরকার বাবা, ঘরে কি টাকার অভাব আছে? কেন দূর দেশে যাবি?' কিন্তু কে কার কথা শোনে। মা আটকাতে গেলে, মাকে মেরে ফেলে দিয়ে সে চলে গেল।



নৌকো ছেড়ে দিল। সাত দিনের মাথায় সমুদ্রের বুকে নৌকো অচল হল। দাঁড়ি-মাঝিরা পড়ল মহা সমস্যায়। অনেক ভেবে তারা দেখল নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একজন ঘোর পাপী আছে। দেখতে হয় কে সেই পাপী। কড়ি গণনা করা হল। তিনবার গণনা করা হল। তিনবারই মিত্রবিন্দিকের নাম উঠল। তখন তারা একটা ভেলা বানিয়ে তাতে মিত্রবিন্দিককে ভাসিয়ে দিল।



মিত্রবিন্দিক ভাসতে ভাসতে এক দ্বীপে এসে ঠেকল। ঐ দ্বীপে চারজন প্রেতিনী নাচগান করছিল। মিত্রবিন্দিককে তাদের পছন্দ হল। তারা তাকে বেশ যত্নআত্তি করল। এক সপ্তাহ পরে তারা বলল: 'প্রভু, আমাদের এক সপ্তাহ সুখ ভোগ আর এক সপ্তাহ দুঃখ ভোগ করতে হয়। আমাদের সুখভোগের সপ্তাহের কাজ শেষ হল। এবার দুঃখ ভোগের জন্য অন্য জায়গায় যেতে হবে। আপনি সাতদিন এখানে অপেক্ষা করবেন, আমরা ফিরে আসব।'

তারা চলে যেতে মিত্রবিন্দিক ভাবল, 'কেন খামোখা ওদের জন্য অপেক্ষা করি। এক সপ্তাহে আমি আরও সুন্দর, চমৎকার দ্বীপে যেতে পারি।' সে ভেলায় চড়ে আবার রওনা হল। নতুন এক দ্বীপে এল সে। সেখানে ছিল ছাপ্পান্ন জন প্রেতিনী। মিত্রবিন্দিক তাদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করে এক সপ্তাহ কাটাল। তারপর তারাও আগে-কার প্রেতিনীদের মত দুঃখভোগ করতে চলল। যাওয়ার সময় মিত্রবিন্দিককে অপেক্ষা করতে বলে গেল।

মিত্রবন্দিক এখানেও তাদের জন্য অপেক্ষা করল না। বরং ভেলায় চড়ে নতুন দ্বীপের খোঁজে রওনা হল। এবার সে হাজির হল উৎখাত নরকে। সেখানে নানা লোকে নানা নারকীয় শাস্তি আর যন্ত্রণা ভোগ করছিল। মিত্রবন্দিক মনে মনে ভাবল আমি এখানকার রাজা হব।

শহরের মধ্যে ঢুকে দেখল একজনের মাথার ওপর চক্র ঘুরছে। মিত্রবন্দিকের মনে হল ওটা চক্র নয়, পদ্মফুল। মিত্রবন্দিক চোখের ভুলে চক্রটাকে পদ্মফুল ভাবল। লোকটার সারা শরীরে রক্তের ধারা নামছিল। মিত্রবন্দিক ভাবল তা খুব দামী পোশাক। সে তার কাছে গিয়ে বলল ঃ সম্রাট, আপনি তো অনেকক্ষণ পদ্মফুলটাকে মাথায় করে আছেন, আমায় একবারের জন্য ধরতে দিন।

এটা চক্র, পদ্মফুল নয়।





কেন মিছে কথা বলছেন?

চক্রধারী লোকটি বুঝতে পারল, 'ও তাহলে আমার মত পাপী, নিজের মাকে মেরেছে বলেই নরকে পতিত হয়েছে।' তারপর সে এগিয়ে এসে বলল, 'এই নিন।' মিত্রবন্দিকের মাথায় সে চক্রটি ফেলে দিল। যন্ত্রণায় মিত্রবন্দিক চিৎকার করতে লাগল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেল।

লোকটির কর্মফল তখন শেষ হয়েছে। কিন্তু মিত্রবন্দিকের সবে শুরু হল। একদিন বোধিসত্ত্ব তাঁর অনুচরদের সঙ্গে নরক দেখতে এলেন। বোধিসত্ত্বকে দেখে মিত্রবন্দিক বলল, 'প্রভু, যাঁতা যেমন তিল পেষে এই চক্র আমাকে সেইভাবে পিষে ফেলছে। আমি কি পাপ করেছি?'

বোধিসত্ত্ব একে একে তাকে তার পাপগুলো বুঝিয়ে দিলেন।

কৃষ্ণ জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে এক ধনবান ব্রাহ্মণ বাস করত। ব্রাহ্মণের কোন ছেলে ছিল না। তখন তিনি ছেলে পাওয়ার আশায় শীলব্রত নিলেন। এই ব্রতের ফলে বোধিসত্ত্ব তাঁর ছেলে হয়ে জন্মান। বোধিসত্ত্বের গায়ের রঙ কালো হয়েছিল, সেজন্য লোকে তাঁকে কৃষ্ণকুমার বলে ডাকত।

কৃষ্ণকুমারের বয়স যখন ষোল বছর হল তখন তাঁকে দেখতে অপূর্ব লাগত। লেখাপড়া শেখাবার জন্য বাবা তাঁকে তক্ষশিলায় পাঠালেন। কৃষ্ণকুমার যথাসময়ে সুশিক্ষিত হয়ে বারাণসীতে ফিরে এলেন। ধনী ব্রাহ্মণ দেশের উপযুক্ত পাত্রী খুঁজে ঘরে পুত্রবধূ আনলেন। তারপর একদিন তাঁর বাবা-মা গত হলেন। কৃষ্ণকুমার এক বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেন।



একদিন কৃষ্ণকুমার তাঁর রত্নভাণ্ডার খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বংশের হিসেবের খাতা খুলে বসলেন। ঐ খাতায় লেখা ছিল কৃষ্ণকুমারের পূর্বপুরুষরা কে কত ধনসম্পত্তি রেখে গেছেন।

কৃষ্ণকুমার খাতাটি খুলে ভাবতে ভাবতে চিন্তায় তলিয়ে গেলেন। প্রত্যেকে কত না ধন রেখে গেছেন। যাঁরা ধন রেখে গেলেন তাঁদের কথা কিছুই জানা যাচ্ছে না। শুধু তাঁরা যে সম্পত্তি উপার্জন

করেছিলেন তার পরিমাণ জানা সম্ভব। তাঁরা কেউই ধনসম্পত্তি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন নি।

ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণকুমার একেকটি স্তর অতিক্রম করতে থাকেন। শত্রু, চোর আর বিপদেই শুধু ধনক্ষয় হয়ে থাকে। সুতরাং ধন হচ্ছে অসার বস্তু। অথচ মানুষ এই অসার বস্তুর পেছনেই নিজেদের মরণশীল জীবন খরচ করে থাকে।



কৃষ্ণকুমার ঠিক করলেন, আমি তা করব না, বরং এই অসার ধন আমি দান করে নিঃশেষ করব। তারপর তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করব।

কৃষ্ণকুমার এ ব্যাপারে রাজার অনুমতি চাইলেন। রাজার অনুমতি পাওয়ার পর কৃষ্ণকুমার একনাগাড়ে সাত দিন অঢেল দান করলেন। যখন তাতেও ধন ফুরোচ্ছে না, তখন তিনি বাড়ির সব দরজা খুলে দিলেন। ঘোষণা করলেন : আমি সমস্তই দান করলাম—যার যা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পার।

কৃষ্ণকুমার তারপর নগর ছেড়ে বনের দিকে চললেন। তপস্বী হলেন। ন্যায়বাদীরা রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। বনের মধ্যে একটা সুন্দর জায়গা বেছে মাকাল গাছের তলায় তিনি তপস্যা করতে বসলেন। তিনি কোন কুটির বানালেন না। খাবার রান্না করতেন না। মাকাল গাছ থেকে যে দু-একটা ফল পড়ত তাই খেতেন। পৃথিবী, জল, আগুন, আর বায়ুর মতই তিনি ক্ষমাশীল হলেন। এবারের জন্মে বোধিসত্ত্ব খুব সামান্য ইচ্ছা নিয়ে জন্মলাভ করেছিলেন।



বোধিসত্ত্বের সিদ্ধিলাভে বিলম্ব হল না। তাঁর তপস্যার জোরে শক্রের আসন টলে উঠল। শক্র ঠিক করলেন তপস্বীকে দিয়ে গর্বভরে ধর্মকথা বলাবেন, তারপর তাঁকে ধ্রুব ফল লাভের বর দিয়ে ফিরে আসবেন। এতে তপস্বীর তেজ নষ্ট হবে।

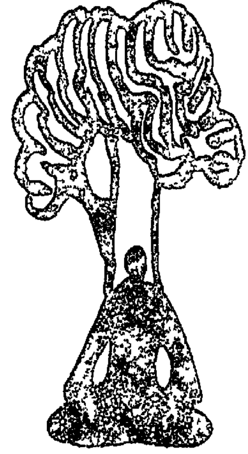
প্রথমে শক্র এসে বোধিসত্ত্বের কালো রঙের নিন্দা শুরু করলেন। বোধিসত্ত্বকে রাগাতে চাইলেন।

'ছিঃ ছিঃ, কি কালো রঙ, দেখলে ঘেন্না করে। একে তো নিজে কালো, আবার কালো কালো ফল-লতা খাস। যে মাটির ওপর তুই বসে আছিস সেটাও কালো। একসঙ্গে এত কালো বেশ মিশেছে।'

বোধিসত্ত্ব তপস্যা ভঙ্গ করে চোখ খুললেন না। তপস্যার শক্তিতেই বুঝলেন শক্র এসেছেন। তখন তিনি বললেন: 'যার অন্তঃকরণ ঘৃণ্য সেই ঘৃণার বস্তু, সেই কালো, আমি কেন কালো হতে যাব মশাই।'

শক্র বোধিসত্ত্বের কথা শুনে খুশি মনে বর দিতে চাইলেন। বেশ কয়েক বার চেষ্টা করলেন তাঁকে সুযোগ সুবিধে দিতে, কিন্তু বোধিসত্ত্ব অন্য বর চেয়ে নিলেন।

রাগ হিংসা যাতে না হয়, অন্যের ক্ষতি না হয় ইত্যাদি ছটি বর তিনি শক্রের কাছে চাইলেন।



শঙ্খ জাতক





অতীত কালে বারাণসীর নাম ছিল মোলিনী। ব্রহ্মদত্তের আমলে এই মোলিনী নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন, তাঁর নাম শঙ্খ। ব্রাহ্মণ নগরের চারদিকে, নগরের মাঝখানে আর নিজের বাড়ির পাশে ছটি দানশালা বানিয়েছিলেন। প্রত্যেক দিন দুঃস্থ গরিবদের তিনি হাজার হাজার টাকা দান করতেন।

শঙ্খ একদিন মনে মনে ভাবতে লাগলেন এভাবে দান করলে আমার সম্পত্তি ফুরিয়ে যাবে, তখন দান বন্ধ করতে হবে। আরও ধন-সম্পত্তি উপার্জন করতে পারলে তবেই এভাবে দান করা সম্ভব। তাহলে কোন দিনই দানশালার দরজা বন্ধ করতে হবে না। যেভাবেই হোক দানশালাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পূর্ব উপদ্বীপে বাণিজ্য করতে যেতে হবে।





শঙ্খ নৌকো সাজালেন। নৌকোয় মাল তোলা হল। তারপর স্ত্রী-পুত্রকে ডেকে বললেন, 'আমি না ফেরা পর্যন্ত তোমরা দানশালা বন্ধ কোরো না।' তার পরদিন লোকজন সঙ্গে নিয়ে নদীর ঘাটের দিকে চললেন। তখন মাঝ দুপুর। শঙ্খের হাতে ছাতা। পায়ে খড়ম দিয়ে শঙ্খ চলেছেন।



ঠিক তখন এক সিদ্ধ পুরুষ গন্ধমাদন পর্বতে বসে অনুভব করলেন শঙ্খ বাণিজ্যে যাচ্ছেন। তিনি চিন্তা করে দেখলেন শঙ্খ সমুদ্রে পৌঁছলে তাঁর বিপদ দেখা দেবে। কারুকাজ করা মণিমুক্তা বসানো তাঁর নৌকোটি ডুবে যাবে। সিদ্ধ পুরুষ দেখলেন শঙ্খকে বাঁচানোর একটাই উপায় আছে। যদি শঙ্খ তাঁকে পাদুকা দান করেন, তাহলে তাহলে শঙ্খ ঐ বিপদে রক্ষা পাবেন।

সিদ্ধপুরুষ আকাশপথে চললেন। একটু দূরে গেলে গরম বালিতে খালি পায়ে হেঁটে তিনি এগিয়ে চললেন। শঙ্খ তাঁকে দেখে ভাবলেন, ওই তপস্বী আমার প্রণম্য। তিনি তাঁকে সমাদর করে একটি গাছের তলায় আসন পেতে বসালেন। নিজের হাতে তাঁর পা-দুটি ধুইয়ে দিলেন। তারপর তাঁকে ছাতা এবং নিজের পাদুকা দান করলেন।

এ ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে শঙ্খ মাঝসমুদ্রে পড়লেন। তখন হঠাৎ তাঁর নৌকোর তলায় ফুটো দেখা দিল। সেখান দিয়ে জল ঢুকতে লাগল। কিছুতেই জল সেঁচে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না দেখে শঙ্খ সারা গায়ে তেল মাখলেন, একজন অনুচরকেও তেল মাখতে বললেন। তারপর ঘিয়ে চিনি মিশিয়ে দুজনেই অনেকটা খেয়ে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।



এক সপ্তাহ তাঁরা সাঁতার কেটে চললেন। সমুদ্রের মধ্যে ঐ অবস্থায়ও শঙ্খ জপতপ করলেন। ধ্যান করলেন।

ঐ সময় মণিমেখলা নামে এক দেবী ছিলেন সমুদ্র রক্ষিনী। তাঁর ওপর নির্দেশ ছিল দানশীল, তপোবল আছে, বাবা-মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে এখন কেউ সমুদ্রে বিপদে পড়লে তাকে রক্ষা করতে হবে। প্রথম এক সপ্তাহ মণিমেখলা নিজের কাজ ভুলে ছিলেন। পরে যেই দেখলেন এক সৎ ব্রাহ্মণ বিপদে পড়েছেন তখন তাঁকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এলেন।



মণিমেখলা প্রথমে তাঁর কাছে খাদ্য নিয়ে এলেন : তুমি সাত দিন না খেয়ে আছ, এই খাবারটা খেয়ে নাও।

শঙ্খ বললেন : আমি উপবাস ব্রত পালন করছি, এখন খেতে পারব না।

শঙ্খের অনুচর ভাবল, ব্রাহ্মণ সাতদিন অনাহারে থেকে, এত কষ্ট পেয়ে এখন প্রলাপ বকছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'প্রভু, কার সঙ্গে কথা বলছেন ?' শঙ্খ বুঝলেন লোকটা দেবীকে দেখতে পাচ্ছে না। তিনি তাকে বললেন সমুদ্র রক্ষিনী এসেছেন।



উনি কি মানবী, না দেবী ?

উনি দেবী।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত শঙ্খ এবং তাঁর অনুচর বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন। দেবী তাঁদের একটি বিশাল নৌকো দিলেন। অঢেল সম্পদ দিলেন। শঙ্খের উদ্দেশ্য সফল হল। দানশালা চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত রইল।

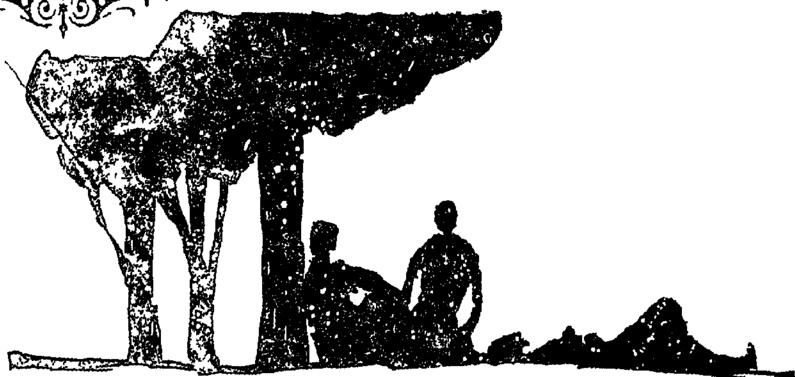
ন্যগ্রোধ জাতক



অতীতকালে রাজগৃহে মগধ মহারাজ নামে এক রাজা ছিলেন। রাজগৃহের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী সেই সময় আর এক ব্যবসায়ীর মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দেন। বিয়ের পর অনেক দিন কেটে গেল। কিন্তু তাঁর ছেলের বৌর কোন ছেলেমেয়ে হল না। তাঁরা তখন ভাবলেন, 'বৌ বাঁজা।' ফলে বৌ-র আদর যত্ন কমল।

ছেলের বৌ দেখল এরকম চললে সে আর কোনদিনই আদরযত্ন ফিরে পাবে না। তাই সে রটিয়ে দিল, 'আমি মা হতে চলেছি।' তারপর কিছুদিন পরে সে শ্বশুর-শাশুড়ির মত নিয়ে বাপের বাড়ি রওনা হল। রাস্তায় সে এক নবজাতককে কুড়িয়ে পেল। কিছুক্ষণ আগেই ঐ নবজাতকের জন্ম হয়েছিল। নবজাতক আর কেউ নন, স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। ছেলেকে নিয়ে সে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে এল। ছেলের নাম হল ন্যগ্রোধকুমার।

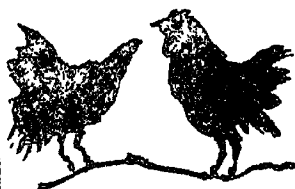




ঠিক ঐদিন নগরের আর এক ব্যবসায়ীর একটি ছেলে হয়, তার নাম রাখা হয় শাখকুমার। সেদিন এক দরিদ্রেরও একটি ছেলে হয়, তার নাম রাখা হল পোত্তিক। রাজগৃহের ব্যবসায়ী ঐ দুটি শিশুকেও নিজের বাড়িতে আনালেন। তিনটি শিশু একসঙ্গে বড় হতে থাকল। তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব জন্মাল। তারা একই গুরুর কাছে শাস্ত্র শিক্ষা সম্পূর্ণ করল।

শিক্ষা শেষ হবে তাঁরা তক্ষশিলা থেকে বেরিয়ে এলেন লোকচরিত্র জানার জন্য। নানা জায়গায় ঘুরে শেষে বারাণসীতে পৌঁছলেন। সেখানে এক মন্দিরের মধ্যে থাকতেন। যখনকার এই ঘটনা, তার ছদিন আগে বারাণসীর রাজা দেহ রেখেছেন। নগরে প্রচার করা হল, রাজার খোঁজে আগামীকাল পুষ্প রথ বের করা হবে।

তিন বন্ধু গাছের তলায় শুয়ে আছেন। পোত্তিক খুব ভোরে উঠে ন্যগ্রোধকুমারের পা টিপছিল। ঐ গাছে কয়েকটা মুরগী থাকত। একটা মুরগী আরেকটি মুরগীর গায়ে মলত্যাগ করল। এতে অপর মুরগীটি রেগে গেল।



গায়ে কি পড়ল রে?

রাগ করিস নে ভাই।

তবে রে, জানিস আমি কে। আমার কি ক্ষমতা জানিস?

বললাম তো, না জেনে ফেলেছি। বল দেখি তো কি ক্ষমতা।

আমার মাংস যে খাবে সে এক হাজার টাকা পাবে।

এই মুর্খ! শোন তবে, আমার মুণ্ডু যে খাবে সে রাজা হবে।



ধড় যে খাবে সে সেনাপতি হবে, ঠ্যাং খেলে হবে ভাণ্ডারিক।

পৌত্তিক গাছে উঠে মুরগীটাকে ধরল। তারপর কেটে রান্না করল। ন্যগ্রোধকে দিল মাথাটা, শাধকুমারকে দিল ধড়, নিজে ঠ্যাংগুলো খেল। তারপর বন্ধুদের কাহিনীটি খুলে বলল।

তিন বন্ধু তারপর বারাণসীতে ঢুকলেন। সেখানে রাজার বাগানে গিয়ে ন্যগ্রোধ শুয়ে রইলেন। দু পাশে রইল দুই বন্ধু। পুষ্পক রথ এসে বাগানের বাইরে থেমে গেল। রাজপুরোহিত বুঝলেন, 'নিশ্চয়ই বাগানের মধ্যে কোন সুলক্ষণযুক্ত পুরুষ আছেন। বাগানে ঢুকে ন্যগ্রোধকে দেখে প্রথমেই তাঁর পায়ের চলা দেখলেন। সেখানে এমন সব লক্ষণ ছিল যাতে ঐ লোকটি সমগ্র জম্বু দ্বীপের রাজা হতে পারেন পুরোহিতের এ রকম বিশ্বাস হল।

ন্যগ্রোধ রাজা হয়ে শাধকুমারকে সেনাপতি করলেন। পৌত্তিকও সঙ্গে থাকলেন। কিছু কাল রাজ্য পরিচালনা করার পর ন্যগ্রোধের বাবা-মার জন্য মন খারাপ হল। তিনি শাধকুমারকে বললেন, 'ভাই- আমাদের সকলের বাবা-মাকে এখানে নিয়ে এস।' কিন্তু শাধকুমার বললেন, 'এটা আমার কাজ নয়।' শেষ পর্যন্ত পৌত্তিককে পাঠান হল।

পৌত্তিক তিন জনের বাবা-মার কাছেই গেলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই বারাণসীতে আসতে রাজি হলেন না। তখন তিনি আবার ফেরার পথ ধরলেন। বারাণসীতে এসে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, 'সামনেই শাধকুমারের বাড়ি, একটু জিরিয়ে নিই এখানে।' শাধকুমারের বাড়িতে এসে তিনি খবর পাঠালেন: 'ভাই, বল শাধকুমারের বন্ধু পৌত্তিক এসেছে।'



শাধকুমার মনে মনে পৌত্তিকের ওপর রেগেছিলেন। কেননা পৌত্তিক যদি তাঁকে মুরগীর মাথাটা খেতে দিত. তাহলে আজ সে রাজা হতে পারত। শাধকুমার পৌত্তিককে চাকর দিয়ে মার খাওয়ালেন, মুখে বললেন, 'এই মিথ্যুককে মার।'

পৌত্তিক ন্যগ্রোধকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। শাধকুমারের সামনেই। শাধকুমার কোন জবাব দিতে পারলেন না। ন্যগ্রোধ তখন শাধকুমারকে প্রাণদণ্ড দিলেন অকৃতজ্ঞতার অপরাধে।

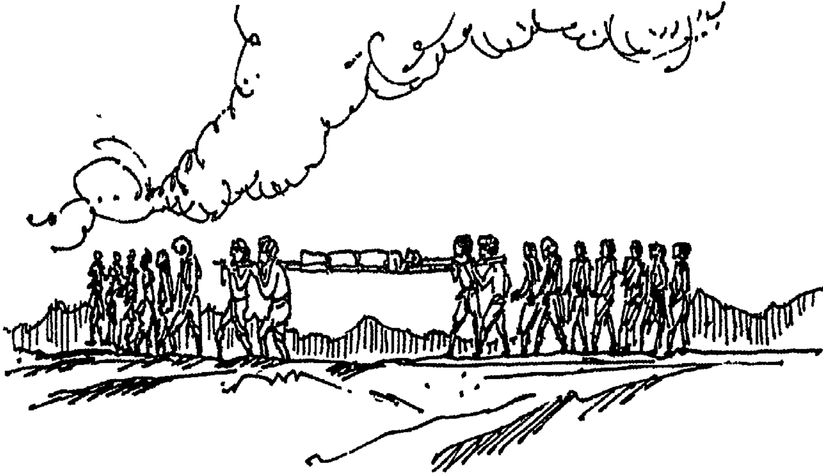
পৌত্তিক বলল, 'বন্ধু, আপনি ওঁকে ক্ষমা করুন। আমি আঘাত পেয়েছি ওর ব্যবহারে। তাই বলে ওর মৃত্যু চাই না।' ন্যগ্রোধ পৌত্তিকের অনুরোধে শাখকে মার্জনা করলেন। পৌত্তিককে দিলেন ভাণ্ডারিকের পদ।

মহাধর্মপাল জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীরাজ্যে ধর্মপালগ্রাম নামে একটি গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে ধর্মপাল বংশ বাস করত বলেই গ্রামটির নাম হয়েছিল ধর্মপালগ্রাম। ধর্মপালের বাড়ির আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব থেকে চাকরবাকর পর্যন্ত সবাই ধর্মপথে চলত। বোধিসত্ত্ব একবার ঐ পরিবারে জন্ম নেন। তখন তাঁর নাম হয় ধর্মপালকুমার।

ধর্মপালকুমারকে তাঁর বাবা তক্ষশিলা পাঠালেন লেখাপড়া শেখার জন্য। ধর্মপাল যে আচার্যের কাছে শাস্ত্র পাঠ করতেন, তাঁর পাঁচশ ছাত্র ছিল, ধর্মপাল ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হঠাৎ একদিন আচার্যের বড় ছেলে মারা গেল। ছেলেকে দাহ করতে আচার্য জ্ঞাতি এবং শ্মশানযাত্রী ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে চললেন। সবাই কাঁদছিল, শুধু ধর্মপালকুমারের চোখে জল নেই। শ্মশান থেকে ফিরে ছাত্রবন্ধুরা বলতে লাগল, 'আহা, এত কম বয়সে তরুণ অবস্থায় বেচারা মারা গেল!'



ধর্মপাল জিজ্ঞাসা করলেন : তরুণ হলে মারা যায় কি,করে ?

ছাত্রবন্ধুরা বলল : কেন ভাই, তুমি কি জান না মানুষ মরণশীল ?

ধর্মপাল : মরণশীল ঠিকই। কিন্তু মৃত্যু হয় বার্ধক্যে।

ছাত্রবন্ধুরা : সংসার অনিত্য, জন্মালে মরতেই হয়।

ধর্মপাল : কিন্তু তরুণ বয়সে মরবে কেন ?

ছাত্রবন্ধুরা : তোমাদের বয়সে কি কেউ তরুণ বয়সে মরেন নি ?

ধর্মপাল : না, এটাই আমাদের বংশের রীতি।

আচার্যের কানে গেল কথাটা। তিনি ধর্মপালকে ডেকে জানতে চাইলেন : 'এ কথা কি সত্যি, তোমাদের বংশে কেউ কম বয়সে মরেন না ?' ধর্মপাল জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ আচার্য।' আচার্য বললেন : 'খুবই আশ্চর্য কথা। আর এ কথা সত্যি হলে আমি তোমাদের বংশের ধর্মই পালন করব।'

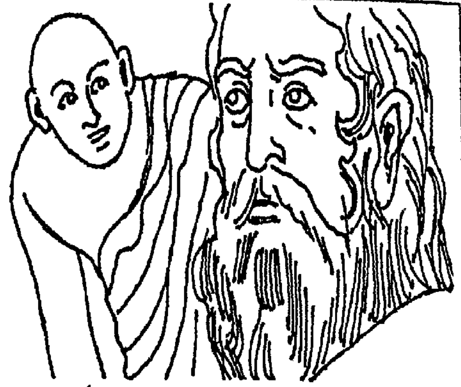


কিছু দিন পরে আচার্য ধর্মপালকে বললেন : বাছা, আমি এক বিশেষ কাজে দিনকয়েক বাইরে থাকব। তুমি সেই সময় শিষ্যদের শিক্ষা দিও।

তারপর তিনি একটা ছাগলের হাড়গোড় থলের মধ্যে পুরে ধর্মপালগ্রামের উদ্দেশে রওনা হলেন।

আচার্য ধর্মপালের বাড়ির কাছে গিয়ে খবর পাঠালেন : বল, ধর্মপালকুমারের আচার্য এসেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে এল তাঁকে আপ্যায়ন করতে। কেউ তাঁর হাত থেকে ছাতাটি নিল, কেউ তাঁর হাতের থলিটি নিল। তারপর তাঁর হাত-পা ধুইয়ে তাঁরা তাঁকে ভক্তির সঙ্গে বসতে আসন দিলেন।



আচার্য দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে ধর্মপালকুমারের বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে বললেন : আপনার ছেলে ছিল আমার ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হঠাৎ এক কাল ব্যাধি তাকে শেষ করেছে। আমি এই দুঃসংবাদ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

এ কথা শোনা মাত্র গৃহস্বামী হো হো করে হেসে উঠলেন। তখন আচার্য জানতে চাইলেন : 'আপনি হাসছেন কেন?' ধর্মপালের বাবা তখন বাড়ির সবাইকে ডেকে বললেন, 'শুনে যাও আচার্য কি বলছেন।' শুনে তাঁরাও হাসতে লাগলেন।

আচার্য তখন ছাগলের হাড় বের করে বললেন, 'তাহলে এই দেখুন ধর্মপালকুমারের অস্থি।' গৃহস্বামী তাতেও অটল। তিনি বললেন, 'ছাগল-কুকুরের হাড় হবে ওটা, আমার ছেলের নয়। আমাদের বংশে একশ বছরের মধ্যে কেউ তরুণ বয়সে মারা যায় নি।'

আচার্য তখন সব কথা স্বীকার করলেন। বললেন, পরীক্ষা করার জন্যই তিনি এই কৌশল নিয়েছিলেন। তারপর নিজের পুত্রশোকের কথা গোপন করলেন না। শেষে ধর্মপালকুমারের বাবার কাছে তাঁর ধর্মচর্চা জেনে নিলেন। বললেন, 'এবার থেকে আমিও এই পথেই চলব।'

ঘট জাতক

পুরাকালে উত্তরাপথে কংসভোগ নামে একটি দেশ ছিল। সেখানে মহাকংস নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল



অসিগঞ্জন। কংসভোগেব দুই ছেলে : কংস আব উপকংস। মেয়ে একটি মাত্র, তাঁব নাম দেবগর্ভা।

দেবগর্ভাব জন্মেব পব জ্যোতিষীবা গণনা কবে বলেছিলেন, 'দেবগর্ভার ছেলে কংসবাজ্য ধ্বংস কববে।' মহাকংস এই সাংঘাতিক গণনা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু দেবগর্ভা তাঁব একমাত্র মেয়ে। বাবা হয়ে তিনি মেয়েকে হত্যা কবতে পারেন না। মহাকংস ভাবলেন, 'দেবগর্ভাব ভাইবাই ববং ঠিক কববে কি কবা উচিত।'

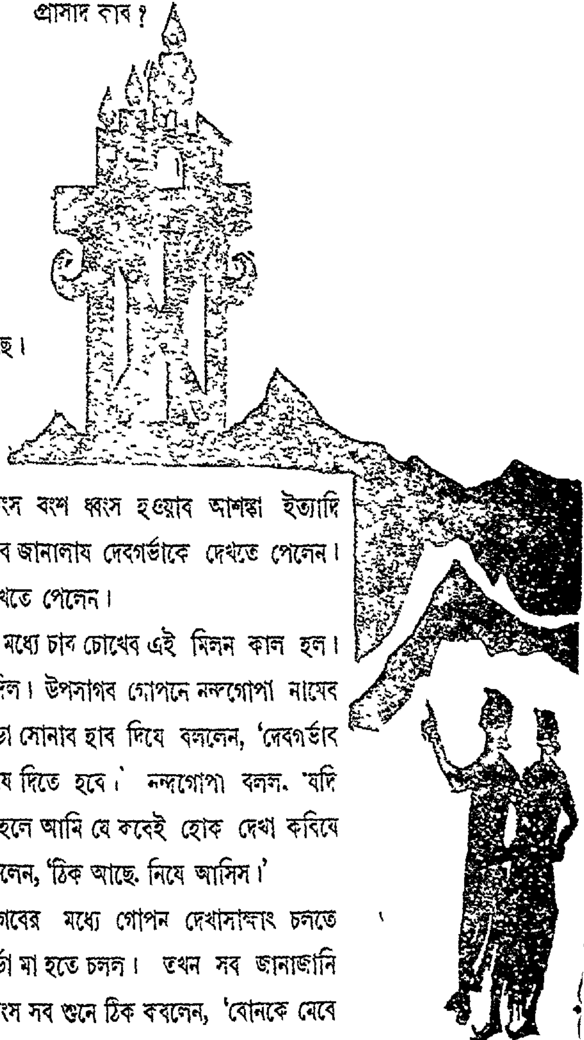
যথাসময়ে মহাকংস বৃদ্ধ হলেন। ইহজগৎ ত্যাগ করলেন। কংস আব উপকংস বাজা হলেন। দু ভাই অনেক বিবেচনা করে দেখলেন, 'বোনকে হত্যা কবলে সবাই আমাদেব নিন্দে কববে। ববং এক কাজ কবা যাক, বোনেব বিয়ে দেব না।' এভাবে তাঁবা একটি স্তম্ভেব ওপেব একটি প্রাসাদ বানালেন। দেবগর্ভাকে রাখা হল সেই প্রাসাদেব মধ্যে। নন্দগোপা নামে এক পরিচাবিকাকে দেবগর্ভাব দেখাশোনাব ভাব দেওয়া হল।



সেই সময় উত্তব মথুবায় মহাসাগব নামে এক বাজা ছিলেন। মহাসাগরেব দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম সাগব, ছোট ছেলের নাম উপসাগব। মহাসাগরের মৃত্যুর প্রব সাগর বাজা হলেন। উপসাগব একটি মাবাত্মক অন্যায় কবলেন। সাগব তাঁকে শাস্তি দেবেন ঠিক কবলেন। উপসাগর প্রাণেব ভয়ে দেশ ছেড়ে পালালেন।

উপসাগরের সঙ্গে উপকংসের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। কারণ তাঁরা দুজনে একই গুরুর কাছে শাস্ত্র শিখেছেন। উপসাগর এই বিপদের দিনে উপকংসের কাছে আশ্রয় চাইলেন। উপকংস উপসাগরকে নিয়ে গিয়ে কংসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। কংস তাঁকে বেশ সম্মান দেখালেন। নগরে তাঁকে থাকার অনুমতি দিলেন।

উপসাগর একদিন রাজসভায় যাওয়ার সময় সেই এক স্তম্ভের প্রাসাদটি দেখলেন। সঙ্গের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন: এ প্রাসাদ কার?



দেবগর্ভার।

তিনি কে?

কংসরাজের বোন।

এখানে থাকেন কেন?

ওঁকে ঘরে বন্দী করা হয়েছে।

কেন?

তারপর উপসাগর কংস বংশ ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা ইত্যাদি জানতে পারলেন। আবার জানালায় দেবগর্ভাকে দেখতে পেলেন। দেবগর্ভাও উপসাগরকে দেখতে পেলেন।

এভাবে ওঁদের দুজনের মধ্যে চার চোখের এই মিলন কাল হল। দুজনের মধ্যে প্রণয় দেখা দিল। উপসাগর গোপনে নন্দগোপা নামের ঐ পরিচারিকাকে এক ছড়া সোনার হার দিয়ে বললেন, 'দেবগর্ভার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে হবে।' নন্দগোপা বলল, 'যদি দেবগর্ভা রাজি থাকে, তাহলে আমি যে করেই হোক দেখা করিয়ে দেব।' শুনে দেবগর্ভা বললেন, 'ঠিক আছে, নিয়ে আসিস।'

দেবগর্ভা আর উপসাগরের মধ্যে গোপন দেখাসাক্ষাৎ চলতে লাগল। এক সময় দেবগর্ভা মা হতে চলল। তখন সব জানাজানি হয়ে গেল। কংস ও উপকংস সব শুনে ঠিক করলেন, 'বোনকে মেরে ফেলে লাভ নেই। দেখা যাক ছেলে হয় না মেয়ে হয়। মেয়ে হলে তো আর কোন চিন্তা নেই।'



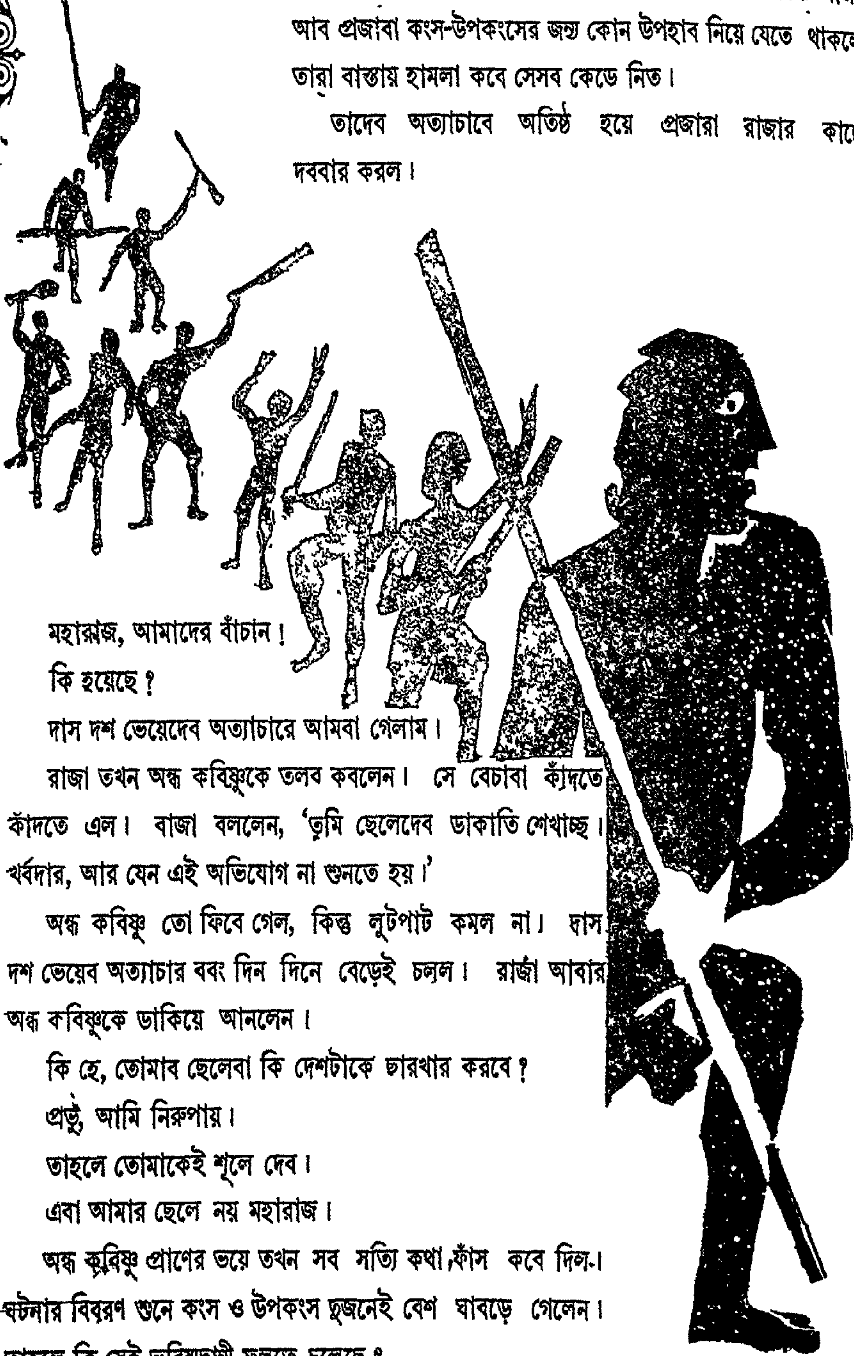
দেবগর্ভাব একটি মেয়ে হল। কংস উপকংস এতে খুব খুশি হলেন। তাঁবা মেয়েটির নাম বাখলেন অঞ্জনা দেবী। তাবপব তাঁবা বোন-ভগ্নীপতিকে একটি গ্রাম লিখে দিলেন। উপসাগব দেবগর্ভাব সঙ্গে গোবর্ধমান নামেব সেই গ্রামটিতে বসবাস কবতে লাগলেন।

কিছু দিন পবে দেবগর্ভা আবাব মা হতে চললেন। তখন নন্দগোপাও মা হতে চলেছে। দুজনে একই দিনে মা হলেন। কিন্তু এবাব দেবগর্ভার ছেলে হল। নন্দগোপাব মেয়ে হল। ভাইদেব হাত থেকে ছেলেকে বাঁচানোর জন্য দেবগর্ভা নন্দগোপাব মেযেব সঙ্গে নিজেব ছেলেকে বদলে নিলেন। ভাইবা যখন দেখলেন দেবগর্ভার মেযে হযেছে তাঁবা আবাব খুশি হলেন।

এভাবে দেবগর্ভাব দশটি ছেলে আব নন্দগোপাব দশটি মেযে হল। যদিও তাঁবা প্রত্যেক বাব বদলে নিলেন বলে সকলে জানল দেবগর্ভাব দশটি মেয়ে হযেছে। নন্দগোপার কাছে দেবগর্ভাব যে ছেলেবা বড হতে লাগল তাদেব যথাক্রমে নাম হল : বাসুদেব, বলদেব, চন্দ্রদেব, সূর্যদেব, অগ্নিদেব, বরুণদেব, অর্জুন, প্রদ্যুম্ন, ঘটপণ্ডিত এবং অঙ্কুব। সবাই তাদেব অন্ধ কবিষ্ণু দাসেব ছেলে বলে জানত। তাই একসঙ্গে তাদেব 'দাস দশ ভেবে' বলে ডাকা হত।

বড় হয়ে এই দশ ভেয়েব গায়ে অসুরেব মত জোর হল। স্বভাব হল অত্যন্ত নির্দয়। তাবা ডাকাতি করে বেড়াত। ভিনদেশী বাজা আব প্রজাবা কংস-উপকংসের জন্য কোন উপহাব নিয়ে যেতে থাকলে তারা বাস্তায় হামলা কবে সেসব কেড়ে নিত।

তাদেব অত্যাচাবে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজারা রাজার কাছে দববার করল।



মহারাজ, আমাদের বাঁচান!

কি হয়েছে?

দাস দশ ভেয়েদেব অত্যাচারে আমবা গেলাম।

রাজা তখন অন্ধ কবিষ্ণুকে তলব কবলেন। সে বেচাবা কাঁদতে কাঁদতে এল। বাজা বললেন, 'তুমি ছেলেদেব ডাকাতি শেখাচ্ছ। খর্বদার, আর যেন এই অভিযোগ না শুনতে হয়।'

অন্ধ কবিষ্ণু তো ফিবে গেল, কিন্তু লুটপাট কমল না। দাস দশ ভেয়েব অত্যাচার ববং দিন দিনে বেড়েই চলল। রাজা আবার অন্ধ কবিষ্ণুকে ডাকিয়ে আনলেন।

কি হে, তোমাব ছেলেবা কি দেশটাকে ছারখার করবে?

প্রভু, আমি নিরুপায়।

তাহলে তোমাকেই শূলে দেব।

এবা আমার ছেলে নয় মহারাজ।

অন্ধ কবিষ্ণু প্রাণের ভয়ে তখন সব সত্যি কথা ফাঁস কবে দিল।

ঘটনার বিবরণ শুনে কংস ও উপকংস দুজনেই বেশ ঘাবড়ে গেলেন। তাহলে কি সেই ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে চলেছে?



বাজাব পবামর্শদাতাবা অনেক আলোচনা কবে বাজাকে বলল, 'প্রভু, এই দস্যুবা কুস্তি লডতে খুব ভালোবাসে। আপনি মল্লযুদ্ধেব আযোজন করুন। আমাদেব চামুব আব মুষ্টিক নামে যে দুজন ভযঙ্কব মোল্লাযোদ্ধা আছে তাদেব দিযে এদেব শেষ কবে ফেলুন।' বাজাব মনে ধবল কথাটা। তিনি ঘোষণা কবে দিলেন, 'আজ থেকে সাত দিনেব মাথায এখানে মল্লযুদ্ধ হবে।' বাজপুবীব সামনে বিশাল সামিয়ানা টাঙানো হল।

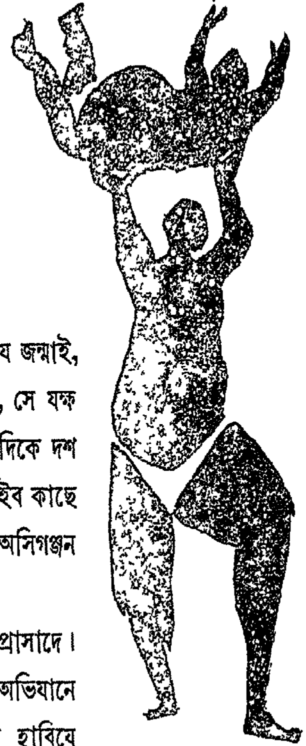
সাবা রাজ্যেব লোক ভেঙ্গে পডল মল্লযুদ্ধ দেখাব জন্য। চামুব আব মুষ্টিক মঞ্চে ঢুকে খুব লম্ফঝম্ফ করছে। এমন সময় রে রে কবে সেই দশ ভাই এসে পড়ল। আসাব সময় তাবা ধোপাপাড়া লুঠ করে



রঙিন কাপড় পরেছে। মালীপাড়া লুট করে ফুলেব মালা গলায গলিযেছে। বীরেব হুঙ্কারে দশ ভাই মঞ্চে ঢুকল।



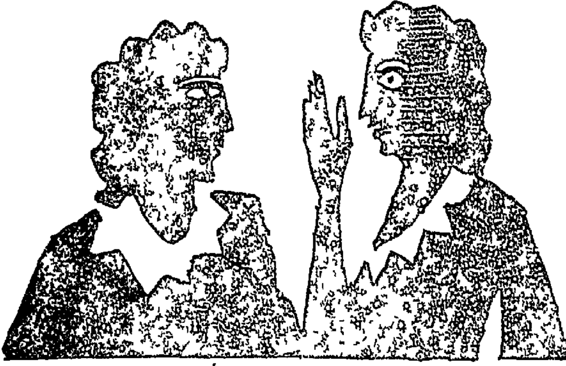
চামুব তখন খুব আস্ফালন কবছিল। প্রথমে বলদেবই চামুবের মুখোমুখি হল। সে ঠিক কবল, 'আমি একে হাত দিযেও ছোঁব না।' সে হাতিশাল থেকে একটা দড়ি আনাল। তারপব চামুরকে সেই দড়ির ফাঁসে আটকে তুলে আছাড় মাবল। চামুব মারা গেলে মুষ্টিক এল। বলদেব তাব দু চোখ কানা কবে দিল। তারপব তাব হাড় গুঁড়িয়ে ফেলাব যোগাড় কবল। মুষ্টিক প্রাণভযে চিৎকার কবতে লাগল, 'আমি কুস্তিগীব নই, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কুস্তিগীর নই।' বলদেব বলল, 'সে আমাব দেখাব দবকার নেই, সঙ্গে এসেছ, এখন মব।' বলে তাকে এমন আছাড় মাবল যে মুষ্টিক সেখানেই প্রাণত্যাগ করল।



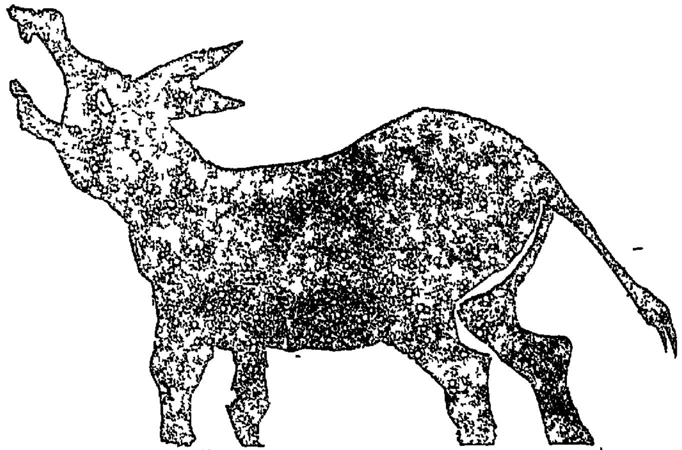
মৃত্যুব সময় মুষ্টিক প্রার্থনা কবেছিল, 'আমি যেন যক্ষ হযে জন্মাই, আব বলদেবেব মাংস ছিঁড়ে খেতে পারি।' মুষ্টিক তাই হল, সে যক্ষ হয়ে কালমাটি নামে একটি গ্রামে বাস কবতে লাগল। ওদিকে দশ ভাইকে মারতে তখন রাজার সেপাই ছুটেছে। কিন্তু দশ ভাইব কাছে তাবা মাব খেযে পালাল। দশ ভাই তাদেব মেবে ফেলল। অসিগঞ্জন নগব দখল কবে নিল।

দশভেয়েরা রাজা হযে বাবা-মাকে নিযে এল রাজপ্রাসাদে। তাবপব জম্বুদ্বীপের অধীশ্বব হওয়াব জন্য তাবা বিজয় অভিযানে বেবিয়ে পড়ল। কয়েক দিনেব মধ্যে কালসেন বাজাকে হাবিযে অযোধ্যা অধিকাব কবল। বাজাকে বন্দী কবল। এবপব তাবা বওনা হল দ্বাবাবতীব দিকে।

দ্বারাবতীব একদিকে পাহাড়, আবেক দিকে সমুদ্র। দ্বাবাবতী এক অদ্ভুত নগব। এক যক্ষ দ্বাবাবতী পাহারা দিত। শত্রু আসছে দেখলে সে ডাক ছাড়ত। সঙ্গে সঙ্গে দ্বাবাবতী শূন্যে উঠে সমুদ্রেব মাঝখানে এক দ্বীপে গিয়ে নামত। দশভেযেবা যত বাব আক্রমণ কবল তত বাবই এই কাণ্ড ঘটল।

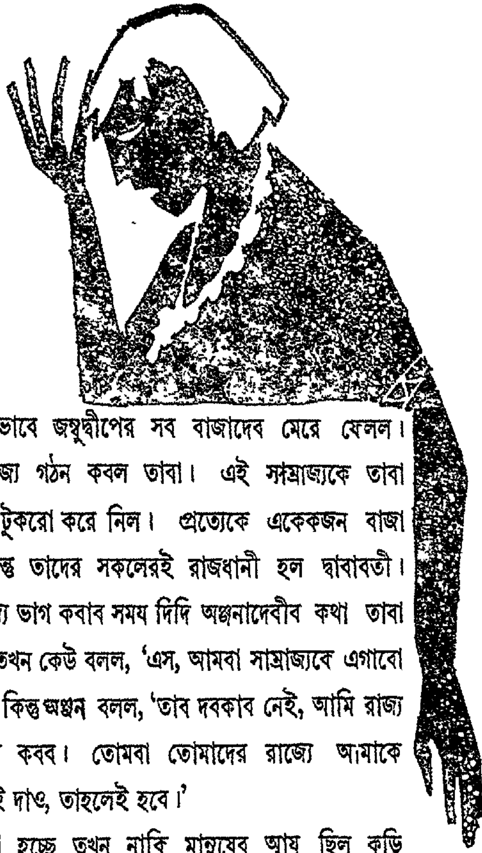


দশভেয়েবা তখন কৃষ্ণ দ্বৈপাযনেব তপস্যা কবতে লাগল। কৃষ্ণ দ্বৈপাযন তাদেব তপস্যায খুশি হলেন। তিনি তাদেব বললেন, 'দ্বারাবতীর পবিখাব কাছে একটা গর্দভ চবছে দেখতে পাবে। তোমবা তার পায়ে গিযে পড।' দশভেয়েবা তাই কবল। গাধা বলল,



'দেখ, আমাব কাজ চেঁচানো, তবে তোমাদেব মধ্যে চাবজন চাবটে লোহাব লাঙল নিযে এসে নগবীব চাব পাশে গর্ত কবে লোহাব থাম গেঁথে ফেলবে, তাবপব লোহাব শিকল দিযে লাঙল চাবটেকে ঐ গ্রামেব সঙ্গে বেঁধে বাখবে। আমি ডাক ছাডলে যেই নগব শূন্যে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে লাঙল ছুঁড়ে আটকে ফেলবে, তাহলে নগব আব উঠতে পারবে না।'

ঠিক ঠিক ঐভাবে কাজ করার ফলে নগব উঠতে পাবল না। দশভেয়েবা তখন নগবের ভেতব ঢুকে রাজাকে মেরে ফেলল। রাজ্য দখল কবে নিল।



দশভেযেরা এভাবে জম্বুদ্বীপের সব বাজাদেব মেরে ফেলল। বিশাল এক সাম্রাজ্য গঠন কবল তাবা। এই সাম্রাজ্যকে তাবা নিজেদের মধ্যে দশ টুকরো করে নিল। প্রত্যেকে একেকজন রাজা হয়ে বসল। কিন্তু তাদের সকলেরই রাজধানী হল দ্বাবাবতী। নিজেদেব মধ্যে রাজ্য ভাগ কবাব সময দিদি অঞ্জনাদেবীব কথা তাবা ভুলে গিয়েছিল। তখন কেউ বলল, 'এস, আমবা সাম্রাজ্যবে এগাবো ভাগ কবে নিই।' কিন্তু অঙ্কুর বলল, 'তাব দবকাব নেই, আমি রাজ্য নেব না। বাণিজ্য কবব। তোমবা তোমাদের রাজ্যে আমাকে খাজনা থেকে রেহাই দাও, তাহলেই হবে।'

যে সমযেব কথা হচ্ছে তখন নাকি মানুষেব আয়ু ছিল কুড়ি হাজাব বছব। তাই কুড়ি হাজাব বছব বাজত্ব করাব পব দশভেযেব বাবা-মা গত হলেন।

তাবপর বাসুদেবের ছেলে মারা গেল। এতে বাসুদেব শয্যা নিল। সে শোকে এত কাতব হল যে আহাব নিদ্রা ত্যাগ কবল।

তখন ঘটপণ্ডিত দেখলেন, 'আমি ছাড়া কেউই এই শোক নিবাবণ কবতে পাববে না।' এই ভেবে ঘটপণ্ডিত পাগল সাজলেন। 'চাঁদ দাও, চাঁদ দাও' বলে চিৎকার করতে লাগলেন। বাসুদেব ঘটপণ্ডিতকে বলল, 'আকাশেব চাঁদ কি পাওয়া যায? তুমি কি শিশু হযে গেলে ঘটপণ্ডিত?'

ঘটপণ্ডিত : চাঁদ দেখতে পাচ্ছেন কিনা?

বাসুদেব : হ্যাঁ, তা পাচ্ছি।

ঘটপণ্ডিত : আপনাব পুত্রের যে মৃত্যু হয়েছে তাকে কি দেখতে পাচ্ছেন?

বাসুদেব ঃ না।

ঘটপণ্ডিত ঃ চাঁদ পেতে চাই, চাঁদ আছেও. কিন্তু আপনাব পুত্র তো নেই, তার জন্য কি করে শোকার্ত হন ? যা নেই, কেউ কি তার জন্য কাঁদে ?

ছোট ভাইয়ের উপদেশে বাসুদেবেব দুঃখ-শোক শেষ হল। আবাব সে বাজ্য শাসনে মন দিল।

এই ঘটনাব অনেক দিন পরে, দশভেযেব ছেলেবা যুক্তি কবল ঃ 'আচ্ছা, লোকে বলে কৃষ্ণ দ্বৈপাযনেব দিব্যচক্ষু আছে। কিন্তু কেউ পবীক্ষা কবে দেখে না। আমবা পবীক্ষা করে দেখব।' তারপর তাবা এক কুমাবকে এমনভাবে সাজাল, যেন সে এক গর্ভবতী নাবী। তারপব তাবা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নেব কাছে তাকে নিয়ে গেল।

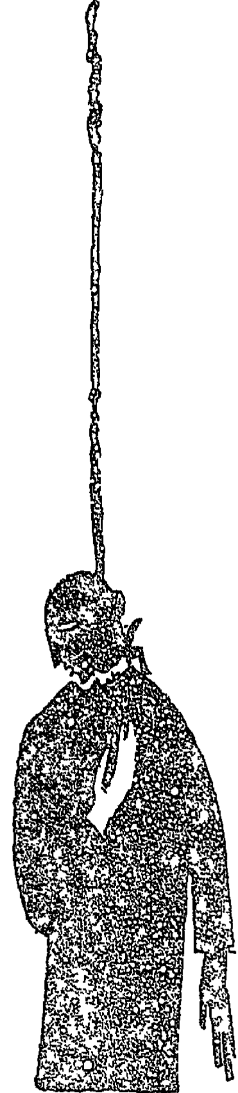
বলুন তো, এই নাবীব ছেলে হবে না মেয়ে হবে ?

তপস্বী বুঝতে পাবলেন দশ ভেযেদেব বিনাশেব সময এসে গেছে। তিনি ধ্যানবলে একবাব নিজেব আয়ু দেখে নিলেন। বুঝতে পাবলেন সেদিনই তাঁব মৃত্যু হবে। তাবপব তিনি কুমাবদেব জিজ্ঞেস কবলেন, 'আচ্ছা, এই মেযেটাব কথা জেনে তোমাদেব কি লাভ ?'

সে যাই হোক, আপনি উত্তব দিন।

তাহলে শোন। এ এক টুকবো কাঠ প্রসব কববে। সাত দিন পরে ঐ কাঠেব টুকবোটি বাসুদেব বংশ ধ্বংস কবরে।

কুমাবেবা তখন রাগে অন্ধ হযে গেল। তাবা তপস্বীব গলায ফাঁস পবিযে তাঁকে হত্যা কবল। বাসুদেব যখন জানতে পাবলেন কুমাববা তপস্বীকে হত্যা কবেছে, তখন তিনি কুমাবদেব ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'তোমবা কেন তপস্বীকে মাবলে ?' কুমাববা তখন সমস্ত ঘটনা জানাল। বাসুদেব তখন সেই কুমাবটিকে (যাকে স্ত্রী সাজানো হযেছিল) কঠিন পাহাবায বাখাব ব্যবস্থা কবল।



সত্যি সত্যি সাতদিনেব মাথায কুমাব এক টুকবো কাঠ প্রসব কবল। কুমাররা কাঠটা পুড়িযে তাব ছাই নদীতে ফেলে দিল। ছাই ভাসতে ভাসতে তীবে এসে এক জায়গায লাগল। সেখানে নল খাগড়ার বন হযে গেল।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। দ্বারাবতীর রাজা আর রাজার ছেলেরা সমুদ্রে স্নান করবে বলে একটা মণ্ডপ বানিয়েছে। সেখানে খুব ঘটা করে পানভোজন করল। তারপর তারা খেলাচ্ছলে একে

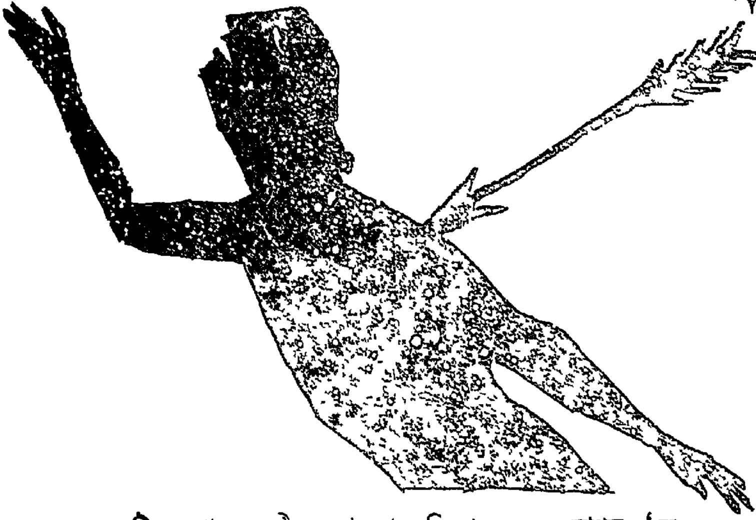


অন্যকে ধরতে গেল। ক্রমে তারা দু দলে ভাগ হয়ে মিছেমিছি মারামারি শুরু করল। কিছুক্ষণ পরে সেই মারামারি সত্যিকারের মারামারিতে পরিণত হল।

মণ্ডপ বাঁধা হয়েছিল সেই নলখাগড়ার কাছে। মারামারি করতে করতে তারা নলখাগড়ার পাতা ছিঁড়তে লাগল। পাতা তাদের হাতে ওঠামাত্র সেগুলো মুগুর হয়ে যেতে লাগল। একের পর এক তারা সেই মুগুরের আঘাতে প্রাণ দিতে লাগল।

রাজবংশ এভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে বাসুদেব, বলদেব, অঞ্জনা দেবী ও রাজপুরোহিত রথে উঠে পালালেন। বাদবাকি সবাই মারা গেল। বাসুদেবরা রথে করে কালমাটিতে হাজির হল। মুষ্টিক নামে সেই কুস্তিগীর তার প্রার্থনা অনুসারে এখানেই যক্ষ হয়ে আছে। বাসুদেব আসছে দেখে সে মায়ার সাহায্যে একটা গ্রাম বানিয়ে ফেলল।



মুষ্টিক সেখানে মল্লবীরের সাজ পরে চিৎকার করতে লাগল, 'কে আমার সাথে লড়বি, চলে আয়।' তা দেখে বলদেব বাসুদেবকে বললেন, 'দাদা, এর বাড়াবাড়িটা বন্ধ করতে হয়। তুমি আজ্ঞা দাও, আমি ওর গর্ব চূর্ণ করি।' বাসুদেব বললেন, 'এখন এই ঘোর বিপদের দিনে এসবের মধ্যে না যাওয়াই ভালো।' কিন্তু কে কার কথা শোনে। বলদেব মুষ্টিকের সামনে যাওয়া মাত্র মুষ্টিক তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলল। অক্লেশে তাকে মূলো খাওয়ার মত পেটে চালান করে দিল।

ভাই মারা যাওয়ার পর তাঁরা সেখান থেকেও পালাতে লাগলেন। এক গ্রামের কাছাকাছি এসে বোন আর পুরোহিতকে বললেন, 'তোমরা গ্রাম থেকে কিছু খাবার নিয়ে এস। আমি এখানে জিরোই।' তারা চলে গেলে এক ব্যাধ দেখল ঝোপের মধ্যে কি যেন নড়ছে। সে তীর ছুঁড়ল। বাসুদেবের গায়ে লাগল সেই তীর। তিনি চিৎকার করে উঠলেন। ব্যাধ পালিয়ে যাচ্ছিল। বাসুদেব তাকে ডাকলেন, 'তোমার নাম কি?' ব্যাধ বলল, 'জরা'। বাসুদেব শুনেছিলেন তিনি জরার হাতে নিহত হবেন। আর সংশয় নেই। ব্যাধকে বললেন, 'তোমার কোন দোষ নেই, জায়গাটা একটু বেঁধে দিয়ে যাও।'

কিছুক্ষণ পরে অঞ্জনা দেবী এবং পুরোহিত খাবার নিয়ে ফিরে



এলেন। বাসুদেবের পক্ষে তখন আর খাওয়া সম্ভব নয়। তিনি তাঁদের বললেন: 'দেখ, আমি মারা যাব কিছুক্ষণের মধ্যেই। তোমরা কখনও খেটে খাও নি। ফলে খাটতে পারবে না। আমি তোমাদের একটা বিদ্যা শিখিয়ে দিতে চাই। তাহলে তোমরা না খেটেও খেতে পারবে।'

অঞ্জনা দেবী এবং পুরোহিতকে গুপ্ত মন্ত্রটি শিখিয়ে বাসুদেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এভাবে একমাত্র অঞ্জনা দেবী ছাড়া উপসাগরের বংশের সবাই শেষ হল।

মাতৃপোষক জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার হাতিকুলে জন্ম নেন। তখন তিনি থাকতেন হিমালয় অঞ্চলে। বোধিসত্ত্বের মা ছিলেন এক অন্ধ হস্তিনী। বোধিসত্ত্বকে দেখতে ছিল অতি সুন্দর। সারা শরীর সাদা। আশি হাজার হাতি ছিল তাঁর অনুচর।

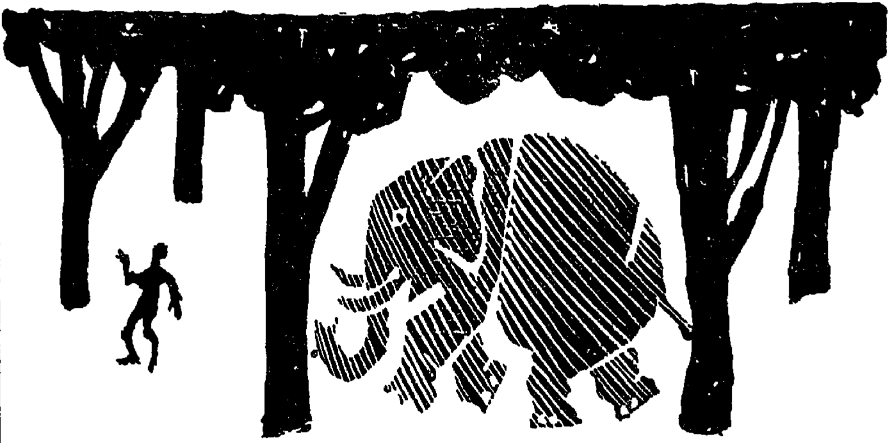
বোধিসত্ত্ব নানারকম ফল-মূল-মধু আহরণ করতেন। তারপর তার কিছুটা ভাগ পাঠাতেন অন্ধ মা-র জন্য। কিন্তু যে হাতিদের ভার ছিল ঐ খাবার-দাবার পৌঁছে দেওয়ার, তারা খুব লোভী বলে নিজেরাই সব খেয়ে ফেলত। যখন বোধিসত্ত্ব জানতে পারলেন মা অনাহারে আছেন, তখন তিনি দলত্যাগ করলেন।

এক রাত্রে অন্য হাতিদের না জানিয়ে, মাকে সঙ্গে নিয়ে চণ্ডোরণ পাহাড়ের দিকে গেলেন। সেই পাহাড়ের তলায় ছিল একটা সুন্দর বনভূমি। আর ছিল স্বচ্ছ জলের একটি সরোবর। বোধিসত্ত্ব মাকে পাহাড়ের গুহায় রেখে দিলেন। নিজে সারাদিন খাবার খুঁজে বেড়াতেন। সন্ধ্যাবেলা গুহায় ফিরে এসে নিজে মাকে খাওয়াতেন। মা-ছেলের মধ্যে ছিল অচ্ছেদ্য সম্পর্ক।





একদিন বারাণসীর এক কাঠুরে কাঠ কাটতে ঐ বনে ঢুকল। সন্ধ্যেবেলা বেচারা বনে রাস্তা হারিয়ে ফেলল। চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন লোকটাকে সাহায্য করা উচিত। তিনি তার দিকে এগিয়ে গেলেন। এতে সে আরও ঘাবড়ে গেল। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ভয় পাবেন না ভাই, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আমি আপনাকে নগরে পৌঁছে দিচ্ছি চলুন।' বোধিসত্ত্ব তারপর সেই কাঠুরেকে পিঠে তুলে নিলেন।

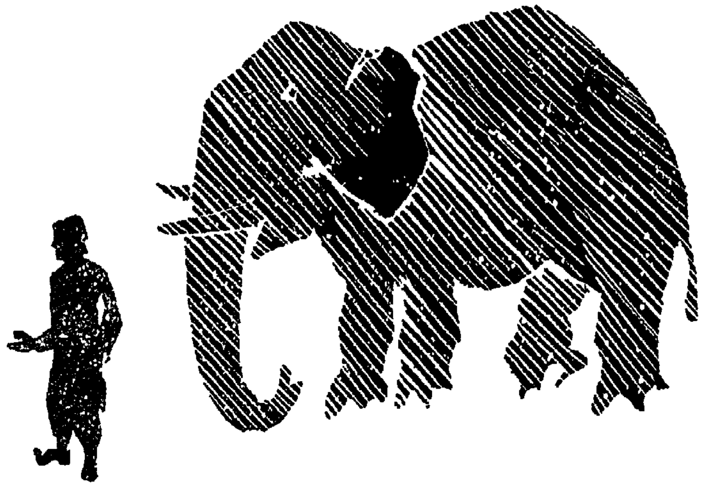


বন পেরিয়ে লোকালয়ে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

কাঠুরেটা ছিল দারুণ শয়তান। বোধিসত্ত্বের সুন্দর চেহারা দেখে সে বুঝেছিল, এ মঙ্গলহস্তী হওয়ার যোগ্য। সেরকম সব সুলক্ষণ এর আছে। সেজন্য সে বন থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তাটা ভালো করে চিনে নিচ্ছিল। পথে কোন্ কোন্ গাছ পড়ছে সে খেয়াল করে রাখল।

তারপর নগরে পৌঁছে সোজা চলে গেল বারাণসীতে। রাজার সঙ্গে দেখা করল। যে সময়ের কথা হচ্ছে ঠিক তখনই রাজার মঙ্গলহস্তী মারা গিয়েছিল। তিনি মঙ্গলহস্তী খুঁজছিলেন। কাঠুরের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে তাঁর ধারণা হল, 'ঐ হাতিটি নিশ্চয়ই সুলক্ষণযুক্ত।'





বাজা গজাচার্যকে ডাকিয়ে আনলেন। গজাচার্য কাঠুবের সঙ্গে সেই বনে গেলেন। সঙ্গে লোকলস্করও গেল। বোধিসত্ত্ব তখন সবোববে স্নান কবছিলেন। এদেব দেখে বুঝতে পাবলেন কাঠুবেব উপকাব কবেই তিনি নিজেব সর্বনাশ করেছেন। মনে মনে ভাবলেন, 'আমি ইচ্ছা কবলে এদেব শুধু নয়, স্বযং বাবাণসীবাজেব বাজ্য ছাবখাব কবতে পাবি। কিন্তু তাতে আমি ক্রোধেব বশবর্তী হব। আমাব পতন ঘটবে। সুতবাং শান্তি বজায় রাখতে হবে।'

গজাচার্য বললেন, 'এস বাছা।' বোধিসত্ত্ব গজাচার্যকে অনুসবণ করলেন। ওদিকে ছেলে ফিবছে না দেখে বোধিসত্ত্বেব অন্ধ মা চিন্তা কবে বুঝলেন যে, বাজা তাকে ধবে নিয়ে গেছে। অন্ধ হস্তিনী কাঁদতে লাগলেন।

বোধিসত্ত্বকে খুব আদরযত্ন কবে হাতিশালায় বাখা হল। বাজা নিজে তাকে খাওয়ানোর জন্য সুস্বাদু খাবাব নিয়ে এলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব কিছুই খেলেন না। বাজা জিজ্ঞেস কবলেন, 'বাছা, খাচ্ছ না কেন?' বোধিসত্ত্ব তখন মানুষেব ভাষায় বললেন, 'আমাব মা অন্ধ, তিনি আমার উপব সম্পূর্ণ নির্ভরশীলা। আজ তিনি অনাহারে থাকবেন।'

শুনে দযালু বাজা বড়ই কষ্ট পেলেন। বোধিসত্ত্বকে মুক্ত কবে দিলেন। অন্ধ মা তার ছেলেকে ফিবে পেয়ে বারাণসীবাজাব উদ্দেশ্যে অনেক ভাল ভাল কথা বললেন। বললেনঃ রাজার মঙ্গল হোক!



পানীয় জাতক



কাশীবাজ্যের এক গ্রামে তুই বন্ধু ছিল। তাবা এক সঙ্গে ঘটিতে কবে জল নিয়ে বোজ চাষ কবতে যেত। ক্ষেতে পৌছে তুজন তুধারে ঘটিতুটো মাটিতে বেখে কাজে মন দিত।

একদিন তুই বন্ধুব একজন নিজেব ঘটি থেকে জল না খেযে অন্য বন্ধুব ঘটিব জল খেযে ফেলল। তাবপব সে স্নান কবে উঠে ধর্ম স্মবণ কবতে গিযে ভাবল, 'আজ কি আমি কেবল পাপ কবছি?' ভাবতেই মনে পড়ে গেল, 'আজ আমি বন্ধুর ঘটিব জল খেযেছি চুবি কবে।'

সেই থেকে সে তৃষ্ণা সম্পর্কে ভাবতে শুরু কবল। এই তৃষ্ণা বোজই বেড়ে যাবে। একদিন এই তৃষ্ণায ডুবেই তাব মৃত্যু হবে। এভাবে তাব ভাবনা একটার পব একটা ধাপ পেবিযে আধ্যাত্মিকতায পৌঁছে গেল। সে তপস্বী হযে গেল।

তখন প্রথম ব্যক্তি এসে সামনে দাঁড়িযেছে।

চল বাড়ি যাই।

তুমি যাও।

কেন, তুমি কি কববে?

আমি যাব না।

কেন?

আজ থেকে আমি তপস্বী।

তোমাকে তপস্বীব মত তো দেখাচ্ছে না।



দ্বিতীয ব্যক্তি তখন নিজেব মাথায হাত বোলাল। সঙ্গে সঙ্গে তাব মাথাব সব চুল পড়ে গেল। গাযে গৈবিক বসন এসে গেল। তপস্বীদেব সমস্ত ভাবই তাব মধ্যে দেখা দিল।

দ্বিতীয গল্প :

কাশী গ্রামের একজন লোক একটা দোকানে বসে ছিল। সে দেখল দোকানেব সামনে দিযে এক সুন্দবী নাবী যাচ্ছে। দেখে লোকটি খুব আকৃষ্ট হল : 'আহা! কি সুন্দব!'



এইটুকু ভেবেই তার মনে পড়ে গেল সৌন্দর্যতৃষ্ণাকে যদি সে বাড়তে দেয় তাহলে তার কোন সীমাপরিসীমা থাকবে না। এই তৃষ্ণার আগুনে পুড়েই তার মৃত্যু হবে।

এই পর্যন্ত ভেবেই সে নিজেকে সংযমী হতে হবে বুঝল। তপস্যা ও ধ্যানবল ছাড়া তা সম্ভব নয়। সে তখনই ধ্যানস্থ হল। তপস্বীর ভাব ফুটে উঠল তার সর্ব শরীরে।

তৃতীয় গল্প ঃ

বাবা আর ছেলে কুটুম বাড়ি যাচ্ছিল। মাঝপথে একটা বন ছিল। তাদের সেই বনটি পেরিয়ে যেতে হবে। বনটি খুবই বিপজ্জনক। ঐ বনে একদল দস্যু থাকত। তারা বাবা-ছেলেকে পেলে ছেলেকে আটকে রেখে বাবাকে পাঠাত মুক্তিপণ আনতে। দু ভাইকে ধরলে বড় ভাইকে পাঠাত টাকা আনতে। গুরু-শিষ্যকে পেলে গুরুকে পাঠাত মুক্তিপণ আনতে।

বনের কাছে এসে বাবা ছেলেকে বলল, 'দেখ, দস্যু ধরলে তুই বলবি আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।' দুজন একটু দূরত্ব রেখে বন পেরোতে লাগল। মাঝপথে দস্যুরা তাদের ধরলে ছেলে বাবার শিখিয়ে দেওয়া কথাটাই বলল। দস্যুরা তাদের ছেড়ে দিল।

বনভূমি পেরিয়ে ছেলেটি খুব বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। মহাপঙ্কে পতিত হয়েছে সে। মিথ্যে কথা বলেছে। একবার মিথ্যে বললে পরে কত না মিথ্যে কথা বলতে হবে। যে করে হোক এই পাপের নিষ্পত্তি ঘটাতে হবে। এরকম ভাবতে ভাবতে ছেলেটি দিব্য ভাব অর্জন করল। তপস্বীর সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠল তার শরীরে।

চতুর্থ গল্প ঃ

কাশীগ্রামের এক শাসক প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। একদিন অনেক লোক একজোট হয়ে তাঁর কাছে দরবার করতে গেল।

প্রভু, আজ বলিদানের যোগ।

তাতে কি হয়েছে?

আমার পশু বলি দিতে চাই, আপনি অনুমতি দিন।

ঠিক আছে।

তারা ফিরে গিয়ে মহানন্দে পশুহত্যা শুরু করল।





এক বেলার মধ্যে মাংসেব স্তূপ জমা হল। মাংসের ঐ স্তূপ দেখে রাজা খুব বিপন্ন বোধ কবলেন। অন্যমনস্কভাবে যে ব্যাপাবে তিনি সম্মতি দিযেছিলেন তা যে এত ভযাবহ এ কথা আগে ভাবতে পাবেন নি।

'আমাব মুখের একটা কথায এত কাণ্ড ঘটেছে', তিনি ভাবলেন। মনে মনে একটা কথাই জপ কবে বললেন, 'প্রাণিহত্যাব জন্য আমিই দাযী।' মন্ত্র উচ্চাবণের মত এই কথা আর পাপবোধে কষ্ট পাওয়া মাত্রই তাঁব মধ্যে দিব্য ভাবেব জন্ম হল।



পঞ্চম গল্প ঃ

কাশী বাজ্যেরই আরেক শাসক নগবেব মধ্যে মদ বিক্রি করা বারণ কবেছিলেন।

একদিন অনেক লোক একসঙ্গে এসে বলল, 'প্রভু, আগেকার দিনে এই সময স্নুবাপান উৎসব হত। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে এবার আমবা ঐ উৎসবেব ব্যবস্থা কবি।'

শাসক বললেন, 'ঠিক আছে। তোমবা তোমাদেব বীতি অনুসাবে যা কবা উচিত তাই কব।'

তুমুল মদ্যপান, বীভৎস চিৎকাব আব মাবামাবিব এক তাণ্ডব লীলা লেগে গেল। বহু লোকেব প্রাণহানি হল। অনেকের হাত-পা ভাঙ্গল। ধনসম্পত্তি নষ্ট হল। অনেকে শাস্তি পেল।

এই পরিণাম সেই শাসককে গভীব চিন্তামগ্ন কবল। তিনি ভাবলেন, 'আমি অনুমতি না দিলে এই ভযাবহ কাণ্ড ঘটত না। এত লোকেব প্রাণহানির জন্য আমিই দাযী।' গভীব অনুতাপে জর্জবিত হলেন তিনি। এই অনুতাপ থেকেই তাঁর মধ্যে এক দিব্য ভাব প্রস্ফুটিত হল। তপস্বীব লক্ষণাদি দেখা দিল।

ষষ্ঠ গল্প :

যে পাঁচজন তপস্বীব কথা এ পর্যন্ত বলা হয়েছে, একদিন তাঁরা ভিক্ষাব জন্য বাবাণসীতে এলেন। তাঁদেব অপরূপ লাগছিল দেখতে।

বারাণসীবাজ তাঁদেব যথেষ্ট সম্মান দেখালেন। সুস্বাদু খাবাব খেতে দিলেন। তারপব প্রশংসা কবে বললেন, 'আপনাবা যে নিতান্ত কম বয়সে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতে আপনাদেব সুবিচার ও প্রজ্ঞাই প্রকাশ পেয়েছে। এখন বলুন তো, কেন আপনারা অত কম বয়সে প্রব্রজ্যা নিলেন?'

ভিক্ষুরা নিজেব নিজেব সব ঘটনা খুলে বললেন। তাবপব কযেক দিন বাজার বাগানে থেকে একদিন হিমবন্ত প্রদেশের উদ্দেশে বওনা হলেন।

এবপর থেকে রাজা পুণ্যকর্ম ও তপস্যায় মেতে বইলেন। সব ব্যাপাবে সংযমী হলেন। বাজাব প্রধান স্ত্রী বাজাকে বিচলিত কবাব অনেক চেষ্টা কবলেন। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন।

এরপব বাজা অমাত্যদেব হাতে বাজ্যভাব দিয়ে নিজেও হিমবন্ত প্রদেশে যাত্রা কবলেন। সেখানে আযুষ্কয় কবে তপস্যা কবলেন। পবে তিনি ব্রহ্মালোকে স্থান পান।

যুবঞ্জয় জাতক





বাজা সর্বদত্তেব এক হাজার ছেলে ছিল। বড় ছেলেব নাম যুবঞ্জয়। রাজা যুবঞ্জয়কে সিংহাসনে বসালেন। যুবঞ্জয় বাজা হলেন।

মহাবাজ যুবঞ্জয় একদিন রথে চড়ে বাগানে যাচ্ছিলেন। তখন সকালবেলা। যুবঞ্জয় গাছেব পাতায ঘাসেব ওপব মুক্তাবিন্দুর মত ঝলমলে আস্তর দেখতে পেলেন।



সারথি!

বলুন মহারাজ।

এগুলো কি?

শিশিরকণা।

সারাটা সকাল যুবঞ্জয় বাগানে ঘুরে বেড়ালেন। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হল। ফেরার সময় তিনি আর শিশিরকণাগুলো দেখতে পেলেন না।

সারথি!



বলুন মহারাজ।

সেই শিশিরকণাগুলো কোথায় গেল?

সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেছে।

যুবঞ্জয় ফিরতি পথে ভাবতে লাগলেন, 'মানুষ আর প্রাণীদের জীবনও তো শিশিরকণার থেকে বেশি কিছু নয়। রোগে ভুগে, বার্ধক্যের কষ্টে হয় মৃত্যু। তার চেয়ে ভাল আগেই প্রব্রজ্যা নেওয়া। বাবা-মার অনুমতি নিয়ে আমি প্রব্রজ্যাই নেব।'

যুবঞ্জয় বাবার কাছে প্রার্থনা করলেন, 'বাবা, আমাকে অনুমতি দিন, আমি তপস্বী হব।' যুবঞ্জয়ের বাবা জানতে চাইলেন, 'বাছা, তোমার কিসের অভাব বল, আমি সমস্তই পূরণ করব।' কিন্তু যুবঞ্জয় তাঁর কাছে বারবার একই প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। রাজা অনুমতি না দিয়ে পারলেন না। যুবঞ্জয়ের অনুগামী হলেন তাঁর ভাই যুধিষ্ঠির। রাজ্যের প্রজারা দুই কুমারকে অনুসরণ করতে লাগল। আর যুবঞ্জয়-যুধিষ্ঠিরের মা কেঁদে ভাসাতে লাগলেন। নগরের প্রান্তে এসে



কুমারবরা প্রজাদেব ফিরে যেতে বললেন। নিজেবা হিমবন্ত প্রদেশেব উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

বোধিসত্ত্বই এই জাতকে যুবঞ্জয়।





দশরথ জাতক



পুরাকালে বারাণসীতে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম দশবথ। রাজা দশরথ সাধনার জোবে বাগ-হিংসা-মোহ জয় কবেছিলেন। রাজা দশবথের অন্তঃপুবে ছিল ষোল হাজাব মহিষী। বাজাব প্রধানা মহিষী দুটি অনিন্দ্যসুন্দর পুত্র ও একটি লাবণ্যময়ী কন্যা প্রসব করেন।

বড় ছেলের নাম বাখা হল বামপণ্ডিত। ছোট ছেলেব নাম ঠিক করা হল লক্ষ্মণকুমার। মেয়েব নাম বাখা হল সীতাদেবী।





আয়ুক্ষয় হলে প্রধানা মহিষীর মৃত্যু হল। রাণীর মৃত্যুতে রাজা দশরথ শোকে মুহ্যমান হলেন। দিনের পর দিন এভাবে কাটে। রাজা কিছুতেই শোক কাটাতে পারেন না। অমাত্য ও অনুচররা রাজাকে সৎপরামর্শ দিয়ে যেতে লাগলেন।

উঠুন মহারাজ।

জীবন অনিত্য।

শেষে তাঁরা রাজাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। অন্তঃপুরচারিণীদের একজনকে প্রধানা মহিষী করার পরামর্শ দিলেন। রাজা সম্মত হলেন।

নতুন এই রাণী রাজার খুবই প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠেন। কিছুদিন পরে নবীনা মহিষীও একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। রাজা ছেলের নাম রাখলেন ভরতকুমার। রাজা একদিন স্নেহের বশে রাণীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি তোমাকে বর দিতে চাই, কি বর নেবে বল।' রাণী বললেন,'মহারাজ, আমি এখন বলব না, পরে চেয়ে নেব।'

ভরতকুমার এখন সাত বছরের ছেলে। রাণী একদিন রাজা দশরথকে বললেন, 'মহারাজের নিশ্চয়ই মনে আছে, আপনি আমাকে একটা বর দিতে চেয়েছিলেন।'

নিশ্চয়ই, মনে আছে বৈ কি।

আমি এখন সেই বরটি চাই।

বেশ তো, বল।

ভরতকে রাজত্ব দিন।



বাজা এই প্রার্থনায় অসম্ভব বেগে গেলেন। বললেন, 'ভবতের বড দুই দাদা বয়েছে, তাদেব বঞ্চিত কবে ভবতকে বাজা কবব? তুমি কি আমাব বড ছেলেদেব মেবে ফেলতে চাও? দূব হও।'

বাণী তখনকাব মত চলে গেলেন। কিন্তু মাঝে মাঝেই তিনি বাজাকে ববেব কথা মনে কবিয়ে দিয়ে ঐ একই প্রার্থনা জানিয়ে যেতে লাগলেন।

বাজা বব না দিলেও মনে মনে ভাবলেন, 'স্ত্রীলোকেবা পাবে না এ বকম কোন কাজ নেই। হয়ত ভবতেব বাস্তা পবিষ্কার কবাব জন্য সে বামপণ্ডিত আব লক্ষ্মণ কুমাবকে বিষ খাইয়েই মেবে ফেলবে।' এইসব ভেবে একদিন তিনি ছেলেদেব আডালে ডেকে নিয়ে গেলেন।

বাম-লক্ষ্মণকে প্রথম থেকে সমস্ত খুলে বললেন, 'এখানে থাকলে তোমাদেব ঘোবতব বিপদ দেখা দিতে পাবে। তোমবা অন্য কোন বাজ্যে বা বনে গিয়ে বসবাস কব। যখন শুনবে আমাব মৃত্যু হয়েছে তখন ফিবে এসে সিংহাসনে বসবে।' ছেলেদেব এ কথা বলে বাজা জ্যোতিষীকে ডাকিয়ে আনলেন, 'বলুন তো, আমি আব কতদিন বাঁচব?'



বাব বছব মহাবাজ।

ঠিক দেখছেন?

হ্যাঁ মহাবাজ।

রাজা দশবথ তখন বামপণ্ডিত ও লক্ষ্মণ কুমাবকে বললেন, 'তোমবা বাব বছব পবে ফিবে এসে বাজচ্ছত্র অধিকাব কব।' কুমাববা বাজাকে প্রণাম কবে বওনা দেওয়াব উদ্যোগ কবলেন। তখন সীতাদেবী বললেন, 'বাবা, আমিও দাদাদেব সঙ্গে যাব, আমাকে অনুমতি দিন।' বাজা দশবথেব চোখ জলে ভবে এল। কিন্তু মুখে বললেন, 'তাই এস মা।'

তিনজন বাজপ্রাসাদ থেকে বেবিয়ে আসা মাত্র হাজাব হাজাব প্রজা তাঁদের অনুগামী হল। বাম পণ্ডিত এবং লক্ষ্মণ কুমাব তাদেব বোঝাবাব চেষ্টা কবলেন, 'আপনাবা ফিরে যান।' শেষে তাবা চোখেব জলে বাজপুত্রকন্যাদেব বিদায় দিলেন।

তিনজন এবপব বহু পথ ঘুবে তাঁবা হাজিব হলেন হিমবন্ত প্রদেশে। যলমূল প্রচুব আছে এ বকম একটি জায়গা বেছে নিয়ে তাঁবা আশ্রম বানালেন। সেখানেই তিনজন থাকতে শুরু করলেন।



লক্ষ্মণ কুমাব আব সীতাদেবী বাম পণ্ডিতকে বললেন, 'দাদা, আপনি আমাদেব বড, পিতৃস্থানীয়, কাজেই আপনাকে ফলমূল জোগাড কবতে যেতে হবে না। ঐ কাজটুকু আমরা দুজনেই করতে পাবব। আপনি আশ্রমেই থাকুন।'

বাম লক্ষ্মণ সীতা যখন বনেব ফল খেয়ে জীবনধাবণ কবছেন, বাজা তখন প্রতিদিনই সন্তানদেব শোকে ভেঙ্গে পড়ছেন। জ্যোতিষীব বাণী ব্যর্থ করে ন' বছবেব মাথায বাজা দশবথ দেহ বাখলেন।

দশবথেব অন্ত্যেষ্টি শেষ হলে ভবতেব মা ভবতকে বাজসিংহাসন দেওযাব কথা বললেন। কিন্তু মন্ত্রী, অমাত্য, অনুচবরা কেউই সে কথায কান দিলেন না। তাঁবা বললেন, সিংহাসন যাঁদের প্রাপ্য, তাঁবা এখন বনে আছেন। অমাত্যবা ভবতকে সিংহাসন অধিকাব কবতে দিলেন না। ভবত তখন ঠিক কবলেন, 'আমি বনে গিযে বাম-পণ্ডিতকে নিযে আসব, তাঁকে বাজছত্র দেব।'

খড়্গ, ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা, চামব—এই পাঁচ বকম বাজচিহ্ন সঙ্গে নিযে ভবত বনেব দিকে চললেন। সঙ্গে চলল চতুরঙ্গ সেনা-বাহিনী আব অমাত্যবা। ভবত যখন আশ্রমে এলেন, লক্ষ্মণ পণ্ডিত এবং সীতা দেবী তখন ফল যোগাড কবতে বনেব মধ্যে



ঘুবছিলেন। আশ্রমে তখন কেবল বাম পণ্ডিত।

দাদা, বাবা দেহ বেখেছেন।

আপনি এবাব সিংহাসনে বসুন।

ইত্যাদি বলে ভরত এবং অমাত্যবা কাঁদতে লাগলেন। বামপণ্ডিত কিন্তু চোখের জল ফেললেন না। সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মণ আর সীতা ফিবে এলেন। বামপণ্ডিত ভাবলেন, এবা এখনও বয়সে নবীন, শোক সহ্য কবতে পাববে না, এদেব পরে বলা যাবে।

তাবপর হঠাৎ যেন খুব বেগে গিয়েছেন এমন ভাব কবে বললেন, 'আজ এত দেবি কবলে কেন, তোমাদেব শাস্তি পেতে হবে।'

যথা আজ্ঞা।

যাও, ঐ জলে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক।



লক্ষ্মণ পণ্ডিত আর সীতা সামনেব এক সবোববে গিয়ে নামলেন। তাঁবা জলে নামার পব বাম পণ্ডিত বললেন, 'আজ ভবত এসে বলল, আমাদেব বাবা মহাবাজ দশবথ দেহ রেখেছেন।'

লক্ষ্মণ আব সীতা বাবাব মৃত্যুব খবব শুনে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হযে গেলেন। তাঁবা বাববাব মূর্চ্ছা যেতে লাগলেন। তিনবাব সংজ্ঞাহাবা হবাব পব অমাত্যবা তাঁদেব জল থেকে তুলে আনলেন। তাঁবা সকলে মিলে একসঙ্গে কাঁদতে লাগলেন। শুধু বামপণ্ডিতেব চোখে জল নেই।

ভবত মনে মনে চিন্তা কবলেন সবাই বাবাব মৃত্যুতে এত কাতব হযে কাঁদছেন, অথচ দাদা বামপণ্ডিতেব চোখে জল নেই কেন। এই ভেবে তিনি বাম পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস কবলেন :





দাদা, সকলেই যখন শোকার্ত তখন আপনি কি করে স্থির থাকছেন?

রাম পণ্ডিত তখন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন।

'দেখ, দিনরাত কেঁদেও কাউকে বাঁচানো যায় না। জ্ঞানী মানুষ তাই কাঁদেন না।

আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই মৃত্যুর অধীন।

গাছের ডালে যে ফল ধরে, সেই ফল পাকলেই যেমন পড়ে যাওয়ার ভয় যেমন থাকে, জীবনও তেমনি। জন্মাবার পরই মৃত্যুর ভয়ে দিন রাত কাঁপে।

ভোরবেলা যাদের দেখা পাই, তাদের অনেককেই সন্ধ্যেবেলা দেখতে পাই না। ওদের মধ্যে অনেকে ভোর হওয়ার আগেই যমের কবলে পড়ে।

লোকেরা শোকে বৃথাই কাতর হয়। যদি শোক করে কোন সুফল পাওয়া যেত তাহলে পণ্ডিতরাও শোক প্রকাশ করতেন।

শোকে আয়ুক্ষয় হয়, শরীর অস্থিচর্মসার হয়। এছাড়া শোকে আর কি হয় বল? শোক তো মৃত্যুকে ফিরিয়ে আনতে পারে না।

গৃহস্থ লোক প্রচণ্ড দাবানলকে জল দিয়ে শাসন করে যাকে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তেমনি জ্ঞানের সাহায্যে শোককে দমন করেন। বাতাসের দাপটে যেমন তুলো উড়ে যায়, জ্ঞানের শক্তিতে তেমনি শোক উড়ে যায়।

কর্মের জন্যই জীবরা যাতায়াত করে। জন্মায়, মরে, আবার জন্মায় —অথচ ভাবে, এ আমার বাবা, এ মা, ভাই-বোন ইত্যাদি। আর এই সুখেই মজে থাকে তারা।

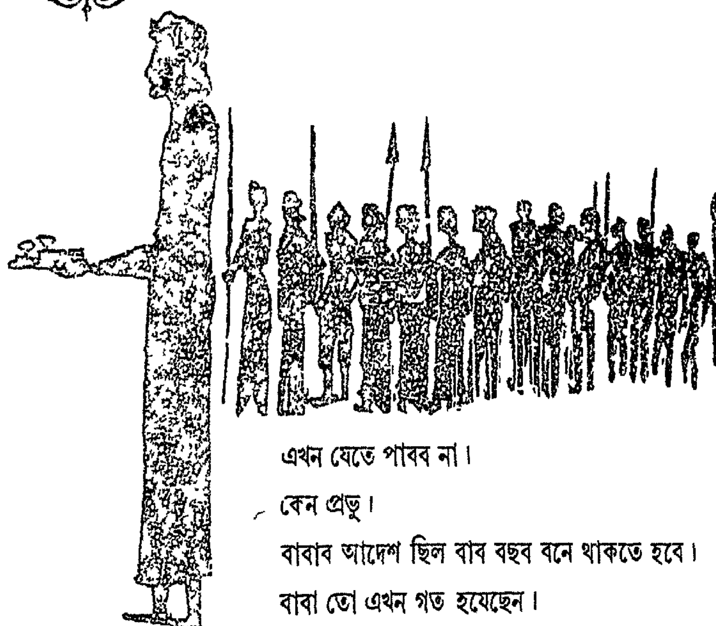
বাবা স্বর্গে গেছেন। কেঁদে কি হবে? বাবার কাজ এখন কাঁধে তুলে নিতে হবে। এবার আমরা সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্মান করব। গরীবকে দান করব। জ্ঞাতি কুটুমকে সযত্নে রাখব।

সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকের পার্থক্য করেন। শোক যত বড়ই হোক, তাতে তাঁদের হৃদয় পোড়ে না।'

রাম পণ্ডিত এভাবে সংসারের অনিত্যতা ব্যাখ্যা করে বোঝালে সকলে মুগ্ধ হলেন। অমাত্যরা এবং ভরত তখন রামকে বললেন, 'প্রভু, এবার দেশে ফিরে চলুন।'







এখন যেতে পারব না।

কেন প্রভু।

বাবার আদেশ ছিল বার বছর বনে থাকতে হবে।

বাবা তো এখন গত হয়েছেন।

আদেশ অলঙ্ঘনীয়।

কবে যাবেন তাহলে?

তিন বছর পরে।

ততদিন কে রাজ্য চালাবে?

ভরতকুমার।

ভরতকুমার এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'না দাদা, আমি পারব না।' তখন রামপণ্ডিত বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে আমার এই পাদুকা নিয়ে যাও, এই পাদুকাই রাজ্য চালাবে।'

এরপর ভরত রাম পণ্ডিত, লক্ষ্মণ কুমার ও সীতার পাদুকা নিয়ে দেশের উদ্দেশে রওনা হলেন। সঙ্গে চলল সেই চতুরঙ্গ সেনা-বাহিনী আর অমাত্যদের দল।

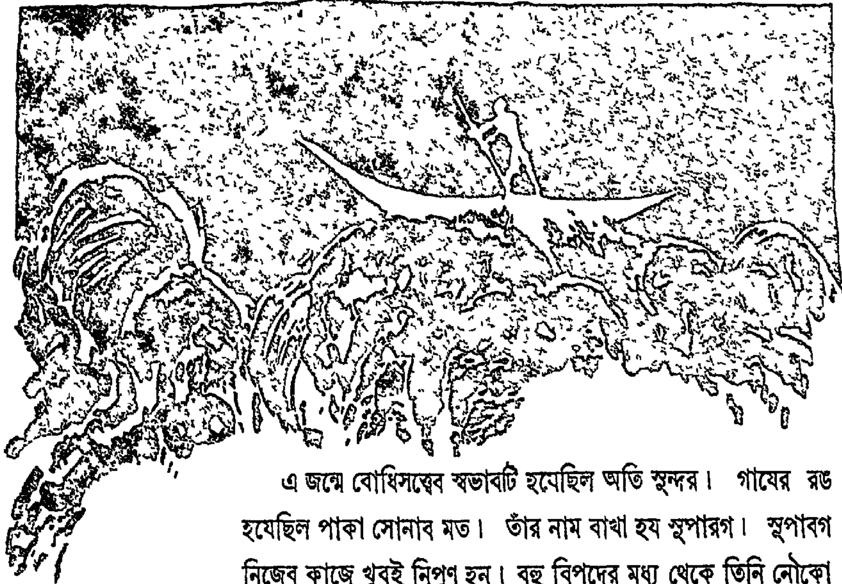
রামের পাদুকাই সেই তিন বছর বারাণসীতে রাজত্ব করল। কোন বিবাদের মীমাংসায় ভুল হলে দুটি পাদুকায় সংঘর্ষ হতো। বিচার ন্যায়সম্মত হলে পাদুকাদুটি স্থির থাকত।

তিন বছর পরে রাম পণ্ডিত ফিরে এলেন। তখন সীতা দেবীকে প্রধানা মহিষী করে রাম পণ্ডিতের অভিষেক উদযাপন করা হল। এরপর তিনি ষোল হাজার বছর যথাধর্ম রাজ্য শাসন করেন। তারপর রাম পণ্ডিত দেবগণের সঙ্গে মিলিত হলেন।



সুপারগ জাতক

পুবাকালে ভৃগুবাষ্ট্র নামে একটি বাজ্য ছিল। সেখানে ভৃগুকচ্ছ নামে এক বন্দব ছিল। বন্দবে যে কজন সমুদ্র-অভিযান বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাঁদেব মধ্যে যিনি সবচেয়ে সেবা, বোধিসত্ত্ব তাঁর ছেলে হয়ে জন্মালেন।



এ জন্মে বোধিসত্ত্বেব স্বভাবটি হয়েছিল অতি সুন্দর। গায়ের রঙ হয়েছিল পাকা সোনাব মত। তাঁর নাম বাখা হয় সুপারগ। সুপাবগ নিজেব কাজে খুবই নিপুণ হন। বহু বিপদের মধ্য থেকে তিনি নৌকো উদ্ধাব কবে এনেছেন। তাঁব সম্পর্কে বলা হত সুপাবগ যে নৌকোয় থাকেন, সেই নৌকোব কোন ভয় নেই।

এভাবে দিন যেতে লাগল। পরে একবাব নৌ-যাত্রায় সমুদ্রের নোনা জলেব প্রচণ্ড আঘাত লাগে তাঁব চোখে। সেই আঘাতে সুপাবগ চোখদুটি খোয়ালেন। তারপব থেকে তিনি নৌ-যাত্রায় ক্ষান্তি দিলেন। মনে মনে ভাবলেন, 'বাজাব কাছে যাই, বাজা নিশ্চয়ই আমাকে একটা যোগ্য কাজ দেবেন।'

সুপাবগকে বাজার পছন্দ হল। বাজা তাঁকে বললেন, 'তুমি আমাব এখানে যেসব জিনিস কেনা হয় তাব দাম ঠিক কবে দেবে।' সুপাবগ সেই কাজ কবতে লাগলেন। সেবা হাতি, বথ, মণি-মাণিক্য ইত্যাদিব দাম সুপাবগ ঠিক করে দিতেন।



একদিন কয়েকজন লোক রাজার মঙ্গলহস্তী করার জন্য একটি হাতিকে নিয়ে এল। হাতিটিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলে সুপারগ হাতির শরীরে হাত বুলিয়ে বললেন, 'এই হাতিকে মঙ্গলহস্তী করা যায় না। এর পেছনের পা দুটো ছোট। জন্মানো মাত্র এর মা একে পিঠে নেয় নি। মাটিতে পড়ে এর পেছনের পা দুটো ছোট হয়ে গেছে।' হাতি বিক্রি করতে এসেছিল যারা, তাদের জিজ্ঞেস করা হল, 'কি হে, আমাদের পণ্ডিত যা বলেছেন তা কি ঠিক?'

হ্যাঁ প্রভু, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

রাজা এ ঘটনার বিবরণ শুনে পণ্ডিতকে আট টাকা পুরস্কার দিলেন।



কিছুদিন পরে আবার একদল লোক একটা ঘোড়া নিয়ে এল। কুলক্ষণা হিসাবে তারা ঘোড়াটাকে বেচতে চায়। রাজা তাদেরও সুপারগের কাছে পাঠালেন। সুপারগ ঘোড়ার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'এ ঘোড়াকে মঙ্গলাশ্ব করা যায় না।'

ব্যাপারী ॥ কেন?

সুপারগ ॥ এ যেদিন জন্মেছে সেদিনই এর মা মারা গেছে।



ব্যাপাবী॥ তাতে কি ?

সুপাবগ॥ মাব দুধ না পাওযায এব ভালোমত পুষ্টি হয নি।

এবাবেব ঘটনা জেনে বাজা আবও খুশি। তিনি আবাব সুপাবগকে আট টাকা পুবস্কাব দিলেন।

এব কিছুদিন পবে একখানা রথ আনা হল সুপাবগেব সামনে।

পণ্ডিত, দেখুনতো।

কি ?

এই বথটি বাজাব মঙ্গল বথ হবে।

সুপাবগ বথেব গাযে হাত বাখলেন। তাঁব ভুরু কুঁচকে গেল। বললেন, 'বাজাব বথ কখনও পোকায কাটা কাঠ দিযে হতে পাবে না। এই বথ বানানো হযেছে পোকায কাটা কাঠে।' বাজা শুনলেন, পবখ কবে দেখলেন কথাটা সত্যি। বাজা এবাবও তাঁকে আট টাকা পুবস্কাব দিলেন।

কিছুদিন পবে কযেকজন ব্যাপাবী বাজাব জন্য একটি কম্বল নিযে এল। কম্বলটা অসম্ভব দামী এবং দেখতেও চমৎকাব। সুপাবগ কম্বলে হাত বুলিযে বললেন, 'কম্বলটায খুঁত আছে। বাজাব যোগ্য নয এ কম্বল।' অনুসন্ধান কবে দেখা গেল কম্বলটাব একটা জাযগা ইঁদুবে কেটেছে। বাজা খুব খুশি হলেন। কিন্তু সুপাবগকে আট টাকা পুবস্কাবই দিলেন।

সুপাবগ তখন মনে মনে ভাবলেন, 'এমন অদ্ভুত সব কাজ দেখেও বাজা দেওযায সময মোটে আট টাকা পুবস্কাবই দিচ্ছেন। এত কম টাকা লোকে নাপিতকে দেয। তাহলে আমাব এই বাজাকে সেবা কবে লাভ কি ? তাব চেযে ববং নিজেব বাড়িতেই ফিবে যাই।'

বোধিসত্ত্ব তাবপব ভৃগুকচ্ছে আবাব ফিবে এলেন। কিছুদিন পবে সেখানকাব ব্যাপাবীবা নৌকো সাজিযে বাণিজ্যে যাওযাব জন্য তৈবি হল। কিন্তু নৌকোব হাল ধবাব মত যোগ্য লোক তাঁবা খুঁজে পেল না। তখন তাদেব অনেকেই সুপাবগেব কথা বলল। সুপাবগ সব শুনলেন।



কিন্তু আমি যে চোখদুটো খুইয়েছি।

তাহলেও আপনাব মত হাল ধবাব লোক মিলবে না।

আমাব বযস হযেছে।

তাতে কিছু এসে যায় না।

ব্যাপাবীদেব কোন মতেই ফেবাতে পাবলেন না তিনি। বাধ্য হযেই রাজি হতে হল। নৌকো প্রথম সাতদিন বেশ তবতব গেল, তাবপব বিপদ শুরু হল। ভযঙ্কব সামুদ্রিক ঝড নৌকোটি নিযে লোফালুফি শুরু কবে দিল। ছ মাস এভাবে কাটল।

তাবপব নৌকো ক্ষুরশাল নামক সমুদ্রে পড়ল। মানুষেব মত সাপেব মত ভীষণাকাব মাছ সেই সমুদ্র তোলপাড় কবছে। বোধিসত্ত্ব জানতেন, ওটা হল হীবক সমুদ্র। কিন্তু ব্যাপাবীদেব বললেন, 'ওটা খুবই বিপজ্জনক জাযগা, তাড়াতাড়ি এই সমুদ্র পেবিযে চল।' এদিকে জলে দড়ি নামিয়ে গোপনে কিছু হীবে তুলে নিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এই ব্যাপাবীবা হীবাব খোঁজ পেলে নৌকোয এত হীরা তুলবে যে নৌকো ডুবে যাবে।

একইভাবে নৌকো স্বর্ণ সমুদ্র, বজত সমুদ্র ও মণি সমুদ্রে পডল। প্রত্যেক বাবেই বোধিসত্ত্ব ওদেব ভয় পাওয়ালেন। আর নিজে গোপনে কিছুটা কবে বত্ন তুলে নিলেন।



একেবাবে শেষে নৌকো এক বিপজ্জনক সমুদ্রে এল। সেখান থেকে কেউ কোন দিন ফিবতে পাবে না। সুপাবগ তখন ব্যাপাবী ও নাবিকদেব বললেন, 'আমাকে স্নান কবিযে নতুন কাপড পবিযে হালেব কাছে বসিযে দাও।'

তাবা তাই কবল। বোধিসত্ত্ব তখন ঈশ্ববেব কাছে প্রার্থনা কবলেন, 'কোনদিন প্রাণী হত্যা কবিনি। প্রভু, আমাদেব নির্বিঘ্নে দেশে পৌঁছে দাও।'

পালে যেন বাতাস লাগল। নৌকো তবতব কবে ভৃগুকচ্ছে ফিবে এল।

বোধিসত্ত্ব সকলেব মধ্যে সমান ভাগে ধনবাশি ভাগ কবে দিলেন। ব্যাপাবী আব মাঝিদেব বললেন, 'এতে তোমাদেব সাবাজীবন কেটে যাবে। আব কখনও সমুদ্রে যেও না।'

ভদ্রশাল জাতক

পুবাকালে বাবাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক বাজা বাজত্ব কবতেন। বাজা ব্রহ্মদত্ত যথাধর্ম বাজ্য শাসন কবতেন। নিযমিত পুণ্যকর্মে কখনও শিথিলতা দেখাননি।

যে সমযেব কথা হচ্ছে তখন জম্বুদ্বীপেব বেশিব ভাগ বাজাই

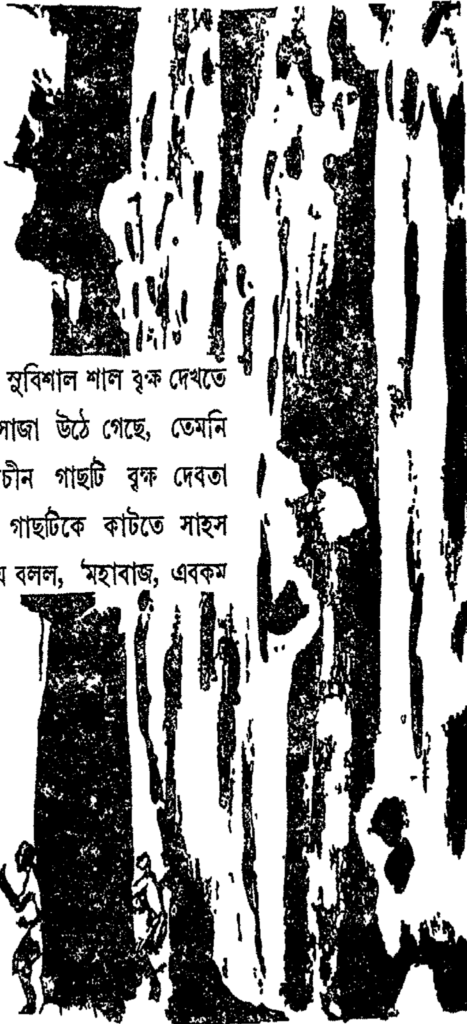




সুন্দব প্রাসাদে থাবতেন। এইসব প্রাসাদেব অনেকই স্তম্ভেব ওপর নির্মিত। ব্রহ্মদত্ত ভাবলেন, 'সব বাজাই অনেক স্তম্ভেব ওপব প্রাসাদ বানিয়েছেন। আমি এমন প্রাসাদ বানাব যা এদেব থেকে আলাদা।' তিনি ঠিক করলেন মাত্র একটি স্তম্ভেব ওপর প্রাসাদ গডবেন।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। তিনি বাজ্যেব সেবা ছুতোব আব বাজমিস্ত্রিদের ডাকিযে আনলেন। তাদেব নির্দেশ দিলেন এক স্তম্ভের একটি প্রাসাদ বানাতে। কাবিগববা বাজাকে প্রণাম কবে চলে গেল।

কিন্তু দুঃখেব বিষয়, সমস্ত বনভূমি চযে ফেলেও তারা এমন একটি গাছ পেল না যা পুরু, সোজা উঠে গেছে এবং শক্ত। তারা বিষণ্ন মনে বাজাব কাছে ফিবে এল



কি হল?

মহারাজ, ও বকম গাছ নেই।

ভাল কবে খুঁজে দেখ।

শেষকালে তাবা বাজাব বাগানে এব সুবিশাল শাল বৃক্ষ দেখতে পেল। এই গাছটি আগাগোডা যেমন সোজা উঠে গেছে, তেমনি শক্তপোক্ত। এখন সমস্যা হল এই প্রাচীন গাছটি বৃক্ষ দেবতা হিসেবে পুজো পেযে আসছে। কাবিগববা গাছটিকে কাটতে সাহস করল না। তাবা বাজাব কাছে ফিবে গিযে বলল, 'মহাবাজ, এবকম একটি গাছ পাওয়া গেছে।'

তাহলে কেটে আন।

একটা সমস্যা আছে।

কি?

এই গাছটা আছে আপনাবই বাগানে

ঠিক আছে, কেটে ফেল।

কিন্তু মহাবাজ· ··

অত কিন্তু কিন্তু কবছ কেন?

মহাবাজ, ও গাছটি বৃক্ষদেবতা।



তোমবা চিন্তা বোবো না। কেটে যেল।

বাবিগববা প্রথমে সেই মঙ্গল বৃক্ষেব পুজো কবল। প্রদীপ জ্বেলে দিল গাছেব তলায, তাবপব মন্ত্রপাঠ কবাব মত বলল, 'সাতদিন পবে এসে এই গাছটিকে আমবা কাটব। বাজা স্বযং গাছটিকে কাটাব অনুমতি দিযেছেন। আমাদেব মিনতি, বৃক্ষ দেবতা অন্য কোন গাছে আশ্রয নিন।'

বৃক্ষ দেবতা ভাবলেন, 'ওবা গাছ কাটলে আমি স্থিব থাকতে পাবব না। আমাব মৃত্যু হবে। কিন্তু তাব চেযে বড কথা আমাকে ঘিবে অন্য যেসব তরুণ শাল গাছ আছে, তাবাও ধ্বংস হবে। ঐ সব গাছেও অনেক দেবতা আছেন। আমি নিজে মাবা যাই ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাব জ্ঞাতিদেব বিনাশ যে কবে হোক আটকাতে হবে।' এই ভেবে বৃক্ষ দেবতা মাঝ বাতে দেবসাজে বাজাকে দেখা দিলেন। বাজা তাঁকে দেখে তাঁব পবিচয জানতে চাইলেন। বৃক্ষ দেবতা তখন বাজাকে নিজের পবিচয দিয়ে বললেন :

বাজা, তুমি আমাকে কাটতে চাও কাট, তবে একবাবে গোটা গাছটা না কেটে টুকবো টুকবো কবে কাট।

সে কি কথা প্রভু!

কেন?

আমবা জানি টুকরো টুকবো কবে কাটলে যন্ত্রণা বাড়ে।

হ্যাঁ, তা ঠিক।

তাহলে আপনি কেন এ বকম আদেশ কবছেন?

আমাকে ঘিবে অনেক চাবা গাছ আছে, আমি একেবাবে মাটিতে পডলে তাদেবও মৃত্যু হবে।

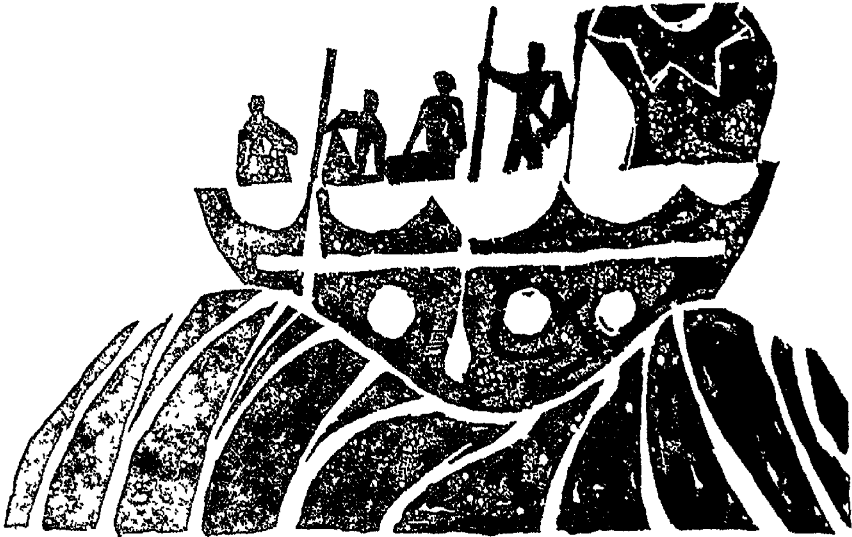
ব্রহ্মদত্ত বৃক্ষ দেবতাব ওই জ্ঞাতি-প্রীতি দেখে মুগ্ধ হলেন। শখেব প্রাসাদ নির্মাণেব চিন্তা মনে থেকে তাডিযে দিলেন। বৃক্ষদেবতা যাওযাব সময তাঁকে অনেক ধর্মকথা শুনিযেছিলেন। বাকি জীবন বাজা সেই ধর্মনির্দেশ মেনে চললেন। একদিন আযুক্ষয কবে, তিনি যেমন কাজ কবেছেন সাবা জীবন, সেই বকম যল লাভেব উদ্দেশ্যে দেহত্যাগ কবলেন।



সমুদ্রবাণিজ জাতক

বাবাণসী নগরেব কাছে ছুতোবদেব একটি গ্রাম ছিল। বেশ বড় সেই গ্রাম। ঐ গ্রামে এক হাজাব ঘব ছুতোব থাকত।

এই গ্রামেব ছুতোবদেব একটা মাবাত্মক দোষ ছিল। তাবা গেবস্থেব কাজ কবে দেবে বলে আগাম টাকা নিত। কিন্তু ভুলেও কোনদিন কোন কাজ কবত না। এব ফলে আশপাশেব গ্রামের মানুষ তাদেব ওপব বেশ খাপ্পা ছিল। দেখলেই গাল দিত, কাজ



কবতে গেলেও বাধা দিত। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে তাদেব পক্ষে ওখানে থাকাই কঠিন হযে উঠল।

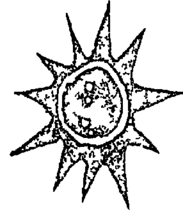
তখন তাবা ঠিক কবল, 'একটা বড নৌকো বানিযে তাতে চেপে আমবা দূবদেশে চলে যাব।' এই ভেবে বনে গিয়ে তাবা গাছ কেটে আনল। সকলে মিলে বেশ বড় একখানা নৌকো বানাল। নৌকোটা গ্রাম থেকে বেশ দূরে লুকিয়ে বাখল। মাঝ বাতে লুকিয়ে পরিবাব-বর্গকে এনে নৌকোয় তুলল। তারপব ভিন দেশেব উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু কবল।

দিনকয়েক পবে নৌকো মাঝসমুদ্রে পড়ল। তারপব বাতাসেব বেগে এদিক সেদিক যেতে লাগল। শেষে এক দ্বীপে এসে নৌকো ঠেকল।



দ্বীপটি ফুলে ফলে ভবা। পৃথিবীতে যত বকম ফল ও শস্য হয় প্রায় সমস্তই সেখানে আপনি ধবেছে। ছুতোববা ভাবল, 'আমবা যদি এখানে ডেবা বেঁধে থাকি তাহলে খাওয়া-পডাব চিন্তা থাকে না। খাটাখাটনিব কোন দবকাব পডে না।'

এব আগে নৌকো ডুবে যাওয়ায় আব আবেকজন লোক ভাসতে ভাসতে ঐ দ্বীপে এসে উঠেছিল। সে শালি চালেব ভাত, আখ, কলা, আম, নাবকেল খেযে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হযেছে। সে সেই দ্বীপে একা থাকত। পবণে কোন জামাকাপড ছিল না। চুলদাডি খুব বেডে গিযেছিল।



ছুতোববা ভাবল, 'একবাব দেখা দবকাব দ্বীপে কোন রাক্ষস আছে কিনা। তাহলে যে সবাই মাবা পডব।' এভাবে তাবা দ্বীপটা ঘুবে ঘুবে দেখতে লাগল। তখন আগে আসা লোকটি মনেব আনন্দে এক জাযগায বসে গান কবছিল। ছুতোববা তাকে দেখে ভাবল, এ নির্ঘাৎ যক্ষ। তখন তাবা তাকে তীর মারাব জন্য প্রস্তুত হল। ইতিমধ্যে লোকটিও তাদেব দেখে ফেলেছে। সে তাদেব কাছে মিনতি কবে বলল, 'মেবো না, আমিও তোমাদেব মত মানুষ। নৌকোডুবি হওযায় এখানে এসে পডেছি।' ছুতোবরা কিছুতেই তা বিশ্বাস কবতে চাইল না। লোকটি অনেক অনুনয-বিনয করাব পব তারা তাকে বেহাই দিল।



নৌকোডুবি হওযা লোকটি তাদের বলল, 'দেখ, এই দ্বীপে সবই ভাল। এটা দেবতাদেব খেলাব জাযগা। শুধু একটা ব্যাপারে সাবধান থেকো। এখানে মলমূত্র ত্যাগ করলে সব সময বালিতে গর্ত করে চাপা দিযে দেবে। নাহলে বিপদ হবে।'



এই ছুতোবদেব মধ্যে দুজন দলপতি ছিল। দুজনেব নেতৃত্বে দু দল ছুতোব চলত। একজন দলপতি বোকা, পেটুক। অপর জন বুদ্ধিমান, সংযমী। ঐ দ্বীপে সুখে বসবাস কবতে কবতে একদিন ছুতোববা ভাবল, 'আমবা এখানে বেশ আরামেই আছি। তবে একটা দুঃখ থেকে গেল। এখানে আসা অবধি সুবা পান কবা হয নি।'

তারপর তাবা আখের বস থেকে সুস্বাদু সুরা তৈরি কবল। সকলে মিলে আকণ্ঠ সেই সুবা পান কবে মত্ত হল। মত্ত অবস্থায তাবা দ্বীপেব এখানে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ কবল। বালি দিযে সেসব

ঢেকে দেওয়াব কথা তাদেব আব মনে বইল না।

দেবতাবা যখন দেখলেন তাঁদেব খেলাব জাযগা দূষিত কবা হযেছে, তখন তাঁবা ভযঙ্কব ক্ষুব্ধ হলেন। ঠিক কবা হল পাঁচদিন পবে পূর্ণিমায় সমুদ্র উচ্ছ্বাস হবে। বিশাল ঢেউ দ্বীপটি ভাসিযে দেবে। তাতেই তাঁদেব খেলাব জাযগাটি আবাব পবিষ্কাব হয়ে যাবে।



দেবতাদেব মধ্যে একজন খুব দয়ালু ছিলেন। তিনি ভাবলেন, 'অনর্থক এতগুলো প্রাণ নষ্ট হবে।' এই ভেবে তিনি ছুতোবদেব দেখা দিযে বললেন, 'পূর্ণিমায এই দ্বীপে বানভাসি হবে, তোমবা বাঁচাতে চাইলে পালাও।' দেবতাদেব মধ্যে একজন ছিলেন খুব নিষ্ঠুব। তিনি এ কথা টেব পেযেই ছুতোবদেব দেখা দিলেন, 'এখানে কি একজন দেবতা এসে তোমাদেব দ্বীপ ছেড়ে যেতে বলেছেন। তিনি নিষ্ঠুব, তোমাদেব তাডাতে চাইছেন, তোমবা ওঁব কথা শুনো না। আনন্দে থাক।'

দুই দেবতাব মত নিযে ছুতোবদেব দুই দলপতিব মধ্যে বিবাদ দেখা দিল। বুদ্ধিমান, সংযমী দলপতি নিজেব লোকজনকে নিযে নৌকো ছেডে দিলেন পূর্ণিমাব আগেব দিন। পেটুক আব বোকা দলপতি তখন ভাবছে, 'ও বোকা, তাই এই স্বর্গ ছেডে চলে গেল।'

পবেব দিন সাত তাল গাছ সমান উঁচু ঢেউ দ্বীপটিতে আছডে পড়ল। ছুতোববা সেই প্রবল জল-উচ্ছ্বাসে খডকুটোব মত ভেসে গেল।

লালসা জাতক

বারাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তেব দুটি ছেলে ছিল। বাজা বড় ছেলেকে যুববাজ ও ছোট ছেলেকে সেনাপতি কবলেন। ব্রহ্মদত্তেব মৃত্যুর পব







অমাত্যবা বড ছেলেকে বাজপদে অভিষেক কবানোব সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করলেন। কিন্তু বড ছেলে বললেন, 'দেখুন, আমি বাজা হতে চাই না, আপনাবা আমাব ছোট ভাইকে বাজা করুন।' অমাত্যবা বললেন, 'প্রভু, আপনি বড, আপনাবই বাজা হওয়া উচিত।' অমাত্যবা একই অনুবোধ বাব বাব কবলেও তিনি বাজি হলেন না।

ফলে শেষ পর্যন্ত ছোট ভাই বাজা হলেন। তখন বড ভাই বললেন, 'আমি যুববাজও থাকতে চাই না।' অমাত্যবা বললেন, 'ঠিক আছে।' কিন্তু বড ছেলেব ত্যাগ আব থামতে চায না। এবপর তিনি বললেন, 'আমাব ধনসম্পত্তিব দবকাব নেই।'



কিন্তু যুববাজ—

কোন কিন্তু নয।

ঠিক আছে, তবে আপনি এখানেই আবামে থাকুন।

না।

সে কি কথা!

আমি এখানে থাকব না।

কেন যুববাজ?

এখানে আমাব কোন কাজ নেই।

এবপব তিনি বাবাণসী ত্যাগ কবে বেবিযে পডলেন। ঘুবতে ঘুবতে বাবাণসী বাজাব সীমানাব কাছাকাছি এক গ্রামে এক ব্যবসাযীব বাড়িতে আশ্রয় নিলেন।

এখানে তিনি ব্যবসাযীব অর্থে জীবন যাপন কবতেন না। নিজেব হাতে কাজকর্ম কবে যে টাকা বোজগাব কবতেন, সেই টাকাতেই তাঁব চলত। আস্তে আস্তে গ্রামেব লোক এবং আশপাশেব গ্রামের লোকেবা জানতে পাবল, ইনি বাজপুত্র। তখন থেকে তাবা তাঁকে কাজ কবতে দিত না। রাজাকে যেবকম উপহার পাঠান হয তেমনভাবে নানা বকম উপহাব পাঠাতে লাগল তাঁকে।

কিছুদিন পরে সেই গ্রামে বাজাব আমিন এল। আমিন এসে জমিজাযগা মাপতে শুরু কবল। এবপব কবেব বোঝা বাড়বে।

প্রভু, বক্ষা করুন।

কি হযেছে?

আমবা আপনাব সেবা কবি।

সে তো ঠিকই।

আপনিও আমাদেব জন্য কিছু করুন।

কি কবতে বল?

বাজা তো আপনাব ভাই?

হ্যাঁ।

তাঁকে একখানা চিঠি লিখে দিন।



এবপব বাজপুত্র ছোট ভাইকে একখানা চিঠি লিখে জানালেন, 'ভাই, সীমানাব গ্রামেব লোকেবা খুব গবীব, আমি অনুবোধ কবছি তুমি তাদেব খাজনা মাফ কবে দাও। একেবাবে তুলে দাও। আব কখনও খাজনা নিও না।' ছোট ভাই দাদাব কথামত খাজনা তুলে দিলেন।

এব ফলে আশপাশেব বেশ কিছু গ্রাম ও শহবেব মানুষ এসে বাজপুত্রকে ধবল, 'মহাবাজ, আপনিই আমাদেব বাজা। আপনি আমাদেব কব মাপ কবিযে দিন। তাবপব থেকে আমবা আপনাকে কব দেব।'



বাজপুত্র তাই কবলেন। এব ফলে বাজপুত্রেব অনেক টাকা-পযসা হল। সম্মানও বৃদ্ধি পেল। শুধু যে তিনি ধনসম্পত্তি পেলেন, সম্মান পেলেন, তাই নয, মনে মনে তাঁব অর্থ ও ক্ষমতাব লালসা হু হু কবতে বাডতে লাগল।

বাজপুত্র ঐসব গ্রামেব যুববাজ হতে চাইলেন। ভাইকে সেই মর্মে চিঠি দিলেন। ভাই তাঁকে যুববাজ হিসেবে ঘোষণা কবলেন। কিন্তু তাঁব তৃষ্ণা এতেও থামল না। একদিন তিনি গ্রামেব লোকজনদেব সঙ্গে নিযে বাজত্ব অধিকাব কবার জন্য রাজধানীব দিকে বওনা হলেন। বাজধানীতে পৌঁছে ভাইকে খবর পাঠালেন, 'হয় আমাকে রাজ্য দাও, না হয যুদ্ধ কব।'

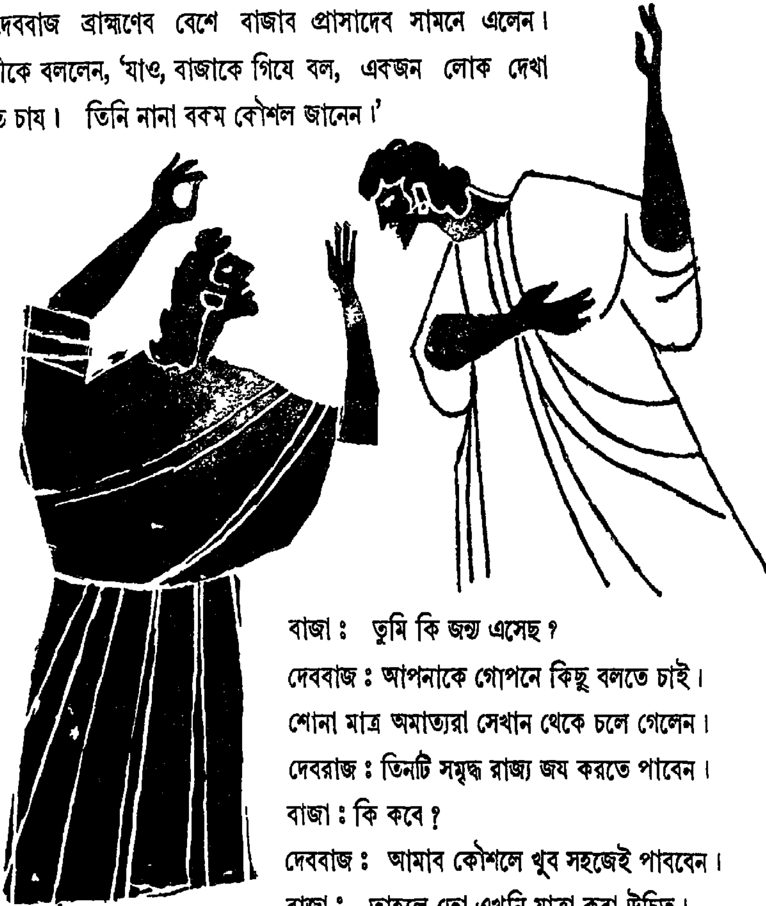
ছোট ভাই ভাবলেন, 'দাদা তো বোকাব হদ্দ। বাজা হওয়াব সময় নিজে ইচ্ছে কবে বাজা হল না। এদিকে এখন যুদ্ধ কবে বাজ্য নেবে বলছে। আমি যদি যুদ্ধ কবে মেবে ফেলি, লোকে আমাকেই দুর্ণাম দেবে। তার চেযে বাজ্য দিযে দেওয়াই ভাল।' এই ভেবে বাজা ভাইকে জানালেন, 'দাদা, যুদ্ধেব কোন দবকাব নেই, আপনি এসে বাজত্ব গ্রহণ করুন।'



বড় রাজকুমার রাজা হওয়ার পর ছোট ভাইকে একেবারে তাড়িয়ে দিলেন না। তিনি ভাইকে বললেন, 'তুমি উপরাজ হও।' এভাবে দিন যেতে লাগল। কিন্তু রাজার তৃষ্ণা দিন দিন বেড়েই চলল।

দেবরাজ শক্র একদিন ভাবলেন, 'মর্ত্যে কে বাবা-মার সেবা করে, কে দানধ্যান করে, কে লালসা তৃষ্ণায় পীড়িত, দেখা দরকার।' দেবরাজ দেখলেন বারাণসীরাজের তৃষ্ণার কোন অন্ত নেই। এই মূর্খ বারাণসীর রাজত্ব পেয়েও মনে মনে তৃপ্ত নয়, একে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

দেবরাজ ব্রাহ্মণের বেশে রাজার প্রাসাদের সামনে এলেন। প্রহরীকে বললেন, 'যাও, রাজাকে গিয়ে বল, একজন লোক দেখা করতে চায়। তিনি নানা রকম কৌশল জানেন।'



রাজা : তুমি কি জন্য এসেছ?

দেবরাজ : আপনাকে গোপনে কিছু বলতে চাই।

শোনা মাত্র অমাত্যরা সেখান থেকে চলে গেলেন।

দেবরাজ : তিনটি সমৃদ্ধ রাজ্য জয় করতে পারেন।

রাজা : কি করে?

দেবরাজ : আমার কৌশলে খুব সহজেই পারবেন।

রাজা : তাহলে তো এখুনি যাত্রা করা উচিত।

দেবরাজ : হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা শক্রর সামনে এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন যে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলেন, আগন্তুক কে, কি তার পরিচয়। শক্রও ঐরকম পরামর্শ দিয়ে চলে যান।



তারপর রাজা অমাত্যদের ডেকে বললেন, 'একজন লোক এসেছিল। সে বলে গেছে তিনটে রাজ্য আমরা জয় করতে পারি। এক্ষুনি ভেরি বাজিয়ে তাকে ডেকে পাঠাও। দেরি করো না, তাহলে রাজ্যগুলো জয় করা যাবে না। অন্য রাজা সেই রাজ্য জয় করে নেবে।'

মহারাজ সেই লোকটির আদরযত্ন করেছিলেন কি?

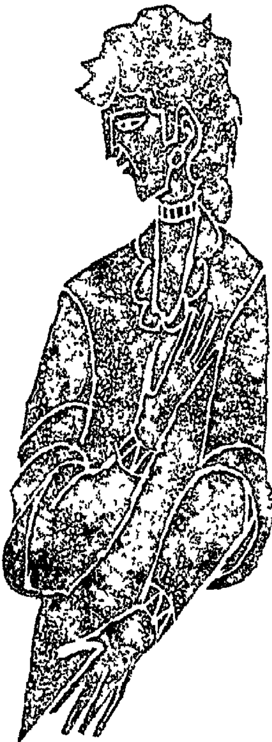
না হে।

তিনি কোথায় থাকেন জেনেছিলেন কি?

না, তা-ও জিজ্ঞেস করা হয় নি।

অমাত্যরা অনেক খোঁজ করেও সেই লোকটিকে খুঁজে পেল না। এর ফলে রাজা খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। প্রায় হাতের ফাঁক দিয়ে তিনটে রাজ্য চলে গেল। কিছুতেই তিনি এ দুঃখ ভুলতে পারছিলেন না। মনে মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'লোকটাকে যত্নআত্তি করা হল না, হয়ত সে রাগ করেই চলে গেছে।'

দিনরাত এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে রাজার শরীর ভেঙ্গে পড়ল। রাজার শরীরে যেন আগুন লেগেছে। এমন জ্বালা তিনি কখনও অনুভব করেন নি। ফলে পেটের গোলযোগ দেখা দিল। রাজা রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হলেন। বারাণসীর বৈদ্যরা রাজার চিকিৎসা করতে পারল না। রোগ ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল।



বোধিসত্ত্ব তখন নানা সাজে সুসজ্জিত হয়ে বাবা-মার কাছে ফিরে আসছিলেন। রাস্তায় শুনতে পেলেন বারাণসীরাজের কঠিন ব্যাধির কথা। ভাবলেন, রাজার চিকিৎসা করে তবে বাড়ি যাবেন।

বোধিসত্ত্ব রাজদরবারে গেলেন, রাজা তাঁকে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বড় বড় কবিরাজ বৈদ্য হার মানল, আর তুমি তো কচি ছেলে। ওরে, এঁকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দে।' রাজার আদেশ শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি বৈদ্য গিরির জন্য পয়সা চাই না, ওষুধের দামটুকু পেলেই খুশি হব।'

বোধিসত্ত্ব নাছোড়বান্দা হওয়ায় রাজাকে চিকিৎসায় রাজি হতে হল।

মহারাজ, এ রোগের কারণ কি?

তা জেনে তোমার কি হবে বাপু?

কারণ না জানলে বৈদ্য চিকিৎসা করতে পারে না।

মহারাজ তখন পূর্ব ইতিহাস খুলে বললেন। সেই তিনটি রাজ্য ও আগের লোকটি, কিছুই বাদ গেল না। শেষে দুঃখ প্রকাশও করলেন। বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, শোক করলে কি ঐ রাজ্য তিনটি পাবেন?' রাজা বললেন, 'না, তা পাব না।'

তাহলে শোক ত্যাগ করুন।

বোধিসত্ত্ব তারপর সহজ উদাহরণে রাজার লালসা দূর করার চেষ্টা করলেন।

'মহারাজ, চারটি রাজ্যের রাজা হলেও একসঙ্গে চারটি থালা থেকে খাবার খেতে পারতেন না। সুতরাং আপনার মূল ব্যাধি লালসা। সম্পত্তি লালসা ত্যাগ করুন। সুস্থ হয়ে যাবেন।'

কিছুদিন পর রাজা সত্যি সুস্থ হলেন। এও বুঝলেন বৈদ্য তাঁকে জ্ঞানের ওষুধ দিয়েই ব্যাধিমুক্ত করলেন।

মহাকৃষ্ণ জাতক

দেবরাজ শক্র একবার দেখলেন স্বর্গে আর নতুন দেবপুত্র আসছেন না। মানুষ সুকর্ম করলে দেবপুত্র হয়। দেবপুত্র যখন জন্মাচ্ছে না তখন নিশ্চয়ই মানুষেরা অধর্ম পথে চলেছে। দেবরাজ নিজের শক্তি-বলে তখন মর্ত্যের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

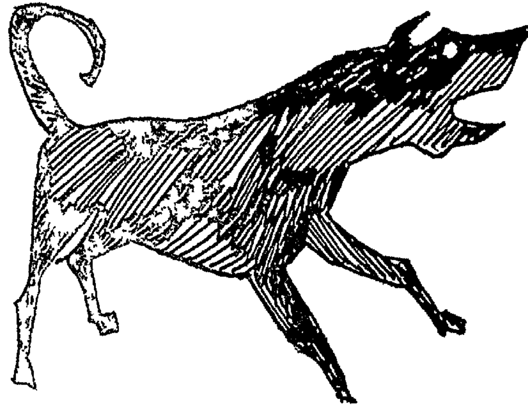


বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা স্বধর্ম ত্যাগ করেছে। তারা নানারকম কুকর্ম করছে। সাধারণ মানুষ যেসব পাপে ডুবে থাকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা সেইরকম পাপে ডুবে আছে।

দেবরাজ তখন দেবতা মাতলিকে এক ঘোর কালো রঙের ভীষণ দর্শন কুকুরে পরিণত করলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে মর্ত্যে নেমে এলেন। দেবরাজের অভিসন্ধি হল, 'মর্ত্যবাসীকে ভয় পাওয়াতে হবে, তারপর তাদের ধর্মশিক্ষা দেব।'

দেবরাজের কুকুরসহ ঐ ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে সবাই ভয়ে পালাতে লাগল। কুকুর এমন বীভৎসভাবে চিৎকার করতে লাগল যে সেই মহাশব্দে মর্ত্য কাঁপতে লাগল।

রাজা নিজে মন শক্ত করে শক্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ভয়ঙ্কর কুকুর এখানে কি চায়?' দেবরাজ বললেন, 'খেতে চায়।' রাজা



প্রথমে বাজপুবীব খাবাব কুকুবকে দিলেন। মুহূর্তেব মধ্যে সেই খাবার খেযে ফেলে কুকুব আবাব হুঙ্কাব দিল। বাজা তখন পবিচাবক ও অমাত্যদেব খাবাব কুকুবকে দেওযালেন। এভাবে কুকুব ক্রমে ক্রমে সব খাবাব খেযে ফেলল।

রাজা তখন সাহস করে জিজ্ঞেস কবলেন, 'এই কুকুরটি কি কাউকে শাস্তি দিতে চায?' দেববাজ বললেন, 'হ্যাঁ, ও অধার্মিকবে শাস্তি দিতেই এসেছে।' তাবপব তিনি আত্মপ্রকাশ করে বললেন. 'আমি দেববাজ শক্র।'

দেববাজ তখন প্রজাদেব ধর্মশিক্ষা দিলেন। বাজাও তাবপব দান-ধ্যানে মন দিলেন।

ভিক্ষু-ভিক্ষুণীবাও ফিবে পেলেন তাঁদেব অতীত জীবনেব সন্ধান।

মহাপদ্ম জাতক





পুবাকালে বোধিসত্ত্ব একবাব বাবাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তেব প্রধানা মহিষীব বড় ছেলে হয়ে জন্মান। বোধিসত্ত্বেব মুখখানি পদ্মফুলেব মত সুন্দব হযেছিল বলে তাব নাম হযেছিল মহাপদ্ম। বযসকালে তিনি সর্ববিদ্যায নিপুণ হলেন। সেই সময় তাঁব মা দেহ বাখেন। মহাপদ্মের মাব স্থানে বাজা অন্য এক স্ত্রীকে প্রধানা মহিষী কবলেন। আব মহাপদ্মকে করলেন যুববাজ।





কিছুদিন পর রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলের প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। রাজা বিদ্রোহ দমন করতে যাওয়ার সময় প্রধানা মহিষীকে বললেন, 'তুমি এখানেই থাক, আমি বিদ্রোহ দমন করতে যাচ্ছি।'

না প্রভু।

কেন?

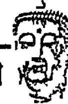
আপনাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না।

যুদ্ধক্ষেত্রে গেলে কষ্ট পাবে।

এভাবে প্রধানা মহিষীকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজা তাঁকে বললেন, 'আমি পদ্ম কুমারকে বলে যাচ্ছি সে তোমার সুবিধে-অসুবিধের ওপর নজর রাখবে।' পদ্ম কুমারকে তিনি ঐ নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

রাজা সীমান্ত বিদ্রোহ দমন করলেন। সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে রাজধানীতে ফিরে আসছেন। বোধিসত্ত্ব বাবার ফিরে আসার খবব পেয়ে রাজধানী সাজিয়ে তুললেন। তারপর রাজভবনের জন্য পাহারার সুব্যবস্থা কবে বাবার সঙ্গে দেখা করতে চললেন।

ঐ সময় প্রধানা মহিষী জানলা দিয়ে বোধিসত্ত্বের যুবরাজ-সাজ আর সুন্দর দেহশ্রী দেখে এ কথা ভুলে গেলেন তিনি সম্পর্কে পদ্ম-কুমাবের মা হন। ভাবলেন, রাজার বযস হয়েছে, আমি রাজার চেয়ে অনেক ছোট, পদ্মকুমার আর আমি প্রায় সমবয়সী। যদি পদ্ম-কুমারেব সঙ্গে আমার প্রণয় থাকে, তাহলে রাজার মৃত্যু হলে আমি পদ্মকুমারের প্রধানা মহিষী হতে পারব।





পদ্মকুমাব বিদায় নিতে এলে বাণী বোধিসত্ত্বের হাত ধবে এমন আচরণ করতে লাগলেন-যা খুবই বিসদৃশ। মহাপদ্ম তখন বাণীকে বললেন, 'আপনি আমার মা। আমি আপনাকে সেই চোখেই দেখি, দযা কবে আমাকে যেতে দিন।' বাণী তখন হিংসায় বললেন, 'তুমি আমাকে অপমান কবলে। এব ফল পাবে।'

মহাপদ্ম চলে গেলে বাণী মলিন কাপড পড়ে, চুল এলোমেলো কবে দরজায় খিল দিযে শুযে পডলেন। রাজা ফিরে এসে জানতে চাইলেন, 'কি হয়েছে তোমার?' রাণী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'মহাপদ্ম আমাকে অপমান করেছে।'



রাজা সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন, 'পদ্মকুমাবকে বেঁধে নিযে এস।'

বাজার সৈন্যরা মহাপদ্মকে শিকল দিযে বেঁধে নিযে চলল। এই দৃশ্য দেখে বাজ্যেব সব মানুষ, সভাসদ ও অমাত্যরা বিলাপ করতে লাগলেন। বাজাব অন্তঃপুবচাবিণীরাও দুঃখে কাতর হল। কিন্তু রাজা কারও শুনলেন না। মহাপদ্ম বললেন, 'মহাবাজ আমি নিরপরাধ, শুধু এইটুকু বলতে পাবি।' অমাত্যবা বললেন, 'একজনের মুখেব কথা বিচাব কববেন না বাজা। ন্যাযবিচারে যত্নবান হোন।'

রাজা কারও কথায় কান দিলেন না। হুকুম হল, মহাপদ্মকে হাত-পা বেঁধে রাজ্যের সুউচ্চ পাহাড থেকে নিচে ফেলে দেওযা হবে।

সৈন্যরা যাতে ফাঁকি না দেয সেজন্য রাজা নিজে তাদেব সঙ্গে গেলেন। মহাপদ্মকে পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হল। মহাপদ্ম যখন নিচে পড়ছেন, শুনতে পেলেন পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলছেন, 'মহাপদ্ম, তোমাব কোন ভয নেই।'

মহাপদ্মকে তিনি দু হাতে কোলে টেনে নিলেন। তারপর নাগরাজ তাঁকে নাগপুবীতে নিয়ে বাখলেন। তাঁকে অর্ধেক রাজত্ব দিলেন। সেখানে মহাপদ্ম এক বছব বাজত্ব কবলেন। তারপব আবাব পৃথিবীতে ফিরে এলেন নাগরাজের অনুমতি নিয়ে। হিমালয় অঞ্চলে প্রব্রজ্যা নিযে ধ্যান কবতে লাগলেন। অচিরেই তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করলেন।



একদিন বারাণসীর এক কাঠুরে হিমালয়ে মহাপদ্মকে দেখতে গেল। সে মহাপদ্মকে জিজ্ঞেস করল, 'মহামান্য, আপনি কি পদ্ম-কুমার?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'হ্যাঁ।'

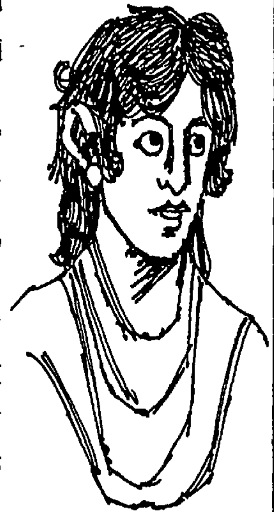
কাঠুরের মুখে খবর পেয়ে বারাণসীরাজ এলেন ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। মহাপদ্ম তাঁকে বললেন: 'বাবা, বিষয়সুখ এখন আমার কাছে বিষের তুল্য। আপনিই রাজ্য শাসন করুন। ন্যায়-ধর্ম পানে চলুন, দান-ধ্যান করুন।'

আম্র জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে একবার তাঁর পুরোহিতরা কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। একে একে সকলেই মারা যেতে লাগলেন। পুরোহিতকুলে একটি ছোট ছেলে ছিল। সে কোনমতে পালিয়ে যেতে পারে। ফলে ঐ সংক্রামক রোগের হাত থেকে বেঁচে যায়।

বালকটি ঘুরতে ঘুরতে তক্ষশিলায় গেল। সেখানে আচার্যের কাছে শিষ্যত্ব নিল। বেশ কিছুদিন আচার্যের কাছে নানা বিষয়ে পড়াশুনো করল। তারপর একদিন বেদ শেষ করে দেশভ্রমণ করার জন্য রওনা হল।

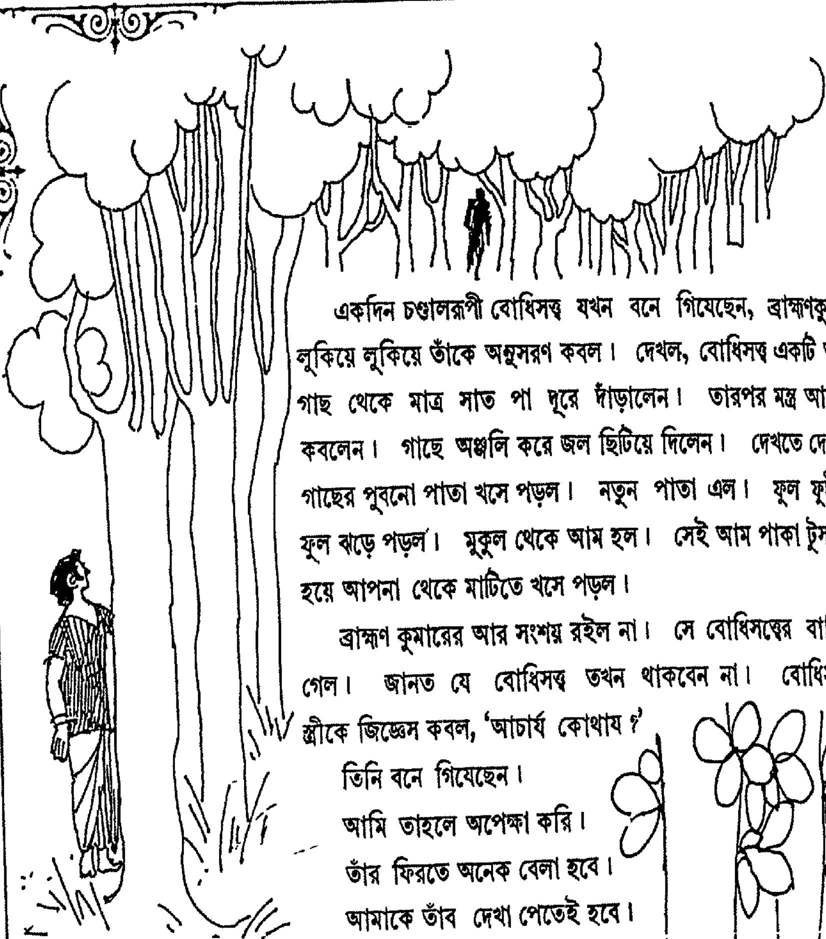
দেশভ্রমণ করতে করতে বালকটি সীমান্তের একটি গ্রামে এসে উপস্থিত হল। ঐ গ্রামের পাশেই ছিল চণ্ডাল গ্রাম। বোধিসত্ত্ব তখন চণ্ডালকুলে জন্ম নিয়েছেন। থাকেন ঐ চণ্ডাল গ্রামটিতে।



বোধিসত্ত্ব চণ্ডালকুলে জন্মেও সুপণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি একটি আশ্চর্য মন্ত্র জানতেন। সেই মন্ত্রবলে অকালে আম গাছে পাকা আম ফলাতে পারতেন। রোজ বনে গিয়ে অকালে পাকা আম ফলাতেন, তারপর সেই আম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

ব্রাহ্মণকুমার বোধিসত্ত্বের কাছে অকালের ফল দেখে অনুমান করল, 'এই লোকটি নিশ্চয়ই মন্ত্র জানে, মন্ত্রবলে ছাড়া অন্য কোন ভাবে রোজ সকালে এত পাকা আম পাওয়া সম্ভব নয়।' ব্রাহ্মণ কুমার মনে মনে ঠিক করল, যে ভাবেই হোক এই চণ্ডালের মন জয় করতে হবে। আর তার কাছ থেকে মন্ত্র শিখে নিতে হবে।





একদিন চণ্ডালরূপী বোধিসত্ত্ব যখন বনে গিয়েছেন, ব্রাহ্মণকুমার লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে অনুসরণ করল। দেখল, বোধিসত্ত্ব একটি আম গাছ থেকে মাত্র সাত পা দূরে দাঁড়ালেন। তারপর মন্ত্র আবৃত্তি করলেন। গাছে অঞ্জলি করে জল ছিটিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে গাছের পুরনো পাতা খসে পড়ল। নতুন পাতা এল। ফুল ফুটল। ফুল ঝড়ে পড়ল। মুকুল থেকে আম হল। সেই আম পাকা টুসটুসে হয়ে আপনা থেকে মাটিতে খসে পড়ল।

ব্রাহ্মণ কুমারের আর সংশয় রইল না। সে বোধিসত্ত্বের বাড়িতে গেল। জানত যে বোধিসত্ত্ব তখন থাকবেন না। বোধিসত্ত্বের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, 'আচার্য কোথায়?'

তিনি বনে গিয়েছেন।

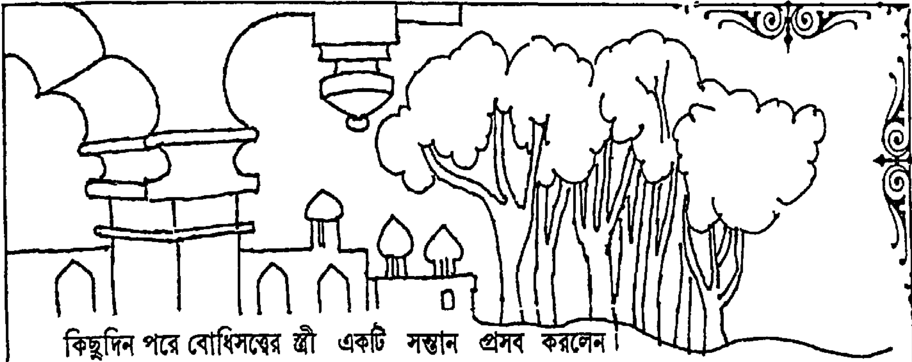
আমি তাহলে অপেক্ষা করি।

তাঁর ফিরতে অনেক বেলা হবে।

আমাকে তাঁর দেখা পেতেই হবে।

ব্রাহ্মণ কুমার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে দেখে বোধিসত্ত্বের স্ত্রীর একটু মায়া হল। বোধিসত্ত্ব ফিরে এসে দেখলেন ব্রাহ্মণ কুমার দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর স্ত্রী তাঁকে একান্তে বললেন, 'বেচারা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।' শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ও মন্ত্র শেখার জন্য এসেছে। তবে লোকটা অসৎ চরিত্রের। মন্ত্র শিখেও রাখতে পারবে না।'

ব্রাহ্মণ কুমার বোধিসত্ত্বের কাছে থেকে গেল। সাংসারিক কাজ-কর্মে সে বোধিসত্ত্বের স্ত্রীকে সাহায্য করতে লাগল। বনে গিয়ে কাঠ কেটে আনত। বোধিসত্ত্ব ফিরলে তাঁর হাত-মুখ ধোয়ার জল এনে দিত। একদিন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বাবা, একখানা আসন নিয়ে এস, পা-টা রাখি।' ব্রাহ্মণ কুমার কোথাও আসন খুঁজে পেল না। তখন সে নিজের উরু মেলে দিয়ে বলল, 'প্রভু, এখানে পা রাখুন।' এই অবস্থায় সে সারা রাত কাটাল।



কিছুদিন পরে বোধিসত্ত্বের স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করলেন। ব্রাহ্মণকুমাব তখন প্রসূতির সেবাযত্নে মনোযোগ দিল। সাধারণত ধাইবা যেসব কাজ কবে থাকে,সে সবই সে নিজেব হাতে করল।

ফলে বোধিসত্ত্বের স্ত্রী বললেন, 'প্রভু, এ লোকটা অনেক কাজ কবেছে। এবাব আপনার উচিত ওকে মন্ত্রটি শিখিযে দেওয়া।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'হ্যাঁ, আমাবও তাই মনে হচ্ছে। এ যদি মন্ত্র ধবে বাখতে না পাবে তাহলে আমাব কি।'

বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুমারকে মন্ত্র শিক্ষা দিলেন।

তাবপব বললেন, 'দেখ, কোনদিন যদি কেউ গুরুব নাম জিজ্ঞেস কবে মিথ্যে কথা বলো না। তাহলে মন্ত্র ভুলে যাবে।'



ব্রাহ্মণকুমাব বোধিসত্ত্বেব কাছে মন্ত্র শিখে অকালের পাকা আম বিক্রি কবতে বাজাব লোকজনদেব কাছে এল। তাবা আমগুলো কিনে নিল। এভাবে চলতে লাগল। 'রাজা একদিন কর্মচাবীদেব জিজ্ঞেস কবলেন, 'এত সুন্দব অকালেব ফল কে নিযে আসছে?'

একটা লোক প্রভু।

তাকে একদিন আমাব কাছে নিযে এস।

যে আজ্ঞা।

ব্রাহ্মণকুমাবকে বাজার কাছে আনা হলে রাজা তাকে বাজ ভৃত্যেব চাকবি দিলেন। তারপব একদিন তাকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'আচ্ছা, এই অকালের ফলগুলো কি তুমি যক্ষদের কাছ থেকে পাও?'

না, প্রভু।

তাহলে মন্ত্রের জোবে পাও কি?

হ্যাঁ।

আমাকে একদিন মন্ত্র গুণ দেখাও।

দেখাব প্রভু।

পরে একদিন রাজাব বাগানে ব্রাহ্মণকুমার সকলের সামনে মন্ত্রের গুণ দেখাল। দেখে সবাই মোহিত হযে গেল। রাজা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে ব্রাহ্মণ কুমাবকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'তুমি এই মন্ত্র কাব কাছে শিখলে?' ব্রাহ্মণ কুমাব ভাবল, বাজাকে চণ্ডালেব কথা বললে উনি অবজ্ঞা কববেন, ববং নামজাদা এক পণ্ডিতের নাম কবা যাক।' এই ভেবে ব্রাহ্মণকুমাব মিথ্যে একটা নাম বলল।

কিছুদিন পবে বাগানে বসে বাজাব ইচ্ছে হল আম খাবার। তিনি ব্রাহ্মণ কুমাবকে ডাকিয়ে বললেন, 'আম খাওয়াতে পাব?' 'নিশ্চয়ই মহাবাজ' বলে সে আমগাছেব সামনে গেল। কিন্তু মন্ত্র উচ্চাবন করতে গিযে দেখে কিছুই মনে পড়ছে না। রাজাকে বোঝাবাব জন্য বলল, 'মহাবাজ, আজ তিথিযোগ নেই।' বাজা লক্ষ্য করেছিলেন, ব্রাহ্মণ কুমাব মন্ত্র বলতে পাবছিল না। ফলে তিনি এই তিথির কথা বিশ্বাস করলেন না, 'ওসব কথা তো আগে বল নি।'

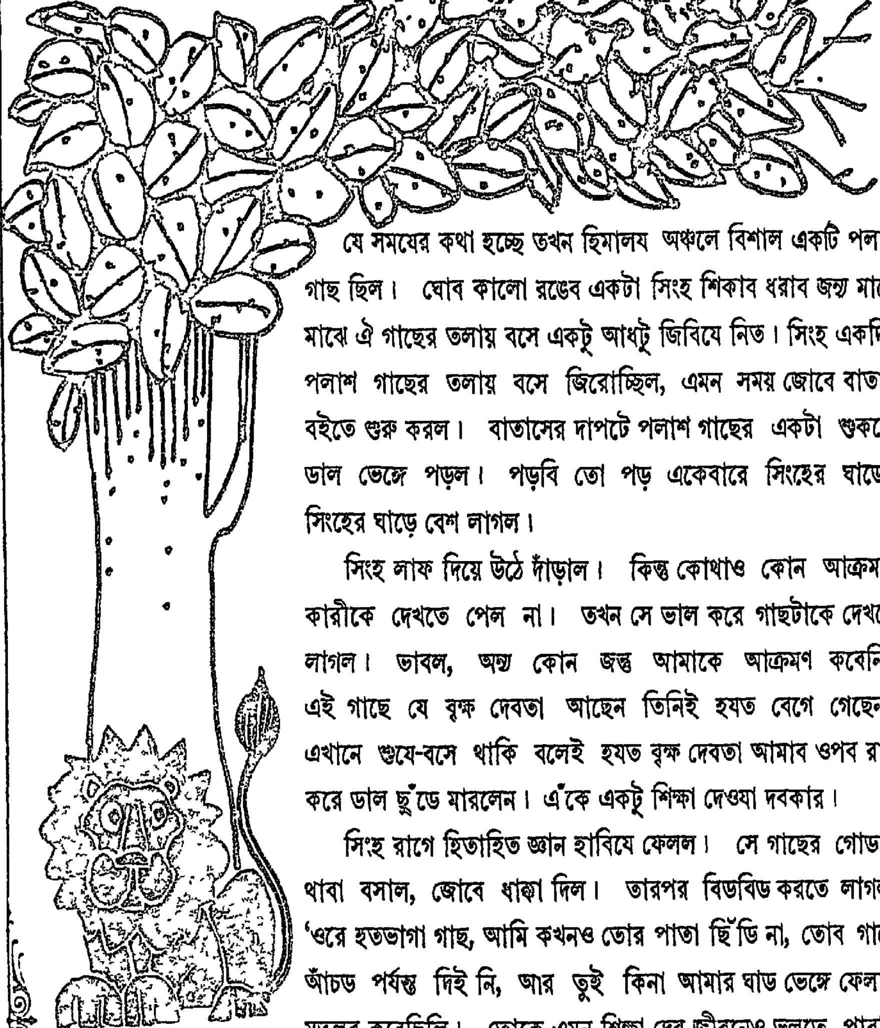
বাজাদেব ক্রোধের কথা ব্রাহ্মণ কুমার জানত। ফলে সে আর মিথ্যে না বলে রাজার পা ধবে বলল, 'প্রভু, আমি ঘোরতব পাপ কবেছি। আমাব গুরু চণ্ডাল। আমি আপনার কাছে মিথ্যে বলেছিলাম। সেই পাপে মন্ত্র আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।'

বাজাব রাগ এতে আব বেড়ে গেল। এমন আশ্চর্য সম্পদ ধবে রাখতে পারে না যে মূর্খ তাকে আব নিজের কাছে রাখলেন না, তাড়িয়ে দিলেন।



স্পন্দন জাতক

অতীতে বারাণসী নগবেব বাইরের দিকে ছুতোরদের একটি গ্রাম ছিল। সেখানে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ব্রাহ্মণও ছুতোরদের সঙ্গে থেকে ছুতোবেব কাজ কবতেন। বন থেকে কাঠ কেটে এনে বথ বানিযে বিক্রি কবাই ছিল ব্রাহ্মণেব কাজ।



যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন হিমালয় অঞ্চলে বিশাল একটি পলাশ গাছ ছিল। ঘোব কালো রঙেব একটা সিংহ শিকাব ধরাব জন্য মাঝে মাঝে ঐ গাছের তলায় বসে একটু আধটু জিবিযে নিত। সিংহ একদিন পলাশ গাছের তলায় বসে জিরোচ্ছিল, এমন সময় জোবে বাতাস বইতে শুরু করল। বাতাসের দাপটে পলাশ গাছের একটা শুকনো ডাল ভেঙ্গে পড়ল। পড়বি তো পড় একেবারে সিংহের ঘাডে। সিংহের ঘাড়ে বেশ লাগল।

সিংহ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু কোথাও কোন আক্রমণ-কারীকে দেখতে পেল না। তখন সে ভাল করে গাছটাকে দেখতে লাগল। ভাবল, অন্য কোন জন্তু আমাকে আক্রমণ কবেনি। এই গাছে যে বৃক্ষ দেবতা আছেন তিনিই হযত বেগে গেছেন। এখানে শুযে-বসে থাকি বলেই হযত বৃক্ষ দেবতা আমাব ওপব রাগ করে ডাল ছুঁডে মারলেন। এঁকে একটু শিক্ষা দেওয়া দবকার।

সিংহ রাগে হিতাহিত জ্ঞান হাবিযে ফেলল। সে গাছের গোডায থাবা বসাল, জোবে ধাক্কা দিল। তারপর বিডবিড করতে লাগল, 'ওরে হতভাগা গাছ, আমি কখনও তোর পাতা ছিঁডি না, তোব গাযে আঁচড পর্যন্ত দিই নি, আর তুই কিনা আমার ঘাড ভেঙ্গে ফেলাব মতলব কবেছিলি। তোকে এমন শিক্ষা দেব জীবনেও ভুলতে পাববি না। তোকে যদি শেকডশুদ্ধ উপডে না ফেলেছি তাহলে তুই আমাব নামে কুকুর পুষিস।'



সিংহ গাছটাকে জব্দ করার ইচ্ছায় আশপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঠিক তখন সেই ছুতোর ব্রাহ্মণ সঙ্গে দু-তিনজন লোক নিয়ে বনে ঢুকল। ব্রাহ্মণ রথে এসেছিলেন। রথটাকে দূরে রেখে কুঠার হাতে নিয়ে তিনি বনের ভেতরে ঢুকলেন। কালো সিংহ ব্রাহ্মণকে দেখে ভাবল, 'আজ গাছটাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া যাবে।' সিংহ গিয়ে পলাশ গাছের তলায় দাঁড়াল। ব্রাহ্মণ পলাশ গাছের দিকে না তাকিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। সিংহ ভাবল, 'এঁকে ডেকে কথা বলি।'

ওহে ব্রাহ্মণ, কি কাঠ কাটতে এ বনে এসেছ?

সিংহের মুখে মানুষের ভাষা শুনে ব্রাহ্মণ তো অবাক। ভাবলেন, 'নিশ্চয়ই এই কালো সিংহটা জানে রথের জন্য কি ধরনের কাঠ সব চেয়ে ভাল হবে।' এই কথা ভেবে ব্রাহ্মণ সিংহকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাই সিংহ, তুমি বনের রাজা, সারাটা বন তোমার নখদর্পণে। বল তো, রথ বানানোর কাঠ কোন্ জায়গায় গেলে পাব?'



শাল, খয়ের এসব কাঠের নাম শুনেছ?

নিশ্চয়ই।

সকলের ধারণা ঐ সব ভাল কাঠে রথ হয়।

হ্যাঁ, তাই তো শুনেছি।

এর চেয়েও ভাল কাঠ আছে।

কিন্তু কোথায় পাব সে কাঠ?

পলাশের কাঠই সেরা।

সেটা কোথায় পাব?

আমি যে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছি সেটাই পলাশ গাছ।

একথা বলে সিংহ চলে গেল। ছুতোররাও গাছ কাটতে আরম্ভ করে দিল। বৃক্ষ দেবতা তখন মনে মনে ভাবছেন, 'এই সিংহটার কোন ক্ষতি আমি করি নি। তবুও আমাকে শেষ করার ষড়যন্ত্র করে গেল। ঠিক আছে, আমি নিজে তো মরবই, কিন্তু একেও ছেড়ে দেব না।'

বৃক্ষ দেবতা তখন কাঠুরে সেজে ছুতোরের কাছে গেলেন।

ও ভাই ছুতোর, বেশ জবর গাছ পেয়েছ দেখছি।

হ্যাঁ ভাই, তা পেয়েছি।

ও গাছের কাঠ দিয়ে কি বানাবে?

রথ।



এ গাছেব কাঠে বথ বানানো যায কে বলল ?

কালো সিংহ।

ঠিক কথাই বলেছে, তবে যদি কালো সিংহের গলাব নবম চামড়া এই বথেব চাকায লাগাও তাহলে চাকাও খুব মজবুত হবে।

ছুতোবরা বলল, 'সে সিংহকে এখন পাই কোথায়?' কাঠুরে-রূপী বৃক্ষ দেবতা বললেন, 'একটু এগোলেই দেখতে পাবে। গাছটা তো আর উড়ে যাবে না। গাছ কাটা বন্ধ রেখে আগে সিংহটাকে জবাই কর।'

নিজেব দুষ্টু বুদ্ধিব জন্য শেষ পর্যন্ত কালো সিংহ ছুতোরদেব হাতে প্রাণ দিতে বাধ্য হল।

জবনহংস জাতক



এক

বারাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তেব আমলে বোধিসত্ত্ব একবার হাঁস হয়ে জন্মান। ন হাজাব হাঁসেব তিনি দলপতি হন। থাকতেন চিত্রকুট পাহাড়ে। একদিন হাঁসের দল এক সরোবরে শ্যাওলা খেয়ে বারাণসী নগরেব ওপর দিযে ফিরে চলেছে চিত্রকুটে। এক সঙ্গে অত হাঁসের মন্দ গতিতে উড়ে যাওযায মনে হচ্ছিল যেন বাবাণসীর মাথার ওপর হীরেব মাদুব বিছিযে দেওযা হযেছে।

বাবাণসীরাজেব নজব এই হাঁসেব দলেব মধ্যে বোধিসত্ত্বকে আবিষ্কার করে ফেলল। তিনি অমাত্যদের বললেন, 'মনে হচ্ছে মাঝখানেব হাঁসটি নিশ্চযই আমার মত একজন বাজা।'

তিনি ভাবলেন হাঁসেব বাজাব সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবেন। সেজন্য বাদকদেব বাজনা বাজাতে বললেন। নিজে ফুলের মালা হাতে নিযে এগিযে এলেন। বাজাব এই অভ্যর্থনা দেখে বোধিসত্ত্ব সঙ্গী হাঁসদেব দিকে তাকালেন।



রাজা কি বলছেন?

রাজা আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান।

তাই নাকি?

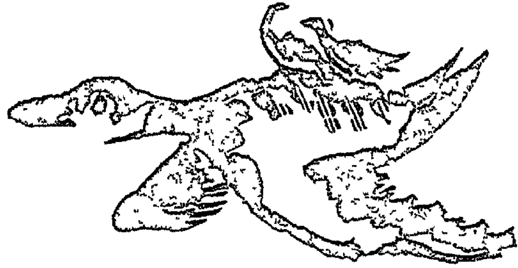
হ্যাঁ প্রভু।

চল, তাহলে নামি।

বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজের বন্ধুত্ব স্বীকার করে সদলবলে উড়ে গেলেন।

দুই

একবার বোধিসত্ত্বের ছোট ভাই দুটি হাঁসের মধ্যে এক অদ্ভুত ইচ্ছা প্রকট হয়ে উঠল। তারা বোধিসত্ত্বকে বলল, 'দাদা, আমরা সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়তে চাই।'



তোমরা এই ইচ্ছেটা ত্যাগ কর।

কেন দাদা?

সূর্যের গতির সঙ্গে পারবে না।

তবু ভাইরা বারবার তাঁর অনুমতি চাইতে লাগল। পরপর তিনবারই তিনি তাদের বারণ করলেন, 'এ সাধ ভয়ঙ্কর, এতে তোমাদের প্রাণ পর্যন্ত হারাতে হতে পারে।'

কচি হাঁসেরা নিজেদের শক্তির দৌড় জানত না। তারা খুব একগুঁয়ে হয়ে ঠিক করল, 'পরের দিন ভোরে সূর্য উঠতে শুরু করলেই আমরাও উড়তে শুরু করব। তারপর দেখা যাক।'

ভোরবেলা বোধিসত্ত্ব ওদের দেখতে পেলেন না। অন্যান্য হাঁসদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন ওরা যুগন্দর পাহাড়ে বসে আছে। সূর্য উঠলেই উড়তে শুরু করবে। বোধিসত্ত্ব মনে মনে ভাবলেন, ওরা তো সূর্যের সঙ্গে পারবে না, মাঝখান থেকে মারা পড়বে। যেভাবে হোক ওদের বাঁচাতে হবে।'

সূর্য ওঠামাত্র হাঁসেরা উড়তে শুরু করল। পেছন পেছন বোধিসত্ত্বও উড়ে চলেছেন। সবচেয়ে ছোটটি সারা সকাল উড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার ডানা অবশ হয়ে এল। সে বোধিসত্ত্বকে জানাল, 'দাদা, আর পারছি না।'



ভয় নেই।

পাবছি না দাদা।

তুমি আমাব পিঠে বস

তাবপব তিনি ছোট ভাইদেব একটিকে যুগন্দব পাহাড়ে নামিযে বেখে এলেন।

আবাব চিত্রকূট থেকে বাতাসেব বেগে উড়ে এসে আবেক ভাইযেব সঙ্গ নিলেন। দুপুব পর্যন্ত সে উড়ে চলল। কিন্তু তাবপব সে-ও কাহিল হয়ে পড়ল। ইশাবা কবে দাদাকে জানাল, আব পাবছে না। সঙ্গে সঙ্গে বোধিসত্ত্ব তাকেও পিঠে কবে এনে চিত্রকূটে পৌঁছে দিলেন।

দুবাব এভাবে উড়ে বোধিসত্ত্বেব মধ্যেও প্রতিযোগিতাব মনোভাব দেখা দিল। ভাবলেন, 'আমাব বেগ বাতাসের মত, আমিই সূর্যেব সঙ্গে পাল্লা দেব।' এই ভেবে তিনি আবার উড়তে শুরু কবলেন। কিছুক্ষণেব মধ্যেই সূর্যেব কাছাকাছি চলে এলেন।

এভাবে তিনি একবার সূর্যেব আগে, একবার সূর্যেব পেছনে উড়তে লাগলেন। উড়তে উড়তে হঠাৎ তাঁব মনে হল, 'শুধুশুধু আমি কেন এই প্রতিযোগিতায় নামলাম। আমার বুদ্ধি নষ্ট হচ্ছে।' এই ভেবে তিনি ওড়াব বেগ কমাতে লাগলেন। আস্তে আস্তে বাবাণসীতে নেমে এলেন।

তিন

বাবাণসীরাজ বোধিসত্ত্বকে আসতে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। বোধিসত্ত্বেব বসাব জন্য সোনাব পিঁড়ি আনলেন। তাঁকে মহা সমাদরে বসতে দিলেন।

রাজা বোধিসত্ত্বেব ডানায পুষ্টিকব তেল মালিশ কবে দিলেন। সোনাব থালায মধু ও ফল দিলেন। তাবপব মধুব স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্ধু, তুমি এখন কোথা থেকে আসছ?'

বোধিসত্ত্ব তখন বাজাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। বাজা সব শুনে বললেন, 'বন্ধু, সূর্যেব সঙ্গে তোমাব প্রতিযোগিতা দেখতে আমাব খুব ইচ্ছে করছে।'

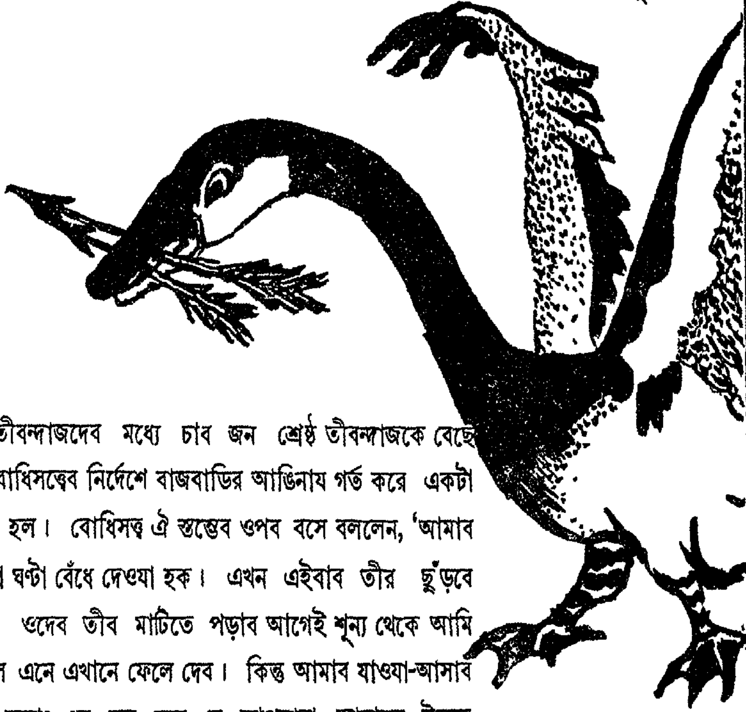
সেই বেগ দেখানো যায় না মহাবাজ।

তাহলে সে বকম কিছু একটা দেখাও।

তা দেখাতে পাবি।

দেখাও বন্ধু।

আপনি তীবন্দাজদের ডাকুন।



বাজা তীবন্দাজদেব মধ্যে চাব জন শ্রেষ্ঠ তীবন্দাজকে বেছে নিলেন। বোধিসত্ত্বেব নির্দেশে বাজবাড়ির আঙিনায় গর্ত করে একটা স্তম্ভ বানানো হল। বোধিসত্ত্ব ঐ স্তম্ভেব ওপব বসে বললেন, 'আমাব গলায় একটা ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হক। এখন এইবাব তীর ছুঁড়বে তীবন্দাজরা। ওদেব তীব মাটিতে পড়াব আগেই শূন্য থেকে আমি সেগুলো তুলে এনে এখানে ফেলে দেব। কিন্তু আমাব যাওয়া-আসাব মধ্যে সময়ের তফাৎ এত কম হবে যে আপনাবা আমাকে উড়তে দেখতে পাববেন না। ঘণ্টাব শব্দ শুনে বুঝতে পারবেন।'

তীবন্দাজ তীব ছুঁড়ল। সবাই অবাক হয়ে দেখল বোধিসত্ত্ব ঐ স্তম্ভের ওপবই আছেন। অথচ তীবগুলো এনে দিলেন। বাজা তখন অবাক হয়ে বললেন, 'বন্ধু, তোমাব বেগেব চেয়ে আরো দ্রুত কোন বেগ আছে কি?'

আছে মহাবাজ।

কি বেগ?

মৃত্যুর বেগই সবচেযে দ্রুত।

এরপব বোধিসত্ত্ব বাজাকে জীবনের অনিত্যতা বিষয়ে অনেক মূল্যবান কথা বললেন। বাজাকে ন্যাযপথে চলার পবামর্শ দিযে চিত্রকুটে ফিবে গেলেন।



কালিঙ্গবোধি জাতক 

অতীতে কলিঙ্গ রাজ্যে দন্তপুর নগরে কলিঙ্গ নামে এক রাজা ছিলেন। কলিঙ্গ রাজার দুটি ছেলে: মহাকালিঙ্গ ও খুল্লকালিঙ্গ। জ্যোতিষীরা গণনা করে বলেছিলেন যে ছোট ভাই খুল্লকালিঙ্গের ছেলে রাজচক্রবর্তী হবেন। আর বড় ভাই মহাকালিঙ্গ কলিঙ্গের মৃত্যুর পর রাজা হবেন। জ্যোতিষীরা আরও বলেছিলেন: খুল্লকালিঙ্গ তপস্বী হবেন।

কলিঙ্গের দেহান্ত হলে মহাকালিঙ্গ রাজা হলেন। খুল্লকালিঙ্গ হলেন যুবরাজ। খুল্লকালিঙ্গ জানতেন তাঁর ছেলে রাজচক্রবর্তী হবে। সেজন্য তিনি বেশ গর্বিত ছিলেন। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের এই গর্ব সহ্য করতে না পেরে অমাত্যকে আদেশ দিলেন, 'খুল্লকালিঙ্গকে গ্রেপ্তার কর।'

অমাত্য খুল্লকালিঙ্গকে ভালবাসত। সে তাঁকে জানিয়ে দিল, 'রাজা আপনাকে বন্দী করার ষড়যন্ত্র করছেন।' খুল্লকালিঙ্গ এ কথা শোনামাত্র দেশত্যাগ করলেন। যাওয়ার আগে অমাত্যকে নিজের শীলমোহর দেখিয়ে বলে রাখলেন, 'এগুলো দেখে রাখ, আমার ছেলে এসে এই চিহ্ন দেখালে তাকে রাজা কোরো।' তারপর তিনি ঘুরতে ঘুরতে বনের কাছে একটি সুন্দর জায়গায় আশ্রম বানালেন। তপস্যা করে দিন কাটাতে লাগলেন।



এদিকে মদ্র রাজ্যের শাকল নগরে মদ্ররাজার একটি মেয়ে হয়েছিল। এই মেয়েটির সম্পর্কেও জ্যোতিষীরা বলেছিলেন, 'এর ছেলে রাজচক্রবর্তী হবে।' জম্বুদ্বীপের রাজারা যখন শুনলেন মদ্র রাজার মেয়ের ছেলে রাজচক্রবর্তী হবে, তখন তাঁরা সবাই ছুটে এলেন মদ্র রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে।

মদ্ররাজা দেখলেন, মহা বিপদ। মেয়ে একটি, অথচ তাকে বিয়ে করতে চাইছে অনেক শক্তিশালী রাজা। এঁদের কারো সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে অন্যরা যুদ্ধ করবে। মেয়েকে বাঁচাতে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই ঠিক হবে। এই ঠিক করে তিনি স্ত্রী-কন্যার হাত ধরে মদ্র

রাজ্য ছেড়ে বনে চলে গেলেন। খুল্লকালিঙ্গের আশ্রমের কাছে তিনিও আশ্রম তৈরি করলেন। তবে খুল্লকালিঙ্গের আশ্রম ছিল পাহাড়ের নিচে, মদ্র রাজার আশ্রম ছিল পাহাড়ের ওপরে।

মদ্ররাজা ও তাঁর স্ত্রী যখন ফলমূল যোগাড়ের জন্য বনের গভীরে ঢুকতেন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন না। কারণ গভীর অরণ্যে অনেক হিংস্র জন্তু আছে। মেয়েকে তাঁরা আশ্রমেই রেখে যেতেন। বাবা-মা চলে গেলে মেয়েটি বনের ফুল তুলে মালা গাঁথত। নদীর তীরে ফুলে ফলে ভরা একটি আম গাছ ছিল। সে ঐ গাছে বসে খেলা করত। মালা গাঁথত। একদিন মদ্ররাজার মেয়ে একটি মালা গেঁথে জলে ফেলে দিল।

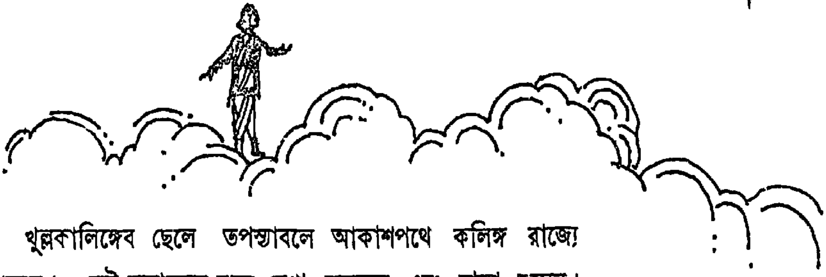


মালাটি ভাসতে ভাসতে নিচের দিকে চলল। তখন খুল্লকালিঙ্গ নদীতে স্নান করছিলেন। মালাটি ভাসতে ভাসতে তাঁর কাছে এল। তিনি মালা দেখে বুঝলেন, 'এ মালা যে গেঁথেছে সে তরুণী।' খুল্লকালিঙ্গের ইচ্ছে হল তরুণীকে দেখার। তিনি নদীর স্রোতের উল্টো মুখে চললেন। পাহাড়ের কাছে এসে মদ্ররাজার মেয়ের সঙ্গে দেখা হল।

দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হল। খুল্লকালিঙ্গ মেয়েটিকে নিজের কাহিনী সব খুলে বললেন। বাবা-মা ফিরলে মদ্ররাজার মেয়ে তাঁদের সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন। মদ্ররাজা তখন ঠিক করলেন এই কুমারের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন।

বিয়ের পর তাঁরা বনেই থাকেন। যথাসময়ে তাঁদের একটি ছেলে হল। ছেলেটি সর্ববিদ্যায় পণ্ডিত হল। তপস্যাবলও অর্জন করল। তখন খুল্লকালিঙ্গ তাকে শীলমোহর দিয়ে বললেন, 'কলিঙ্গ রাজ্যে যাও, আমি শুনে দেখছি দাদা গত হয়েছেন, তুমি সেখানে গিয়ে এই শীলমোহর দেখিয়ে রাজা হও।'





খুল্লকালিঙ্গেব ছেলে তপস্যাবলে আকাশপথে কলিঙ্গ রাজ্যে গেলেন। সেই অমাত্যেব সঙ্গে দেখা কবলেন এবং বাজা হলেন। জ্যোতিষীব গণনা সম্পূর্ণ মিলে গেল। খুল্লকালিঙ্গের ছেলে বাজ-চক্রবর্তী হলেন।

পবে বাজচক্রবর্তী কলিঙ্গকুমাব বনে গিযে বাবা-মা-কেও ফিরিযে আনলেন। ন্যাযধর্ম অনুসাবে বাজ্য শাসন কবে কালক্ষয হলে যথাসমযে দেহ বাখলেন। তাব আগেই তাঁব বাবা-মা গত হযেছেন।

অকীর্তি জাতক



বোধিসত্ত্ব একবার এক ধনবান ব্রাহ্মণকুলে জন্মালেন। তখন তাঁর নাম বাখা হয অকীর্তি। অকীর্তি যখন সবে হাঁটতে শিখেছেন সে সময তাঁব এক বোন জন্মায। বোনেব নাম বাখা হল যশোবতী।

একসময অকীর্তি ষোল বছব বযসে পা দিলেন। তখন তিনি তক্ষশিলায সর্ববিদ্যা শিখে বাড়িতে ফিরে এলেন। এবপব তাঁব বাবা গত হলেন। কিছুদিন পরে মা-ও দেহ রাখলেন। বাবা-মার শেষ কাজ সেবে ফেলাব পর তিনি ধন-সম্পত্তিব খোঁজ নিতে লাগলেন। তাঁব চাবপাশে তখন আত্মীযস্বজনরা বলে চলেছেন—



তোমাব বাবা এত সম্পত্তি কবেন।

পিতামহ এত সম্পত্তি রেখে যান।

প্রপিতামহ রেখে গেছেন এত সম্পত্তি।

তোমার মাতামহও রেখে গেছেন বিপুল সম্পত্তি।

বাববার একই কথা শুনতে শুনতে অকীর্তিকুমারের মনে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দিল : ১. এখানে দেখছি কেবল ধনসম্পত্তিই রযেছে, যাঁরা এসব উপার্জন কবলেন তাঁবা কোথায? ২ যদি তাঁরা এত ধন ফেলে বেখে যেতে বাধ্য হযে থাকেন আমিই কি ঐ ধনবাশি নিজের কাছে



বাখতে পাবব ? ও. নাকি আমাকেও একদিন বাধ্য হয়ে ওসব ছেড়ে চলে যেতে হবে ?

এইসব ভেবে সংসারেব অনিত্যতা সম্পর্কে তাঁব উপলব্ধি জন্মাল। যক্ষেব মত ধন আগলে বসে থাকার কোন কাবণ দেখতে পেলেন না। অকীর্তি তখন তাঁব বোন যশোবতীকে ডেকে বললেন—

বোন, তুমি এই সম্পত্তি বক্ষা কব।

আব আপনি কি কববেন ?

আমি সম্পত্তি ত্যাগ কবব।

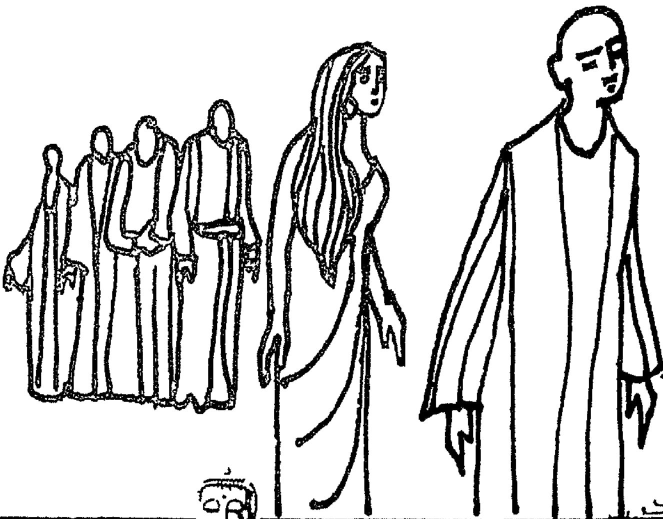
তাবপব ?

তপস্যা কবব।

আপনি যদি তাই কবেন তাহলে আমিও আপনাব সঙ্গেই থাকব।

অকীর্তি তখন বাজাব কাছে দানেব অনুমতি চাইলেন। তাবপর ধনভাণ্ডার খুলে দু হাতে দান করতে লাগলেন। ধন তবু ফুবোয না। তখন অকীর্তিকুমাব ভাবলেন, 'রোজই আমার আয়ু কমে আসছে, অথচ ধন ফুরোচ্ছে না।'

অকীর্তিকুমাব তখন তাঁব বাড়িব সব দবজা খুলে দিলেন। ঘোষণা কবে দিলেন, 'আমি সমস্ত সম্পত্তি দান কবলাম। যাব খুশি নিযে যাক।' আত্মীযরা অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অকীর্তিব মত বদলানো গেল না। বোনেব হাত ধবে তিনি বাবাণসী গমন কবলেন।



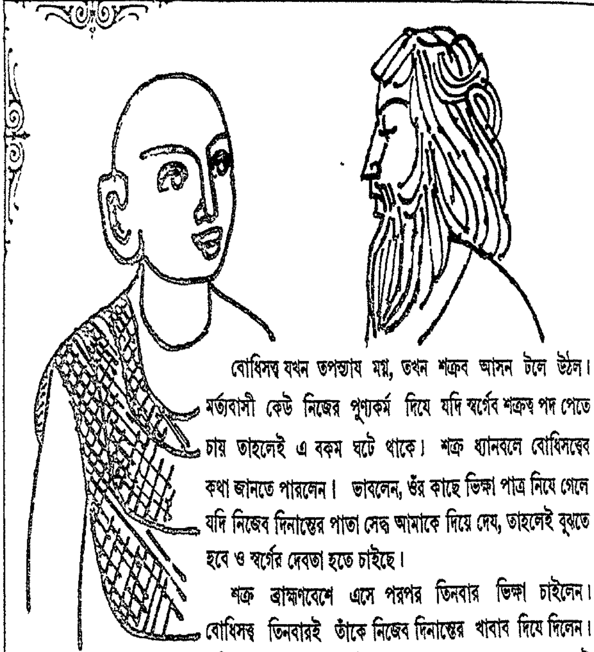
বাবাণসী থেকে কযেক যোজন দূবে অকীর্তি এক আশ্রম গড়লেন। সেখানে বোনেব সঙ্গে থাকতে লাগলেন। তাঁব শিষ্টাচার এবং ধর্ম পালন দেখে লোকজন উৎসাহিত হল। অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব নিযে আশ্রমে থাকতে শুরু কবল। তাবা অকীর্তিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত।



ওদিকে তিনি এতে মনে মনে অতিষ্ঠ হযে উঠলেন, 'আমাব উচিত একা থাকা।' পাছে লোকজন টের পায, সেজন্য মাঝবাতে বোনের হাত ধবে অকীর্তি আবাব যাত্রা শুরু কবলেন।

এখান থেকে গেলেন দ্রাবিড় বাজ্যে। কিন্তু তাতে অবস্থা কিছুই বদলাল না। সেখানেও অনেক শিষ্য ও অনুচর জুটে গেল। আবাব উপহাব আসতে শুরু কবল। এতে বিবক্ত হয়ে বোধিসত্ত্ব এবার বোনকেও না জানিযে দ্রাবিড় রাজ্য ত্যাগ করলেন। কাযাদ্বীপেব কাছে মহি নামে এক দ্বীপ ছিল, এবার গেলেন সেখানে। বিশাল এক গাছেব তলায বসে ধ্যান করতে লাগলেন।

অকীর্তি ঐ গাছের তলা থেকে মুহূর্তের জন্যও নড়েন না। ফলমূল যোগাড়েব চেষ্টা করেন না। দিবারাত্র ধ্যান কবছেন। খাচ্ছেন ঐ গাছের পাতা সিদ্ধ কবে।



বোধিসত্ত্ব যখন তপস্যায মগ্ন, তখন শক্রব আসন টলে উঠল। মর্ত্যবাসী কেউ নিজের পুণ্যকর্ম দিযে যদি স্বর্গেব শক্রত্ব পদ পেতে চায় তাহলেই এ বকম ঘটে থাকে। শক্র ধ্যানবলে বোধিসত্ত্বেব কথা জানতে পারলেন। ভাবলেন, ওঁর কাছে ভিক্ষা পাত্র নিযে গেলে যদি নিজেব দিনান্তের পাতা সেদ্ধ আমাকে দিয়ে দেয, তাহলেই বুঝতে হবে ও স্বর্গের দেবতা হতে চাইছে।

শক্র ব্রাহ্মণবেশে এসে পরপর তিনবার ভিক্ষা চাইলেন। বোধিসত্ত্ব তিনবারই তাঁকে নিজেব দিনান্তের খাবাব দিযে দিলেন। পবিণামে শূন্য থালা পড়ে বইল শুধু। শক্র মুগ্ধ হযে গেলেন এই নবীন তপস্বীর মোহমুক্তি দেখে। তিনি তাঁকে প্রকৃত জ্ঞানেব পথ বলে দিলেন।

রুরু জাতক

এক

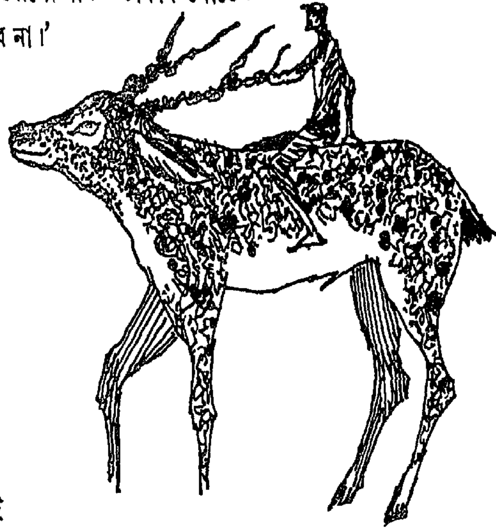


পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে এক ধনবান ব্যবসাযীর একটি ছেলে জন্মায়। বাবসাযী ছেলে পেয়ে খুব খুশি। নিজের অগাধ টাকা আছে, ছেলেব ছেলে, তার ছেলেরও ঐ সম্পত্তিতে ভাল ভাবেই দিন কেটে যাবে ভেবে ব্যবসায়ী ছেলেকে লেখাপড়া শিখতে পাঠাল না। কেননা এতে ছেলেব খুব কষ্ট হবে। সুতরাং ছেলে আমোদ প্রমোদেই দিন কাটাতে লাগল। একদিন ব্যবসাযী মারা গেল।



বাবার মৃত্যুর পর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ছেলেটি সব টাকা উড়িয়ে দিল। তারপর ধার করতে শুরু করল। ধারে তার গলা অবধি ডুবে গেল। নিজেকে এরকম অসম্মানজনক অবস্থায় দেখে সে খুবই মনোকষ্ট পেল। রোজ লোক এসে টাকার জন্য কথা শুনিয়ে যাচ্ছে। শেষে সে ঠিক করল আত্মহত্যা করবে। এই ভেবে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর জলে ভেসে যেতে যেতে সে মৃত্যুভয়ে আর্তনাদ করতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব তখন রুরু মৃগ বংশে জন্ম নিয়েছেন। তাঁর সর্বাঙ্গ সোনার মত। সঙ্গে কয়েক হাজার হরিণ সব সময় ঘুরছে। মানুষের আর্ত চিৎকার শুনে তাঁর মায়া হল। তিনি লোকটাকে বাঁচালেন। সে তো সোনার হরিণের প্রতি কৃতজ্ঞতার বন্যা বইয়ে দিতে লাগল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব তাঁকে বললেন, 'ভাই, এত ভাল ভাল কথা বলার দরকার নেই। আমি তোমাকে বারাণসীতে ছেড়ে আসছি, তবে তুমি সোনার হরিণের ঘটনাটা কাউকে বোলো না। টাকার লোভেও কখনও আমার ঠিকানা কাউকে জানাবে না।'



দুই

বারাণসীরাজের মহিষী আগের রাতে স্বপ্ন দেখেছেন এক সোনার হরিণ তাঁকে ধর্মকথা শোনাচ্ছে। রাণী ভাবলেন, 'পৃথিবীতে যদি সোনার হরিণ না থাকত আমিও স্বপ্নে তা দেখতাম না। নিশ্চয়ই সোনার হরিণ আছে।' তখন তিনি রাজাকে বললেন, 'হয় সোনার হরিণ এনে আমাকে ধর্মকথা শোনান, নইলে আমি এ জীবন রাখব







না।' রাজা বললেন, 'পৃথিবীতে যদি সোনাব হরিণ থাকে তাহলে তোমাব ইচ্ছা নিশ্চযই পূর্ণ হবে।'

বাজাব লোকলস্কব সোনার হবিণেব খোঁজ কেউ জানে না। তারা খোঁজ করতে শুরু কবল। ঘোষণা কবা হল, যে সোনাব হবিণেব খোঁজ দিতে পারবে বাজা তাকে অর্ধেক বাজত্ব দেবেন।

বাজাব লোকেবা যখন ঢাক পিটিযে এ কথা ঘোষণা করছে সেই লোকটাও তখন বাবাণসীতে ঢুকছিল। সে ভাবল, 'এবার আমার কপাল ফিবল, আব আমাকে গবীব হযে থাকতে হবে না।' সে বাজার লোককে বলল, 'আমাকে রাজাব কাছে নিয়ে চল, আমি জানি সোনাব হবিণ কোথায় থাকে।'

এবপব বাজা সৈন্যসামন্ত নিযে সোনাব হবিণেব বন ঘিবে ফেললেন। লোভী লোকটাকেও সঙ্গে এলেন। সে জাযগাটা দেখিয়ে দিল। সৈন্যবা তা ঘিবে ফেলল।

সোনাব হবিণরূপী বোধিসত্ত্ব পড়লেন মহা বিপদে। বাজার কাছে যাওয়াটাই ভাল। নইলে সৈন্যদেব হাতে প্রাণ দিতে হবে। ঝডেব বেগে তিনি বাজাব সামনে এলেন, 'মহাবাজ, আপনি আমার খোঁজ কি ভাবে পেলেন?' বাজা তখন লোকটাকে দেখিয়ে দিলেন। তাকে দেখে বোধিসত্ত্বের সব কথা মনে পডে গেল। তিনি তখন মানুষের ভাষাতেই মানুষেব অনেক নিন্দা করলেন। বাজাও জানতে পারলেন সোনার হবিণ লোকটাকে মৃত্যুব হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সেই লোকই তাকে ধরিয়ে দিচ্ছে দেখে বাজা খুবই বিবক্ত হলেন, বললেন, 'ওকে এখানে শেষ করব।'





বোধিসত্ত্বই লোকটাকে বাঁচিয়ে দিলেন। বললেন, 'ও যে মিত্রদ্রোহ, সে তো দেখাই যাচ্ছে। মেবে আর কি হবে।'

তাবপব বাজাকে ও বাণীকে অনেক ধর্মকথা শোনালেন, সর্ব জীবে দযা কবতে বললেন।

শরভমৃগ জাতক

অতীতে বারাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তেব আমলে বোধিসত্ত্ব হরিণকুলে জন্ম নেন। হরিণদের মধ্যে শবভকুলে তাঁব জন্ম হয।

রাজা শিকার করতে খুব ভালবাসতেন। সকলেই জানে রাজারা

হরিণের মাংস খুব ভালবাসে। ব্রহ্মদত্তের তো কথাই নেই। তাছাড়া ব্রহ্মদত্তের শরীরে ছিল অসুরের মত শক্তি। তিনি মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করতেন না।

একবার বনে শিকার করতে গিয়ে তিনি অনুচরদের বললেন, 'যার পাশ দিয়ে হরিণ পালিয়ে যাবে তাকে উচিত শিক্ষা পেতে হবে।' অনুচররা ভয় পেয়ে গেল। তখন তারা ঠিক করল যেভাবে হোক নিজেদের বাঁচতে হবে। ওই ভেবে রাজাকে বনের এক জায়গায় রেখে হরিণের আস্তানার চারপাশ নিজেরা ঘিরে দাঁড়াল। তারপর তুমুল শব্দ শুরু করে দিল।



ঐ আস্তানায় তখন শরভ মৃগরূপী বোধিসত্ত্ব ছিলেন। তিনি দেখলেন সামনে দিয়ে পালানোর রাস্তা বন্ধ। রাজার লোকেরা সেখানে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে তীর-ধনুক। অথচ সামনের দিকটা একেবারে ফাঁকা। সেখানে পাহারা দিচ্ছে মাত্র একজন, আর তিনি হলেন রাজা। শরভ তখন প্রচণ্ড গতিতে রাজার দিকে ছুটলেন। হঠাৎ চোখে একমুঠো বালি ছুঁড়ে দিলে যা হয় রাজার হল সেই অবস্থা। শরভ অনায়াসে রাজাকে ডিঙিয়ে চলে গেলেন। তারপর মটকা মেরে পড়ে রইলেন। রাজা ভাবলেন, আমি যে তীর ছুঁড়েছি তাতেই শরভ মারা পড়েছে। তিনি চিৎকার করে সঙ্গীদের ডাকলেন, 'শরভকে মেরে ফেলেছি, দেখে যাও।'



সঙ্গীরা তখন বেষ্টনী ভেঙ্গে এগিয়ে আসতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে শরভ উঠে তাদের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গেলেন। রাজার অনুচররা তখন রাজাকে নানারকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল। রাজা সেসব সহ্য করতে না পেরে খড়্গ হাতে শরভকে ধরতে বনের মধ্যে ছুটলেন।

শরভ গভীর বনে ঢুকলেন, রাজাও তার পিছু পিছু ছুটে চললেন। কিছুদূর যাওয়ার পর শরভ সামনে পচা জলের গন্ধ পেলেন। ওখানে কোন ব্যাধ মাটিতে গর্ত করে ফাঁদ পেতে রেখেছিল। গর্তটি লতাপাতা দিয়ে বুঁজিয়ে রেখেছিল। ফলে বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল কোথাও কোন গর্ত নেই। শরভ বিপদ বুঝে একদিকে সরে গেলেন। কিন্তু রাজা না বুঝে সেই গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন। পচা জলে হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

এতে শবভেব মাযা হল। বাজা তাকে হত্যা কবতে এসেছিলেন জেনেও তিনি এভাবে জীবেব মৃত্যু সহ্য করতে পারলেন না। গর্তেব সামনে এসে বললেন, 'ভয নেই বাজা, আমি আপনাব প্রাণ বক্ষা কবব।' বাজাকে গর্তেব ওপব থেকে তুলে নিজের পিঠে বসালেন। তাবপব বাজাকে সৈন্য সামন্তেব কাছে নিযে যাবাব জন্য তাঁকে নিযে ছুটলেন। সৈন্যদেব থেকে কিছু দূবে তিনি বাজাকে পিঠ থেকে নামালেন। তাবপব বাজাকে পঞ্চশীলে দীক্ষা দিলেন।

বাজা এখন শবভকে ছাড়তে চান না। তিনি শবভকে বাবাণসীতে নিযে আসাব জন্য পীড়াপীড়ি কবতে লাগলেন। কিন্তু শবভ তাতে বাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'মহাবাজ, শীল পালন করলেই আমি আনন্দিত হব। আপনি আপনাব প্রজাদেব মধ্যে শীলব্রত প্রচাব করুন।' এই বলে শবভ বনেব মধ্যে চলে গেলেন।

সেবাব মৃগযা থেকে ফিবে এসে রাজা বাজ্যময শীল ব্রত প্রচার করলেন। কিন্তু শবভরূপী বোধিসত্ত্ব বাজাব যে উপকাব কবেছে সে কথা তিনি কাউকে জানালেন না।



একদিন ভোবে বাজা ঘুম থেকে উঠে উদাস গান গাইছিলেন। পুবোহিত তখন বাজাব দবজাব কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বাজাব গান শুনে বুঝতে পাবলেন শবভ মৃগ বাজাব কি উপকার করেছে। উদাস গান শেষ হতে পুবোহিত দবজায টোকা দিলেন। বাজা ভেতর থেকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'কে?'

পুবোহিত তাবপব বাজাব শোওয়াব ঘবে ঢুকে বাজাকে হুবহু বলে গেলেন মৃগয়ায গিযে বাজাব কি হয়েছিল। শবভ মৃগ কিভাবে তাঁকে বক্ষা কবেছে। এ কথা শুনে বাজা স্তম্ভিত।

'আপনি কি কবে জানলেন?'

'আপনাব গান শুনে।'

বাজা পুবোহিতেব বুদ্ধি দেখে তাঁকে অনেক টাকাপয়সা দান কবলেন। এবপব থেকে বাজা নিয়মিত দান ব্রত পালনও শুরু কবলেন। বাজাব লোকেবাও ক্রমাগত আবও বেশি কবে গুণগান কবতে লাগল।



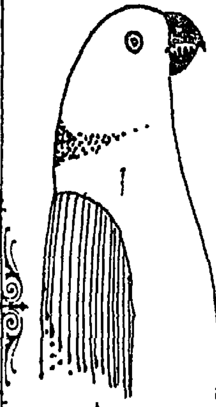
ওদিকে দেববাজ শক্র স্বর্গে বোজই নতুন নতুন দেব ও দেবকন্যা দেখে চিন্তিত হয়ে পডলেন। তিনি বুঝলেন, শবভ মৃগ বাজাকে নবক থেকে উদ্ধাব কবে তাঁকে শীলে প্রতিষ্ঠা কবেছেন। বাজাব পৃষ্ঠ-পোষকতা পেয়ে প্রজাবাও ধর্মপথে চলেছে, ফলে মৃত্যুব পব তাবা স্বর্গেব বাসিন্দা হচ্ছে। দেববাজ শক্র তখন ঠিক কবলেন, বাজাব চবিত্র পবীক্ষা কবতে হবে।



বাজা তখন লক্ষ্য ভেদ কবতে গেছেন। শক্র নিজেব মাযা প্রভাবে লক্ষ্য আব রাজাব ধনুকেব মাঝখানে শবভ মৃগেব মূর্তি তৈবি কবলেন। শবভকে দেখে বাজা আব তীব ছুঁডলেন না। শক্র তখন বাজপুবোহিতেব শবীবে ঢুকে তাঁকে দিযে বলালেন, 'বাজা, তুমি তীব ধনুকে লাগিযে ছুঁডতে ইতস্তত কবছ কেন,এ তো ক্ষত্রিযেব কাজ নয। তীব ছুঁডে তুমি শবভকে হত্যা কব।' বাজা বললেন, 'প্রাণ থাকতে আমি শবভকে বধ কবতে পাবব না। তাব জন্য যদি নবকযন্ত্রণা সহ্য কবতে হয আমি বাজি আছি।'

এবপব শক্র পুবোহিতেব শবীব থেকে বেবিযে এলেন। স্বমূর্তিতে বাজাব সামনে আত্মপ্রকাশ কবলেন। বাজাকে ধর্ম উপদেশ দিযে তিনি স্বর্গে ফিবে গেলেন।

শালিকেদার জাতক



পুবাকালে বোধিসত্ত্ব একবাব শুক পাখি হযে জন্মান। তাঁব বাবা ছিলেন শুকরাজ। বোধিসত্ত্ব বড হলে শুকবাজ বললেন, 'বাবা, আমি বুডো হযেছি। এখন থেকে তুমিই শুকদেব বাজা। সকলেব বক্ষণা-বেক্ষণ আজ থেকে তোমাব কাজ।'

পবেব দিন থেকে বোধিসত্ত্ব তাঁর বাবা-মাকে আব খাবাবেব খোঁজে যেতে দিতেন না। নিজে শুকদেব সঙ্গে উডে গিযে হিমালযে চলে যেতেন। সেখানে গিযে পেট ভবে শালি খেতেন। তারপর ফিবে আসাব সময বোধিসত্ত্ব তাঁব বাবা-মাব জন্য কিছু শালি মুখে কবে নিযে আসতেন।

এভাবে দিন যেতে লাগল। একদিন শুকেরা বোধিসত্ত্বকে বলল, 'প্রভু, আগে মগধ রাজ্যে কত শালি জন্মাত। এখন যদি সেসব শালি পাওয়া যায় তাহলে আমাদের আর রোজ হিমালয় পাড়ি দিতে হয় না।' শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বেশ তো, তোমরা খুঁজে দেখ, মাঠে আগের মত শালি জন্মাচ্ছে কিনা। জন্মালে আমরা সেখানে গিয়েই শালি খাব।'

শুক পাখির দল সারা মগধ রাজ্য ঘুরে দেখতে লাগল। খোঁজ করতে করতে তারা শালিন্দিক গ্রামে হাজির হল।

শালিন্দিক গ্রামটি ছিল ব্রাহ্মণের গ্রাম। অতীতে সেখানে শালিন্দিকবাসী কৌশিকগোত্রজ নামে এক ব্রাহ্মণ প্রায় আট একর পরিমাণ জমিতে ধান বুনেছিলেন। যখন অনেক ফসল হল তখন তিনি বিভিন্ন লোককে নিযুক্ত করলেন ক্ষেতে পাহারা দেওয়ার জন্য। এর মধ্যে একজন সেখানে কুটির বানিয়ে থাকত। শুকপাখিরা যেখানে থাকত এই ক্ষেতটি তার কাছেই। এত কাছেই শালি ধানের ক্ষেত রয়েছে, অথচ তারা এতদিন তারা খোঁজ পায় নি জেনে শুকেরা খুব অবাক হল। যাই হোক, তারা ঐ লোকটির ক্ষেতে নেমে পেট ভরে শালি খেল। তারপর দু-চার গাছা শীষ মুখে করে নিয়ে গেল বোধিসত্ত্বকে দেখাবে বলে।

এরপর থেকে শুকেরা রোজ সেখানে এসে শালি খেতে শুরু করল। যাওয়ার সময় বোধিসত্ত্ব মা-বাবার জন্য কয়েকটি শালির শীষ ঠোঁটে নিয়ে চলে যেতেন। পাহারাদার লোকটি যখন অনেক চেষ্টা করেও শুকদের তাড়াতে পারল না, তখন সে ভয় পেয়ে গেল। শস্যহানির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্রাহ্মণ যদি তার কাছে টাকা চেয়ে বসেন তাহলে সে কি করবে ভেবে কুলকিনারা পেল না। চিন্তিত মনে সে একদিন জমির মালিক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা করল।



প্রভু, শুকপাখি ক্ষেত ধ্বংস করছে।

সামলাতে পারছ না ?

না প্রভু।

লোকটি ব্রাহ্মণকে বলল, 'প্রভু, এদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে শক্তিশালী শুকটি চলে যাওয়ার সময় রোজই এক আঁটি ধান ঠোঁটে করে নিয়ে যায়।' ব্রাহ্মণ শুকরূপী বোধিসত্ত্বের কাণ্ড শুনে একটু অবাকই হলেন। তিনি লোকটাকে বললেন, 'এক কাজ কর। ঘোড়ার লোম দিয়ে ফাঁদ পেতে রাখ। যেভাবে হোক বড় শুকটিকে ধরে আন।'



পরের দিন যখন শুকেরা ক্ষেতে এসেছে তার আগেই পাহারাদার ফাঁদ পেতে রেখেছে। বোধিসত্ত্ব সেখানেই এসে প্রথমে বসলেন যেখানে ফাঁদটি পাতা হয়েছিল। ফলে বোধিসত্ত্ব ক্ষেতে এসে বসা মাত্র ফাঁদে আটকা পড়লেন। কিন্তু ভাবলেন, 'এখন যদি চিৎকার করি, তাহলে অন্য সব শুকেরা ভয়ে আর খেতে পারবে না। ওদের খাওয়া শেষ হোক, তারপর চিৎকার করব।' যখন সকলের খাওয়া শেষ হল তখন বোধিসত্ত্ব চিৎকার করে জানালেন, 'আমি ফাঁদে পড়েছি।' কিন্তু সেই চিৎকার শুনে অন্য সব শুক স্বার্থপরের মত উড়ে চলে গেল।

পাহারাদার বোধিসত্ত্বের চিৎকার এবং শুকদের উড়ে যাওয়া দেখে বুঝল, বড় শুকটাই ফাঁদে পড়েছে, ব্রাহ্মণ খুশি হবেন। সে তখন ফাঁদের কাছে গিয়ে বোধিসত্ত্বকে ফাঁদ থেকে বের করে তাঁর পা-দুটি বেঁধে নিল, তারপর তাঁকে নিয়ে ব্রাহ্মণের কাছে দিয়ে দিল।

ব্রাহ্মণ সস্নেহে শুককে কোলে বসিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন :

'খিদে সকলেরই আছে, কিন্তু তোমার কি সকলের থেকে বেশি ?'

'না মহাশয়।'

'তাহলে রোজ ফিরে যাওয়ার সময় আমার শালি নিয়ে যাও কেন ?'

'ধার শোধ করি, ধার দিই, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করি।'

'তোমার ধার শোধের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দাও।'

'বাচ্চা শুক আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের খেতে দিই। মা-বাবাকে খেতে দেওয়াটা ধার শোধ করা।'



বোধিসত্ত্বের সঙ্গে কথা বলে ব্রাহ্মণ বুঝলেন, এ পাখি সামান্য নয়। তিনি তাকে ঐ শালি ক্ষেতের অধিকার দিলেন। আর অনুরোধ করলেন, 'আপনি মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে একটু ধর্মকথা আলোচনা করে যাবেন। যান, আপনি মুক্ত।' বোধিসত্ত্ব ফিরে এলে তাঁর বাবা-মার মুখে হাসি ফুটল। তাঁরা জানতে চাইলেন, 'কি ভাবে তুমি মুক্ত হলে বাছা।' বোধিসত্ত্ব তখন তাঁদের সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন।

মহোৎক্রোশ জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে একদল লোক যাযাবরের মত বসবাস করত। তারা যখন যেখানে অনেক মাংস পাওয়া যেত, তখন সেখানে গিয়ে ডেরা বাঁধত। একবার তারা এক জায়গায় এসে ডেরা বাঁধল। যেখানে তারা গ্রামের পত্তন করল তার কাছেই একটি হ্রদ ছিল। তারা আশপাশের বন থেকে পশুপাখি শিকার করে আনত।

ঐ হ্রদের ডানদিকে থাকত এক বাজ পাখি। উত্তর দিকে থাকত এক বাজ পক্ষিনী। পূবদিকে থাকত এক শিকারী পাখি। মাঝখানের





দ্বীপে থাকত এক কচ্ছপ। আর ছিল পশুরাজ সিংহ।

বাজপাখি একদিন বাজ পক্ষিনীকে গিয়ে বলল, 'তুমি আমার স্ত্রী হও।' পক্ষিনী তখন বাজকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কোন বন্ধু আছে কি?'

'না।'

'বন্ধু থাকা খুব দরকার।'

'কোথায় পাব?'

'কেন, এখানেই তো শিকারী পাখি, কচ্ছপ, সিংহ আছে।'

'ঠিক আছে, ওদের সঙ্গে মিতালি পাতাব।'

বাজ পাখি যখন শুনল যে বিপদে বন্ধুই একমাত্র ভরসা এবং সংসার পাতার আগে এ রকম বন্ধু খুবই দরকার, তখন সে বনের ঐ সব প্রাণীর সঙ্গে ভাব করে ফেলল। তারপর তারা বিয়ে করে হ্রদের তীরে সেই গাছে বাস করতে লাগল। তাদের গুটিকয় শাবক জন্মাল।

শাবকদের তখনও ডানা গজায় নি, এমন সময় একদিন সেই শিকারী লোকগুলো ঐ বনে ঢুকল। সারা বন ঘুরেও তারা কিছু শিকার পারল না। রাতের দিকে ক্লান্ত হয়ে বাজপাখি দম্পতি যে গাছে বাস করে সেই গাছের গুঁড়িতে তারা হেলান দিয়ে বসে পড়ল। সেখানে মশারা তাদের ওপর এমন হামলা চালাল যে ওরা অস্থির হয়ে উঠল। তারা আগুন জ্বালাল মশা তাড়াতে। এতে মশা কমল। ওদিকে ধোঁয়া ওপরে পাক দিয়ে উঠতে লাগল। ধোঁয়ায় বাজের ছানাদের খুব কষ্ট হল। তারা চিৎকার করতে লাগল।

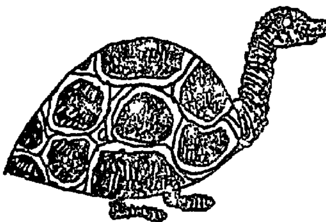
'আরে, আরে, এ গাছে পাখি আছে।'

'চল, আগুন জ্বেলে পাখি ধরি।'

'পাখির মাংস খাই।'

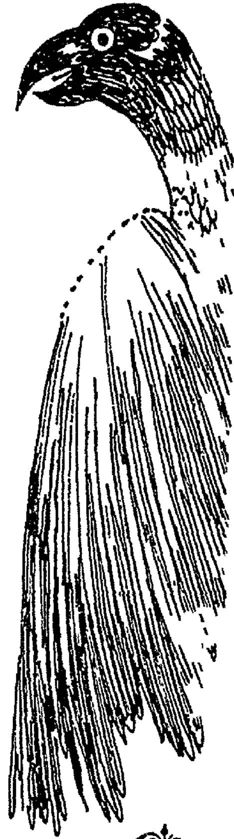
'পেটে খিদেয় আগুন জ্বলছে।'





সত্যি সত্যি তারা মশাল জ্বেলে গাছে ওঠার ষড়যন্ত্র করল। তখন বাজ পক্ষিনী তার স্বামীকে বলল, 'ছানাদের বাঁচাতে হলে এক্ষুনি আমাদের বন্ধু শিকারী পাখিকে খবর দাও।' শিকারী পাখি বন্ধুর বিপদে সাহায্য করতে ছুটে এল। সে হ্রদ থেকে যত পারল জল মুখে করে নিল। যেই প্রথম লোকটা মশাল জ্বেলে গাছে উঠল সে জল ছিটিয়ে তার মশাল নিভিয়ে দিল। তখন লোকগুলো বলল, 'দাঁড়া, গাছের ছানা দুটোকে তো খাবই, তোকেও ছাড়ছি না।' কিন্তু তারা যতবার মশাল জ্বালে শিকারী পাখি ততবারই তাদের আগুন নিভিয়ে দেয়।

এভাবে মাঝ রাত পর্যন্ত চলল। আগুনের তাপ লেগে শিকারী পাখির লোম পুড়ে গেল। বেচারা কাহিল হয়ে পড়ল। যদিও বন্ধুকে রক্ষা করার জন্য তার চেষ্টায় কোন শিথিলতা দেখা গেল না। বাজ পক্ষিনী তখন স্বামীকে বলল, 'প্রভু, শিকারী পাখি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তুমি কচ্ছপ রাজকে খবর দাও।'



বাজ তখন শিকারী পাখিকে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, তুমি আমার জন্য বন্ধুত্বের স্বার্থে অনেক করেছ। কিন্তু এখন তোমার যত্ন করা দরকার। মশালের আগুনে তুমি পুড়ে যাচ্ছ। তুমি এবার ক্ষান্ত হও, তাতে যদি আমার ছানারা মরে মরুক।'

শিকারী পাখি তা শুনে বলল, 'তুমি যাই বল না কেন ভাই, তোমার ছানাকে বাঁচাতে গিয়ে যদি আমার প্রাণ যায় সে-ও ভাল, তবু আমি নিজেকে বাঁচানোর জন্য এই মহৎ কাজে অবহেলা করতে পারব না।' বাজ তখন তাকে খুব অনুরোধ করে বলল, 'বেশ ভাই, তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও অন্তত।'

তারপর বাজ গেল কচ্ছপের কাছে। কচ্ছপ সমস্ত ঘটনা শুনে বলল, 'নিশ্চয়ই যাব। বন্ধুকে রক্ষা করার জন্য যা করা দরকার সবই করব।' কচ্ছপ যখন এই কথা বলছে তখন তার ছেলে এসে বলল, 'আমি সব শুনেছি। আপনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। ছেলের কাজ হল পিতৃসত্য রক্ষা করা। আপনি থাকুন, আমি যাচ্ছি।' কচ্ছপ বলল, 'দেখ বাবা, তোমার শরীর আমার মত বড় নয়। তোমাকে দেখে লোকগুলো ভয় পাবে না। এ কাজ তুমি পারবে না। আমাকেই করতে দাও।'



কচ্ছপ তাবপব প্রথমেই হ্রদে গিয়ে পডল। সেখান থেকে জল কাছা নিয়ে এসে মশালেব ওপব ঝাঁপিয়ে পডল। সঙ্গে সঙ্গে মশাল নিভে গেল। কচ্ছপ তাবপব খোলেব ভেতব ঢুকে স্থির হয়ে বসে রইল। লোকগুলো বলল, 'ধব কচ্ছপটাকে, এটাকে মেবেই আগে মাংস খাই।' লতাপাতা ছিঁডে তাবা কচ্ছপকে বাঁধল। কিন্তু সকলে এক জোট হয়েও কচ্ছপকে নডাতে পাবল না। উল্টে কচ্ছপ তাদের দুজনকে নিয়ে জলে ফেলল। জলে-কাদায় হাবুডুবু খেয়ে লোকগুলো

কাহিল হয়ে পডল।

তাবপব তাবা বলাবলি কবতে লাগল, 'দেখ ভাই, শিকাবী পাখিটা বাববাব আমাদেব মশাল নিভিয়ে দিয়েছে। এখন কচ্ছপটা আমাদের এমন জল কাদা খাওযাল যে পেট ফুলে গেছে। এস, এখন চুপচাপ বসে থাকি, আগুন জ্বেলে হাত-পা সেঁকে নিই। ভোর হলে তখন বাজের ছানাগুলোকে ধরা যাবে।'

বাজেব স্ত্রী এ কথা শুনে তাব স্বামীকে বলল, 'এরা আমার ছেলে-দেব শেষ না কবে যাবে না। তুমি পশুবাজ সিংহকে খবব দাও।'

সিংহ বাজকে দেখে জিজ্ঞাসা কবল, 'এমন অসময়ে তুমি!'

'বিপদে পডেছি প্রভু। তুমি আমাদেব বাজা, রক্ষাকর্তা।'

'নিশ্চয়ই রক্ষা কবব, বল কি বিপদ।'

বাজ পাখি তখন যা যা ঘটেছে সবই সিংহকে জানাল। সিংহ তখন বিপুল বিক্রমে সেই লোকগুলোকে লক্ষ্য করে ছুটে চলল। এইবাব তাবা বিপদে পড়ল। প্রাণ বাঁচাতে সঙ্গে সঙ্গে যে যেদিক পারে ছুটে পালাল। কচ্ছপ, বাজ আব শিকারী পাখি সিংহকে প্রণাম করল। সিংহ তাদেব ভালভাবে থাকতে বলে চলে গেল। তখন বাজেব স্ত্রী তাব ছানাদেব বলল, 'আজ তোবা প্রাণে বাঁচলি বাবার বন্ধুদেব সাহায্যে।'



বিস জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার এক ধনবান ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে জন্মান। বোধিসত্ত্বের নাম রাখা হল মহাকাঞ্চন কুমার। কাঞ্চনকুমারের যখন এক বছর বয়স পূর্ণ হল তখন ব্রাহ্মণের আরেকটি ছেলে জন্মায়। তার নাম রাখা হল উপকাঞ্চন কুমার। এভাবে ব্রাহ্মণের সাতটি ছেলে আর একটি মেয়ে জন্মাল। মেয়েটি সব থেকে ছোট। তার নাম রাখা হল কাঞ্চন দেবী।

মহাকাঞ্চন কুমার যথাসময়ে তক্ষশিলায় গেলেন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে। একদিন সেখান থেকে সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে ফিরে এলেন। তখন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ভাবলেন, 'বাবা-মা হিসেবে আমাদের কর্তব্য এখন ছেলের সংসার পেতে দেওয়া।' তাঁরা মহাকাঞ্চন কুমারকে ডেকে বললেন, 'দেখ বাছা, আমরা ঘটক লাগিয়েছি। আমাদের সমান



জাতি ও কুল থেকে সুলক্ষণা কন্যার খোঁজ করে তোমার বিয়ে দিতে চাই।'

মহাকাঞ্চন কুমার বললেন, 'সংসার করার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। পার্থিব জিনিস আমার কাছে কারাগারের মত বাধা, মলভূমির মত ঘেন্নার। আপনাদের তো ছেলের অভাব নেই। অন্য কোন ছেলের বিয়ে দিন।' তারপর মহাকাঞ্চন কুমারের ভাইয়েরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, তুমি কেন রাজি হচ্ছ না?' মহাকাঞ্চন কুমার তখন তাদের ধর্মকথা শোনালেন। শুনে তারাও আকৃষ্ট হল। ঠিক করল তারাও বিয়ে করবে না। কাঞ্চনদেবীও ঠিক করল বিয়ে করবে না।



ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর বয়স হয়েছিল। একদিন তাঁরা দেহ রাখলেন। মহাকাঞ্চন পণ্ডিত বাবা-মার পারলৌকিক কাজ শেষ করলেন। ধনসম্পত্তি দরিদ্রদের মধ্যে দান করে দিলেন। তারপর ভাই-বোনকে সঙ্গে নিয়ে হিমবন্ত প্রদেশে চললেন। সেখানে পদ্ম সরোবরের তীরে অতি সুন্দর একটি আশ্রম স্থাপন করে প্রব্রজ্যা নিলেন। বনের ফলমূল খেয়েই তখন তাঁরা প্রাণ ধারণ করতেন। বনে ফল খোঁজার সময় একেক জন একেক দিকে যেতেন এবং চিৎকার করে ডেকে বলতেন, কি কি পাওয়া গেল। এর ফলে বনের মধ্যে যেন বাজার বসে যেত হৈ চৈ-তে।

আচার্য মহাকাঞ্চন একদিন ভাবলেন, এটা ঠিক হচ্ছে না। ধনসম্পত্তি বিষয় ত্যাগ করে এসে বনের ফল নিয়ে যদি এত উত্তেজনা দেখা দেয় তাহলে সবই পণ্ড হয়েছে। এবার থেকে আমি একা ফলের খোঁজে যাব। ভাইদের ডেকে বললেন, কিন্তু ভাইরা রাজি হল না।

'আচার্য, আমরা আপনার আশ্রয়ে আছি।'

'তাতে কি?'

'আপনার তপস্যায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য...'

'সেজন্য কি করতে চাও?'

'ফলের খোঁজে আমরা যাব, আপনি আর কাঞ্চন দেবী আশ্রমেই থাকবেন।'

এরপর থেকে এই ব্যবস্থা চলতে লাগল। ভাইয়েরা পালা করে ফলমূল সংগ্রহ করে আনে, তারপর প্রত্যেকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। ফল এনেও ডাকাডাকি করা চলত না। একটা পাথরের ওপর



ফলগুলো সমান ভাগে ভাগ করে ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া হতো। তারপ যে যার কুটির থেকে বেরিয়ে এসে নিজের ভাগটা নিয়ে চলে যেত।

এই তপস্বীদের পুণ্য কর্মের জোরে শক্রর আসন টলে উঠল শক্র তখন ভাবলেন, একবার পরীক্ষা করে দেখতে হয় এই ত ...দে মধ্যে সত্যি সত্যি লোভলালসা আছে কিনা। শক্র তখন ত অলৌকিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে মহাকাঞ্চন কুমারের ভাগ পর প তিনদিন নিয়ে চলে গেলেন।

মহাকাঞ্চন কুমার প্রথম দিন নিজের ভাগ না দেখে ভেবেছিলেন, 'হয়ত ভুলে গেছে আমার ভাগটা রাখতে।' দ্বিতীয় দিনে ভাবলেন, 'হয়ত আমি কোন দোষ করেছি, সে জন্য আমাব ভাগ রাখেনি।' তৃতীয় দিনে তাঁব মনে হল, 'যদি আমাব দোষের জন্যই আমার ভাগ না বেখে থাকে তাহলে জানা দরকাব আমি কি দোষ করেছি। তাব পব ক্ষমা চাইতে হবে।' এই ভেবে তিনি ঘণ্টা বাজালেন। তখন ভাইয়েরা এবং কাঞ্চন দেবী সবাই এল। মহাকাঞ্চন কুমার জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ভাই, আজ থেকে তিন দিন আগে কে ফল এনেছিল?' একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি।'

'তুমি কি আমার ভাগ বেখেছিলে?'

'হ্যাঁ আচার্য।'

এভাবে তিনি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে যে যে ফল এনেছিল তাদেব সঙ্গে কথা বললেন। তাবা সবাই এক বাক্যে বলল, 'হ্যাঁ প্রভু, আমবা তো আপনাব ভাগ রেখেছি।'

মহাকাঞ্চন কুমাব তখন বললেন, 'দেখ, তিন দিনই আমি আমাব ভাগ পাই নি। কিন্তু তাব চেয়েও বড় কথা, বিষয়-আশয় ত্যাগ কবে এসেও যদি আমাদেব কারো মধ্যে এবকম লোভ থেকে থাকে তাহলে খুবই ভয়ের ব্যাপার।'

তখন ভাইরা ঠিক করল তাবা প্রতিজ্ঞা করে বলবে, তারা ফল চুরি করেনি। সব ভাই একে একে প্রতিজ্ঞা করতে লাগল। প্রত্যেকেবই প্রতিজ্ঞার বিষয় এক : 'এ কাজ যে করেছে তাব মন বিষয়মুখী হোক, সে রাজকার্য ভোগ করুক। সে ক্ষমতাশালী হোক। অগণিত মানুষের দ্বারা পূজিত হোক।' ভাইদের প্রতিজ্ঞা শেষ হলে মহাকাঞ্চন কুমার ভাবলেন, তাঁরও প্রতিজ্ঞা করা উচিত, নইলে কেউ ভাবতে পারে, নিজের ভাগ পাইনি বলে মিথ্যা বলছি। মহাকাঞ্চন কুমাব প্রতিজ্ঞা কবলেন, 'ফল পেয়ে যদি কেউ পাইনি বলে থাকে তাহলে সে যেন বাকি জীবন বিষয়-সমুদ্রে ডুবে থাকে।'

শক্র অদৃশ্য থেকে এঁদেব কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি আর নিজেকে ধবে রাখতে পাবলেন না। মহাকাঞ্চন কুমারকে এসে জিজ্ঞেস কবলেন, 'সকলে যা পেতে চায় আপনারা তাকে ঘৃণ্য ভাবছেন কেন?' মহাকাঞ্চন কুমার বললেন, 'বিষয় হল প্রকৃত বিষ, এই বিষের হাত থেকে উদ্ধাব পাওয়া কঠিন।'

শক্র তখন খুশি হযে তিনদিনেব অপহৃত ফল মহাকাঞ্চন কুমাবকে ফেবৎ দিযে বললেন, 'ঋষি, চবিত্র পবীক্ষা কবাব জন্য আমি আপনাদেব ফল চুবি কবেছিলাম।' শুনে মহাকাঞ্চন কুমাব বললেন, 'আপনাব সঙ্গে আমাব তো বসিকতাব সম্পর্ক নয। কেন এমন কবলেন?'

শক্র তখন ভয পেযে মহাকাঞ্চন কুমাবকে ক্রোধসংবরণ কবতে বললেন। বোধিসত্ত্বও শক্রকে ক্ষমা কবলেন। ঋষিবা তপস্যায আয়ু ক্ষয কবে একদিন দেবলোকে যাত্রা কবলেন।

চিত্র সম্ভূত জাতক

পুবাকালে উজ্জযিনী নগবে অবন্তী মহাবাজ নামে এক রাজা ছিলেন। তখন উজ্জযিনীব বাইবে চণ্ডালদেব একটি গ্রাম ছিল। বোধিসত্ত্ব একবাব ঐ গ্রামে চণ্ডাল বংশে জন্ম নেন। বোধিসত্ত্বেব নাম হল চিত্র। বোধিসত্ত্বের এক ভাই হল, তাব নাম বাখা হল সম্ভূত।

দু ভাই একদিন উজ্জযিনী নগবে খেলা কবছিলেন। তখন এক পুবোহিত আব এক ব্যবসাযীব মেযে স্নান কবতে যাচ্ছিল। তাবা দু ভাইযেব খেলা দেখে মুগ্ধ হযে যায। সঙ্গীদেব জিজ্ঞেস কবল, 'এবা কাবা?'

'এবা চণ্ডালেব ছেলে।'

'যা দেখতে নেই তাই দেখলাম। চল, চল।'

পুবোহিত আব ব্যবসাযীব মেযেব মেজাজ খাবাপ হযে গেল। স্নান কবতে গিযে রোজ যেমন সঙ্গীদেব বখশিস দেয সেদিন আব তেমন দিল না। ফলে সঙ্গীদেব খুব বাগ হল চণ্ডাল ছেলেদুটোব ওপব। ফেবাব পথে তাবা চিত্র আব সম্ভূতকে ধবে খুব মাবল।

চিত্র আব সম্ভূত তখন প্রতিজ্ঞা কবলেন তাঁবা চণ্ডাল বংশে জন্মেছেন এ কথা লুকিযে ব্রাহ্মণেব কাছে গিযে বেদ শিখবেন। দু ভাই চলে গেলেন তক্ষশিলায। সেখানে গিযে তাঁরা এক আচার্যেব কাছে লেখাপড়া শিখতে শুরু কবলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আচার্য দেখলেন, এঁদেব দুজনেব বেশ মেধা আছে।



একদিন আচার্য শরীর খারাপ বলে এক ব্রাহ্মণ ভোজনে যেতে পারলেন না। তখন তিনি চিত্র আর সম্ভূতকে বললেন, 'তোমরা আমার হয়ে শিষ্যদের নিয়ে নেমন্তন্ন বাড়িতে যাও। নিজেরা আহার শেষ করে, আমার জন্য যা দেবে নিয়ে এস।'

চিত্র-সম্ভূত শিষ্যদের নিয়ে চললেন। গৃহস্থ আসন পেতে সবাইকে খেতে দিল। পায়েসটা ছিল খুব গরম। চিত্র আর সম্ভূত তড়িঘড়ি খেতে গিয়ে মুখ পুড়িয়ে ফেললেন। তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে চণ্ডাল ভাষায় কি সব বলাবলি করলেন। অন্য শিষ্যরা ভাবল, 'এঁরা কি ভাষায় কথা বলছেন?'

পরে খোঁজ করে দেখল এটা চণ্ডাল ভাষা। তখন তাদের বুঝতে বাকি রইল না এরা চণ্ডাল। শিষ্যরা খুব রেগে গেল। তারা দু ভাইকে বেত মারতে শুরু করল। তখন ঐ গ্রামেরই এক ভদ্রলোক কোন মতে দু ভাইকে বাঁচালেন। তারপর তাঁদের বললেন, 'তোমরা বনে গিয়ে তপস্যা কর।'

দু ভাই বনে গিয়ে তপস্যা শুরু করলেন। তপস্যা করতে করতে সেখানেই তাঁরা দেহ রাখলেন। তারপর হরিণ পশু পাখি হয়ে জন্মালেন। সেই সময়েও কিন্তু তাঁরা সহোদর ভাই হিসেবেই জন্মেছেন। এরপর একজন জন্মান রাজপরিবারে, আরেকজন পুরোহিত পরিবারে।

বোধিসত্ত্ব, অর্থাৎ চিত্র জন্মেছিলেন পুরোহিত পরিবারে। তিনি বয়সকালে প্রব্রজ্যা নিলেন। এদিকে সম্ভূত রাজবংশের ছেলে হয়ে রাজা হলেন। সম্ভূতের আগের দু-এক জন্মের কথা মনে ছিল। কিন্তু চিত্রের মনে ছিল সব কটি জন্মের কথা। একদিন চিত্র ভাবলেন, যাই, ভাইকে গিয়ে প্রব্রজ্যা নিতে বলি। তারপর ভাবলেন, না' বয়স না হলে ওর মধ্যে বিষয়-বৈরাগ্য আনা যাবে না।

সম্ভূতের ছেলেরা যখন বড় হয়েছে তখন একদিন চিত্র আকাশ-পথে এসে সম্ভূতকে দেখা দিলেন। সম্ভূত চিত্রকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন। চিত্র তাঁকে বললেন, 'তোমার বিষয়-সুখের চেয়ে তপস্যার সুখ অনেক গভীর।' আস্তে আস্তে সম্ভূত বুঝতে পারলেন ধর্মই একমাত্র আশ্রয়। তিনি ছেলেদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে ঋষি প্রব্রজ্যা নিলেন।



শিবি জাতক



অতীতে শিবি বাজ্যে শিবি নামে এক রাজা বাজত্ব কবতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁব ছেলে হযে জন্মান। তখন তাঁব নাম বাখা হয শিবিকুমাব। বযসকালে তিনি তক্ষশিলায এক আচার্যেব কাছে বেদ এবং শাস্ত্র শেখেন।

শিক্ষা শেষ কবে শিবিকুমাব দেশে ফিবলেন। শিবিবাজা ছেলেকে যুববাজ কবলেন। এব কিছুদিন পবে শিবি বাজা দেহ বাখলেন। শিবিকুমাব বাজা হলেন। বাজা হযে শিবিকুমাব যথাধর্ম বাজ্যশাসন করতেন। প্রচুব দান ধ্যান কবতেন। তিনি ছটি দানশালা তৈবি কবেন। সেখান থেকে বোজ দান কবতেন।

একদিন পূর্ণিমায শিবিকুমাব নিজেব দান কর্ম নিযে ভাবছিলেন। ভাবতে গিযে দেখলেন, 'যত বকম বস্তু হয় সবই আমি দান কবেছি। আমি দান কবিনি এমন কোন বস্তু তো দেখতেই পাচ্ছি না। বাইবেব বস্তু দান কবে আমি আব সুখ পাচ্ছি না। আজ যদি কেউ এসে আমার হৃদয-মাংস চায তাহলে তাকে তাই দান করব। বা কেউ যদি এসে আমাকে বলে তাব বাডিতে গিযে দাসেব কাজ কবতে হবে, তাহলে বাজবেশ ছেডে আমি তাব সঙ্গে চলে যাব দাসত্ব কবতে। কিংবা কেউ যদি আমাব বক্ত চায শবীবেব সব বক্ত তাকে দিযে দেব। যদি চোখ দুটো চায তাহলে তাই দেব।'

এইসব ভেবে শিবিকুমাব ভাল কবে স্নান কবলেন। তাবপর বাজকীয ভোজন শেষ কবে দানশালায গিযে বসলেন।

এদিকে দেববাজ শক্র নিজের শক্তিবলে যখন জানতে পাবলেন শিবিকুমাব আজ ভযঙ্কব দানেব সংকল্প কবেছেন, তখন তিনি শিবিকুমাবকে পবীক্ষাব জন্য অন্ধ ব্রাহ্মণ সেজে বাজা যে বাস্তা দিযে যাবেন সেখানে দাঁডিযে বইলেন। শিবিকুমার যখন সেখান দিযে যাচ্ছিলেন শক্র বললেন, 'মহাবাজেব জয হোক।' শিবিকুমাব কিছুদূব গিযে ফিবে এসে জিজ্ঞেস কবলেন, 'ঠাকুব, আপনি কি বললেন?'

রাজা, আমি অন্ধ।



খুবই দুঃখেব কথা।

আপনাব দুটি চোখ আছে।

তা আছে ঠাকুব।

চোখদুটি আমবা ভাগ করে নিলে দুজনেই দেখতে পাই।

বাজা ভাবলেন এখানে চক্ষু দান কবা ঠিক হবে না। তিনি ব্রাহ্মণকে নিয়ে অন্তঃপুরে গেলেন। এদিকে বাজ্যময় খবব ছড়িয়ে পড়ল শিবিকুমাব নিজেব চোখ এক অন্ধ ব্রাহ্মণকে দান কবেন আজ। মন্ত্রী, সেনাপতি, বাজাব অমাত্য, বাণী সবাই ছুটে এলেন। বাজাকে নিবস্ত কবাব জন্য তাঁবা খুব চেষ্টা কবলেন।

কেন আপনি চোখ দান কবছেন?

কোন কিছু পাবাব আশায় নয়।

তাহলে কিসেব আশায়?

দানের ধর্মে।

বাজাব চিকিৎসক সীবক এলেন। তিনি বাজাকে শান্ত কবাব জন্য পদ্মফুলে ওষুধ লাগিয়ে বাজাব চোখেব সামনে ধবলেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখে স্খলন শুরু হল। বাজা চিৎকাব কবে উঠলেন। সীবক বললেন, 'মহারাজ, আপনি যদি আদেশ করেন তাহলে এখনও আপনাব চোখ বাঁচান যায়।' বাজা বললেন, 'না, তুমি তাড়াতাড়ি চোখ তুলে দাও।'

রাজা একে একে দুটি চোখই ব্রাহ্মণরূপী শক্রকে দিলেন। কিছু দিন পবে বাজার মনে হল, 'অন্ধ হয়ে আর বাজ্যে কি দরকাব। আমি প্রব্রজ্যা নেব।' মন্ত্রী তাঁকে পালকিতে কবে রাজাব বাগানেব পাশে বেখে এলেন। সেখানে এসে রাজা নিজের দানেব কথা ভাবতে লাগলেন। তখন শক্রব আসন নড়ে উঠল।



বাজা ভাবছিলেন 'অন্ধ হয়ে কি লাভ!' শক্র এসে বাজাকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'আপনি অন্ধ হয়েছেন বলেই কি মবতে চাইছেন?' বাজা বললেন, 'হ্যাঁ।'

শক্র তখন বললেন, 'আপনাব দান বলেই আপনার চোখদুটি আগের মত হয়ে যাবে।' আব বাস্তবে তাই হল। শিবিকুমাব চক্ষুষ্মান হয়ে আবাব নিজেব বাজত্বে ফিবে এলেন। যথাধর্ম বাজ্য শাসন কবে, আয়ুক্ষয় কবে দেবকুলে যোগ দিলেন।



শক্তিগুল্ম জাতক

পুবাকালে পাঞ্চাল নগবে পাঞ্চাল নামে এক বাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন এক পাহাড়ী এলাকায শিমূল গাছে শুক পাখি হযে জন্ম নিলেন। তাঁব একটি সহোদব ভাইও ছিল।

পাহাড়ী এলাকাব পাশেই চোবদেব একটা গ্রাম ছিল। সেই গ্রামেব উল্টো দিকে ছিল ঋষিদেব একটি গ্রাম। একবাব প্রবল ঝড দেখা দিল। ঝড়েব দাপটে বোধিসত্ত্ব ও তাঁব ভাই দুজন ছিটকে পড়লেন। ভাই গিযে পডল চোবদেব গ্রামে, আব বোধিসত্ত্ব ছিটকে পড়লেন ঋষিদেব গ্রামে।

পাঞ্চালরাজ একবার মৃগযা কবতে এসে ঐ পাহাড়ী এলাকায পথ হারিযে ফেললেন। তাবপব ক্লান্ত হযে গাছে শুযে পডলেন। সাবথি বথ নিযে অপেক্ষা কবতে লাগল। চোব গ্রামে যে শুক পাখিটি ছিল সে বাজাকে ঐ অবস্থায দেখে একজন চোবকে ডেকে বাজাকে খুন কবাব পবামর্শ দেয। বলে, 'একে মেবে কাপড় চোপড় কেড়ে নাও।' চোব এসে যখন দেখল বাজা শুযে আছেন সে শুককে খুব বকতে লাগল। শুকও তাব সঙ্গে ঝগডা শুরু কবে দিল।

দুজনেব কলহে বাজাব ঘুম ভেঙ্গে গেল। সব শুনে তিনি ভয পেযে গেলেন। বাজা উঠে নগবেব দিকে ফিবতে লাগলেন। বাস্তায পডল ঋষিদেব গ্রাম। তখন একজনও ঋষি নেই।

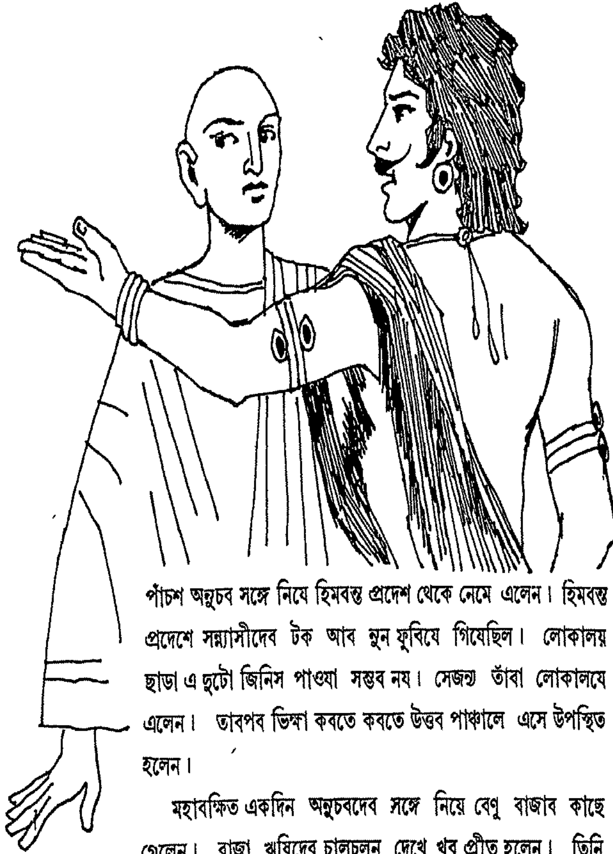
ঋষি গ্রামেব বাজাব শুক বাজাকে ডেকে বলল, 'হে অতিথি, গ্রামে এখন এমন কেউ নেই যে আপনাকে আদব যত্ন কবে বসায। আপনি নিজেই শীতল জল নিযে পান করুন। অমুক জাযগায ফল আছে, আপনি আহাব করুন।'

বাজা এই শুকবে প্রথম শুকেব কথা বললেন, 'তার স্বভাব চোবেব মত।' ঋষি গ্রামেব শুক তখন বললেন, 'আমবা দুজনে ভাই।' তাবপব তিনি ঝড়েব কথা, দুজনেব দু জাযগায বেড়ে ওঠার কথা জানিযে বললেন, 'সঙ্গ দোষেই এটা হযেছে। সেজন্য লোকে বলে, সৎ-সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ-সঙ্গে নবকবাস।'



সৌমনস্য জাতক

পুবাকালে কুরুবাজ্যে উত্তব পাঞ্চাল নগবে বেণু নামে এক বাজা বাজত্ব কবতেন। একদিন মহাবক্ষিত নামে এক সিদ্ধ তপস্বী তাঁব



পাঁচশ অনুচব সঙ্গে নিযে হিমবন্ত প্রদেশ থেকে নেমে এলেন। হিমবন্ত প্রদেশে সন্ন্যাসীদেব টক আব নুন ফুবিযে গিযেছিল। লোকালয় ছাড়া এ দুটো জিনিস পাওযা সম্ভব নয। সেজন্য তাঁবা লোকালযে এলেন। তাবপব ভিক্ষা কবতে কবতে উত্তব পাঞ্চালে এসে উপস্থিত হলেন।

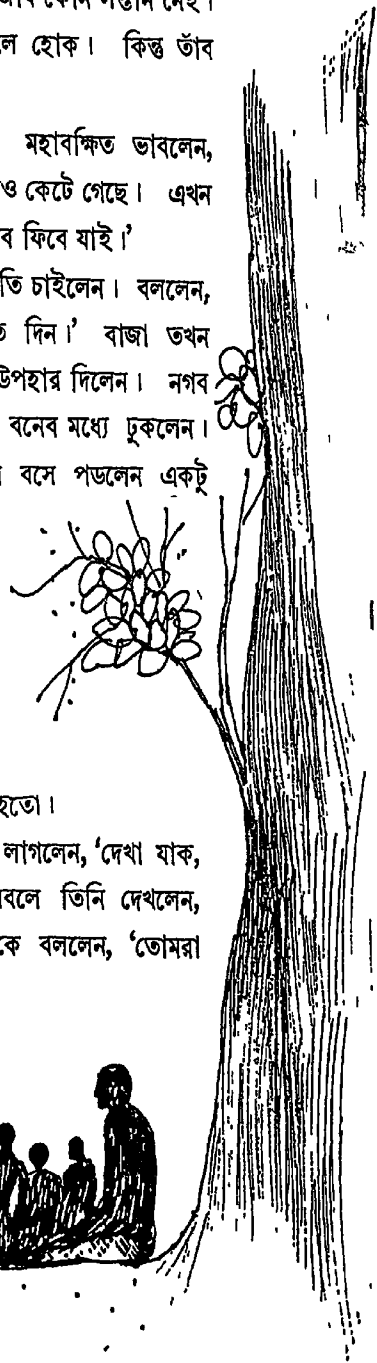
মহাবক্ষিত একদিন অনুচবদেব সঙ্গে নিয়ে বেণু বাজাব কাছে গেলেন। বাজা ঋষিদেব চালচলন দেখে খুব প্রীত হলেন। তিনি তাঁদেব যথেষ্ট সম্মান দেখালেন। যত্নআত্তি কবলেন। তাবপব বললেন, 'প্রভু। আপনাবা আমাব বাগানে থাকুন, আমি কুটির বানিযে দিচ্ছি।'



তপস্বীরা তারপর থেকে রাজার বাগানে থাকতে শুরু করলেন। রাজবাড়িতে যেতেন আহার করতে। বেণু রাজার কোন সন্তান নেই। রাজা মনে মনে চাইতেন তাঁর একটি ছেলে হোক। কিন্তু তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয় নি।

এভাবে গোটা বর্ষাকাল কেটে গেল। মহারক্ষিত ভাবলেন, 'রাজার আশ্রয়ে অনেকদিন থাকা হল। বর্ষাও কেটে গেছে। এখন হিমবন্ত প্রদেশ খুব সুন্দর হয়ে উঠেছে। এবার ফিরে যাই।'

তিনি রাজার কাছে গেলেন। রাজ-অনুমতি চাইলেন। বললেন, 'এবার আশ্রমে ফিরতে চাই, রাজা অনুমতি দিন।' রাজা তখন আবার তাঁদের খুব সম্মান দেখালেন। বহু উপহার দিলেন। নগর থেকে বেরিয়ে মহারক্ষিত দুপুরে রাজপথ ছেড়ে বনের মধ্যে ঢুকলেন। বিশাল এক গাছের তলায় অনুচরদের নিয়ে বসে পড়লেন একটু জিরিয়ে নিতে।



তখন ঋষিরা বলাবলি করতে লাগল :

রাজার বড় দুঃখ।

হ্যাঁ।

রাজার কোন ছেলে নেই।

ছেলে না জন্মালে বংশরক্ষা হবে না।

সত্যি, রাজার একটা ছেলে হলে বড় ভাল হতো।

ঋষিদের কথাবার্তা শুনে মহারক্ষিত ভাবতে লাগলেন, 'দেখা যাক, রাজার কোন ছেলেপিলে হবে কিনা।' ধ্যানবলে তিনি দেখলেন, রাজার একটি ছেলে হবে। তখন ঋষিদের ডেকে বললেন, 'তোমরা





নিশ্চিন্ত থাক, আজ সকালেই এক দেবপুত্র বাজাব প্রধান মহিষীব গর্ভে প্রবেশ কবেছেন।'

ঋষিদেব মধ্যে একজন ছিল ভণ্ড। সে ভাবল, 'আমি আব ফিরে যাব না। ববং বাজাকে গিযে এই খবব দেব। তাবপব বাজাব কুলগুরু হব।' যখন যাওযাব সময হল ভণ্ড তখন বলল, 'আমি পবে যাচ্ছি, আপনাবা আগে যান।'

কেন, কি হল?

আমাব শবীব খাবাপ।

কই, আগে তো বল নি!

এখন হঠাৎ কেমন লাগছে যেন।

মহাবক্ষিত নিজেব শক্তিবলে ভণ্ড তপস্বীব মনোবাসনা বুঝতে পাবলেন। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে কিছু বললেন না। অন্য তপস্বীদেব বললেন, 'তাহলে চল, আমবা বওনা দিই, উনি সুস্থ হলে আসবেন।'

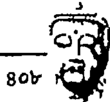
ঋষিবা চলে যেতেই ভণ্ড বাজাব কাছে গেল। বাজাকে এই সুসংবাদ দিযে সে বলল, 'আমি ঋষি বলে এ কথা জানাব পব ভাবলাম আপনাকে বলে যাই। আপনি যাতে বাণীকে সাবধানে বাখতে পারেন। এখন আমি যাই, ঋষিবা অনেক দূব এগিযে গেছেন।'

বাজা ভণ্ডকে যেতে দিলেন না। তাকে বাগানে থাকাব ব্যবস্থা কবে দিলেন। ভণ্ডর সব বকম আবামেব ব্যবস্থা কবলেন। সে-ও বাজাব আশ্রযে সুখে থাকতে লাগল।

যথাসমযে বাজমহিষীর ছেলে হল। এই ছেলে আর কেউ নয়, স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বব যখন সাত বছব বযস, তখন বাজা একদিন বিদ্রোহী প্রজাদেব দমন কবতে সীমান্তে গেলেন। বোধিসত্ত্ব বেড়াতে এসে ভণ্ড তপস্বীব দেখা পেলেন।



ভণ্ড তপস্বী বাজাব আশ্রযে থেকে যাবতীয চাষ কবত। সেই-সব সবজি সে বাজাবেব দোকানদারদেব কাছে বিক্রি কবে টাকা জমাত। বোধিসত্ত্ব দেখলেন ভণ্ড তপস্বী খুবপি হাতে তবকাবিব ক্ষেত সামলাচ্ছে। বোধিসত্ত্বের নাম বাখা হযেছিল সৌমনস্য কুমাব। ভণ্ড যখন দেখল কুমার এসেছেন, সে খুবপি নামিযে এল। সৌমনস্য কুমাব ভণ্ডকে দেখে বলল, 'ওহে গেবস্থ, তুমি কি করছ?'



এ কথা শুনে ভণ্ড খুব রেগে গেল। সে তখন ভাবল, 'ও ছেলে এখনই আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে, বড় হয়ে না জানি কত কি করবে।' ভণ্ড তখন নিজের কুটির লণ্ডভণ্ড করল। তারপর মলিনভাবে বিছানায় শুয়ে রইল।

যুদ্ধ জয় করে ফেরার পথে রাজা ভণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কুটিরের হাল দেখে রাজা অবাক হলেন। তারপর তপস্বীর করুণ মূর্তি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে প্রভু?'

'কুমার অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে এসে আমার কুটির ভেঙ্গে দিয়ে গেছে।'

'আজ কুমারের একদিন কি আমার একদিন।'

রাজা ঘাতককে বললেন, 'কুমারের কাটা মুণ্ডু নিয়ে এসে তপস্বীর পায়ে উপহার দাও।' ঘাতক গিয়ে কুমারকে বলল, 'প্রভু, পালান, রাজা আপনার মাথা কাটতে হুকুম দিয়েছেন।'

এক কাজ করতে পারবে?

কি কুমার?

আমাকে জ্যান্ত অবস্থায় রাজার কাছে নিয়ে চল।

কেন?





কুমারকে নিয়ে আসা হলে রাজাকে কুমার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার অপরাধ কি সেটা আগে বলুন। তারপর আপনি নিজের হাতে আমার মাথা কাটুন।' রাজা বললেন, 'তুমি তপস্বীর অনিষ্ট করেছ।' কুমার বললেন, 'না, আমি কোন অনিষ্ট করিনি। আমি শুধু ওঁকে গৃহী বলেছি। তা যে ক্ষেতে চাষ করে, তরকারি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে, তাকে কি আপনি ব্রাহ্মণ বা তপস্বী বলবেন?'



রাজা তখন খোঁজ করে দেখলেন, সত্যি ভণ্ডর কুটিরে টাকা সঞ্চিত আছে। রাজারের দোকানদাররাও এসে বলে গেল, 'হ্যাঁ প্রভু, উনি আমাদের কাছে তরিতরকারি বিক্রি করেন।' রাজা ভণ্ড তপস্বীকে দূর করে দিলেন। কুমারকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কিন্তু কুমারের মনে ততক্ষণে সংশয় দেখা দিয়েছে। তিনি ভাবছেন 'এই মূর্খ রাজার ছেলে হয়ে বেঁচে থাকাটাই কঠিন।' তিনি অতি অল্প বয়সে ঋষি প্রব্রজ্যা নিলেন।

চাম্পেয় জাতক

অতীতে অঙ্গন ও মগধ রাজ্যে মগধ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। দুই রাজ্যের মাঝখানে ছিল চম্পা নদী। ঐ নদীতে ছিল নাগদের রাজত্ব। বোধিসত্ত্ব তখন খুব গরীব ঘরে জন্মেছিলেন। একদিন তিনি চম্পানদীর তীরে নাগ রাজাকে বিহার করতে দেখেন। নাগরাজের সম্পত্তি দেখে তাঁর একান্ত ইচ্ছা হল ঐ সম্পত্তি লাভের। বোধিসত্ত্ব এই বাসনা নিয়ে তপস্যা শুরু করলেন। একদিন নাগরাজ চম্পায় মারা গেলেন। বোধিসত্ত্ব তার কিছুদিন পরে মারা গেলেন।

আকাঙ্ক্ষা ও তপস্যার জোরে তিনি নাগকুলে জন্ম নিলেন। নাগরাজ হলেন। আরাম এবং বিলাসে তাঁর দিন কাটতে লাগল। কিন্তু তাঁর মনে সুখ নেই। তিনি এখন বিষয়সুখ চান না। পেতে চান মহাজ্ঞান। সেজন্য পোষধব্রত শুরু করলেন। নাগরাজের রাণী ওঁকে অনাহারে থাকতে দিতে চান না। সেজন্য তিনি লোকালয়ে চলে যেতেন পোষধের দিনে।



নাগরাজ ভাবতেন, 'যদি কেউ আমাকে মেরে আমার চামড়া কাজে লাগায় তো লাগাক, বাধা দেব না।' কিন্তু নগরবাসীরা তাঁকে দেবজ্ঞানে পুজো দিতে লাগল। একদিন এক সাপুড়ে তাঁকে ধরতে এল।

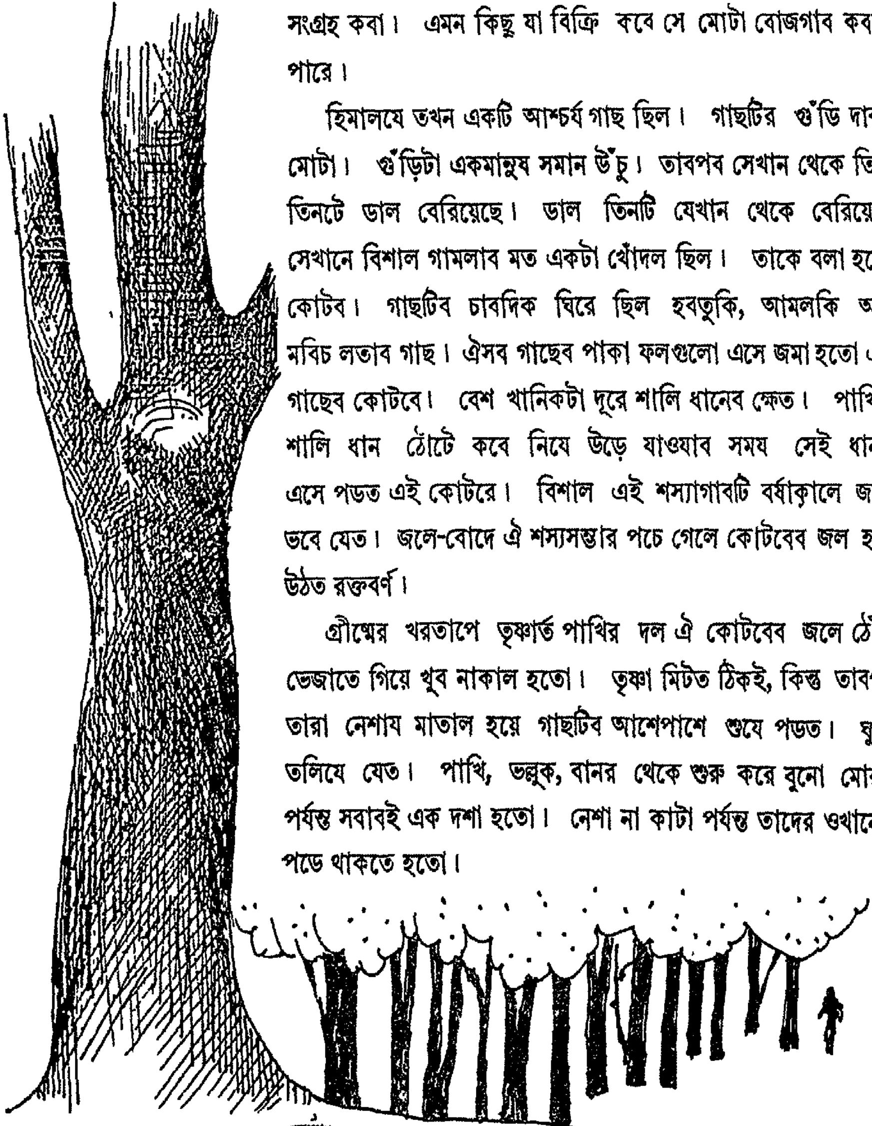
নাগরাজা বুঝলেন তিনি যদি সাপুড়ের দিকে তাকান তাহলেই সাপুড়ে উগ্র বিষে মারা যাবে। সেজন্য তিনি বাধা দিলেন না। সাপুড়ে তাকে বেঁধে নিয়ে চলে গেল। বিষদাঁত উপড়ে ফেলল। খুব নির্যাতন করল। নাগরাজ মুখ বুঁজে সব সহ্য করতে লাগলেন। সাপুড়ের জন্য তিনি খেলা দেখাতেন। সাপুড়ে অনেক টাকা আয় করতে লাগল।

নাগরাজার মহিষী দীর্ঘকাল নাগরাজকে না দেখে তাঁর খোঁজে লোকালয়ে এলেন মানবশরীর ধারণ করেন। আকাশপথে ঘুরতে লাগলেন। তখন বোধিসত্ত্বকে নিয়ে সাপুড়ে বারাণসীরাজের দরবারে খেলা দেখাচ্ছে। হঠাৎ বোধিসত্ত্ব আকাশপথে স্ত্রী সুমনাকে দেখে লজ্জায় সাপুড়ের ঝুড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। রাজাও আকাশের দিকে তাকিয়ে সুমনার আশ্চর্য সুন্দর মূর্তি দেখলেন। রাজা সুমনার পরিচয় জানতে চাইলেন। সুমনা তখন রাজাকে যা যা ঘটেছে সব খুলে বললেন।

রাজার নির্দেশে নাগরাজ মুক্তি লাভ করলেন। বারাণসীরাজকে নাগরাজ নিজের রাজ্যে নিমন্ত্রণ করে আনলেন। সেখানে তাঁকে দীর্ঘদিন আদর যত্নে রেখে অনেক মণি-মাণিক্য দিয়ে আবার তাঁকে বারাণসীতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এই দুই রাজার বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

কুম্ভ জাতক

বারাণসীর রাজা তখন ব্রহ্মদত্ত। তাঁর আমলে কাশ্মীর রাজ্যে সুর নামে এক ব্যক্তি বসবাস করত। সুরের কাজ ছিল বনে বনে ঘুরে বেড়ানো। জীবিকার দায়েই তাকে এত শাস্তি পোয়াতে হতো। একবার সে হিমালয় প্রদেশের বনে ঢুকল। উদ্দেশ্য, দুর্লভ কিছু সংগ্রহ করা। এমন কিছু যা বিক্রি করে সে মোটা রোজগার করতে পারে।



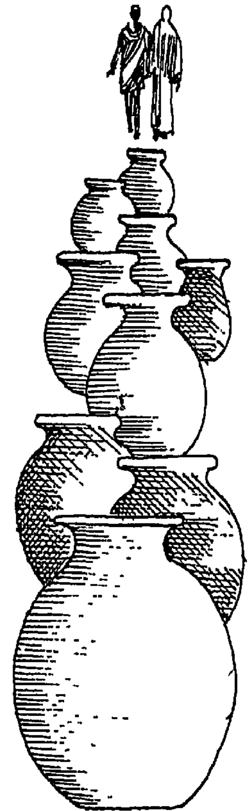
হিমালয়ে তখন একটি আশ্চর্য গাছ ছিল। গাছটির গুঁড়ি দারুণ মোটা। গুঁড়িটা একমানুষ সমান উঁচু। তারপর সেখান থেকে তিন-তিনটে ডাল বেরিয়েছে। ডাল তিনটি যেখান থেকে বেরিয়েছে সেখানে বিশাল গামলার মত একটা খোঁদল ছিল। তাকে বলা হতো কোটর। গাছটির চারদিক ঘিরে ছিল হরতুকি, আমলকি আর মরিচ লতার গাছ। ঐসব গাছের পাকা ফলগুলো এসে জমা হতো এই গাছের কোটরে। বেশ খানিকটা দূরে শালি ধানের ক্ষেত। পাখিরা শালি ধান ঠোঁটে করে নিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় সেই ধানও এসে পড়ত এই কোটরে। বিশাল এই শস্যাগারটি বর্ষাকালে জলে ভরে যেত। জলে-রোদে ঐ শস্যসম্ভার পচে গেলে কোটরের জল হয়ে উঠত রক্তবর্ণ।

গ্রীষ্মের খরতাপে তৃষ্ণার্ত পাখির দল ঐ কোটরের জলে ঠোঁট ভেজাতে গিয়ে খুব নাকাল হতো। তৃষ্ণা মিটত ঠিকই, কিন্তু তারপর তারা নেশায় মাতাল হয়ে গাছটির আশেপাশে শুয়ে পড়ত। ঘুমে তলিয়ে যেত। পাখি, ভল্লুক, বানর থেকে শুরু করে বুনো মোরগ পর্যন্ত সবারই এক দশা হতো। নেশা না কাটা পর্যন্ত তাদের ওখানেই পড়ে থাকতে হতো।

ঘুরতে ঘুরতে স্থর এসে ঐ গাছটিব তলায় থেমেছিল। ইচ্ছে ছিল একটু জিবিযে নেওযা। কিন্তু চোখের সামনে এসব দৃশ্য দেখাব পর ঐ কোটবটির জল সম্পর্কে তাব অদম্য কৌতূহল জাগল। জলটা বিষাক্ত হলে এসব পাখি আব উঠে দাঁড়াতে পাবত না। সুতবাং সে ঠিক কবল খেযে দেখবে।

জল মুখে দেওযা মাত্র সুবও নেশায আক্রান্ত হল। খিদেও চবমে উঠল। তখন সে মাংস খাবে ঠিক কবল। গাছেব তলা থেকে ঘুমন্ত কযেকটা টিযাপাখিকে তুলে নিল। বেশ কবে আগুনে ঝলসে নিযে টিযাপাখিব মাংস খেল। এত আমোদ সে জীবনে কখনও পায নি। ফলে ঐ গাছটি ছেড়ে নডতে পাবল না। কয়েকদিন সেই পাহাড়েই বযে গেল। দিনগুলো পালকের মত উড়ে গেল।

অত্যাশ্চর্য সেই গাছেব কাছাকাছি এক তপস্বী থাকতেন। স্থরের হঠাৎ সেই তপস্বীব কথা মনে পড়ে গেল। এব আগে যখন সে হিমালযে এসেছে তখনও সে বরুণ নামের ঐ তপস্বীর সঙ্গে দেখা কবত। এমন চমৎকাব পানীযটি আবিষ্কাব কবাব পর স্থুরেব মনে হল, তপস্বী বরুণকে এই পানীয খাওযাতে হবে। নিশ্চয তাঁর খুব ভাল লাগবে। এসব সাত-পাঁচ ভেবে স্থর বাঁশেব মগে করে বেশ খানিকটা পানীয নিযে বরুণেব কাছে গেল। তারপর দুজনে মিলে গভীব আনন্দে ঐ পানীয় আব মাংস খেল। সুব আর বরুণই যেহেতু ওই পানীয প্রথম পান করে সেজন্য পানীযটির নাম হল বারুণী ও সুবা।



বেশ কযেকদিন দুজনে পানাহারে মত্ত থাকার পর স্থুর আর বরুণ ঠিক কবল, এই আশ্চর্য পানীযের শক্তি একবার লোকদেব দেখাতে হবে। বড় বড় বাঁশেব পাত্র তৈরি কবে তাতে ঐ লাল জল ভবে নিল তাবা। তারপব বাঁকে করে সেই পানীয নিযে তারা শহরের দিকে বওনা দিল। শহবে পৌছেই তারা রটিয়ে দিল ভিনদেশী দুই শুঁড়িওযালা এসেছে। তাদেব মত অত চমৎকার স্থুরা বানানোর কৌশল আর কেউ জানে না।

এক কান দু কান হযে রাজার কাছেও এই বার্তা পৌছে গেল। বাজা হুকুম দিলেন, এক্ষুনি তাদেব বাজসভায নিয়ে এস।

স্থুরা পান কবে রাজাও মুগ্ধ। পাত্র-মিত্র, সভাসদগণ, রাজার



পেযাদা থেকে বাগানের মালী পর্যন্ত সবাই ঐ সোমবস পান করে মত্ত হযে গেল।

কিছুদিনেব মধ্যেই সুব আব বরুণেব ভাঁড়াব খালি হয়ে গেল। তখন দুজনে যুক্তি কবল, 'দেখ, বারবাব তো আর বনে গিয়ে সুবা আনা সম্ভব নয। তার চেযে এক কাজ কবা যাক। আমরা ঐ গাছেব ছাল আর যা যা দিযে বসটা তৈরি হয় সেসব ফুটিয়ে নিজেরাই মদ বানাই।' এরপব তারা খেটেখুটে নিজেবাই অঢেল পরিমাণে সুবা তৈবি করল। সেই সুরা গাছের কোটবে জমা লাল জলের মতই চমৎকার হল। শহরময তাদেব নিয়ে সোরগোল পড়ে গেল। বাজ্যের লোকের তখন সুরা পান করা ছাডা আর কোন কাজ বইল না। রাজা রাজ্যশাসন ভুলে গেলেন, কৃষক ভুলে গেল চাষের কাজ। কামারের চুল্লী গেল নিভে। কুমোবেব চাকার ঘোবাও বন্ধ হযে গেল। সুবার গন্ধও আকাশে সেই সঙ্গে ছড়িযে গেল।

দুই বন্ধু তখন ঐ সম্পদ ছেডে আবার বাস্তা ধবল। এবাব তারা হাঁটতে হাঁটতে এল সাতেক নগরে। সেখানেও কেনাবেচা হল। তারপর এল শ্রাবস্তী নগবে। তখন আর এক ফোঁটা মদও নেই। শ্রাবস্তীর বাজা তখন সর্বমিত্র। তিনি তাদেব জিজ্ঞেস করলেন, 'সব তো বুঝলাম, তোমরা এখন কি চাও বল দেখি।'

'চালেব গুঁড়ো।'

'আর ?'

'মবিচ ও অন্যান্য ফল।'

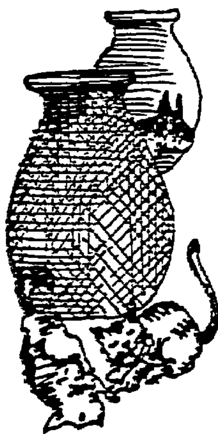
'আর কি ?'

'পাঁচশটি কলসী।'



রাজার ততক্ষণে অন্য কৌতূহল জেগে উঠেছে। তিনি হুকুম দিলেন, 'বিদেশীরা যা যা চাইছে দিয়ে দাও।' সুর আর বরুণ পাঁচশ কলসী সুরা বানিয়ে ফেলল। যাতে কেউ সুরা চুরি করে পান করতে না পারে সেজন্য প্রতিটি কলসীর সঙ্গে একটা করে বেড়ালকে বেঁধে রাখা হল। কলসীর সুরা পচে গেঁজে উঠল। ফেনা উথলে পড়তে লাগল। সুরার মদীর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে বেড়ালগুলো কলসীর গা থেকে সমস্ত ফেনা চেটে খেয়ে ফেলল। তাতে তাদের এমন নেশা হল যে বেড়ালগুলো মড়ার মত ঘুমোতে লাগল। বেড়ালগুলো এমন ভাবে ঢলে পড়েছিল যে ইঁদুরের পাল এসে তাদের লেজ আর কান কামড়াতে লাগল। রাজার সেপাই এই কাণ্ড দেখে ভাবল, 'নিশ্চয়ই এতে বিষ আছে।' তারা রাজাকে গিয়ে জানাল, 'মহারাজ, ঐ লোক-দুটো আমাদের মারার জন্য বিষ বানিয়েছিল। তা খেয়ে বেড়ালগুলো মরে গেছে।' রাজা গেলেন ভয়ঙ্কর রেগে। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন, 'ওদের শূলে চড়াও।' হতভাগ্য বরুণ এবং সুর কিন্তু শূলে চড়েও চিৎকার করতে লাগল, 'আমাদের সুরা দাও, মধু দাও।'

দুজনের প্রাণদণ্ড দেওয়ার পর রাজা পেয়াদাদের বললেন, 'যাও, এবার কলসীগুলো ভেঙ্গে ফেল।' পেয়াদারা কলসী ভাঙ্গতে গিয়ে নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। বেড়ালগুলোর ততক্ষণে নেশা কেটে গেছে। পেয়াদারা এসে রাজাকে খবর দিল, 'মহারাজ! বেড়ালগুলো বেঁচে আছে। খুশিতে ডগমগ করছে।' রাজা বুঝলেন বেচারারা তাহলে মদই বানিয়েছিল, বিষ নয়। ভাবলেন, 'বেশ জাঁকজমক করে ঐ মদ খেতে হবে।' বিশাল মণ্ডপ বানানো হল। রাজা সর্বমিত্র স্বয়ং বসলেন দুধের মত পালঙ্কে। সভাসদরা চারদিকে ঘিরে বসলেন। রাজা আদেশ করলেন, 'এবার সুরা নিয়ে এস।'



রাজা সর্বমিত্র যখন সুরা পান করতে থাকেন স্বর্গে তখন দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তা করছিলেন পৃথিবীতে এখন ন্যায়বান ব্যক্তি কে আছেন? চিন্তা করামাত্র তাঁর মানসচক্ষে রাজা সর্বমিত্রের মুখ ভেসে উঠল। ইন্দ্র দেখলেন সর্বনাশ। রাজা সুরার চুমুক দিলে শ্রাবস্তী নগর তলিয়ে যাবে। তিনি রাজার সুরাপান বন্ধ করার জন্য একটি আশ্চর্য কৌশল বের করলেন।





এক হাতে সুরাপূর্ণ একটি কলসী নিয়ে তিনি আকাশপথে সর্বমিত্রের সামনে আবির্ভূত হলেন। হঠাৎ শূন্যে ঐ কলসীসমেত ইন্দ্রকে স্থির থাকতে দেখে সর্বমিত্র খুবই বিস্মিত হলেন। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তখন এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন ঃ

'আমার হাতের এই কলসীটি কে কিনবেন বলুন। আমার হাতের এই কলসীটি কিনে নিন। এতে আছে অমৃত রস। যাকে সুরা বলা হয়। সুরার গুণ শুনলে আপনারা মুগ্ধ হয়ে যাবেন। এর অসাধ্য কোন কাজ নেই।'

সর্বমিত্র ॥ কে আপনি ব্রাহ্মণ? আপনার শরীর থেকে আশ্চর্য জ্যোতি বেরিয়ে আসছে। যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কোন্ আশ্চর্য উপায়ে আপনি আকাশে স্থির হয়ে আছেন? দেবতা ছাড়া এমন



ক্ষমতা আর কারও আছে বলে মনে হয় না। আর আপনি কেনই বা আমাদের ঐ কলসীটি কিনতে বলছেন? এই কলসীতে কি আছে দয়া করে বলুন।

ইন্দ্র ॥ শোন রাজা, এই কলসীতে ঘি-ও নেই, তেল-ও নেই। এমন কি মধু কিংবা গুড়-ও নেই। এতে আছে একরকম রস। কলসীটি রসের আধার। এই কলসীর রস পান করলে মানুষ যা নয় তাই হয়ে ওঠে। তার চাল চলন বদলে যায়। নিজের ওপর তার কোন বশ থাকে না। তার পা নড়তে থাকে। গ্রামের শেষে দুর্গন্ধ ও আবর্জনার স্তূপের মধ্যে পড়ে সে হাবুডুবু খায়। উন্মাদের মত যা পায় তাই খায়। শরীর ও মনের ওপর নিজের বশ না থাকায় তারা নাগা সন্ন্যাসীর মত উদোম হয়ে যায়। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকে। অসময়ে অচেতন হয়ে ঘুমোতে থাকে। এমনভাবে হাত পা ছুঁড়তে থাকে যেন তারা কলের পুতুল।

মানুষের ব্যথাজ্ঞান লোপ পায়। তাদের শরীর থেকে মাংস কেটে নিলেও তারা অনুভব করতে পারে না। সুরা পানের ফলে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করতে হয়। মানুষের মুখের লাগাম থাকে না। তারা তখন অকথা-কুকথা বলে। নিজেদের মনে করে সর্বেসর্বা। ত্রিলোকেশ্বর। কত যে সর্বনাশের জন্ম দিতে পারে এই সুরা তা বলে শেষ করার নয়।



নিজেব পৈতৃক সম্পত্তি, পাবিবাবিক সম্মান, বংশগত কৌলিন্য সবই এতে লোপ পায়। ইতব জন্তুব মত তাবা ঝগড়া মাবামাবি করে। কোন কাজ কবতে যাওযাব পথে সুবাপান কবলে তাবা সেই কাজেব কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায। মহিলাবা সুরা পান কবলে মান-সম্মান হাবায। গৃহস্থেব অকল্যাণ হয। হাজার প্রলোভনেও যে মিথ্যা কথা বলে না, সুবা তাকে দিযে হাজাবটা মিথ্যে বলিযে দিতে পাবে। ব্রাহ্মণ-চণ্ডালেব ভেদবেখা মুছে যায। তাবা একসঙ্গে শুযোবেব পালেব মত গাদাগাদি কবে থাকে। এতে শবীব ধ্বংস হয। আপনার নিশ্চয মনে আছে, মহাভাবতে মুষলপর্বেব সূচনা হযেছিল এই সুবাপান থেকেই। যদুবংশ ধ্বংস হযেছিল। এমনকি অসুববা যে স্বর্গ থেকে বিতাডিত হল সে-ও তো সুবাব জন্যই। শোন বাজা, সুবাব গুণাগুণ সবই তোমাকে বললাম। এবাব তুমি কলসীটি কিনে নাও। প্রাণ ভবে খাও। আনন্দ কব।

সর্বমিত্র॥ শুনুন ব্রাহ্মণ। আপনি আজ আমাব যে উপকাব কবলেন তার কোন তুলনা নেই। এত উপকাব আমার বাবা-মা-ও কবেন নি। হযত তাঁরা জানতেন না। আমাব মঙ্গলের জন্য আপনি আমাকে যথেষ্ট উপদেশ দিলেন। আর আমি সেই উপদেশ মেনেই চলব। আমাব চোখ খুলে দিযেছেন আপনি। এখুনি আমি আপনাকে সম্মানেব সঙ্গে পাঁচটি গ্রাম, একশ দাসী ও সাতশ গাভী দান কবছি। আর এই যে রথ দেখছেন এ অতি দুর্মূল্য। এ বথেব ঘোড়াও খুব দুর্লভ জাতেব। এখন থেকে এই বথটি আপনার হল। দযা কবে গ্রহণ করুন। আজ থেকে আপনিই আমাব আচার্য।



ইন্দ্র ॥ আমি ব্রাহ্মণ নই রাজা। আমি দেবরাজ ইন্দ্র। তোমার গ্রাম, দাসী ও গাভী তোমারই থাক। প্রিয় রথটিও নিজের কাছেই রাখ। ধর্মে মতি রেখ। শীল পালন কর। দেহ নশ্বর। দেহহীন হলে তুমি স্বর্গে স্থান পাবে।

রাজাকে আরও অনেক ধর্মকথা ও উপদেশ দিয়ে ইন্দ্র ফিরে গেলেন। রাজা সঙ্গে সঙ্গে পেয়াদাদের বললেন, 'কলসীগুলো এক্ষুনি ভেঙ্গে ফেল।' এরপর থেকে সর্বমিত্র আগের মতই দানধ্যানে ও প্রজাপালনে ডুবে রইলেন। দিন যেতে লাগল। রাজা আয়ু ক্ষয় করার পর স্বর্গে স্থায়ী আসন পেলেন। শ্রাবস্তীতে সুরা প্রবেশ করতে পারল না। কিন্তু জম্বুদ্বীপে সুরাপানের অভ্যাস ক্রমেই ভীষণ হয়ে উঠতে লাগল।

মহাকপি জাতক

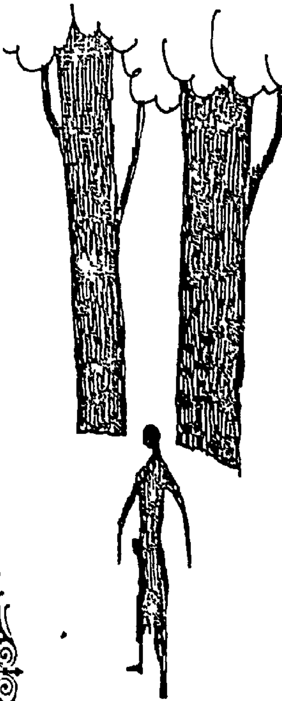


বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে কাশী গ্রামটিতে বহু কৃষক বসবাস করত। কাশীগ্রামের এক ব্রাহ্মণ কৃষক একদিন মাঠে কাজ করতে করতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি তখন গোরুগুলোকে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিলেন। এমনিতে লাঙলের কাজ সারা হয়েছে। বেচারা গোরুগুলোও হাঁফিয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ গোরুগুলোকে চরতে দিয়ে নিজে এক গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নিতে লাগলেন।

খানিক বাদে উঠে আবার ক্ষেতে নামলেন। শুরু হল কোদালের কাজ। এক মনে কাজ করে চলেছেন। সময়ও বয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এক সময় সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত গোরুগুলোর ফেরার নামগন্ধ নেই। ব্রাহ্মণ পড়লেন মহা বিপদে। এদিকে সেদিনের মত কাজ শেষ। ঘরে ফিরতে হবে। ব্রাহ্মণ কি আর করেন, গোরুর খোঁজ-তালাশ শুরু করলেন। কিন্তু যতদূর যাচ্ছিলেন ততদূরের মধ্যে কোথাও তাদের লেজগাছাও দেখতে পেলেন না।



এদিকে গোরুগুলো ততক্ষণে গভীর বনে ঢুকে পড়েছে। ব্রাহ্মণ খুঁজতে খুঁজতে চললেন। বনের পর বন পেরিয়ে হাজির হলেন হিমালয়ের গহন বনে। সেখানে ঘন বনে পথ হারিয়ে ফেললেন। আর হাঁটতেও পারছেন না। বনের পথ কাঁটা আর ঝোপে ভরা। শরীরও ভেঙ্গে আসছে। এভাবে পর পর সাত দিন কেটে গেল। আহার নিদ্রাহীন অবস্থায় পাগলের মত ঘুরতে ঘুরতে তিনি একটা গাব গাছের কাছে এলেন। গাছে উঠে পাকা গাব ফল খেয়ে খিদে মেটাবার ইচ্ছা করলেন। দুর্বল শরীর, টাল সামলাতে পারলেন না। পা ফসকে পড়ে গেলেন ষাট হাত নিচে, এক গহ্বরের মধ্যে। গহ্বরটিতে বছরের পর বছর তালপাতা পড়েছে। জল জমেছে। সেসব পচে সে এক মহা নরক। ব্রাহ্মণ মনে মনে প্রমাদ গুনলেন। আর নিস্তার নেই। এখান থেকে তাঁর মুক্তির কোন আশা নেই। এই গহন বনে কে-ই বা তাঁকে মুক্ত করতে আসবে। এসব ভাবতে ভাবতে মৃতপ্রায় অবস্থায় একে একে দশ দিন কেটে গেল।



ঠিক সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব বানর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, নাম মহাসত্ত্ব। হিমবন্ত প্রদেশই তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র।' দুর্গম বন বলে কোন কিছু জানতেন না। অরণ্যময় তাঁর ছিল অবাধ গতি। একদিন আহারের খোঁজ করতে করতে বোধিসত্ত্ব সেই নগরের কাছে এসে পড়লেন। খুব লম্বা একটা গাছের মাথার চড়ে দোল খেতে খেতে তিনি হঠাৎই ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন। বুঝতে পারলেন, বেচারা বিপদে পড়েছে। তখন ভাবলেন, 'এঁকে যদি আমি মুক্ত না করি তাহলে এখানেই বেচারা শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে। যেভাবেই হোক মানুষটাকে বাঁচাতে হবে।'

মহাসত্ত্বের পক্ষেও কাজটা খুব সহজ ছিল না। কি করে তিনি মানুষটাকে কাঁধে করে আনেন, ভেবে কূল পেলেন না। শেষে ঠিক করলেন, 'আগে ভারি পাথর তোলা অভ্যাস করি।' অসম্ভব কষ্ট করে তিনি কাঁধে পাথর তোলার চেষ্টা করে গেলেন। অনেকবারের চেষ্টায়

সফল হওয়ার পর মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করতে এগিয়ে গেলেন। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে তাঁকে রক্ষা করলেন।

মুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ দেখলেন বানরটা তাঁকে কাঁধ থেকে নামিয়েই ক্লান্তিতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে বললেন, 'তুমি আমাকে পাহারা দাও, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।' ব্রাহ্মণ বানরকে ঘুমোতে দেখে ভাবলেন, 'এটাকে শেষ করে ফেললেই তো হয়, কে এখন বাঁদরকে পাহারা দেবে?' ভাবি একটা পাথর তুলে তিনি মহাসত্ত্বের দিকে ছুঁড়লেন। মহাসত্ত্বের মাথার একপাশে পাথরটা লাগতেই তিনি জেগে উঠলেন। এক লাফে গাছের মাথায় চড়ে বসলেন। সেখান থেকে বললেন, 'শয়তান, আমি তোকে প্রাণে বাঁচালাম, আর তুই আমাকেই খুন করতে যাচ্ছিলি। তোকে উচিত শাস্তি দিতে হবে।' তারপরই কি যেন ভেবে বললেন, 'না, তোকে আমি কোন শাস্তি দেব না। চল, তোকে রাস্তা দেখাচ্ছি বনের বাইরে যাওয়ার। তবে আমি গাছে-গাছেই যাব।' মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে তাঁকে পথ দেখিয়ে বনের বাইরে পৌঁছে দিয়ে এলেন।



বানররূপী বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে কিছু না বললেও, মহাপাপের ফল ফলল কয়েকদিনের মধ্যেই। ব্রাহ্মণের কুষ্ঠ হল। শরীর ক্ষয়ে যেতে লাগল। ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রেতের মত হয়ে গেল। একটানা সাত বছর তাঁর দুর্ভোগ চলল। তারপর একদিন ঘুরতে ঘুরতে ব্রাহ্মণ বারাণসীরাজের বাগানে ঢুকে পড়লেন। সেদিন ছিল পুণ্য তিথি। বারাণসীরাজ বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি ব্রাহ্মণকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

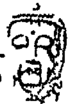
কি পাপে তোমার এই অবস্থা হল?

অবধ্যকে বধ করেছ?

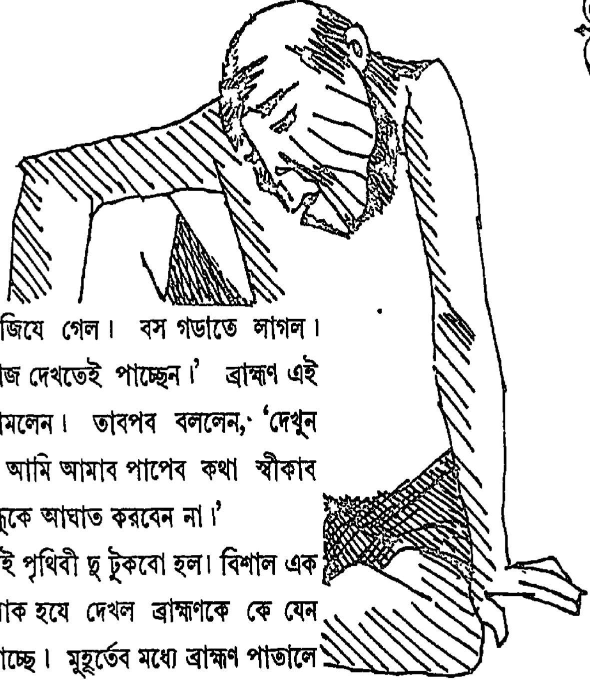
কেন এত কষ্ট পাচ্ছ?

কি অন্যায় করেছ?

ব্রাহ্মণ তখন যা-যা ঘটেছিল সব কথাই বারাণসীরাজকে খুলে বললেন। নিজের পাপ ঢাকা দেওয়ার কোন চেষ্টা করলেন না। শেষে বললেন, 'আমাকে পথ দেখানো শেষ করে সেই মহান বানরটি এক হ্রদে নেমে ক্ষতস্থান ধুয়েছিল। সে চলে যেতে তেষ্টায় আমি



কষ্ট পাচ্ছিলাম। জল খেতে হ্রদে নামলাম। সঙ্গে সঙ্গে যেন সর্বাঙ্গে আগুন লাগল। যেখানে যেখানে হ্রদের জল লেগেছিল, সেইসব জায়গায়



দেখতে দেখতে বিস্তব ফোড়া গজিয়ে গেল। বস গড়াতে লাগল। এই হল শুরু, তাবপব তো মহাবাজ দেখতেই পাচ্ছেন।' ব্রাহ্মণ এই পর্যন্ত বলে দম নেওয়াব জন্য থামলেন। তাবপব বললেন,' 'দেখুন মহাবাজ, এত মানুষেব 'সামনে আমি আমাব পাপেব কথা স্বীকাব কবলাম। আপনাবাও কখন বন্ধুকে আঘাত করবেন না।'

ব্রাহ্মণেব কথা যুবোনো মাত্রই পৃথিবী দু টুকবো হল। বিশাল এক গহ্বব দেখা গেল। সবাই অবাক হয়ে দেখল ব্রাহ্মণকে কে যেন সেই গহ্ববেব মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তেব মধ্যে ব্রাহ্মণ পাতালে তলিয়ে গেলেন। বাজাও সভাসদদের নিয়ে বাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন।

সম্ভব জাতক

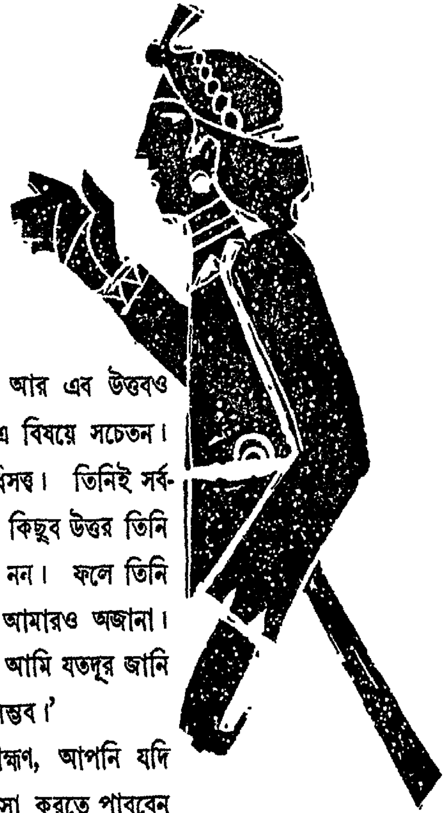
প্রাচীন ভাবতে কুরু নামে একটি বাজ্য ছিল। কুরু রাজ্যের ইন্দ্রপ্রস্থ নগবে ধনঞ্জয় কৌববা নামে এক বাজা বাজত্ব কবতেন। কৌববাব প্রধান পুবোহিত এবং উপদেষ্টাব নাম ছিল শুচিবত। বাজা একদিন স্থিব কবলেন মহাজ্ঞানী প্রধান পুবোহিতেব কাছে নিজেব মনেব আকাঙ্ক্ষাব কথা জানাবেন। তাঁর উপদেশ শুনবেন।

মনে মনে এ কথা স্থিব কবার পব একদিন তিনি শুচিবতকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে তাঁকে সুসজ্জিত আসনে বসতে আহ্বান জানালেন। নিজে নিচে বসলেন। তারপর বাজা কৌববা শুচিবতকে জিজ্ঞেস করলেন:



'আমি রাজ্য লাভ করেছি। ক্ষমতা লাভ করেছি। তবু অতৃপ্তির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছি না। ভাববেন না আমি কোন বিষয়সুখের লালসায় অতৃপ্ত। মান্যবর, আমার আকাঙ্ক্ষা গভীর। আমি মহত্তী কিছু প্রার্থনা করছি। ধর্মের শক্তিতে নিজেকে মহৎ করে তোলাই আমার বাসনা। আমি জানি রাজার চরিত্রে এমন সব দুর্লভ গুণের সমাবেশ ঘটা আবশ্যক যা থেকে প্রজারাও শিখতে পারে। তারা উন্নত হতে পারে। আমি চাই সেইসব গুণে মহীয়ান হয়ে উঠতে, যাতে কি দেব, কি যক্ষ, কি মানব সকলেরই প্রশংসা লাভ করতে পারি। আমার দুর্ভাগ্য আমি জানি না, কোন্ খানে, কি উপায়ে সেই সৌভাগ্য অর্জন করা সম্ভব। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি





আপনি আমাকে সেই শিক্ষা দিন।'

এমন গূঢ় প্রশ্ন সকলে করতে জানেন না। আর এর উত্তরও সকলের জানা নেই। সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানীরাই এ বিষয়ে সচেতন। এরকম মানুষের দৃষ্টান্ত হতে পারেন একমাত্র বোধিসত্ত্ব। তিনিই সর্বজ্ঞানী। রাজা সব কিছু জানতে চান, কিন্তু সব কিছুর উত্তর তিনি জানতে পারেন না। শুচিরত তো আর বোধিসত্ত্ব নন। ফলে তিনি কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, 'রাজা, ওসব প্রশ্নের উত্তর আমারও অজানা। পৃথিবীতে খুব কম লোকই এ বিষয়ে জানেন। আমি যতদূর জানি ধর্মপ্রাণ বিদূরের কাছেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব।'

শুচিরতের জবাব শুনে রাজা বললেন, 'ব্রাহ্মণ, আপনি যদি সত্যিই জানেন যে মহাজ্ঞানী বিদূর এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারবেন তাহলে এক্ষুনি তাঁকে গিয়ে বলুন। আমি এ প্রশ্নের উত্তর জানতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে আছি।' এই বলে রাজা বিদূরের প্রণামী হিসেবে পনেরটি মোহর শুচিরতের হাতে দিলেন।



বাজাব কাছ থেকে প্রচুব যৌতুক ও সিপাই সান্ত্রী নিযে শুচিবত বিদূবেব উদ্দেশে বওনা হলেন। শুচিবত কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে সোজা বারাণসী গেলেন না। তিনি পথেব মাঝখানে নানা জাযগায পণ্ডিতদেব আখড়ায একজন সর্বজ্ঞানীব খোঁজ কবতে কবতে চললেন। তবে প্রত্যেকবাবই তাঁকে হতাশ হতে হল। এমন একজন পণ্ডিতেরও দেখা পাওয়া গেল না। গোটা জম্বুদ্বীপ এভাবে চষে ফেলাব পবও প্রশ্নেব জবাব পাওয়া গেল না। শেষকালে তিনি বাবাণসীতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে নিজেব থাকাব একটা আস্তানা যোগাড কবে সোজা চলে গেলেন বিদূবেব বাড়িতে। একেবাবে ভোব না হতেই। যেতেই বিদূর তাঁকে সমাদব করে বসালেন। শুচিবত দেখলেন বিদূব তখন খেতে বসেছেন। এখানে বলে বাখা দবকাব, বিদূব আব শুচিবত ছেলেবেলায একই আচার্যেব কাছে একসঙ্গে পড়েছেন। তাঁবা বাল্যবন্ধু।



বিদূব ॥ কি মনে কবে এতদিন পবে এলে ?

শুচিবত ॥ যুধিষ্ঠিবের বংশেব এক রাজা, কৌরবা আমাকে তোমাব কাছে পাঠিযেছেন।

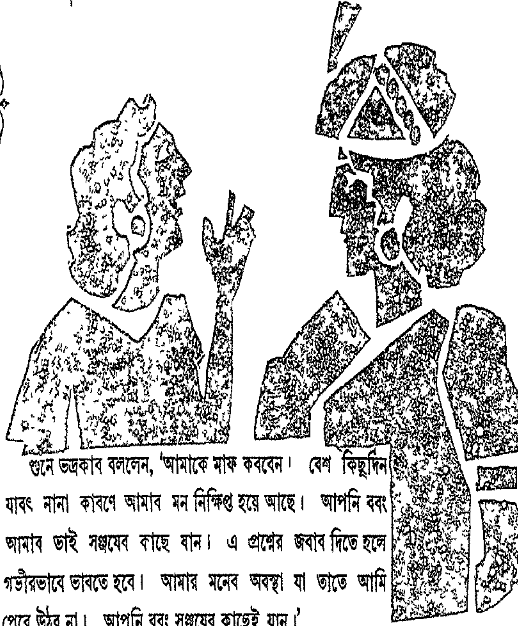
বিদূব ॥ কেন বল তো ?

শুচিবত ॥ তিনি অর্থ আর ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানতে চান।



বিদূব ॥ কঠিন প্রশ্ন। জানই তো, আমি আদালতে কাজ কবি। ভাবাব সময পর্যন্ত নেই। এ প্রশ্নেব মীমাংসা কবতে হলে ভাবতে হবে। কিন্তু আমাব হাতে সে সময নেই। তুমি এক কাজ কব, আমাব ছেলে ভদ্রকারেব কাছে যাও। সে আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী। আমাব ধাবণা, সে তোমার প্রশ্নের উত্তব দিতে পাববে।

বেচাবা শুচিবত! তাঁকে আবাব বওনা হতে হল ভদ্রকারের খোঁজে। শুচিবত যখন ভদ্রকাবেব বাড়িতে গেলেন তিনি তখন প্রাতবাশ সেবে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলেন। ভদ্রকাব জানতে চাইলেন, 'মহাশযেব আগমনেব হেতু '। শুচিরত তখন বিদূরকে যা যা বলেছেন ভদ্রকাবকেও সেসব কথা আবাব বললেন।



শুনে ভদ্রকার বললেন, 'আমাকে মাফ করবেন। বেশ কিছুদিন যাবৎ নানা কারণে আমার মন নিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আপনি বরং আমার ভাই সঞ্জয়ের কাছে যান। এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে গভীরভাবে ভাবতে হবে। আমার মনের অবস্থা যা তাতে আমি পেরে উঠব না। আপনি বরং সঞ্জয়ের কাছেই যান।'

সঞ্জয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন সেখানকার অবস্থাও ভদ্রকারের বাড়ির মতই। অতিথি ও বন্ধুসমাগমে সঞ্জয়ের গৃহ পরিপূর্ণ। সঞ্জয় বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। সঞ্জয়ের মন-মেজাজও ভাল নেই। মনঃসংযোগ করাই তাঁর পক্ষে তখন বেশ দুরূহ ব্যাপার। যাই হোক সঞ্জয় বললেন, 'আপনি এক কাজ করুন, আমার সাত বছরের ভাই সম্ভবকুমারের কাছে যান।'

শুচিরত এতে বেজায় অবাক হলেন। বাবা-দাদারা যে প্রশ্নের জবাব দিতে পারছেন না, রথী-মহারথীরা যে প্রশ্নের অর্থ পান না, সেই প্রশ্নের জবাব দেবে সাত বছরের এক বালক! সঞ্জয় শুচিরতের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, 'আপনি কোন সংশয় রাখবেন না। সম্ভবকুমারের বয়স দিয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা বোঝার চেষ্টা করবেন না। যদি কেউ পারে, তাহলে সে-ই পারবে।'

শুচিরত তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পাব তাঁকে?'

সঞ্জয় বললেন, 'ঐ যে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করছে, ফর্সা মত ঐ ছেলেটা।'



শুচিবত কাছে যেতে বালক সম্ভবকুমাব বললেন, 'মহাশযেব জন্য আমি কি কবতে পাবি ?'

'আমাব একটি প্রশ্ন আছে, জম্বুদ্বীপে কেউই তাব উত্তব দিতে পাবে নি।'

'বেশ মহাশয়, আপনি জিজ্ঞেস করুন। বুদ্ধেব লীলায আমি উত্তব দিচ্ছি।'

'অর্থ কি, আব ধর্ম-ই বা কি ?'

সম্ভবকুমাব তখন মধুব স্বরে অর্থ ও ধর্মেব ব্যাখ্যা শুরু কবলেন। তাঁর কণ্ঠস্বব বাব যোজন অবধি ছড়িযে পড়ল। বাবাণসীনগবেব সর্বত্র শোনা যেতে লাগল সেই সুমধুব স্বব। বাজা, উপবাজ ও মান্য জনেবা ছুটে এলেন সম্ভবকুমাবেব কাছে।

সম্ভবকুমাব বললেন—

১। যুধিষ্ঠিব বংশেব তোমাব বাজাকে বল, তিনি যেন ভাল কাজ কখনও যেলে না বাখেন। আজ আব কাল-কে যেন সমান মনে না কবেন। বর্তমানকে অবহেলা কবে যেন ভবিষ্যতেব জন্য কাজ তুলে না বাখেন।

২। বাজা যখন জিজ্ঞেস কববেন তাঁকে বলবে, এই হচ্ছে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। মূর্খেব মত তিনি যেন অধর্ম ও কুকর্মেব পেছনে না ছোটেন।

৩। কুকর্মে ডুবে থেকে তিনি যেন নিজেব বিনাশ না ঘটান। শুধু যে নিজেই কুকর্ম থেকে দূবে থাকবেন তাই নয়, কাউকে কখনও কুপথে চলাব পরামর্শ বা প্রবোচনাও দেবেন না। যেসব ব্যক্তি বা বস্তুতে অনর্থ ঘটতে পাবে, তাদেব সঙ্গে সম্পর্ক চুকিযে ফেলতে হবে।

৪। এভাবে সযত্নে ও সতর্কতার সঙ্গে নিজেব কাজ যিনি কবতে পারেন, সেই বাজাব বিকাশ ঘটে। শুক্লপক্ষে চাঁদেব আবির্ভাবেব মতই রাজার অভ্যুদযও অনিবার্য হযে থাকে।

৫। এমন কি তাঁর মৃত্যু ঘটলেও জ্ঞানীরা তাঁকে নিজেদেব প্রাণের মতই ভালবাসেন। বন্ধুবা তাঁব মহিমা কীর্তন কবতে থাকেন। দেহ ক্ষয হলে সে ব্যক্তিব স্বর্গলাভ ঘটে।

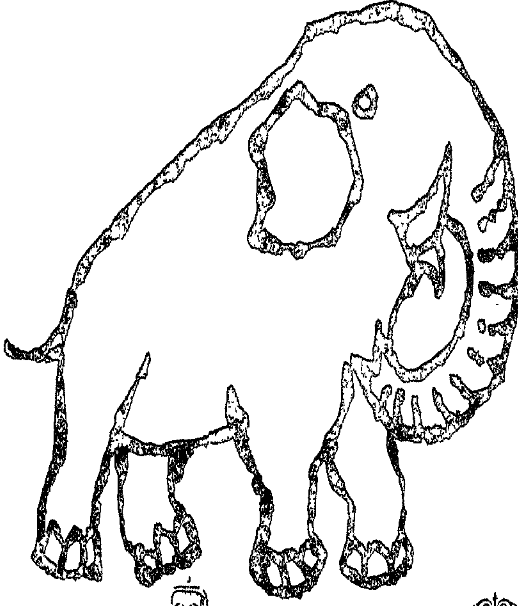


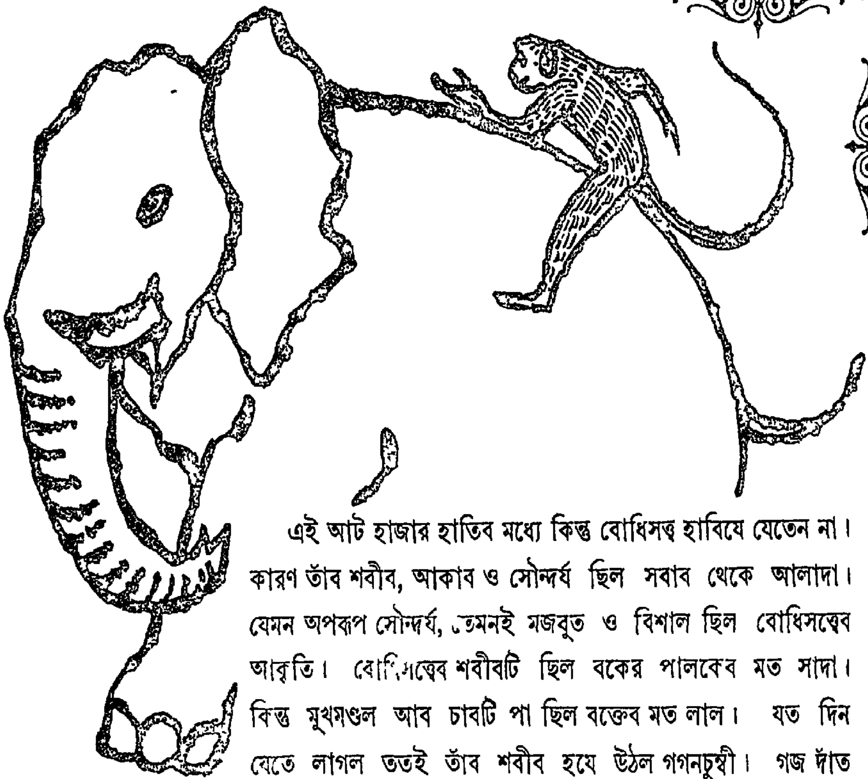
এই ব্যাখ্যা শুনে সমবেত জনসাধারণ, রাজা, উপরাজ ও সভাসদগণ 'সাধু। সাধু।' বলে উঠলেন। সবাই দুর্মূল্য অলঙ্কার ও বস্ত্র দান করলেন ঐ বালককে। এভাবে সকলে মিলে যা দান করলেন তার মোট পরিমাণ হল এক কোটি টাকা। তাছাড়া রাজা নিজেও সম্ভব-কুমারকে প্রচুর ধনরত্ন দিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে শুচিরত রাজা কৌরবাকে সবিস্তারে অর্থ ও ধর্ম সম্বন্ধে সব কথা বললেন। তারপর থেকে রাজা ধর্মপথে অটল রইলেন। মৃত্যুর পরে তাঁর স্বর্গলাভ ঘটে।

ষড়দন্ত জাতক

১

হিমবন্ত প্রদেশে ষড়দন্ত নামে একটি হ্রদ ছিল। ঐ হ্রদের পাশেই বসবাস করত এক হস্তী যূথ। বোধিসত্ত্ব এই হাতির পালে জন্মেছিলেন। তাঁর পিতাই তখন ঐ হস্তীযূথের দলপতি। দলটি নেহাৎ ছোট নয়। একসঙ্গে আট হাজার হাতি থাকত।





এই আট হাজার হাতিব মধ্যে কিন্তু বোধিসত্ত্ব হাবিযে যেতেন না। কারণ তাঁব শবীব, আকাব ও সৌন্দর্য ছিল সবাব থেকে আলাদা। যেমন অপৰূপ সৌন্দর্য, তেমনই মজবুত ও বিশাল ছিল বোধিসত্ত্বেব আকৃতি। বোধিসত্ত্বেব শবীবটি ছিল বকের পালবেব মত সাদা। কিন্তু মুখমণ্ডল আব চাবটি পা ছিল বক্তেব মত লাল। যত দিন যেতে লাগল ততই তাঁব শবীব হযে উঠল গগনচুম্বী। গজ দাঁত দুটিব আকাব ছিল এত বিশাল যে কল্পনা কবা যায না। ত্রিশ হাত লম্বা আব পনেব হাত চওড়া। শুঁডটি ছিল আটান্ন হাত লম্বা।

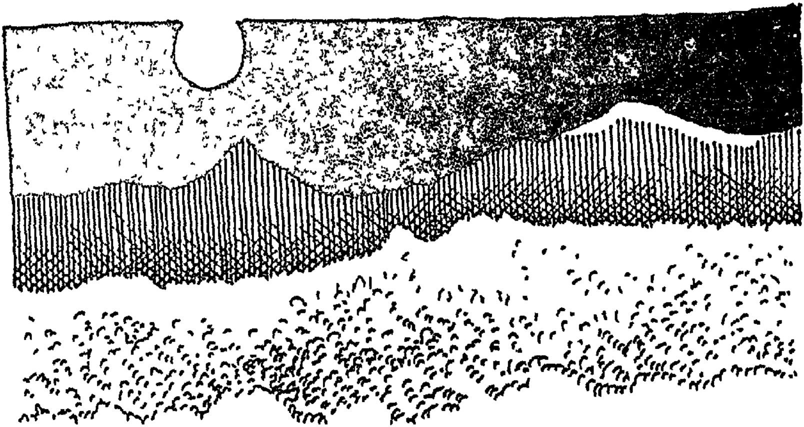
এ তো গেল আকাবেব দিক। এ ছাড়া তাঁব দাঁত থেকে সব সময বহুবর্ণবঞ্জিত বশ্মি বিচ্ছুবিত হতো। বযসকালে বোধিসত্ত্বই এই আট হাজাব হাতিব দলপতি হলেন। দলপতি হিসেবে বোধিসত্ত্বের যোগ্যতাও ছিল অসীম। সকলেব সুখ শান্তিব প্রতি তাব দৃষ্টি সর্বদা সজাগ থাকত। বোধিসত্ত্বেব দুই স্ত্রী। খুল্লসুভদ্রা আব মহাসুভদ্রা। বিশাল এই দল ও নিজেব পত্নীদেব সঙ্গে তিনি কাঞ্চন গুহায বসবাস কবতেন।

সে অবণ্যেব কোন সীমা পবিসীমা ছিল না। পাখি-পাখালি, হবিণ, খবগোশ সকলেই সেখানে নির্ভযে ঘোবাফেবা করে। আর এই অভযাবণ্যেব মাঝখানেই ছিল ষডদন্ত হ্রদটি। হ্রদটিও অরণ্যের মতই বিশাল। তাব জল টলটল করছে আযনাব মত। হিমবন্ত প্রদেশের প্রাণীরা সেখানে জল খেতে আসে। আর আশপাশে

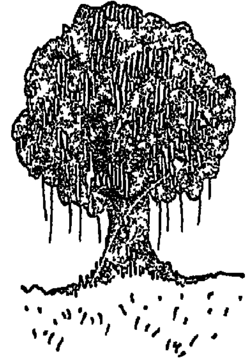
বিশ্রাম করে।

হ্রদের মাঝখানটিতে আটচল্লিশ যোজন জায়গা ফাঁকা থাকত। সেখানে কোন লতাগুল্ম বা গাছগাছালি নেই। নেই কোন জলজ উদ্ভিদ। হ্রদটির মাঝখানে আছে শালুক বন। শালুক বনটি ঘিরে রেখেছে নীল পদ্মের একটি বন। নীল পদ্মকে আবার বলয়ের মত ঘিরে রেখেছে পদ্ম ও কুমুদে ঢাকা বন। যোজন যোজন ধরে চলেছে এই বন। এমন কি সেখানেও শেষ নয়। অগভীর জলে আবার ছিল রক্তকমল অরণ্য। একেবারে কিনার দিয়ে চলে গেছে বুনো ফুলের দীর্ঘ গাছের সারি। এইসব ফুলগাছের মধ্যে সুগন্ধি ফুলগাছ যেমন ছিল, তেমনি গন্ধহীন ফুলের গাছও ছিল অঢেল। ফুলের পর ছিল নানা ফলের গাছের একটি বলয়। কলা বন। আম-কাঁঠাল-তেঁতুল গাছ। এর বাইরে নানা গাছের মিশ্র জঙ্গল। বেণুবনও একটি ছিল। তবে তা ছিল বাইরে।

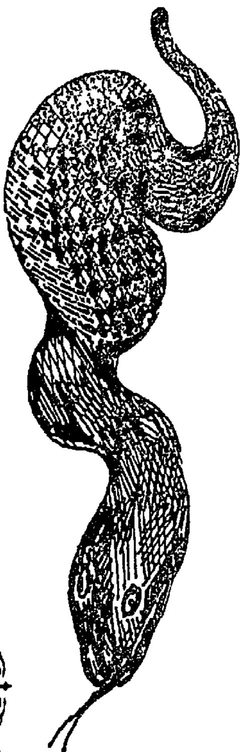
বেণুবন পেরোলেই পর্বতের এলাকা। পর্বতের পর পর্বত। এই সব পর্বতের নামও খুব বিচিত্র। ক্ষুদ্র কৃষ্ণ, মহাকৃষ্ণ, উদক, চণ্ডপার্শ্ব, সূর্য পার্শ্ব, সুবর্ণপার্শ্ব ইত্যাদি। আঠাশ ক্রোশ উঁচু ও সুদীর্ঘ সুবর্ণপার্শ্ব পর্বতটি ষড়দন্ত হ্রদকে প্রহরীর মত ঘিরে রেখেছিল। পর্বতটির একপাশের রঙ ছিল স্বর্ণাভ। সূর্যের আলো পড়লে সেদিকটা সুবর্ণময় মনে হতো।



শত পাহাড় ঘেরা এই হ্রদের পূবে ছিল একটি প্রাচীন বট গাছ। বিশাল তার আকৃতি। অজস্র তার ঝুরি। গুঁড়ির আয়তনই ছিল আঠাশ ক্রোশ। আর এত ডালপালা যে, সবকিছু সমেত সে নিজেই ছোটখাট এক অরণ্য। কারণ তার ডালপালা ছিল আট হাজারেরও বেশি। হ্রদের একপাশে সে ছিল স্বতন্ত্র এক প্রহরী।



কাঞ্চন গুহার অবস্থান হ্রদের পশ্চিমে। এই বিশাল বটগাছের ঠিক উল্টো দিকে। এই অলৌকিক বনে ছিলেন এক নাগরাজ। তাঁর নাম ষড়দন্ত। আর হ্রদের নাম ঐ নাগরাজের নাম অনুসারেই হয়েছে। ষড়দন্ত নাগরাজের অধীনে ছিল আট হাজার বহুবর্ণরঞ্জিত ও নানাবিধ দৈর্ঘ্যের সর্পরাজি। নাগরাজ বর্ষাকালে বাস করতেন কাঞ্চনগুহায়। গ্রীষ্মকালে তিনি থাকতেন ঐ প্রাচীন বটের কোটরে। আট হাজার সাপ সমেত নাগরাজ গরমকালে গাছের কোটরে আশ্রয় নিতেন ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য। কারণ হ্রদের বুক থেকে তখন যে শীতল বাতাস উঠে আসত তাতে প্রাণ জুড়িয়ে যেত।



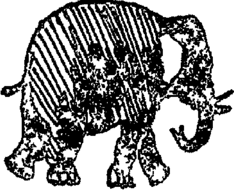
২

হাতিদের দলপতির কাছে একদিন খবর এল, বসন্ত এসেছে। হ্রদের তীরের ফুলগাছগুলো জেগে উঠেছে। সেই গন্ধে গোটা এলাকা ম-ম করছে। বসন্ত ঋতুতে হ্রদের এই এলাকায় ঘুরে বেড়াতে হাতিরা বেজায় পছন্দ করত। গজরাজ বোধিসত্ত্ব আর বিলম্ব না করে তাঁর যূথ নিয়ে চললেন হ্রদের দিকে। হ্রদের তীরে খেলতে খেলতে গজরাজ কাঁধ দিয়ে এক প্রাচীন শালগাছে ধাক্কা দিলেন। ঐ শালগাছটি ছিল অজস্র পিঁপড়ের আশ্রয়। ধাক্কা খাওয়া শালগাছটি থেকে অসংখ্য শুকনো পাতা আর পিঁপড়ের দল এসে বোধিসত্ত্বের পিঠে পড়ল।

তখন মহাসুভদ্রা বোধিসত্ত্বের বাঁ-পাশে থাকায় তার শরীরে পড়ল ফুলের রেণু। কিন্তু খুল্লসুভদ্রা ছিল তাঁর ডানপাশে। যেজন্য তার শরীরে কেবল শুকনো ডাল আর পাতা ঝরে পড়ল। এতে খুল্লসুভদ্রার বেজায় হিংসে হল। সে ভাবল, 'গজরাজ আমাকে ভালবাসেন না। ভালবাসেন শুধু সুভদ্রাকে। অথচ আমিও তাঁর পত্নী। না, এর প্রতিশোধ নিতেই হবে।' _ খুল্লসুভদ্রা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল,

'গজবাজকে শিক্ষা দিতে হবে, এমন বিপদে ফেলতে হবে, যাতে হাড়ে হাড়ে টেব পান।'

এব কিছুদিন পবেব ঘটনা। গজবাজ একদিন তাঁব দলবল নিযে জলে নেমেছেন। স্নান কবছেন। শুঁড দিযে জল ছিটিযে দিচ্ছেন। হাতিব দল তাঁব সেবা কবতে লাগল। যুল-সাজে তাঁকে সাজিযে দিল। বাজাব সমাদব কবে চলল। এভাবে অনেকক্ষণ জলকেলিব পব গজবাজ ডাঙায উঠে এলেন। তখন অন্যান্য হাতিবা জলকেলি শুরু কবল। কিছুক্ষণ পবে একটি হাতি বিশাল একটি পদ্মযুল পেল। সে শুঁড়ে কবে সেই বিশাল ফুলটি এনে গজবাজকে উপহাব দিল। গজবাজ সঙ্গে সঙ্গে ফুলটি সুভদ্রাকে দিযে দিলেন। কাবণ সেটাই নিযম। সুভদ্রা তাঁব অগ্রজ মহিষী। কিন্তু খুল্লসুভদ্রাব পুবনো বাগ এতে আবও বহুগুণ বেড়ে গেল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল, 'ইস, কত বড় যুল। গজরাজ কিনা এ ফুলটা সুভদ্রাকে দিযে দিলেন। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে তিনি সুভদ্রাকেই ভালবাসেন। ঠিক আছে, আমিও খুল্লসুভদ্রা, কি কবে মহা সুভদ্রাকে জব্দ কবতে হয আমাব



ভাল কবেই জানা আছে।' গজবাজেব ওপর খুল্লসুভদ্রাব বাগ আবও বহুগুণ বেড়ে গেল।



একদিন গজবাজ পদ্মমধু মেশানো নানাবকম ফলমূল হাতিব দলেব মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছিলেন। খুল্লসুভদ্রাও তার নিজের ভাগ পেল। নিজের ভাগটি হাতে নিযে সে ভাবল, 'আমি যদি কোন কামনা করে আমার ভাগের ফল সবাইকে দান করি তাহলে নিশ্চযই আমার সেই কামনা-ও পূর্ণ হবে।' এই ভেবে খুল্লসুভদ্রা তার ভাগের ফল অন্যান্য হাতিদেব একটুকবো একটুকরো কবে দান কবল। তারপর মনে মনে প্রার্থনা করল : 'আগামী জন্মে আমি যেন মদ্ররাজ বংশে জন্মাই। বাবাণসীরাজের প্রধানা মহিষী হতে পাবি। তাহলে রাজাকে বলে আমি হিমবন্ত প্রদেশে ব্যাধ পাঠাব। সে গজবাজকে ধরে নিযে আসবে। তখন আমি গজবাজকে হত্যা কবাব। তাঁব দাঁতদুটো উপড়ে নেব।'



খুল্লসুভদ্রা তারপর থেকে প্রতিদিনই এই অনাহার এবং দানব্রত চালিয়ে যেতে লাগল। দিনে দিনে তার শরীর শুকিয়ে এল। চলচ্ছক্তিও রইল না। একদিন তার শীর্ণ শরীর আর প্রাণ ধরে রাখতে পারল না। খুল্লসুভদ্রার মৃত্যু হল।

৩

মৃত্যুকালীন কামনা অনুসারে খুল্লসুভদ্রা মদ্ররাজ বংশে জন্মাল। তার নাম হল সুভদ্রা। প্রতিদিন চাঁদের কলার মতই সুভদ্রা বেড়ে উঠতে লাগল। তার রূপ লাবণ্যের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়তে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। সুভদ্রা বড় হতে মদ্ররাজ মেয়ের জন্য যথাযোগ্য পাত্রের খোঁজ শুরু করলেন। এদেশ সেদেশ ঘুরেও মনোমত পাত্র পাওয়া গেল না। তারপর পাত্র হিসেবে বারাণসীরাজার কথা তাঁর মনে এল। বারাণসীরাজও সুভদ্রার রূপলাবণ্যের খ্যাতি শুনেছিলেন। ফলে তাঁর দিক থেকেও এই বিবাহে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গেল। মদ্ররাজও মনের মত পাত্র পেয়ে বেজায় খুশি হলেন।

রাজকীয় জাঁকজমকের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে হয়ে গেল। সুভদ্রা যে কেবল রূপলাবণ্যে অসামান্যা তাই নয়, বারাণসীরাজ তার গুণেরও অনেক প্রমাণ পেলেন। বারাণসীরাজের ছিল ষোল হাজার মহিষী। কিন্তু সুভদ্রা অনুভব করলেন, রাজা এই ষোল হাজার মহিষীর মধ্যে তাঁকেই সব থেকে বেশি ভালবাসছেন। এতে সুভদ্রার খুশির সীমা রইল না। এমন এক খুশির দিনেই পূর্বজন্মের সমস্ত কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা। অনাহার ব্রতের কথা।



সুভদ্রা একদিন ভাবল, 'এজন্মের মত আমার সুখ-সম্পদের আশা মিটেছে। এখন পূর্বজন্মের প্রতিজ্ঞা পূরণই আমার একমাত্র কাজ। এবার রাজার কাছে গজরাজের কথা বলতে হবে। যে করে হোক, তাকে ধরে আনতে হবে।' এই ভেবে সে সারা শরীরে তেল মেখে, মলিন ও ছেঁড়া কাপড় পরে শুয়ে পড়ল। দরজায় খিল পড়ল। এ সবই রাণীর শোক-দুঃখের লক্ষণ। যথাসময়ে রাজার কানে কথাটা গেল। হন্তদন্ত হয়ে তিনি ছুটে চলেন। দরজায় টোকা দিলেন। সুভদ্রা বিষণ্ণ মুখে দরজা খুলে দিল।

কি হয়েছে তোমার ?

তেমন কিছু নয়।

আমাব কাছে গোপন কোবো না।

আমি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি।

কিসেব স্বপ্ন ?

দেখুন মহাবাজ,আপনার কাজ নেই সে স্বপ্নেব কথা শুনে···

ও কথা বোলো না।

এভাবে বাজার কৌতূহল ক্রমাগত বাড়িয়ে চলল সে। শেষে বাজাকে এই কথা বলিয়ে নিতে পাবল, 'তোমাব কোন বাসনাই আমি অপূর্ণ বাখব না।' এবাব সুভদ্রা সুনিশ্চিত হল, গজবাজেব ওপর প্রতিশোধ নিতে পাববে।

সুভদ্রা বলল—'মহাবাজ আমাব স্বপ্নেব কথা আপনাকে বলব। তবে তাব আগে আপনি বাজ্যের সব ব্যাধকে ডেকে পাঠান। তাবা এলে, তাদেব সামনেই আমি সব কথা খুলে বলব।'

বাবাণসীবাজ সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জাবি কবলেন। দেখতে দেখতে দলে দলে ব্যাধ আসতে লাগল। কাশীবাজ্যেব তিনশ যোজনেব মধ্যে যত ব্যাধ ছিল সবাই হাজিব হল। তাবা কেউ খালি হাতে আসে নি। সঙ্গে এনেছে রাজাব জন্য নানাবকম উপহাব। সব মিলে তাদেব সংখ্যা দাঁড়াল ছ হাজাব। বাজা সুভদ্রাকে ডেকে বললেন :

'বাণী, ব্যাধরা সবাই এসেছে। এদের সম্পর্কে তোমাকে বলি, আমার আজ্ঞা পূরণ কবতে এরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। অবণ্য এদের নখদর্পণে। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই এবা অরণ্যের দুর্গম অঞ্চলে কাটিয়েছে। অরণ্যেব কোথায় কি আছে সবই ওবা নিখুঁত জানে। তুমি তোমার বাসনাব কথা অনায়াসে এদের বলতে পাব।'





সুভদ্রা ব্যাধদেব দিকে একবাব তাকিয়ে বলল, 'ওহে ব্যাধেব দল, আমি ছ-দাঁতওয়ালা একটি হাতি স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্নে তাব দাঁত দেখা অবধি আমাব মন আকুল হয়ে আছে দাঁতগুলোব জন্য। ঐ দাঁত না পেলে আমাব জীবনই বৃথা। তোমবা আমাকে ঐ দাঁত এনে দাও। নইলে আমি দুঃখে মবে যাব।'

ব্যাধেব দল ছ-দাঁতওয়ালা হাতিব কথা কস্মিন কালে শোনেনি। তাবা অবাক। হাতিব ছ'টা দাঁত, এ কখনো হয়? ভিড়েব মধ্য থেকে এক ব্যাধ জিজ্ঞেস কবল, 'হাতিটা কোথায় থাকে তা না জানলে কি কবে তাকে ধবব। এবকম হাতিব কথা তো আমবা কখনও শুনিনি।' অন্যেবাও এ বকম নানা সংশয়েব কথা বলতে লাগল। শুধু একজন নির্বিকাবভাবে সব শুনে যেতে লাগল।



সুভদ্রা ভিড়েব মধ্যে একজন যোগ্য ব্যাধ খুঁজতে লাগল। তার চোখ ভিড়ের ওপব দিয়ে সবে যেতে লাগল। এমন সময় সবচেয়ে লম্বা সুবিশাল শবীবেব কুৎসিত দর্শন এক ব্যাধকে তাব মনে ধরল। সে যেমন লম্বা, তাব শবীবটিও সেবকম বিশাল। যেন একটি ছোটখাট পর্বত। বিশাল থামেব মত দুটি পা। বিস্তীর্ণ পাহাড়েব গায়েব মত তাব বুক। কুৎসিত মুখটি গোঁফদাড়িতে ঢাকা। হলদে বীভৎস দাঁত। এব নাম শোনোত্তর। শোনোত্তব এব আগেব জন্মে ছিল বোধিসত্ত্বেব শত্রু।

সুভদ্রা শোনোত্তবকে দেখে খুবই খুশি হল। তার মনে হল, পাবলে এই লোকটাই পাববে। সুভদ্রা মহাবাজকে বলল, 'প্রভু, আমাব মনে হচ্ছে এই শোনোত্তবই পাববে। আপনি অনুমতি দিলে আমি ওর সঙ্গে একটু গোপনে কথা বলি।' রাজা বললেন, 'নিশ্চযই।' সুভদ্রা তখন শোনোত্তবকে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদেব ছাতে উঠল।

প্রাসাদেব ছাত থেকে উত্তবে হিমালয পর্বতমালা আর তার চূড়া-গুলো স্পষ্ট দেখা যায। তখন মাঝ দুপুর। সূর্যের আলোয পাহাড়েব চূড়াগুলো ঝলমল কবছে। শোনোত্তবকে দেখিয়ে সুভদ্রা বলল, 'ঐ যে পাহাড়েব চূড়া দেখছ, তোমাকে যেতে হবে এই পথ দিয়ে

সোজা উত্তরে। পথে সাত পাহাড় পড়বে। ওদের মধ্যে এক পাহাড়ের চূড়ো দেখে মনে হবে সোনায় মোড়া। সেখানে দেবতারা থাকেন। তুমি ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নিচের দিকে তাকাবে। তখন তোমার চোখে পড়বে এক অকল্পনীয় বিশাল বটগাছ। আট হাজার ডালপালা সমেত ঐ গাছটির দিকে তাকালে মনে হবে যেন সেখানে নরকের রাস্তা বাসা বেঁধেছে। তুমি সোজা চলে যাবে ঐ গাছের কাছে। এবার ভাল করে শোন, ঐ গাছের কাছেই তুমি দেখতে পাবে ছ-টি দাঁতওয়ালা বিশাল এক শ্বেতহস্তীকে। এই হাতিটি আট হাজার হাতির রাজা। আট হাজার হাতি এর সেবায় নিযুক্ত। ওদের অবহেলা কোরো না। ঐ হাতিগুলো সাংঘাতিক। তারা নিঃশ্বাস ফেললেই শয়ে-শয়ে মানুষ মারা পড়বে। তাছাড়া বাতাস শুঁকেই তারা বিপদের আঁচ পেয়ে যায়। আর একবার বিপদের গন্ধ পেলেই তারা ভয়াবহ হয়ে ওঠে।'

'রাণীমা!'

'কি, ভয় করছে?'

'আপনার তো ধনরত্নের অভাব নেই।'

'তবুও ঐ গজদাঁত আমার চাই।'

'বেশ।'

'তুমিই পারবে, ভয়কে জয় কর।'

সুভদ্রা ব্যাধকে ধনরত্নের খুব লোভ দেখাল। গরিব ব্যাধ সেই লোভ এড়াতে পারল না। তাছাড়া সে অস্বীকার করলে তাকে কয়েদ করা হতো। সুতরাং রাজি হতেই হল। সুভদ্রা তাকে বলল, 'তুমি সাতদিন পরে এস, এর মধ্যে তোমার অভিযানের জন্য যা যা দরকার সব কিছুই আমি তৈরি করে রাখব। এস, এখন তোমাকে জায়গাটা আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিই।'



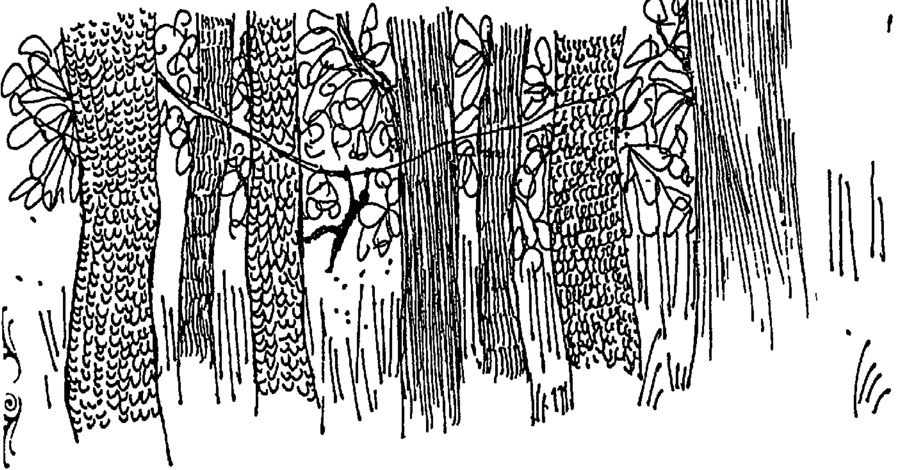


৪

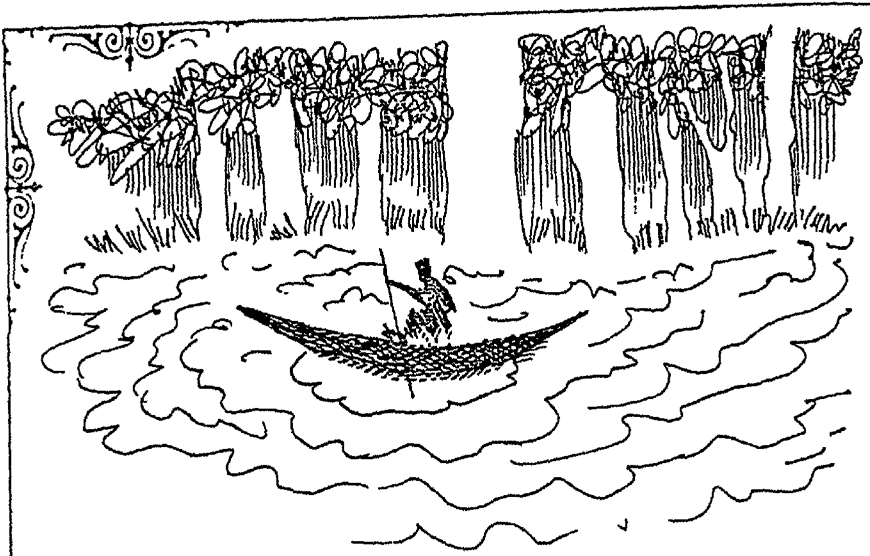
ব্যাধ চলে যাওযাব পব সুভদ্রা কামাব আব চামাবদেব ডেকে পাঠাল। কামাবদেব আদেশ দিল নানাবকম কোদাল গাঁইতি বানানোর জন্য। চামাবদেব বলা হল, বিশাল এক চামডার থলে বানাতে। থলেটা এমন হবে যাতে খুব ভারি জিনিসও তাতে অনাযাসে বযে নিযে যাওযা যায। বাঁশেব ঝোপ কেটেফেলার প্রচুব যন্ত্র, শাবল, কাস্তে, কোদাল তৈবি কবানো হল। চামডাব থলেও তৈবি হল।

সাত দিন পরে শোনোত্তব এল। সে যাওযাব জন্য একেবারে তৈবি হযে এসেছে। সুভদ্রা তাকে প্রচুব অস্ত্রশস্ত্র আব খাবার দাবাব দিল। সেসব ঐ চামডাব থলেতে পুবে ব্যাধ থলেটা হাতে তুলে নিল। সুভদ্রাকে প্রণাম করে শোনোত্তর রওনা হল।

গ্রামেব পর গ্রাম, শহরেব পব শহব, অবণ্যের পব অরণ্য উজিযে শোনোত্তর হিমবন্ত প্রদেশে এল। রথ সেখান থেকে ফিবে গেল। কেননা এব পব পথেব শেষ। তাকে এখন শুধুই অবণ্যের মধ্য দিযে যেতে হবে। মাইলেব পর মাইল উজিযে ঐ গভীব অন্ধকাব বন পেবিযে সে চলতে লাগল। বনেব কাঁটায তাব পা ক্ষত বিক্ষত, এদিকে পথের শেষ নেই। পা আব চলে না। নিশ্ছিদ্র সেই বন। সাপ পর্যন্ত সেই ঠাসা জঙ্গল ভেদ কবে যেতে পাববে না। শোনোত্তব তখন বাঁশঝোপেব ডাল ধবে, গাছেব ঝুরি ধবে দোল খেতে খেতে শূন্য পথে এগিযে চলল। সামনে এবার এক জঙ্গলাকীর্ণ জলাশয।







এবার উপায়? শোনোত্তর শুধু বলশালী নয়, যথেষ্ট চতুরও। তৎক্ষণাৎ বাঁশ কেটে একটি ডোঙা বানাল। সেই ডোঙা বেয়ে ঐ জলাশয় পেরিয়ে গেল। এভাবে একদিন পাহাড়টির কোলে এসে পৌঁছল। সুভদ্রা তাকে ত্রিশূলের মত কিছু অস্ত্র দিয়েছিল। আগে সে জানত না এগুলো কোন কাজে লাগবে, গাঁইতিগুলো দিয়েই বা কি হবে। এবার থলে হাতড়ে সেসব বের করতে গিয়ে বুঝল, এ সবের সাহায্যেই পাহাড়ে উঠতে হবে। ত্রিশূলে চামড়ার দড়ি বেঁধে সে পাহাড়ের খাঁজে ছুঁড়ে মারল। তারপর দড়ি ধরে ধরে পাহাড়ের মাথায় উঠে এল এক সময়। পাহাড়ে ওঠার পর সে থলে থেকে চামড়ার ছাতা বের করল। সেই ছাতার সাহায্যে শূন্যে ভেসে ভেসে সে পাহাড় থেকে নিচে নেমে এল। একে একে সাতটি পাহাড় এভাবে পেরিয়ে গেল।

এবার সেই বিশাল জলাশয়। জলাশয়ের এক পাশে বিশাল বট গাছটি-ও দেখা গেল। ব্যাধ বুঝল ছ-দাঁতওয়ালা শাদা হাতি এই গাছের কাছেই থাকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে নিজের চোখেই তাকে দেখতে গেল। সত্যি আট হাজার হাতির পাল ঘিরে আছে ঐ মহা বলশালী গজরাজকে। নিজের গায়ের জোর আর শক্তি-ও কম নয়। তবু সে ভয় পেল। হাতিদের বিশাল-বিশাল চেহারা, বিরাট দাঁত শোনোত্তরকে বেজায় ঘাবড়ে দিয়েছে।

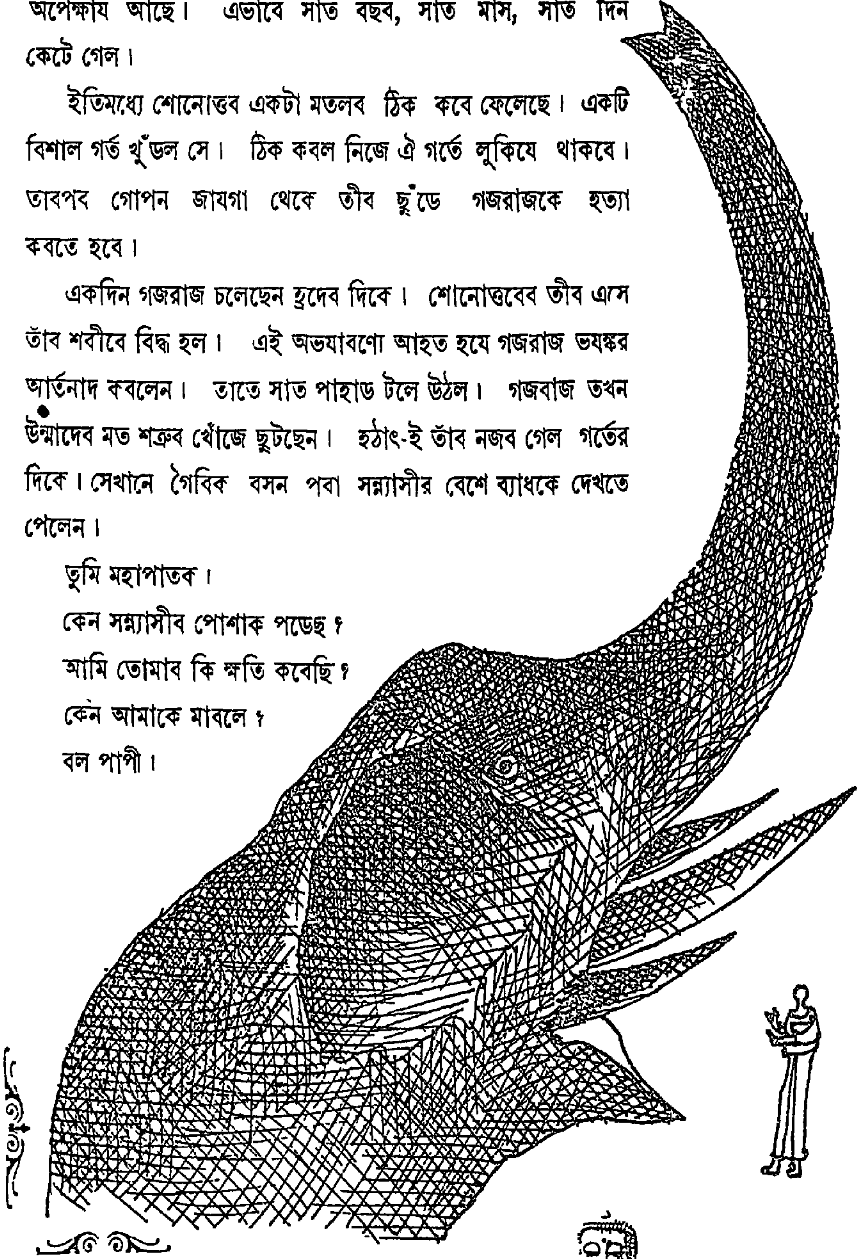


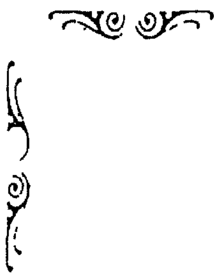
শোনোত্তবেব ফেবাব পথ নেই। গজবাজের দাঁত তাকে নিতেই হবে। নাহলে বাজবোষে পডতে হবে। তাছাড়া কাজ সাঙ্গ হলে শোনোত্তরের দাবিদ্র্যও ঘুচে যাবে। সে অপেক্ষা করতে লাগল। নজর বাখতে লাগল গজবাজেব যাতাযাতেব বাস্তার দিকে। গজরাজের যাতাযাতেব পথটি যেমন ভযঙ্কর তেমনি দুর্গম। শোনোত্তর সুযোগের অপেক্ষায আছে। এভাবে সাত বছব, সাত মাস, সাত দিন কেটে গেল।

ইতিমধ্যে শোনোত্তব একটা মতলব ঠিক কবে ফেলেছে। একটি বিশাল গর্ত খুঁডল সে। ঠিক কবল নিজে ঐ গর্তে লুকিযে থাকবে। তাবপব গোপন জাযগা থেকে তীব ছুঁডে গজরাজকে হত্যা কবতে হবে।

একদিন গজরাজ চলেছেন হ্রদেব দিকে। শোনোত্তবেব তীব এসে তাঁব শবীবে বিদ্ধ হল। এই অভযাবণো আহত হযে গজরাজ ভযঙ্কর আর্তনাদ কবলেন। তাতে সাত পাহাড টলে উঠল। গজবাজ তখন উন্মাদেব মত শত্রুব খোঁজে ছুটছেন। হঠাৎ-ই তাঁব নজব গেল গর্তের দিকে। সেখানে গৈবিক বসন পবা সন্ন্যাসীর বেশে ব্যাধকে দেখতে পেলেন।

তুমি মহাপাতক।
কেন সন্ন্যাসীব পোশাক পড়েছ?
আমি তোমাব কি ক্ষতি কবেছি?
কেন আমাকে মাবলে?
বল পাপী।





ব্যাধ তখন ঐ বিশালাকাব গজবাজকে বিনীতভাবে জানাল— 'আমার অপরাধ নেবেন না। কাশীরাজেব প্রধানা মহিষী আপনার দাঁত আনতে আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনিই আমাকে আপনাব গোপন বাসেব সন্ধান দিয়েছেন।'

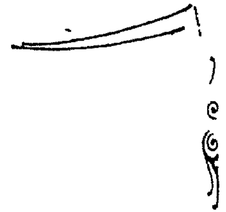
বোধিসত্ত্ব মুহূর্তেব মধ্যে অনুভব কবতে পাবলেন কে তখন কাশীরাজেব প্রধানা মহিষী। আর কেনই বা সে এসব করেছে। ব্যাধকে বললেন, 'দেখ, যদি তোমাব শুধু দাঁতেব দবকার হতো তাহলে আমাকে বলতে পারতে। আমাব বাবা-ঠাকুর্দাব দাঁত কোথায আছে আমি জানি। সেসবই আমি তোমাকে দিতে পাবতাম। তুমি অনর্থক আমাকে হত্যা করলে। যা হবার তা হয়েছে। এখন তুমি



আমাব দাঁত কেটে নিতে পাব। বাণীকে গিযে বোলো গজরাজ মারা গেছে, এই তাঁব দাঁত।'

গজরাজের অনুমতি পেযে ব্যাধ তাঁব দাঁত কাটতে চেষ্টা কবল। অনেকক্ষণ করাত চালিযেও সে একটুও কাটতে পাবল না। তখন গজরাজ বললেন, 'করাতটা আমাব শুঁড়েব কাছে নিয়ে এসো। এরপর সেই শীলবান গজরাজ নিজেই নিজেব দাঁত কেটে ফেললেন। ব্যাধ দাঁত নিযে চলল। হাতিব পাল এসে ঘিরে দাঁড়াল তাদের প্রভুকে। তাঁকে নিযে চলল পূর্বপুরুষদেব সমাধিক্ষেত্রেব দিকে।

ওদিকে জন্ম-জন্মান্তব পর্যন্ত পুষে বাখা বাগ ও হিংসা সত্ত্বেও সুভদ্রা যখন গজবাজেব দাঁত পেলেন সঙ্গে সঙ্গে দুঃখে-শোকে তার ও অন্তর পূর্ণ হযে গেল। দাঁত দেখে পূর্ব জন্মেব স্বামীব দাঁত বলে চিনতে তাব ভুল হয নি। সে ভেবেছিল, গজবাজকে একটু বিপদে ফেলবে। সুভদ্রা স্বপ্নেও ভাবেনি এই ব্যাধ মহান গজরাজকে সত্যি হত্যা কবতে পাববে। শোকে-দুঃখে সুভদ্রার জীবনও অকালে শুকিযে গেল।





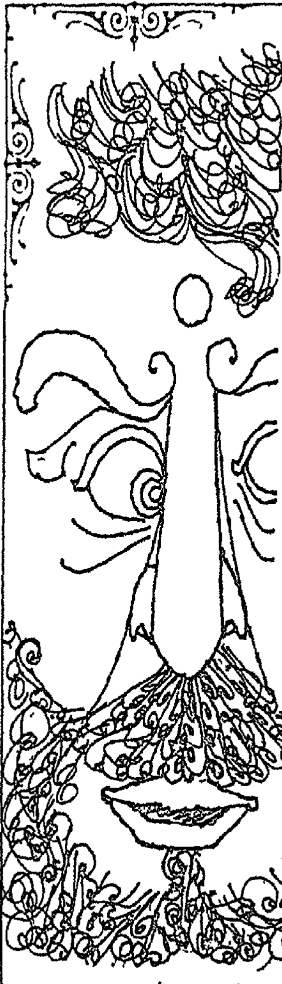
গণ্ডাতিন্দু জাতক

সে অনেককাল আগের কথা। ভারতবর্ষে তখন কাম্পিল্য নামে এক রাজ্য ছিল। কাম্পিল্য রাজ্যের উত্তর পঞ্চাল নগরে পঞ্চাল নামে এক রাজা ছিলেন। অত্যাচারী রাজা হিসেবে তাঁর তুলনা মেলা ভার। নিষ্ঠুর পঞ্চালের অত্যাচারে প্রজাদের জীবন ওষ্ঠাগত। যেমন রাজা, ঠিক তেমনি তার মন্ত্রীকুল। পাহাড়ের মত খাজনার বোঝা। নির্দয় রাজার হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রজারা দেশ ছাড়ল। তারা বনে বনে ঘুরে বেড়াত।

প্রজারা নগর ছেড়ে চলে গেলে তাদের বাস্তু জমিতে আগাছা জন্মাল। ঝোপে-জঙ্গলে-বনে উত্তর পঞ্চালের গ্রামগুলি হয়ে উঠল জনশূন্য এক অরণ্য। বেচারা প্রজারা ঘরে ফেরার চেষ্টা করলে রাজার পেয়াদারা তাদের ওপর এমন অত্যাচার করত যে তারা বাধ্য হতো আবার পালিয়ে যেতে। অনাহারে, অত্যাচারে রোজই মানুষ মারা যেত। দিনের বেলায় পর্যন্ত গ্রামগুলোয় শিয়াল ডাকতে শুরু করল।

বাস্তু ভিটের টান বড় সাংঘাতিক। এত কষ্ট ও অত্যাচার সত্ত্বেও রাতের দিকে প্রজারা নিঃসাড়ে গ্রামে ফিরে আসত। দিনের আলো ফোটার আগেই আবার তারা উধাও হয়ে যেত। এর মধ্যে কেউ





কেউ দস্যুদেব হাতে পড়ত। তাদেব সর্বস্ব লুট করে নিত দস্যুর দল। অসহায় প্রজারা দস্যুদেব কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইত। দস্যুদেব রক্ত-লিপ্সা ছিল সাংঘাতিক। অসহায় প্রজাবা দলে দলে তাদের হাতে প্রাণ দিত। দস্যুদের হাত থেকে কোন ক্রমে যারা বেঁচে যেত, তাদেব আবার প্রাণ দিতে হত রাজার পেযাদাদের হাতে।

যে সময়েব কথা বলা হচ্ছে, বোধিসত্ত্ব তখন বৃক্ষদেবতা হিসেবে জন্ম নিয়েছেন। একটি সুবিশাল গাব গাছে ছিল তাঁব অধিষ্ঠান। অত্যাচারী বাজা সামান্য ধর্ম-ভীরু ছিলেন। বৃক্ষ দেবতারূপী বোধি-সত্ত্বকে তিনি প্রতি বছব পুজো করতেন। পুজোর জন্য বছরে এক হাজার টাকা ববাদ্দ ছিল। বোধিসত্ত্ব বৃক্ষ দেবতা হিসাবে সেই পুজো গ্রহণ কবতেন। কিন্তু রাজাব সমস্ত অপরাধকে তিনি ক্ষমা করে দিতেন তা নয়। রাজাব অত্যাচারের বহব তাঁব জানা ছিল। সবই দেখতেন। সবই বুঝতেন। বোধিসত্ত্ব একদিন মনে মনে ভাবলেন, 'বাজা ধর্মভীরু হযেও অত্যাচাবী। তাব বুদ্ধিব দোষ ও নৃশংসতায় গোটা বাজ্য ডুবতে বসেছে। কিছু একটা কবা দরকার। এমন কিছু কি কবা যায় না, যাতে রাজার মনটা ভাল দিকে টেনে আনা যায়?'



বাজা যেহেতু বোধিসত্ত্বের উপাসক, সুতরাং তাঁর তো একটা দায়িত্বও আছে। এই ভেবে একদিন তিনি সশরীরে রাজাকে দেখা দিলেন। গভীর রাতে তিনি রাজার শিয়রে উপস্থিত হলেন। রাজা দেখলেন এক দীর্ঘদেহী পুরুষ তাঁব মাথাব সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর শরীর অনন্ত সূর্যকিরণে ঝলমল করছে। রাজা প্রথমে ভয়ে শিউরে উঠলেন, 'কে এই দীর্ঘদেহী পুরুষ? ইনি কি দেবতা? না কি যমদূত?' মনে জোর এনে বাজা নিজেব ঘোব কাটালেন। কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রাজপুরুষ, আপনি কে? দেব? দানব? না কি যক্ষ? দযা করে নিজের পরিচয় দিন। আব কেনই বা এমন অসময়ে আপনি আমাকে দেখা দিলেন?'



বোধিসত্ত্ব শান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, 'শোন হে রাজা। আমার নাম তিন্দুক। আমি সেই গাছের দেবতা, যে গাছটিকে তুমি প্রতি বছর পুজো করে থাক। তুমি আমার উপাসক। সেজন্য তোমার মঙ্গল দেখা আমার কর্তব্য। আমি আজ এসেছি তোমাকে কিছু সদুপদেশ দিতে।'

রাজা বৃক্ষ দেবতাকে মান্য করতেন। হয়ত নিজের অধর্ম আচরণের ব্যাপারটাও কিছুটা টের পেতেন। ফলে মনে মনে শঙ্কিত হলেন। বৃক্ষ দেবতাকে প্রণাম করে বললেন :

'বলুন প্রভু, আমি আপনার উপদেশ শুনতে আগ্রহী।'

'রাজা,তোমার প্রজাকুল কি শান্তিতে আছে?'

রাজা নিরুত্তর।

বৃক্ষ দেবতা আবার বললেন,'তুমি জান তারা শান্তিতে নেই।'

'হ্যাঁ,জানি প্রভু।

'তোমার অত্যাচারেই তাদের জীবন আজ বিপন্ন।'

'হয়ত আপনি ঠিকই বলছেন।'

'এতে তোমারই রাজ্য নষ্ট হবে।'

'এখন আমার কি কর্তব্য তাই বলুন।'

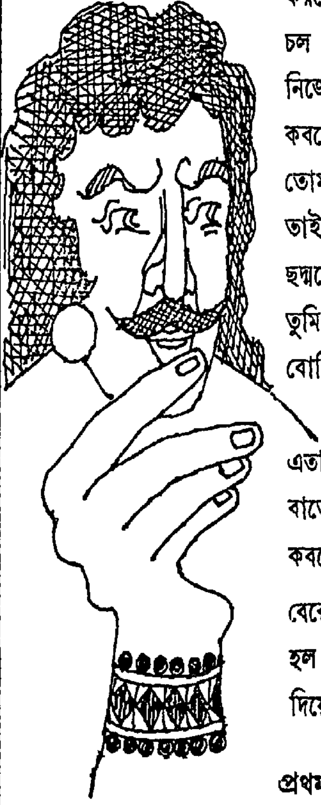
'যে অন্যায় তুমি করেছ তাতে পরলোকেও শান্তি পাবে না।'

'দয়া করে বলুন আমার কি করা উচিত।'





বৃক্ষদেবতারূপী বোধিসত্ত্ব তখন রাজাকে একে একে সৎ পরামর্শ দিতে লাগলেন, 'দেখ রাজা, কর্ম অনুসারে ফল লাভ ঘটে। ইহলোকে তুমি যদি মঙ্গল কাজে রত থাক পরকালে তাহলে অমৃত-ফল লাভ করবে। স্বর্গে তোমার জন্য সংরক্ষিত থাকবে আসন। কিন্তু যদি তা না কর তাহলে মৃত্যু তোমাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করবে। ভেবেচিন্তে কাজ করলে যমপুরীকে তোমার ভয় না করলেও চলবে। কিন্তু যদি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মত্ত হাতির মত চল তোমার পতন অনিবার্য। যাই হোক, আমার মনে হয় তুমি নিজের কাজের ফল সম্পর্কে আদৌ সজাগ নও। তুমি অনুভবই করতে পার না যে প্রজাদের কি সর্বনাশ তুমি করেছ। তারা তোমাকে কি চোখে দেখে, কত নিন্দা করে, কিছুই জান না। তাই আমার প্রথম পরামর্শ হল, তুমি ছদ্মবেশ ধারণ কর। ছদ্মবেশে নিজের রাজ্যে ঘুরে বেড়াও। স্বচক্ষে দেখ কি নরক তুমি রচনা করেছ। তারপর অন্য কথা।' এইমাত্র পরামর্শ দিয়ে বোধিসত্ত্ব অদৃশ্য হলেন।



পরের দিন সকালে রাজার প্রথম চিন্তাই হল নিজের অপকর্ম। এতদিন যেন এক দুঃস্বপ্নের ঘোরের মধ্যে দিয়ে চলেছিলেন। গতকাল রাতে বৃক্ষদেবতা স্বয়ং তাঁর সেই ঘোর ভেঙ্গে দিয়েছেন। রাজা স্থির করলেন বৃক্ষদেবতার পরামর্শ অনুসারে তিনি ছদ্মবেশে রাজ্য ভ্রমণে বেরোবেন। পুরোহিতকে ডেকে ভ্রমণের বন্দোবস্ত করা হল। ঠিক হল দুজনে ছদ্মবেশে একসঙ্গে রওনা দেবেন। রাজ্যের ভার মন্ত্রীকে দিয়ে রাজা পরের দিন সকালে পুরোহিতের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

প্রথম দৃশ্য

রাজা কিছুদূর গিয়েছেন, এমন সময় কে যেন যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। রাজা পুরোহিতকে বললেন, 'চলুন, ওদিকে যাই, কি ব্যাপার দেখে আসি।' একটু এগোতেই এক বৃদ্ধ গ্রামবাসীর দেখা পেলেন। তাঁর পা দিয়ে রক্ত পড়ছে। সঙ্গে তাঁর পরিবার। সকলেই কাঁদছে। রোজ ভোরে বাড়িটিতে তালাচাবি দিয়ে তারা বনে চলে যেত। সেপাই আর দস্যুদের হাত থেকে নিজেদের সামান্য হাঁড়িকুড়ি বাঁচাবার জন্য চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রেখেছিল। বৃদ্ধের পায়ে সেই



কাঁটাই ফুঁটে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধ অভিশাপ দিচ্ছিলেন, 'আজ আমি যে বকম কাঁটাব যন্ত্রণায কষ্ট পাচ্ছি, এদেশেব বাজা পঞ্চালও যেন এইবকম কষ্টে ছটফট করে।' শুনে বাজা শিউবে উঠলেন। আসলে কথাটা বৃদ্ধ বলেন নি। বোধিসত্ত্ব তখন ঐ বৃদ্ধেব দেহে প্রবেশ কবে কথাটা বলান।

বাজা আব পুবোহিত বৃদ্ধেব কাছে এগিযে গেলেন। পুবোহিত বৃদ্ধকে বললেন, 'দেখো বাপু, তোমাব তো আচ্ছা আক্কেল। কাঁটা বিঁধল নিজেব দোষে, খামোকা বাজাকে শাপ দিচ্ছ কেন।'

'দেখ বাপু, বাস্তায ধাক্কা খেলেও বাজাব দোষ দেব।'

'কেন?'

'বাজাব সেপাইদের ভযে পালাতে গিযেই আজ আমাব এই দশা হযেছে।'



এরপব বৃদ্ধ বাজাব নামে অনেক অ'কথা-কুকথা বললেন। তবে কথাগুলো মিথ্যে নয। বৃদ্ধেব মধ্য থেকে বোধিসত্ত্ব বলে উঠলেন, 'আজ যদি বাজা পাবও না হতো তাহলে তাব সেপাইদেব সাধ্য হতো না আমাদেব অনিষ্ট কবার।'

শুনে বাজাব হুঁশ ফিরে এল। পুবোহিতকে বললেন, 'চলুন, ঘবে ফেবা যাক। এখন সবই বুঝতে পাবছি।' কিন্তু পুবোহিতের মধ্য থেকে তখন বোধিসত্ত্ব বলে উঠলেন, 'মহারাজ, আবেকটু দেখা যাক।'

দ্বিতীয় দৃশ্য

আবাব তাঁবা পথ চলছেন। কিছুদূব এগোতেই আবার কান্নাব পেলেন। শব্দ শুনে তাঁবা এগিযে চললেন। হঠাৎ দেখেন একটা তালাবন্ধ বাডিব সামনে এক বৃদ্ধা মাটিতে গডাগড়ি দিযে কাঁদছেন। কাছে যেতে দেখলেন বৃদ্ধা বলছেন, 'যে বাজাব বাজ্যে আইবুডো মেযেব বিযে হয না সে বাজা চিতেয ওঠে না কেন? কেন তাঁর সর্বনাশ হয না? বংশলোপ হয না? পঞ্চাল, তুইও আমাব মত আগুনে পুডবি। তুইও এক ফোঁটা শান্তি পাবি না।'

কাঁদছ কেন মা?

তোমবা কে?

আমবা ভিনদেশী পথিক।

আমাদেব দেশ ছাবখার হয়েছে রাজাব অত্যাচাবে।

তাই নাকি!

আমাব মেয়েদের বিয়ে দেব এমন পাত্র মিলছে না।

কেন?

লোকজন সব সেপাইদেব ভয়ে বনে চলে গেছে।

তৃতীয় দৃশ্য

রাস্তায় দেখা গেল এক চাষী বাজাব মুণ্ডুপাত কবছে। চাষী বুক চাপড়াচ্ছে আব বলছে, 'আমাব বলদ যে ভাবে মবল পঞ্চালও যেন সেভাবে মবে।' পুবোহিত এবাবও চাষীকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'ভাই, কি কবে তোমাব বলদ মরল?' চাষী জবাব দিল, 'লাঙলের খোঁচা খেযে।' পুবোহিত অবাক হযে জিজ্ঞেস কবলেন, 'তাহলে বাজাকে গাল দিচ্ছ কেন?' চাষী বলল, 'কাবণ আছে ভাই। বাজার সেপাই আজ আমার হাঁড়িব ভাত কেড়ে খেয়ে নিয়েছে। পেটে দানা নেই। লাঙল দেওয়াব সময খেযালই কবিনি যে গরুটাব পেটে খোঁচা লেগেছে। সেই অবস্থায তাকে দিযে লাঙল টানিযেছে। খিদেব জ্বালায আমাব হুঁশ ছিল না। বাজাব জন্যই তো এটা হল। নাহলে বলদটা অমন বেঘোবে মবে?'

চতুর্থ দৃশ্য

হাঁটতে হাঁটতে দিন ফুরল। বাতটা এক গ্রামে কাটিয়ে পবেব দিন আবাব তাঁবা হাঁটতে শুরু কবেছেন। বাস্তায একটা সোরগোল শোনা গেল। এক চাষীকে তাব গোরু এমন চাট মেবেছে যে বেচাবা যায যায়। সেও বাজাকে অভিশাপ দিচ্ছিল। কাবণ গোরুটা দুষ্ট ঠিকই, কিন্তু সেপাইব ভযে তাড়াতাড়ি দুধ দুইতে না গেলে বেচাবাকে অমন মোক্ষম চাট খেতে হতো না।







পঞ্চম দৃশ্য

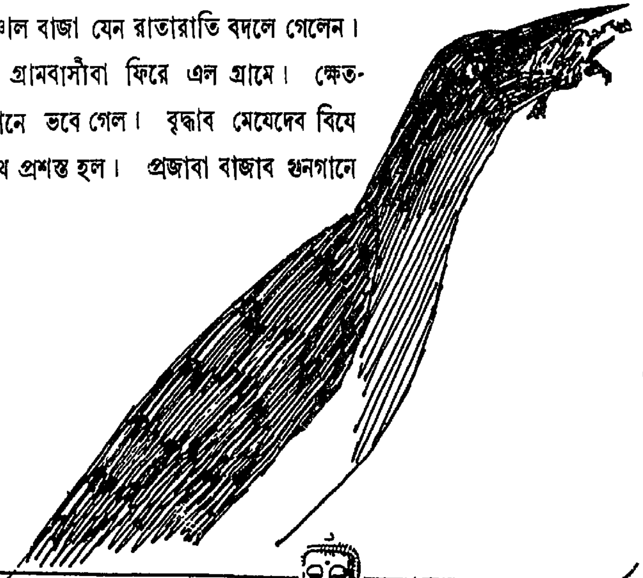
মাইলখানেক আরও দক্ষিণে এগোনর পর রাজা শুনলেন বালকের দল রাজাকে অভিশাপ দিচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, একটি গাভী মারা গেছে। রাজার সেপাইরা ঐ গাভীর বকনা বাছুরটি কেড়ে নিয়ে গেছে। তারা বকনাটাকে কেটে খেয়ে ফেলেছে। সেই দুঃখেই গাভীটি মৃতপ্রায়।

ষষ্ঠ দৃশ্য

আরও কিছুদূর এগোনোর পর দেখা গেল কাকেরা ব্যাঙ ধরে খাচ্ছে। আর ব্যাঙের দল গ্যাঙর-গ্যাঙ গ্যাঙর-গ্যাঙ করে রাজাকে অভিশাপ দিচ্ছে। পুরোহিত এবার উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'এ তো অদ্ভুত কাণ্ড। ও ভাই ব্যাঙের দল। কাক ব্যাঙ ধরে খাচ্ছে তাতে রাজার দোষ কোথায়?'

ব্যাঙের দল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'তুমি মহামূর্খ! রাজার কাজের ফল কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তোমার ধারণা নেই। রাজার অত্যাচারেই আজ গৃহস্থরা বনবাসী হয়েছে। এঁটোকাটা পড়ছে না। কাকদের খাবারের আকাল দেখা দিয়েছে, তবেই না তারা আমাদের ধরে খাচ্ছে।'

পর পর এই ছটি দৃশ্য দেখবার পর রাজা ফিরতে চাইলেন। বোধিসত্ত্ব পুরোহিতের মধ্যে থেকে বাধা দিলেন না। কারণ তিনি ততক্ষণে বুঝছেন রাজা নিজের পাপের ওজন বুঝতে পেরেছেন। আর সত্যিই তাই। এরপর পঞ্চাল রাজা যেন রাতারাতি বদলে গেলেন। দুষ্ট সেপাইরা শাস্তি পেল। গ্রামবাসীরা ফিরে এল গ্রামে। ক্ষেতগুলো আবার সোনালী ধানে ভরে গেল। বৃদ্ধার মেয়েদের বিয়ে হল। দান, ধ্যান ধর্মের পথ প্রশস্ত হল। প্রজারা রাজার গুনগানে পঞ্চমুখ হল।



ত্রিশকুন জাতক

১

বাবাণসীব রাজা তখন ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্ত নিঃসন্তান। সন্তানেব অভাবে তিনি পীড়িত। দেবতা এবং তপস্বীদেব কাছে ধর্ণা দিয়েও কোন সুবিধে হযনি। সন্তানেব আশা বলতে গেলে একবকম ছেড়েই দিয়েছেন। ওদিকে বাজকাজেও মন বসাতে পারছেন না। অনুচরদের পবামর্শে একদিন তিনি ভ্রমণে চললেন। সঙ্গে সভাসদগণ।

ঘুরতে ঘুবতে তাঁবা বাগানে এলেন। বাজাব মনে এমনিতেই সুখ নেই, তারপব এতটা পথ হাঁটায বেশ ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়লেন। বিশাল এক গাছের নিচে জরির কাজ কবা চাদর পেতে তিনি ঘুমে ঢলে পড়লেন। ঘুম ভাঙতেই তাঁব চোখে পড়ল গাছেব মগডালে চমৎকার একটি পাখির বাসা রয়েছে। বাজা এক অনুচবকে ডেকে বললেন, 'ঐ ডালে উঠতে পারবে?'



পারব মহারাজ।

যদি ওখানে পাখিব ডিম পাও যত্ন কবে নিয়ে আসবে।

যে আজ্ঞা মহারাজ।

দেখো তোমার নিঃশ্বাসও যেন ডিমে না লাগে।

পাখিব বাসায় ছিল তিনটি ডিম। অনুচব সন্তর্পণে ডিম তিনটি পেড়ে আনল। তাবপর একটি বাক্সে তুলো ভবে সেখানে ডিমগুলো আলতো করে বাখা হল। বাজা অনুচবদেব জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ডিমগুলো কিসের বল দেখি?' অনুচববা মাথা চুলকোতে লাগল। কেউ সঠিক জবাব দিতে পাবল না। একজন বলল, 'মহারাজ, ব্যাধরাই বলতে পাববে।' তখন বাজ্যেব সব ব্যাধকে ডাকা হল। তাবা ভাল কবে পবখ করে বলল, 'মহাবাজ, এব মধ্যে একটা ডিম পেঁচাব, একটা শালিকেব এবং আবেকটা হল শুক পাখিব।

সে কি কথা!

কেন মহাবাজ?

তিনজনেব ডিম কখনও এক বাসায় থাকে?



হ্যাঁ মহাবাজ। কখনও কখনও এবকম হয়।

ব্যাধদেব কথা শুনে বাজা মজা পেলেন। ঠিক কবলেন এই পাখিব বাচ্চাদেবই তিনি সন্তানেব মত লালন পালন কববেন। তিন মন্ত্রীব ওপব ভাব দেওয়া হল ডিম তিনটি বক্ষণাবেক্ষণেব। তাঁদেব সতর্ক কবে বলে দিলেন, 'মনে বাখবেন এরা সবাই আমাব সন্তান। যত্ন কবে বাখবেন। ডিম ফোটা মাত্র আমাকে খবব দেবেন।'

২

যথাসময়ে একদিন প্রথম ডিমটি ফুটল। তা থেকে বেবিয়ে এল পেঁচা। খবর পেয়ে রাজা খুশি। পেঁচাটি আবার পুরুষ পাখি হওয়ায় সকলে বলল, 'বাজার ছেলে হয়েছে।' তারপর শালিকের ডিম ফুটল। এ হল মেয়ে পাখি। সুতরাং খবর রটে গেল, 'রাজার একটি কন্যা হয়েছে।' ছেলেব নাম বাখা হয়েছিল বিশ্বম্ভর। মেয়ের নাম রাখা হল কুন্তলিনী। শুকের ডিম থেকে হল একটি ছেলে পাখি। তার নাম বাখা হল জম্বুক। রাজা এবার মন্ত্রীদের দেদার টাকাকড়ি দিয়ে বললেন, 'তোমরা আমাব তিন সন্তানকে সযত্নে পালন কববে।'

রাজাব পাখি-ছেলেমেয়েদেব ব্যাপার নিয়ে অমাত্যবা খুব হাসাহাসি করতেন। বাজাব কানেও একদিন কথাটা গেল। তখন তিনি ভাবলেন, এদেব একটু শিক্ষা দেওয়া দবকার। অমাত্যদের ডেকে বললেন, 'দেখ বাপু,আমাব পাখি-ছেলেমেয়েদেব সামান্য ভেবনা, কদিন পরেই আমি বিশ্বম্ভবকে ডেকে পাঠাব। তাকে একটা প্রশ্ন করব। দেখ, সে কেমন উত্তব দেয়।' বাজার হুকুমে দিন কয়েক পরে বিশ্বম্ভর সোনার দাঁড়ে চেপে এল।

'পুত্র বিশ্বম্ভব,বল তো এ পৃথিবীতে যে রাজা সুখে রাজত্ব করতে চায় তার কি কবা উচিত?'

বিশ্বম্ভর প্রথমে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইল। সে বলল, 'মহারাজ, এরকম অনর্থক প্রশ্ন কেন কবছেন, সব বাজাই তো সুখে রাজত্ব করতে চায়।' বাজা এতে শান্ত হলেন না। তখন বিশ্বম্ভব বলল:

'শুনুন মহাবাজ, সে বাজাব মিথ্যে কথা বলা চলবে না। ক্রোধ বর্জন করতে হবে। পরিহাসপ্রিয়তা ছাড়তে হবে। রাজাকে শান্ত থাকতে হবে, নইলে তাব বাজ্য ছারখাব হয়ে যাবে। অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে বাজা শুধু বাজকার্য কবে যাবেন।'



বিশ্বম্ভরের উত্তর শোনার পর রাজা সভাসদ ও অমাত্যদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা তো শুনলেন। এখন বলুন দেখি, আমার এই উপযুক্ত পুত্রকে কি কাজ দেওয়া যায়, যা ওর যোগ্য হবে।' সকলেই একবাক্যে বললেন, 'এঁকে সেনাপতির পদ দিন।'

৩

এরপর কিছুদিন কেটে গেল। রাজার ইচ্ছে হল এবার কুন্তলিনীর ক্ষমতা পরখ করবেন। রাজার আদরের কুন্তলিনীকে রাজসভায় নিয়ে আসা হল। বিশ্বম্ভরকে রাজা যে প্রশ্ন করেছিলেন কুন্তলিনীকেও সেই একই প্রশ্ন করলেন :



'কুন্তলিনী, রাজধর্ম বলতে কি বোঝ?'

এ প্রশ্নে কুন্তলিনী মৃদু হাসল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে বলতে শুরু করল : 'আপনি আমার পিতা। আমার মনে হচ্ছে আপনি আমাকে পরখ করতে চাইছেন। দেখতে চাইছেন পাখি হয়ে মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারি কিনা। এ ধরনের পরীক্ষা করা আপনার পক্ষে শোভা পায় না। তবু আপনি যখন জানতে চাইছেন আমি বলছি। শুনুন মহারাজ, রাজধর্মের মূল কথা হল যা নেই তা লাভ করা। আর যা আছে তা রক্ষা করা। রাজার উচিত এমন সব ব্যক্তিদের অমাত্য পদ দেওয়া যারা ধীরস্থির। মন্ত্রী নির্বাচনের সময় মনে রাখতে হবে রথের কথা। সঠিক সারথির হাতে পড়লে তবেই রথ ঠিকমত ছুটতে পারে। শুনুন রাজা, রাজধর্ম কেবল রাজার নিজের গুণে রক্ষা পায় না। রাজকর্মচারী নির্বাচনে রাজা যদি কোন ভুল করেন তাহলে তা মারাত্মক হয়ে ওঠে। প্রজাদের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। আর একটি কথা, আপনি ভুলেও সুরা পান করবেন না। ভালকে জয়ী করুন, মন্দকে করুন পরাভূত। ত্রিলোকে আপনার জয়ধ্বনি উঠবে।'





কুন্তলিনীর জবাব শুনে রাজা মন্ত্রী ও সভাসদদের বললেন, 'এখন আপনারা বলুন কুন্তলিনীকে কোন্ পদ দেওয়া উচিত?'

'ভাণ্ডাবরক্ষকের পদ, মহাবাজ।'

৪

এ ঘটনার কিছুদিন পরে বাজা তাঁব তৃতীয় সন্তান জম্বুককে পবখ কবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সাতদিনের মাথায় জম্বুককে নিয়ে আসা হল। বেশ আদর কবে রাজসভায় জম্বুককে আসন দেওয়া হল। জম্বুক প্রথমে রাজার কোলে এসে বসল। রাজা তাব মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ এভাবে কাটল। বাজা স্থিব করলেন জম্বুককে ভিন্ন ধবনের প্রশ্ন কববেন।

জম্বুক, তোমাকে একটা প্রশ্ন কবতে চাই।

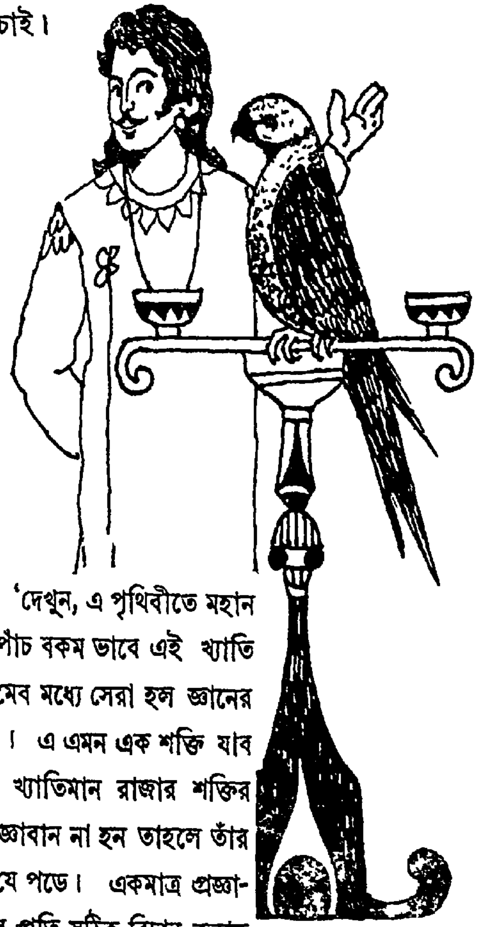
মহারাজের যেমন ইচ্ছা।

আচ্ছা জম্বুক, প্রকৃত ক্ষমতা কি?

মহারাজের আর কোন প্রশ্ন আছে?

হ্যাঁ। প্রকৃত ক্ষমতাবানই বা কে?

তাহলে শুনুন পিতা··



জম্বুক তাবপর বলতে শুরু কবলেন, 'দেখুন, এ পৃথিবীতে মহান বলে খ্যাতি যাঁবা পেয়েছেন দেখা গিয়েছে পাঁচ বকম ভাবে এই খ্যাতি তাঁবা অর্জন করেছেন। তবে এই পাঁচ বকমেব মধ্যে সেরা হল জ্ঞানের পথ। জ্ঞানই প্রকৃত ক্ষমতা, প্রকৃত শক্তি। এ এমন এক শক্তি যাব কাছে আব সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। খ্যাতিমান রাজার শক্তির প্রকৃত উৎস হল প্রজ্ঞা। রাজা যদি প্রজ্ঞাবান না হন তাহলে তাঁর পক্ষে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন অসম্ভব হয়ে পড়ে। একমাত্র প্রজ্ঞাবানই জানেন তিনি কে। ফলে তিনি নিজেব প্রতি সঠিক বিচার করতে



পাবেন। মহাবাজ, আপনিও প্রজ্ঞাবান হোন। আব যদি কখনও কুকর্ম না কবেন তাহলেই আপনাব প্রকৃত সুকৃতি নজরে পড়বে।'

জম্বুক ছিলেন মহাসত্ত্ব। এই জন্মে তিনি শকুনকুলে জন্মেছিলেন। প্রজ্ঞাব কথা ছাড়াও জম্বুক তাঁর পিতাকে ধর্ম সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। শীলব্রত শেখালেন। বললেন, 'বাজা যেন কোন অবস্থাতেই ধর্মেব পথ ত্যাগ না করেন। এমন কি যুদ্ধেব মত আপৎকালীন অবস্থাতেও।' জম্বুককে দেওয়া হল মহাসেনাপতিব পদ।

এব কিছু দিন পবে আয়ুক্ষয় কবে বাজা ইহলোক ত্যাগ কবলেন। তখন অমাত্যবা স্থিব করলেন, বিচক্ষণ জম্বুককেই বাজপদ দেওয়া উচিত। জম্বুক কিন্তু তাতে বাজি হলেন না। তিনি অমাত্য ও সভাসদদেব অনেক সুপবামর্শ দিলেন। রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন কিভাবে কবতে হবে সে বিষয়ে বিস্তব উপদেশ দিলেন। কিভাবে ধর্ম বক্ষা কবা যায় সে বিষয়েও অনেক কথা বললেন। তারপর সকলেব কাছে বিদায় চাইলেন। বললেন, 'এই ভাবে আপনাবাই বাজ্য পবিচালনা করুন, আমি অবণ্যে চলে যেতে চাই। বাকি জীবনটা নির্বিঘ্নে তপস্যা কবাই আমাব লক্ষ্য।'

শরভঙ্গ জাতক

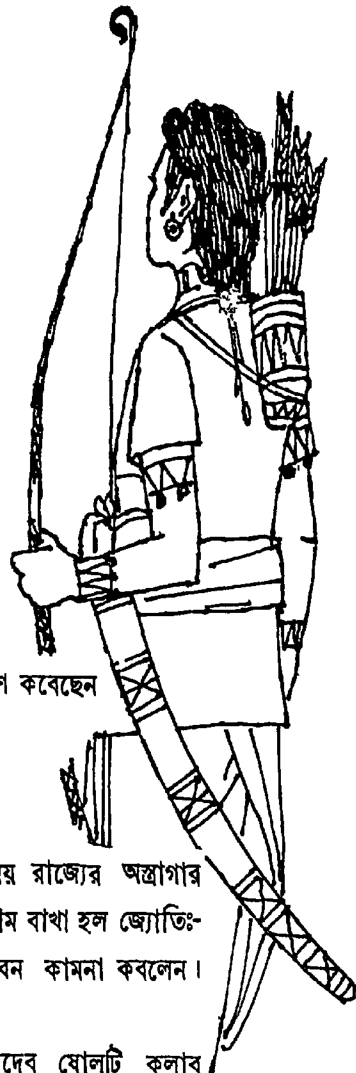
১



বারাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার তাঁব পুবোহিতের ছেলে হয়ে জন্মান। রাজপুরোহিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। পুত্রের জন্মক্ষণ বিচাব কবে তিনি গণনা কবতে বসলেন। পুত্রের জন্মক্ষণে নক্ষত্রের অবস্থান থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, এই ছেলে বড় হলে সমগ্র জম্বুদ্বীপেব সেরা বীর হবে। বিশেষ কবে ধনুর্বিদ্যায় সে এত পাবঙ্গম হবে যে কেউই তাব সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।

পুবোহিত পুত্রেব কোষ্ঠী গণনা কবে বাইবে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে খবব পেলেন যে পুত্রের জন্মক্ষণে বারাণসীরাজের যেখানে যত অস্ত্র ছিল সব এক আশ্চর্য আলোকে ঝলমল করে উঠেছে। পুরোহিত এ কথা শুনে নিজেব গণনা সম্পর্কে আবও সুনিশ্চিত হলেন। তারপর তিনি চললেন রাজ-সন্দর্শনে।





মহাবাজেব জয় হোক।

আসুন আচার্য।

মহাবাজেব কি বাতে ভাল ঘুম হযেছে?

না আচার্য।

কেন মহাবাজ?

কি করে হবে, সব অস্ত্র যে ঝলসে উঠল।

মহাবাজ কি আতঙ্কিত বোধ কবছেন?

কিছুটা।

শান্ত হোন, ভযেব কোন কাবণ নেই।

কেন এমন হল?

আমার পুত্রের জন্য। এক মহাবীব জন্মগ্রহণ কবেছেন আপনি তাঁর বক্ষণাবেক্ষণে যত্ন নিন।

নিশ্চয।

বড হলে ওঁর দাযিত্ব আমাব।

পুরোহিত-পুত্ররূপী বোধিসত্ত্বেব জন্মেব সময় রাজ্যের অস্ত্রাগার ঝলমল কবে উঠেছিল বলে এজন্মে বোধিসত্ত্বেব নাম বাখা হল জ্যোতিঃপাল। বাজা স্বযং জ্যোতিঃপালেব দীর্ঘ জীবন কামনা কবলেন। খুশি হযে ব্রাহ্মণকে প্রচুব ধনদৌলত দিলেন।

আদব-আহ্লাদেব মধ্য দিযে জ্যোতিঃপাল চাঁদেব ষোলটি কলাব মত ক্রমে ক্রমে বিকশিত হতে লাগলেন। বিভিন্ন শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায তাঁব শিক্ষা চলল পুবোদমে। শিক্ষা হল সবচেযে যোগ্য ব্যক্তিদেব হাতে। এখানেও একটি আশ্চর্য ঘটনা আছে। সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালাভেব জন্য জ্যোতিঃপালকে পডানো হযেছিল তক্ষশিলায। জ্যোতিঃপাল সেখানে আচার্যের কাছে মাত্র এক সপ্তাহ থেকে সব কিছু নিপুণভাবে শিখে ফেললেন। এতে আচার্যও বিস্মিত হলেন। তিনি নিজের অস্ত্র ও উষ্ণীষ জ্যোতিঃপালকে দান করলেন। বললেন, 'এবাব তুমিই আমার অর্ধসহস্র ছাত্রকে শিক্ষা দাও।' জ্যোতিঃপাল এই পর্বও দ্রুত



শেষ করে বারাণসীতে ফিরে এলেন। তখন রাজার প্রতিশ্রুতি অনুসারে জ্যোতিঃপালকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। রাজা দৈনিক এক হাজার টাকা বেতনে জ্যোতিঃপালকে রাখলেন।

জ্যোতিঃপাল একে তরুণ, তার ওপর তাঁর বেতন হাজার টাকা। এতে অমাত্যরা তাঁকে ঈর্ষা করতে শুরু করল। রাজার প্রতিও তারা বিরূপ হল। শেষে তারা দল বেঁধে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, জ্যোতিঃপাল যে পরিমাণ বেতন পাচ্ছে সে তা পাওয়ার যোগ্য কিনা তার কি প্রমাণ সে দিয়েছে?' শুনে রাজা পুরোহিতকে জানালেন। পুরোহিত তাঁর ছেলেকে ডেকে বললেন: রাজা তোমার পরীক্ষা নিতে চান।

বেশ, আপনি রাজাকে বলুন রাজ্যের সব ধনুর্বিদদের খবর দিতে।

যথাসময়ে মহড়ার প্রস্তুতি শেষ হল। মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে। একে একে সেখানে উপস্থিত হল রাজ্যের সব ধনুর্বিদ। জ্যোতিঃপাল এলেন সকলের শেষে। জ্যোতিঃপালকে দেখে তো ধনুর্বিদরা অবাক। জ্যোতিঃপালের সঙ্গে কোন ধনুক নেই। তাহলে সে কি করে তীর ছুঁড়বে? সে কি মায়া দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করবে? যাই হোক, তারা সকলে মিলে ঠিক করল; কেউই জ্যোতিঃপালকে তাদের ধনুক ব্যবহার করতে দেবে না। জ্যোতিঃপাল তাঁর গুরুপ্রদত্ত অস্ত্রবাজি লুকিয়ে রেখে শুধুমাত্র তরবারি হাতে এলেন।



মহারাজকে প্রণাম করে জ্যোতিঃপাল ময়দানে একটি বৃত্ত এঁকে দিলেন। তারপর রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার ধনুর্বিদদের মধ্যে অনেকে শব্দ শুনে চুল পর্যন্ত বিদ্ধ করতে পারেন শুনেছি। আপনি তাদের ডাকুন।' রাজার আদেশে বারজন ধনুর্বিদ এগিয়ে এল। জ্যোতিঃপাল তাদের ঐ বৃত্তের মধ্যে যেতে বললেন। তারপর নিজে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসে বললেন, 'মহারাজ, এদের আদেশ করুন আমাকে বিদ্ধ করতে। আমি এদের আঘাত প্রতিহত করব।' ধনুর্বিদরা বলল, 'মহারাজ, আমরা এই তরুণকে বিদ্ধ করতে রাজি নই।' জ্যোতিঃপাল তার জবাবে বললেন, 'অত উদারতা দেখিয়ে লাভ নেই। সত্যি যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে বিদ্ধ কর।' তখন তারা সকলে এক সঙ্গে রেগে উঠল, 'তবে রে পাষণ্ড!' জ্যোতিঃপালের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে এল।

চার তীরন্দাজ প্রত্যেকে চার হাজার করে ষোল হাজারটি তীর ছুঁড়ল। জ্যোতিঃপাল সমস্ত তীর ফিরিয়ে দিলেন। আকাশ বাতাস তাঁর জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল। রাজা সস্নেহে জ্যোতিঃপালকে ডাকলেন।

জ্যোতিঃপাল।

বলুন মহারাজ।

এই বিদ্যার নাম কি?

শর প্রতিবাহন।

তুমি ছাড়া এ বিদ্যা আর কে জানে?

কেউ না মহারাজ।

বেশ, এবার অন্য কোন বিদ্যা দেখাও।

তখন জ্যোতিঃপাল চারজন তীরন্দাজকে চারটি কোণে দাঁড়াতে বললেন। বললেন, 'আমি এক শরে চারজনকেই বিদ্ধ করব। করার পর শরটি আমার কাছে ফিরে আসবে।' খানিক আগে দেখা অলৌকিক কাণ্ডের পর কেউ সামনে দাঁড়াতে সাহস করল না। তখন চার কোণে চারটি কলা গাছ রাখা হল। এক তীরে জ্যোতিঃপাল সেই চারটি কলাগাছকেই বিদ্ধ করলেন। তারপর তীরটি আবার তাঁর কাছে ফিরে এল।

তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল। সমবেত জনমণ্ডলী জ্যোতিঃপালের দিকে নানারকম উপহার ছুঁড়ে দিতে লাগল। দুর্মূল্য পোশাক, অর্থ, ফুলের মালা। রাজা আবার জানতে চাইলেন, 'বৎস, এ কৌশলের নাম কি?'

চক্রবেধ, মহারাজ।

তুমি কি আরো কৌশল জান?

জানি মহারাজ।

তাহলে তা দেখাও।

জ্যোতিঃপাল একে একে বারটি বিভিন্ন ধরনের কৌশল দেখালেন। ওদিকে বেলাও হয়ে যাচ্ছে। রাজা এবং সভাসদরা বেজায় খুশি। জ্যোতিঃপালের নামে জয়ধ্বনি উঠল। রাজা সমবেত জনমণ্ডলীকে জানালেন, 'আজ থেকে জম্বু দ্বীপের এই বীরই আমার প্রধান সেনাপতি হবেন।' রাজা নিজে জ্যোতিঃপালকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা উপহার হিসেবে দিলেন।





শরভঙ্গ জাতক (দ্বিতীয়)



জ্যোতিঃপাল অস্ত্রবিদ্যায় এমন অত্যাশ্চর্য পবিচয় দিয়ে যে ধন-বত্নাদি পেলেন, সে সবই তিনি বিনয়েব সঙ্গে দাতাদেবই ফিরিয়ে দিলেন। এমন কি বাজাব লক্ষ স্বর্ণমুদ্রাও। তাবপব ঘবে ফিবে এসে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। সেনাপতিব পদ গ্রহণ কবলে যুদ্ধ-কালীন অবস্থায় তাঁকে প্রচুর বক্তপাত ঘটাতে হবে। তাঁব হাতে অনেকে মারা পডবে। বিদ্যুৎ ঝিলিকেব মত তাঁব মনে হল, 'এব চেয়ে বনবাসী হয়ে তপস্যা কবা অনেক শ্রেয়ঃ।'

যেমন কথা সেই কাজ। জ্যোতিঃপাল কাউকে কিছু জানালেন না। এমন কি তাঁব পিতা বাজপুরোহিতকেও কিছু বললেন না। এক বস্ত্রে তিনি অরণ্যেব দিকে রওনা হলেন। জ্যোতিঃপাল যখন অবণ্যেব দিকে চলেছেন, দেবরাজ ইন্দ্র তখন তাঁব অভিপ্রায় টেব পেলেন। দেববাজ এই পুণ্যাত্মাকে কিছু উপহার দিতে চাইলেন। তিনি বিশ্বকর্মাকে ডেকে বললেন, 'অরণ্যপথে এঁর জন্য আশ্রম গড়ে দাও।' দেবতাদের ইচ্ছা মুহূর্তের মধ্যে বাস্তব রূপ পেতে পারে। ফলে জ্যোতিঃপাল অরণ্যে পৌঁছে দেখলেন চমৎকার একটি আশ্রম পবিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। নিজের ক্ষমতাবলে বোধিসত্ত্ব জানতে পারলেন, দেবরাজ ইন্দ্রই তাঁকে এই উপহার দিয়েছেন। জ্যোতিঃ-পাল এই উপহার সানন্দিত চিত্তে গ্রহণ করে তপস্যা শুরু করলেন।

জ্যোতিঃপালেব খোঁজে বাজা এবং অমাত্যবা দিকে দিকে লোক পাঠালেন। অবশেষে তাঁবা আশ্রমটির খোঁজ পেলেন। বাজপুরোহিত-সহ সকলে এলেন জ্যোতিঃপালের সঙ্গে দেখা কবতে। তিনি তখন আকাশপথে আসীন হলেন। শূন্য থেকে সকলকে ধর্মকথা বললেন। সুমধুব কণ্ঠস্বর, জ্ঞানগম্ভীর কথা শুনে সকলেরই চিত্ত শান্ত হল। তাঁবা জ্যোতিঃপালকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবাব জন্য পীড়াপীড়ি কবলেন না আব। বরং সকলেই ধর্মপথে এলেন। জ্যোতিঃপালের কথা অনুসারে শীলব্রত গ্রহণ কবলেন। সারা দেশে ধর্মেব আবহাওয়া বিবাজ করতে লাগল।

জ্যোতিঃপালের সাত জন প্রধান শিষ্য। তাঁদেব স্থান আবাব পর্যাযক্রমে। দিনে দিনে শিষ্যদেব শিষ্য ও জ্যোতিঃপালেব ভক্তদের ভিড়ে আশ্রম উপচে পড়তে লাগল। তখন তিনি ভিড



কমাতে আব নিজেব তপস্যাব নির্জনতা বজায রাখতে সাত শিষ্যকে তাদেব শিষ্য-শিষ্যাসহ সাতটি আলাদা আলাদা জায়গায কুটিব বানিযে থাকতে বললেন।

প্রথম শিষ্য যেখানে কুটিব গডেছেন একদিন সেখানে বাজার এক প্রিযপাত্রী এলেন। বাজা তাঁব প্রিযপাত্রীকে ভর্ৎসনা কবে দূব করে দিয়েছিলেন। বাজার অনুচবী ঐ তপস্বীকে দেখে ভাবল, 'এঁকে যদি আমার পাপের বোঝা দিই তাহলে আমি বক্ষা পেতে পারি।' এই ভেবে সে তপস্বীব জটায থুতু ফেলল। আশ্চর্য ব্যাপার, তাবপবই রাজা ঐ অনুচরীকে ডেকে পাঠান। আগেকার চেযে বেশি খাতিব কবতে লাগলেন তাকে। কিছু দিন পরে ঐ রাজাব পুবোহিত রাজাব রোষানলে পডলেন। অনুচবী তখন পুরোহিতকে পরামর্শ দিল, 'আপনি রাজার বাগানেব ঐ তপস্বীর জটায নিজের পাপ ত্যাগ করুন। আপনার মঙ্গল হবে।'

পুরোহিত তাই করলেন। আব সত্যি রাজার মনও বদলে গেল। কিছু দিন পবে শত্রু সৈন্য ঐ রাজ্যটি আক্রমণ করল। রাজা মুষডে পডেছেন। পুরোহিত তখন রাজাকে উপদেশ দিল, 'সন্ন্যাসীর জটায থুতু ফেলুন। তাহলেই বিপদ কেটে যাবে।' রাজা তাঁর সেনাপতি ও পাত্রমিত্রসহ গেলেন তপস্বীর জটায় থুতু ফেলতে। সবাই চলে গেলে সেনাপতি তপস্বীকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'প্রভু, সবাই যে আপনার শরীবে পাপ ত্যাগ করে গেল, এতে তাঁদের কোন ক্ষতি হবে না তো।'

আমি নিজে কোন ক্ষতি কবব না।

তাহলে ?

দেবতারা অসন্তুষ্ট হবেন।

তাতে কি হতে পারে প্রভু ?

এই রাজ্য ছারখার হবে।

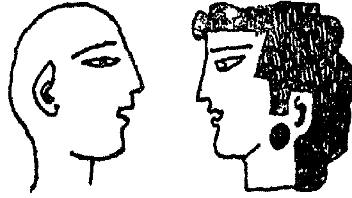
সে কি !

তুমি অন্য কোথাও চলে যাও।



সেনাপতি তপস্বীর পরামর্শে নিজের পরিবারসহ অন্য দেশে চলে গেলেন। এদিকে রাজা যুদ্ধে জযলাভ কবলেন ঠিকই, কিন্তু ফেরার সময তাঁর বাহিনীর ওপব বিশাল বিশাল পাহাড ভেঙে পডতে লাগল। এভাবে গোটা রাজ্যটি বিনষ্ট হল। এদিকে জ্যোতিঃপাল সন্ন্যাসেব পর

'শবভঙ্গ' নাম নিয়েছেন। যোগবলে তিনি প্রথম শিষ্যেব বিপদেব কথা



জানলেন। মন্ত্রবলে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন।

সেই প্রবল পর্বতবৃষ্টিতে শুধু এই বাজার নয়, আশপাশের আরও অনেক রাজার বাজ্য নষ্ট হল। তাঁরা ঠিক করলেন, মহাসত্বের কাছে যাবেন। একমাত্র তিনিই বলতে পারবেন, কেন এমন হল। রাজারা যেদিন শবভঙ্গের আশ্রমে এলেন সেই দিন তাঁব প্রথম শিষ্য গত হয়েছেন। ফলে আশ্রমে ছিল গভীব শোকের ছায়া।

শিষ্যর শেষকৃত্য সাবতে সকলে তখন গোদাবরীর তীরে এসেছেন। রাজাবা কাউকে আশ্রমে না পেযে বুঝলেন একমাত্র নদী-তীবে গেলেই তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। সকলে মিলে গোদাবরীর তীবে এলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে দেববাজ ইন্দ্রও বাজার বেশে গোদাববীতে নেমে এলেন।

শবভঙ্গ॥ কি আপনাদেব প্রশ্ন?

দেববাজ॥ কাকে বধ কবলে কোন শোক হয না তপস্বী?

শবভঙ্গ॥ কপটতা এবং ক্রোধকে।

দেববাজ॥ কি ত্যাগ করলে লোকে ধন্য ধন্য কবে?

শবভঙ্গ॥ ঐ একই উত্তর।

দেববাজ॥ কাব কঠোব ব্যবহার সর্বদা ক্ষমা কবা যায়?

শবভঙ্গ॥ ক্ষমাই ধর্ম। সুতবাং সকলকেই ক্ষমা করা যায়।

দেববাজ॥ নিচু জনেব কঠোব ব্যবহাবও কি ক্ষমা কবা যায়?

শবভঙ্গ॥ দেখুন বাজা, শক্তিমান ও উত্তমেব অপরাধ অনেকেই ক্ষমা কবেন। কিন্তু নিচু জনেব কঠোবতাও যিনি ক্ষমা করতে পাবেন তিনিই প্রকৃত সাধু।

দেবরাজ॥ প্রকৃত সাধু কে?

শবভঙ্গ॥ যিনি বীতরাগ, যার দ্বেষ নেই, আছে শুধু প্রজ্ঞা, তিনিই প্রকৃত সাধু।

সকলে শরভঙ্গের নামে জয়ধ্বনি দিল।



খুল্লসুতসোম জাতক

পুবাকালে কোন এক সময়ে বাবাণসীব নাম ছিল সুদর্শননগব। সেখানে বাজত্ব কবতেন ব্রহ্মদত্ত। বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্তেব ছেলে হয়ে জন্মালেন। তাঁব নাম বাখা হল সোমকুমাব। কাবণ বোধিসত্ত্বেব দেহলাবণ্য ছিল অসাধাবণ। এই সোমকুমাব বড হয়ে সোমবস-প্রিয় হয়ে ওঠেন। সেজন্য তাঁব নাম হয়ে যায় সুতসোম।



যথাসময়ে সুতসোম গেলেন তক্ষশিলায়। সেখানে বিদ্যাচর্চা শেষ কবে একদিন তিনি সুদর্শননগবে ফিবেও এলেন। বাজা ব্রহ্মদত্ত তখন তাঁব যোগ্য পুত্রকে অভ্যর্থনা জানালেন শ্বেতচ্ছত্র দিয়ে। এব পব থেকে সুতসোম যথাধর্ম বাজ্য শাসন কবতে লাগলেন। বাজকোষেব সম্পদও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। সুতসোমেব ষোল হাজাব বাণী ছিল। এদেব মধ্যে চণ্ডদেবীই ছিলেন প্রধানা।

সুখ-সম্ভোগে দিন যেতে লাগল। ইতিমধ্যে সুতসোমের অনেক সন্তানাদিও হয়েছে। সৌভাগ্যেব শিখবে পৌঁছেছেন তিনি। হঠাৎ একদিন তাঁব মনে বৈবাগ্য জন্মাল। সংসাবকে মায়াজালে পূর্ণ অসাব মনে হল। তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন সন্ন্যাস নেবাব জন্য। একদিন তিনি নাপিতকে ডেকে বললেন ঃ

শোন হে, আমাব মাথায় একগাছা পাকা চুল দেখলেই বলবে।

যে আজ্ঞা মহাবাজ।

এ ঘটনাব কয়েক দিনেব মধ্যেই নাপিত সুতসোমকে বলল, 'মহাবাজ, আপনাব মাথায় পাকা চুল দেখতে পাচ্ছি।' শুনে সুতসোম বললেন, 'চুলটা ছিঁডে আমাব হাতে দাও।' নাপিত সোনাব সন্না





দিয়ে পাকা চুলটা তুলে সুতসোমের হাতে দিল। সুতসোম সেই পাকা চুলটি হাতে নিয়ে বলে উঠলেন, 'হায়! জরা এসে আমার দখল করে নিল।' চুলটা হাতে নিয়ে তিনি রাজসভায় এলেন। সেখানে সকলেই ছিল। একদৃষ্টে চুলটির দিকে তাকিয়ে থেকে সুতসোম বললেন, 'শুনুন, আমার চুল পাকতে শুরু করেছে। আমি বৃদ্ধ হচ্ছি। এখন থেকে আমি আর রাজ্যভার বহন করতে পারব না। আমি প্রব্রজ্যা নেব স্থির করেছি।'

রাজার মনোভাব দেখে অমাত্যরা খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। এমন ভরা রাজ্যপাট, এসব ছেড়ে কিনা সুতসোম বনবাসী হবেন! তাঁরা সমস্বরে বলে উঠলেন, 'হে রাজা, আপনি এই সঙ্কল্প ত্যাগ করুন। এতে কারও কল্যাণ হবে না। একবার চেয়ে দেখুন, আপনার ষোল হাজার স্ত্রী আছেন। আপনি চলে গেলে তাঁদের কি হবে।'

'তাঁরা নিজেরাই তাঁদের গতি করে নেবেন।'

'কি করে মহারাজ?'

'তাঁরা এখনও নবীন। তাঁদের রূপও আছে, সুতরাং তাঁরা যথাযোগ্য আশ্রয় পেয়ে যাবেন।'

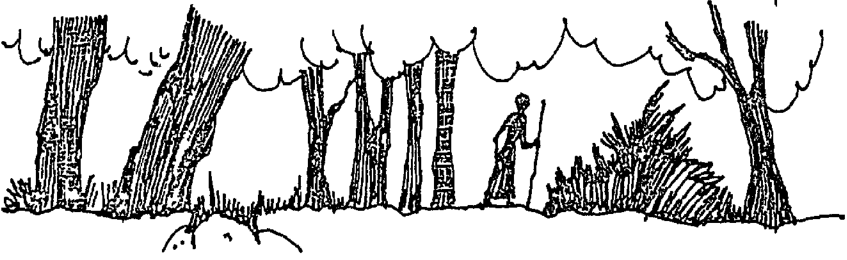
কোন রকমেই যখন সুতসোমকে তাঁরা শান্ত করতে পারলেন না, তখন অমাত্যরা রাজমাতার কাছে গেলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে রাজমাতা দ্রুত ছুটে এলেন।

'বাবা, তুই নাকি প্রব্রজ্যা নিচ্ছিস?'

'হ্যাঁ, মা।'

'তুই আমাকে বৃথাই মা বলে ডাকিস, মিথ্যেই তোকে গর্ভে ধরেছিলাম রে। তুই কিনা বুড়ি মাকে ছেড়ে প্রব্রজ্যা নিচ্ছিস।'





বাজমাতাব কান্নাব জবাবে সুতসোম 'হ্যাঁ-না' কোন কথাই বললেন না। অমাত্যবা তখন সুতসোমেব পিতাব কাছে গেলেন। সব শুনে সুতসোমেব পিতা এসে বললেন, 'দেখ বাবা, বুড়ো বাপ-মাব প্রতি যদি টান না-ও থাকে, নিজেব ছেলেমেযেব কথাটা তো ভাববে। তুমি প্রব্রজ্যা নিলে তাদেব কি হবে?'

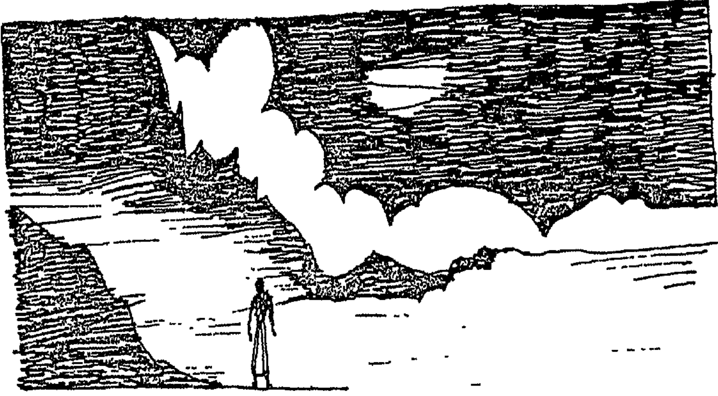
'দেখ বাবা, অনেকদিন ছেলেমেযেব সঙ্গে কাটালাম। এখন এসব নিছক মাযা বলে মনে হচ্ছে।'

সুতসোম নানা ধর্মকথার সাহায্যে বোঝাতে চাইলেন সংসাব শুধু মাযা। তা চিবস্থাযী নয। এই অনিত্যেব জন্য জীবনপাত কবাব কোন অর্থ হয না। সুতসোমেব কথা শুনে তাঁব পিতা আব কোন কথা বলতে পাবলেন না। বিষণ্নচিত্ত বসে বইলেন।

অমাত্যবা এব পবে তাঁব ষোল হাজাব পত্নীকে ডেকে আনলেন। আবাব কান্নাকাটি, অনুবোধ-উপবোধ চলল। কিন্তু সুতসোমকে তাঁরাও টলাতে পাবলেন না। বাজাব প্রধানা মহিষী তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, অমাত্যবা তাঁকে ডেকে আনলেন। কিন্তু এতেও কোন ফল হল না। তখন সাত বছবেব ছেলেটি এল। সে সুতসোমেব গলা জডিযে ধবে বলল, 'এবাব আপনি যান তো দেখি।' বাজাব অন্তব এতে একটু কাতব হযে পডল। কিন্তু তিনি ধাত্রীকে বললেন, 'বাজপুত্রকে নিযে যাও।'

মহাসেনাপতিব মনে হল, 'হযত মহাবাজের মনে হযেছে বাজ-কোষে যথেষ্ট ধনসম্পদ নেই। সেই দুঃখেই প্রব্রজ্যা নেওযাব কথা ভাবছেন।' সেনাপতি বাজাকে এসে জানালেন, 'মহাবাজ, আপনাব বাজকোষে ধনসম্পদেব কোন অভাব নেই। তাহলে কেন আপনি বনে গিযে অনর্থক কষ্ট কববেন।' এবপর কুলবর্ধন নামে এক বণিক এল। সে এসে বলল, 'মহাবাজ, আমার যা অর্থ আছে তা দেবতাদেব





পক্ষেও গোনা সম্ভব নয়। সে সবই আমি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনি প্রব্রজ্যা নেওয়ার ইচ্ছে ত্যাগ করুন।'

এত কাণ্ড করেও সুতসোমকে ধরে রাখা গেল না। তিনি বললেন, 'যা জন্মেছে তা কখনও চিরস্থায়ী হয় না, তার বিনাশ হবেই। যাই হোক, আমি মনস্থির করছি। এখন আর আমি তোমাদের কেউ নই। তোমরা এবার থেকে নিজেদের ইচ্ছেমত রাজ্য চালিও।' এ কথা শুনে নগরবাসীরা, অমাত্য ও রাজার স্ত্রী-পুত্ররা ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। তাঁদের গড়াগড়িতে বিশাল ধুলোর ঝড় ওঠে নগর ঢেকে ফেলল। সুতসোম গৃহত্যাগ করলেন।

সুতসোমের গৃহত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাকুল, আত্মীয়বন্ধু ও অমাত্যরা দল বেঁধে চললেন তাঁর খোঁজে। অরণ্য পথে তাঁরা রাজাকে ধরে ফেললেন। তাঁরা সবাই রাজার অনুগামী হলেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র এই মহতী ব্যাপার দেখে হিমালয়ের কোলে একটি চমৎকার আশ্রম তৈরি করে রাখলেন।

রাজা এবং তাঁর অনুগামীরা ঐ আশ্রমে আশ্রয় নিলেন। আশ্রমবাসীদের ধর্মচর্চা ও সরল জীবনযাপনের কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর তা চুম্বকের মতই সহস্র ধর্মপিপাসু মানুষকে টেনে আনতে লাগল।

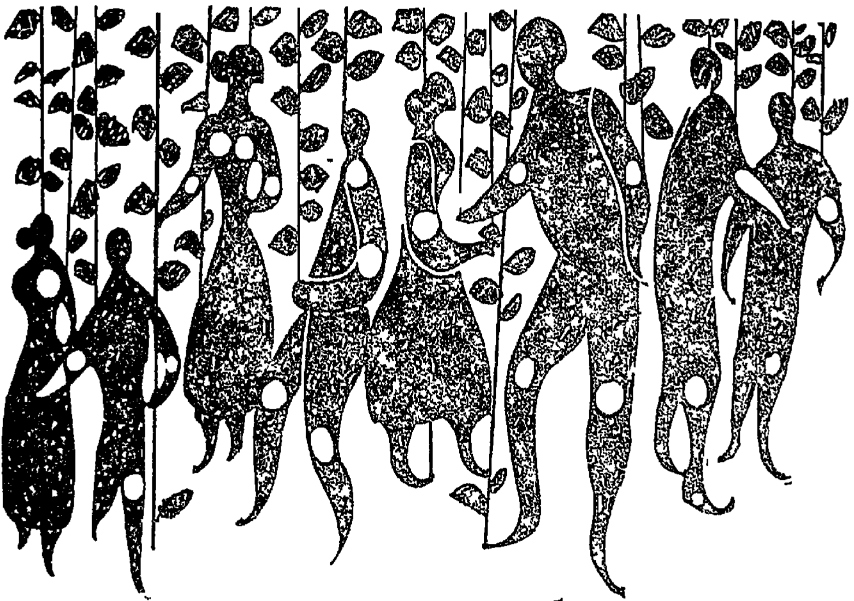
কিংছন্দো জাতক

১

সে অনেককাল আগের কথা। বারাণসীর রাজা তখন ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্তের প্রজাপালন ও রাজ্যচালনা বিষয়ে সুনামের কোন অন্ত ছিল না। ঘোরতর সংযমী ও শীলাচারী ছিলেন তিনি।

কিন্তু ব্রহ্মদত্তের এমনই দুর্ভাগ্য যে তাঁর পুরোহিত ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের লোক। পুরোহিত প্রায় সবরকম অন্যায় কাজেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রকাশ্যে ঘুষ খাওয়া, অন্যায় বিচার করা ছাড়াও তিনি লোকের আড়ালে রাজা সম্পর্কে কটু মন্তব্য ও নিন্দা করতেন।

সেদিন ছিল তিথিনক্ষত্র অনুসারে পোষধের দিন। রাজা তাঁর অমাত্যদের ডাকলেন। বললেন, 'আজ পুণ্যলগ্ন। তোমরা আজ পোষধ ব্রত পালন কর।' অমাত্যরা রাজার আদেশ ও পরামর্শ অনুসারে নিষ্ঠার সঙ্গে পোষধ পালন করলেন। কিন্তু পুরোহিত লোভ সামলাতে পারলেন না। তিনি রোজ যা যা করে থাকেন আজও তাই করলেন।

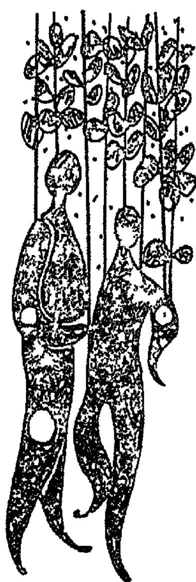


অর্থাৎ ঘুষ নিলেন, অবিচাব কবে মিথ্যে শাস্তি এবং পুবস্কাব দিলেন বিবাদী এবং ফরিয়াদীদেব।

এরপর পুবোহিত রাজার সঙ্গে দেখা কবতে গেলেন। ব্রহ্মদত্ত তখন অমাত্যদেব জিজ্ঞেস কবলেন, 'আপনাবা কে কে পোষধ পালন কবছেন?' অমাত্যবা সবাই একবাক্যে বললেন, তাঁরা পোষধ বক্ষা কবেছেন। বাজা তখন পুবোহিতকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'আচার্য, আপনি পোষধ পালন কবেছেন কি?' পুবোহিত বললেন, 'হ্যাঁ।'

মিথ্যে জবাব দিযে পুরোহিত প্রাসাদেব বাইবে যাচ্ছিলেন। তখন একজন অমাত্য তাঁকে বললেন, 'মহাশয়, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন, আপনি পোষধ পালন কবেন নি।' পুরোহিত সামান্য হতচকিত হলেন। পবমুহূর্তে বললেন, 'সকালে সামান্য কিছু খেযেছিলাম ঠিকই, কিন্তু ঘবে গিযে আমি হাত-মুখ ধুযে ফেলব। বাত হওযাব আগে মুখে কুটোগাছাও দেব না। এতে অন্তত আধবেলা উপোস কবা তো হবে।' পুবোহিত ঘবে ফিবে সত্যিই তাই কবলেন।

একদিন পুবোহিত বিচাব কবতে বসেছেন। বিচাবপ্রার্থিনী এক শীলবতী নারী। সে দিনটিও ছিল পোষধেব দিন। মহিলা উপবাসী ছিলেন। ওদিকে বিচারেব কাজে বেলা বযে যেতে লাগল। ক্রমে বিকেল হল। শীলবতী নারী ভাবলেন, রাতে বাড়ি ফিবে পোষধ ভাঙবেন। ঠিক তখন একজন পুরোহিতকে কযেকটি পাকা আম উপহাব দিযে গেল। পুবোহিত স্নেহপরবশ হয়ে শীলবতী ঐ নাবীকে কযেকটি আম খেতে দিলেন।



২

যথাসমযে আযুক্ষয কবে পুরোহিত গত হলেন। পবজন্মে তিনি হিমালযেব পাদদেশে এক আশ্চর্য সুন্দব আমেব বনে জন্মগ্রহণ কবলেন। শীলবতী নারীব প্রতি তিনি সম্মান দেখিযেছিলেন। পূর্বজন্মে তাঁকে আম খেতে দিযেছিলেন বলে এ জন্মে গোটা একটা আমবাগানেব অধীশ্বব হলেন। সেদিন আধ বেলা উপোসও কবেছিলেন। এজন্য তিনি অর্ধস্বর্গ লাভ কবলেন। ঐ আশ্চর্য কাননে প্রতি বাতে তিনি দেবদূতের মত সানন্দে বিচবণ কবতেন। কিন্তু বাত শেষ হওযাব সঙ্গে সঙ্গে সেই ঐশ্বর্য হাবিযে যেত। তখন আব



তাকে ঐবকম লাবণ্যমণ্ডিত তো লাগতই না, উল্টে এক কদাকার চেহাবা দেখা দিত। দু হাতে থাকত মাত্র একটি কবে আঙুল। ঐ দুটিতে দেখা দিত কোদালেব মত বিশাল দুটি নখ। সে তখন নখ দিয়ে নিজেব মাংস ছিঁড়ে খেত।

ক্রমে দিন যায়। বারাণসীব বাজা ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘকাল বাজ্য পবিচালনা ও বিষয়সুখ ভোগ কবেছেন। এক সময় সব কিছুতেই তাঁব আগ্রহ কমতে থাকল। কিছুই আব ভাল লাগে না। বিষয় বিষেব মত লাগছে। এই ভাব কিছু দিন চলাব পব বাজা প্রব্রজ্যা নিলেন। গঙ্গাব তীবে একটি কুটিব তৈবি কবে থাকেন। ধর্ম চিন্তা ছাড়া বাজাব আব কোন চিন্তা নেই। একদিন নদীতে স্নান কবতে গিয়ে রাজা একটি পাকা আম পেলেন। আমটিব আকাবও ছিল বেশ বড়। বাজা অনেক দিন ধবে একটু একটু কবে শুধু ঐ আমটি খেয়েই বেঁচে থাকলেন। একদিন আমটি ফুবিয়ে গেল। কিন্তু অত চমৎকাব একটি ফলেব স্বাদ পাওয়াব পব বাজা আব অন্য কিছু মুখে দেওয়াব কথা ভাবতেও পাবছেন না।

ভাবলেন, 'নদীব জলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কবব। আবার যদি ভেসে আসে। আর যদি না-ও আসে তাহলে নদীতেই দেহত্যাগ কবব।'

বাজা পাকা আমের আশায় দিনেব পব দিন নদীব তীবে পড়ে আছেন। তাঁব শবীব শুকিয়ে যাচ্ছে। একে একে সাত দিন কেটে গেল। তখন গঙ্গাদেবী বাজাব প্রাণ বক্ষাব জন্য স্বমূর্তিতে রাজাব সামনে এলেন।



'হে তপস্বী, কেন তুমি এত কষ্ট কবছ?'

'দেবী, আমি চমৎকার একটি ফল খেযেছিলাম, সেই ফলটি আবাব পাওয়ার আশায়।'

'দেখ রাজা, তুমি বুদ্ধিমান। বিষযবন্ধন ছিন্ন কবেছ, কিন্তু দেখ, আবাব কেমন নতুন বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছ।'

দেবী তাঁকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু দেখা গেল বাজা শিশুব মত, কিছুতেই ভবি ভোলে না। গঙ্গাদেবী তখন বাজাকে সঙ্গে কবে নিয়ে গেলেন সেই আশ্চর্য আমের বনে। বাজা আকাশপথে সেই বনে গিয়ে নামলেন।

বাজা সেখানে মনেব সুখে আছেন। হঠাৎ বাত্রিবেলা দেখলেন দেবদূতেব মত এক ব্যক্তি। তার সঙ্গে অজস্র লোকজন এবং অনুচব। সবাই এক ঘোব আনন্দে মত্ত। রাত পোহালে আবাব সেই দেবদূতই হয়ে গেল এক কদাকাব জীব। সে নিজে নিজেব মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে।



পুরোহিত বাজাকে দেখে চিনতে পেবেছিলেন। সেই রাতেই তিনি বাজার কাছে এগিয়ে এসে নিজেব অতীত জন্মের পাপ আব সুকৃতির কথা বললেন। তাবপব তিনি যখন জানলেন বাজা পাকা আম খাওয়াব জন্যই এ বনে এসেছেন, তখন বললেন, 'চলুন, আপনাকে আপনাব আশ্রমে বেখে আসি। এই আমবাগানের অধীশ্বব আমিই, সুতবাং আমি আপনাকে বোজ আম পাঠাব।'

এব পব থেকে বাজা আম খেযেই জীবন ধাবণ কবতেন। তপস্যা কবতে কবতে আয়ু ফুরিযে এল। বাজাব দেহান্ত ঘটল। অজস্র পুণ্য-কর্ম তাঁব নিত্যসঙ্গী ছিল। সে কাবণে তাঁব স্বর্গবাস হয়েছিল।



শোননন্দ জাতক



একসময় বারাণসীর নাম ছিল ব্রহ্মবর্ধন। মনোজ নামে এক রাজা সেখানে রাজত্ব করতেন। তাঁর আমলে ব্রহ্মবর্ধনে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ব্রাহ্মণের ছিল অঢেল সম্পত্তি। শান্তি ছিল না। কারণ তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। একদিন ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীকে বললেন, 'তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যেন আমাদের একটা ছেলে হয়।'

ব্রাহ্মণীর প্রার্থনায় কাতর হয়ে বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মলোক থেকে ব্রাহ্মণীর গর্ভে প্রবেশ করলেন। যথাসময়ে তিনি ব্রাহ্মণীর ছেলে হয়ে জন্মা-লেন। তাঁর নাম রাখা হল শোনকুমার। বোধিসত্ত্ব যখন হামা দেওয়া ছেড়ে দু পায়ে হাঁটতে শিখছেন ঠিক সেই সময় ব্রহ্মলোক থেকে আরেক দেবতা ব্রাহ্মণীর গর্ভে এলেন। যথাসময়ে দ্বিতীয় ছেলেটিও ভূমিষ্ঠ হল। তার নাম রাখা হল নন্দকুমার।

আচার্যের কাছে দু ভাই লেখাপড়া শিখতে গেলেন। তাঁদের মত মেধাবী ছাত্র আচার্য এর আগে কম দেখেছেন। স্বল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা সর্ববিদ্যায় বিশারদ হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণ এবার তাঁর যুবক পুত্রের বিয়ে দিতে আগ্রহী হলেন। ব্রাহ্মণীকে বললেন, 'দেখ, শোন-কুমার বেশ বড় হয়েছে, এবার ওর বিয়ে দিতে চাই।' শুনে ব্রাহ্মণী বললেন, 'নিশ্চয়ই, তবে শোনকে একবার জিজ্ঞেস করে নেওয়া দরকার।' ব্রাহ্মণী শোনকুমারের কাছে প্রস্তাবটি করতে তিনি বললেন, 'মা, গার্হস্থ্য-ধর্মে আমার মন নেই। যতদিন আপনারা বেঁচে আছেন আপনাদের সেবাযত্ন করব। আপনাদের দেহান্তর হলে আমি প্রব্রজ্যা নেব।'

শোনকুমারের কথা শোনার পর ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দুজনেই বেশ



বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। অনেক তপস্যা করে ছেলে পেয়েছেন তাঁরা। এখন সেই ছেলে যদি বিয়ে না করে প্রব্রজ্যা নিতে চায় এর থেকে দুঃখের আর কি আছে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, তখন নন্দকুমারকে বললেন, 'বাছা, তোমার দাদা বলছেন বিবাহ করবেন না। তিনি প্রব্রজ্যা নেবেন। সুতরাং তুমি বিবাহ করে গার্হস্থ্য ব্রত নাও।'

'আমাকে মাফ করবেন।'

'কেন বাবা?'

'দাদা যে জিনিস ছুঁড়ে ফেলেছেন আমি তা তুলতে যাব না।'

'তুমি তাহলে কি করবে?'

'আমিও দাদার মতই প্রব্রজ্যা নেব।'

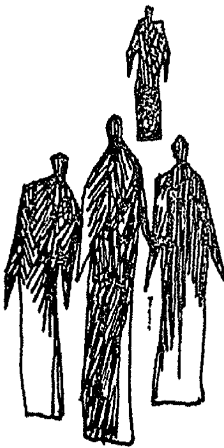
দু ছেলের মুখে একই কথা শুনে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন, 'তাহলে এই ধনরাশি, এত সম্পদ দিয়ে কি হবে। বাছারা এই কচি বয়সেই যদি সন্ন্যাস নিতে পারে তাহলে আমরাই বা কেন পারব না।' এই সব ভেবে শোন আর নন্দের বাবা-মা তাঁদের বললেন, 'দেখ, তোমরা যদি প্রব্রজ্যাই নিতে চাও তাহলে আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন দরকার নেই।'

'তা হয় না।'

'কেন?'

'আমরা আপনাদের ফেলে যেতে পারি না।'

'ফেলে যাবে কেন, আমরা সকলেই একসঙ্গে প্রব্রজ্যা নেব।'

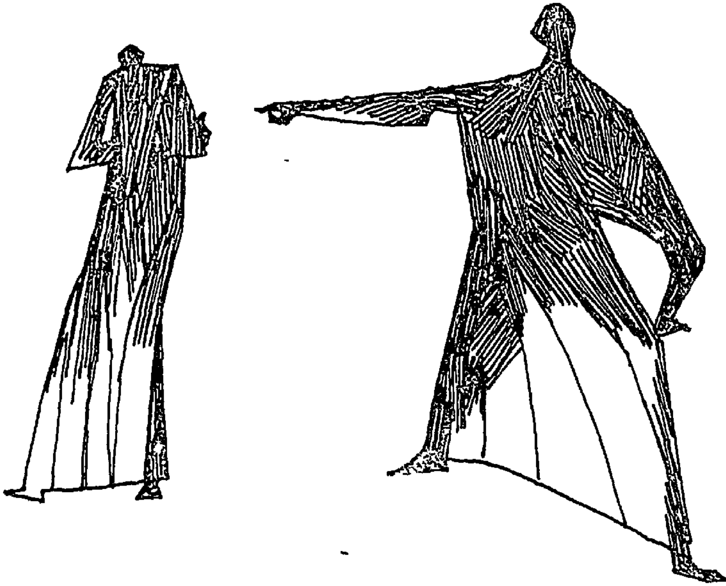


ব্রাহ্মণ তারপর রাজার অনুমতি নিয়ে নিজের সমস্ত ধনসম্পত্তি দান করে দিলেন। দাসদাসীদের মুক্ত করে দিলেন। তারপর চারজন একসঙ্গে ব্রহ্মবর্ধন ছেড়ে হিমবন্ত প্রদেশে এসে আশ্রম গড়লেন। চারজন সেখানে মহানন্দে থাকেন। বাবা-মার জন্য জল তুলে আনা, খাবার জোটানো, তাঁদের জটা পরিষ্কার করে দেওয়া —সব কাজই দু ভাই সমানভাবে করে। এভাবে কিছুদিন গেল।

একদিন নন্দ ভাবলেন, 'দাদার আগেই যদি ফল এনে আমি বাবা-মাকে খাওয়াতে পারি তাহলে আমার বেশি পুণ্য হবে।' এই ভেবে তিনি গাছ থেকে বুনো ফল এনে বাবা-মাকে দিতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী



সেই ফল খেয়েই পোষধ পালন করতেন। শোন্ দূর থেকে যেসব সুস্বাদু ফল বাবা-মার জন্য নিয়ে আসতেন তাঁরা সেগুলো খেতেন না।



এভাবে পর পর সাতদিন শোনের আনা ফলগুলো নষ্ট হল। শোন দেখলেন, এই বুনো আধপাকা ফল খেতে থাকলে বাবা-মা বেশিদিন বাঁচতেই পারবেন না। তিনি নন্দকে ডেকে বললেন :

নন্দ, এখন থেকে তুমি ফল আনার পর অপেক্ষা করবে।

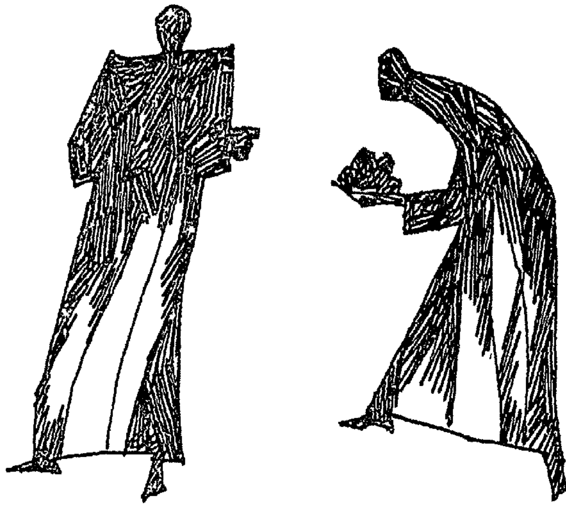
কেন দাদা?

দুজনে একসঙ্গে বাবা-মাকে খাওয়াব।

নন্দ কিন্তু দাদার কথা কানেই নিলেন না। একা পুণ্য অর্জনের কামনায় তিনি তখন মত্ত। তখন শোনকুমার মনে মনে ঠিক করলেন, 'নন্দ যখন আমার কথা শুনছে না, অন্যায় করেই চলেছে, তখন ওকে দূর করে দেওয়াই উচিত।' একদিন নন্দকে ডেকে বললেন :

'দেখ ভাই নন্দ, তুমি উপদেশ শুনে চল না, পণ্ডিতদের কথা মান্য কর না। দুজনের মধ্যে আমিই বাবা-মার বড় ছেলে। বাবা-মার সেবা যত্ন আমারই কর্তব্য। এখন থেকে এঁদের রক্ষণাবেক্ষণ আমি একাই করব। তুমি আর এখানে থাকতে পারবে না। এখান থেকে চলে যাও।'





এরপর নন্দ বাবা-মার কাছে গিয়ে জানালেন বড় ভাই কি আদেশ করেছেন। তাবপর নিজের কুটিরে গেলেন। নন্দ নিজেব অপবাধ বুঝতে পেবেছিলেন। মনে মনে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। এ রকম অবস্থায় তপস্যায় বসলেন। সেদিনের তপস্যায় নন্দ সিদ্ধিলাভ করলেন। সিদ্ধিলাভেব পর নন্দ ভাবতে লাগলেন, কি করে দাদার কাছে ক্ষমা পাওয়া যায়। আবার এ-ও ভাবতে লাগলেন, এমন কি কোন ভাবে কি দাদাব কাছে ক্ষমা পাওয়া যায় না যাতে শোন পণ্ডিতের সুনাম দশ দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তখন তাঁর মনে হল, 'যদি জম্বুদ্বীপের বাজাধিবাজ এবং অন্যান্য রাজাদের এনে নিজেব জন্য ক্ষমা চাওয়াতে পাবি তাহলে দু কুলই রক্ষা পায়।'

এই ভেবে তিনি নিজেব অলৌকিক ক্ষমতার বলে আকাশপথে এসে ব্রহ্মবর্ধন নগরেব রাজদ্বারে নামলেন। দুয়াবীকে বললেন, 'যাও, রাজাকে বল, এক তপস্বী আপনার সঙ্গে দেখা কবতে চান।' দুয়াবী গিযে বাজাকে জানাল। বাজা ভাবলেন, 'তপস্বী নিশ্চয়ই আমার কাছে খাবার দাবাব চাইবেন।' এই ভেবে তিনি নন্দকে খাবার পাঠালেন। নন্দ সেই খাবাব ছুঁলেন না। দুযাবীকে বললেন, 'বল, আমি বাজাব সেবা কবতে চাই।' বাজা জবাব পাঠালেন, 'আমাব বহু সেবক আছে।

তপস্বী তাঁর তপস্যার কাজেই রত থাকুন।' তখন নন্দ বললেন, 'রাজাকে গিয়ে বল, আমার অলৌকিক শক্তিতে তোমাদের রাজাকে সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজা করে দেব।'

রাজা এ প্রস্তাব ফেলে দিতে পারলেন না। 'তপস্বীরা অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন শুনেছি। হয়ত ইনি এরকমই একজন শক্তিধর ব্যক্তি।' রাজা এলেন নন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করতে।

আপনি নাকি সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজ্য আমাকে দান করবেন?

হ্যাঁ মহারাজ।

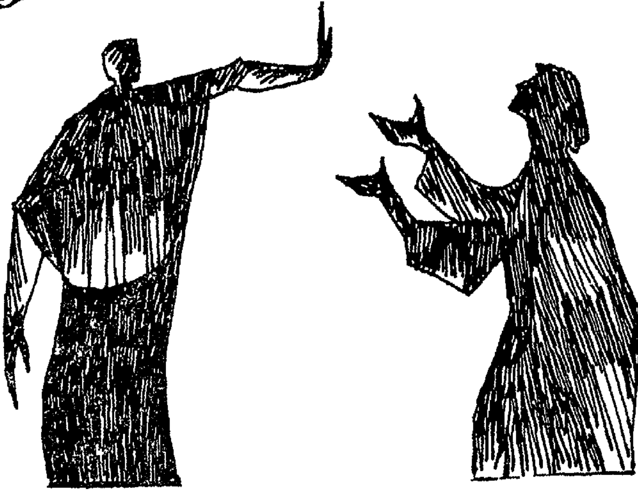
কিভাবে?

ছোট একটা মশা যতটুকু রক্ত পান করে, ততটুকুও রক্তপাত না ঘটিয়ে আমি কাজটি সমাধা করব।



মহারাজাকে নন্দ বললেন, 'অবিলম্বে যাত্রা করতে হবে মহারাজ।' নন্দের কথা বিশ্বাস করে রাজা সেনা সাজিয়ে রওনা হলেন। সেনা-বাহিনীর চলার পথের সমস্ত বাধা নন্দ পণ্ডিত মন্ত্রবলে দূর করলেন। তাদের গায়ে প্রখর সূর্যতাপ লাগল না। বৃষ্টিও তাদের চলার পথ থেকে দূরেই থেকে গেল।

যেতে যেতে কোশল রাজ্য পড়ল। নগরের খানিক দূরে শিবির গড়ে দূতকে পাঠানো হল কোশলরাজের কাছে। দূত বলল, 'হয় যুদ্ধ করুন, না হয় বশ্যতা স্বীকার করুন।' কোশলরাজ সিংহবিক্রমে সৈন্য নিয়ে মনোজের সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধ শুরু হতেই নন্দ একটা কাজ করলেন। যে চামড়ার আসনটিতে তিনি বসে ছিলেন মন্ত্রবলে তা বিশাল করে নিলেন। দু পক্ষের মাঝখানে এভাবে তিনি বসে থাকায় তীরগুলো সব এসে চামড়ায় বিঁধে যেতে লাগল। দু পক্ষের কারও গায়েই তীর লাগছে না। এভাবে দীর্ঘক্ষণ চলার পর দু পক্ষেরই তীর ফুরিয়ে এল। দু পক্ষই ক্লান্ত।



নন্দপণ্ডিত তখন তাঁর চামড়ার আসন সমেত কোশলরাজকে দেখা দিলেন। তাঁকে বললেন, 'মহারাজ, নির্ভয়ে থাকুন। আপনিই আপনার রাজ্যের অধিকারী থাকবেন। রাজা মনোজ আপনার রাজত্ব গ্রহণ করবেন না। আপনি শুধু মৌখিকভাবে তাঁর বশ্যতা মেনে নিন।' কোশলরাজের সম্মত হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। নন্দপণ্ডিত তখন কোশলরাজকে রাজা মনোজের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ, কোশলরাজ আপনার বশ্যতা মেনে নিচ্ছেন। এখন এঁর রাজ্য এঁরই থাকুক।' মনোজও এতে রাজি হলেন।

এভাবে একে একে অঙ্গরাজ্য, মগধ ইত্যাদি জয় করে, সমগ্র জম্বুদ্বীপকে নিজের অধীনে এনে মনোজ সৈন্যসামন্তসহ ব্রহ্মবর্ধনে ফিরে এলেন। যুদ্ধ বিজয়ের পর রাজা মনোজ অন্য সব রাজাদের সঙ্গে পানাহারে মত্ত থাকলেন। নন্দপণ্ডিত ঠিক করলেন, এখন এক সপ্তাহ রাজা মনোজকে দেখা দেবেন না। তিনি একটু আনন্দ-স্ফূর্তি করে নিন। ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় রাজা মনোজের হঠাৎ মনে হল, 'যে তপস্বীর জন্য আমার এত জয়জয়কার তাঁকেই যে দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় গেলেন তিনি?'

রাজা মনোজ নন্দপণ্ডিতকে স্মরণ করা মাত্র নন্দপণ্ডিতও তা অনুভব করতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আকাশপথে এসে রাজাকে



দেখা দিলেন। মাঝ আকাশে নন্দপণ্ডিত বসে আছেন। রাজা মনোজ ভাবলেন, 'ইনি কি দেবতা না মানব, যক্ষ না কিন্নর? ইনি যদি মানব হন তাহলে জম্বুদ্বীপের আধিপত্য আমি এঁকেই দিয়ে দেব।'

'প্রভু, আপনি কি দেব না মানব?'

'আমি দেবতা নই, আমি তপস্বী।'

'আপনি আমাব অনেক উপকার করেছেন। আমি আপনার হাতে রাজ্য তুলে দিতে চাই।'

'রাজা, রাজ্যে আমার কোন বাসনা নেই। এ বাজ্যের অবণ্যে থাকেন শোন, তিনি আমাব দাদা। আমি শুধু তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তিনি পিতামাতার সেবাতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। আপনাদের সঙ্গে নিযে আমি শোনের কাছে যেতে চাই ক্ষমাপ্রার্থী হিসেবে।'

'আপনি যা বলবেন তাই হবে। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে শোন পণ্ডিতের কাছে যাব।'

নন্দপণ্ডিত বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে যেদিন শোন পণ্ডিতেব আশ্রমের দিকে চলেছেন, সেদিন শোন পণ্ডিতেরও ছোট ভাইযের কথা মনে পড়ছিল। সাত বছর সাত মাস কেটে গেল, নন্দব দেখা নেই। সে এখন কোথায় আছে—এই কথা ভাবা মাত্র শোন পণ্ডিত দেখলেন, রাজা ও রাজসৈন্যদের সঙ্গে নিযে নন্দ আশ্রমের দিকে আসছেন। শোন পণ্ডিত বুঝলেন, নন্দ এই রাজাদের কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এখন এই রাজারা ভাবছেন শোন পণ্ডিতের মত এক সামান্য তপস্বী কি করে নন্দপণ্ডিতকে তাড়িয়ে দেন। শোন পণ্ডিত তখন দূরের হ্রদ থেকে জল আনার জন্য আকাশপথে যেতে লাগলেন। রাজা মনোজ তাঁকে দেখলেন। নন্দ শোন পণ্ডিতকে আসতে দেখে লুকিযে পড়লেন। মনোজ তখন শোনেব পরিচয জানতে চাইলেন। তিনি শোনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হলেন।

এর পরের অংশ সংক্ষিপ্ত। নন্দ শোনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে বললেন, 'আপনি অনেকদিন বাবা-মার সেবা করেছেন। এবার আপনি আমাকে এ সুযোগ দিন। বাবা-মার সেবাযত্ন করাই স্বর্গে যাওয়ার প্রশস্ত পথ। আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না।'

এর উত্তরে শোন বললেন, বড় ছেলেরই অধিকার রয়েছে বাবা-মার সেবা করার। ছোটরা বড়দের মান্য করে চলবে এটাই রীতি।' নন্দ তখন নিজের ত্রুটি স্বীকার করলেন। শোনও ভাইকে ক্ষমা করলেন। নন্দ মাকে সেবা করার দায়িত্ব পেলেন। শোন পণ্ডিতের কাঁধে রইল পিতার সেবার দায়িত্ব।

শোনক জাতক

১

মগধরাজ তখন রাজগৃহ নগরে রাজত্ব করেন। মগধরাজের প্রধানা মহিষীর গর্ভে জন্ম নেন বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বের নাম রাখা হল অরিন্দমকুমার। অরিন্দমকুমারের জন্ম আর পুরোহিতের এক ছেলের জন্ম একই দিনে হয়েছিল। পুরোহিতের ছেলের নাম রাখা হয় শোনকুমার।



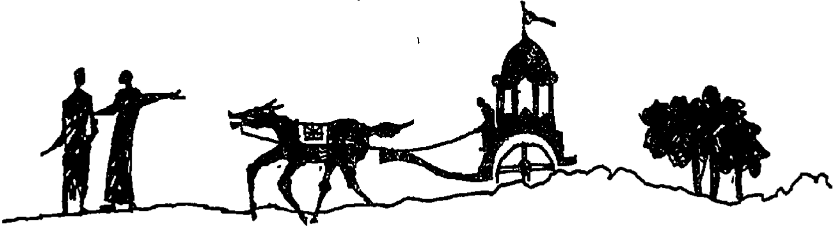
অরিন্দমকুমার আর শোনকুমার একসঙ্গে হেসে খেলে বেড়ে উঠতে লাগলেন। যথাসময়ে বিদ্যা শিক্ষার জন্য দুজনে তক্ষশিলায় গেলেন। নিষ্ঠার সঙ্গে আচার্যের কাছে সর্ববিদ্যা শিখলেন। তারপর দুজনে তক্ষশিলা থেকে রওনা দিলেন। নানারকম জাতি-গোষ্ঠীর লোকদের আচার-আচরণ ও লোকচরিত্র জানার জন্য কুমাররা ঘুরতে লাগলেন।



এদেশ সেদেশ ঘুরে এক সময় দুজনে এলেন বারাণসীতে বারাণসীর রাজার বাগানে ঢুকলেন খানিক জিরিয়ে নিতে। পরের দিন সকালবেলায় তাঁরা বারাণসী নগরে ঢুকলেন। সেই দিনটি ছিল এক পুণ্য দিন। বারাণসী নগরের অনেকেই নিজের নিজের বাড়িতে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করেছিলেন। অরিন্দমকুমার ও শোনকুমারকে তারা রাজপথ দিয়ে যেতে দেখল। এই সুন্দর যুবাদের তারা ব্রাহ্মণ বলে ধরে নিয়ে গেল।

কুমারদের বসার জন্য দু রকমের আসন দেওয়া হল। সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা আসনটিতে তারা অরিন্দমকুমারকে বসতে দিল। শোনকে বসতে দেওয়া হল লাল কম্বলে ঢাকা একটি আসনে। শোনকুমার এই লক্ষণ দেখে বুঝতে পারলেন, 'আমার প্রিয় বন্ধু আজ বারাণসীর রাজা হবে, আর আমি হব সেনাপতি।' খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে আবার সেই রাজ-বাগানে ফিরে গেলেন।

যেদিন এ ঘটনা ঘটে তার ঠিক দু দিন আগে বারাণসীরাজের মৃত্যু হয়েছিল। রাজার কোন ছেলে ছিল না। রাজকুলে কারও পুত্র সন্তান নেই। রাজার অমাত্যরা পুষ্পরথ বানালেন। তারপর সকলে



সমস্বরে বললেন, 'হে রথ, রাজা হওয়ার যোগ্য যিনি,তার কাছে যাও।' রথটি এপথ-সেপথ ঘুরে রাজার বাগানের সামনে থেমে গেল।

অরিন্দমকুমার তখন তাঁর উত্তরীয়টি মাথার তলায় দিয়ে পাথরের ওপর শুয়েছিলেন। শোনকুমার বসেছিলেন বোধিসত্ত্বের পায়ের কাছে। রাজকীয় বাজনা শুনে শোনকুমার বুঝতে পারলেন, 'বন্ধুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রথ এসে গেছে। রাজা হয়েই আমার প্রিয় বন্ধু আমাকে সেনাপতি করবেন। কিন্তু ঐশ্বর্য নিয়ে আমি কি করব? ক্ষমতা দিয়েই বা কি করব? বরং অরিন্দমকে রথে করে নিয়ে যাওয়ামাত্র আমি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব। প্রব্রজ্যা নেব।' মনে মনে এসব ভেবে শোনকুমার আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন।



পুষ্প বথ থেকে বাজপুবোহিত নেমে এলেন। বাগানে ঢুকে ঘুমন্ত বোধিসত্ত্বকে দেখে তিনি বাজনদারদের বললেন 'বাজনা বাজাও।' বাজনা শুনে অবিন্দমকুমাবেব ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি উঠে বসলেন। পুবোহিত তখন হাতজোড কবে বললেন, 'প্রভু, বাজলক্ষ্মী আপনাকে ববণ করতে এসেছেন।'



অরিন্দমকুমাব ॥ রাজকুলে কি কোন পুরুষ নেই ?

পুবোহিত ॥ না প্রভু।

অরিন্দমকুমার ॥ তাহলে আমি রাজি হচ্ছি।

বাজাব বাগানেই অভিষেকপর্ব সাঙ্গ হল। তাবপব সবাই বোধিসত্ত্বকে রথে তুলে জয়ধ্বনি দিতে দিতে বাজপ্রাসাদে নিযে গেল। প্রাসাদে পৌছে রাজকীয় সুখে বোধিসত্ত্ব ডুবে গেলেন। বন্ধুর কথা একেবারে ভুলে গেলেন।

এদিকে অরিন্দমকুমাব চলে যাওযার পর শোন লুকোনো জাযগা থেকে বেরিয়ে এলেন। যে পাথবের ওপর অরিন্দমকুমার শুযেছিলেন সেখানে শুযে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে একটি বিবর্ণ শালপাতা শোনের গায়ে উড়ে এসে পড়ল। শোন শালপাতাটি হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগলেন। ভাবলেন, এই পাতাটি একদিন কচি ছিল। তখন ওর বঙ ছিল সবুজ। এখন জবায পাতাটি হলুদ হযেছে। মানুষেব জীবনও ঠিক এই শালপাতাটির মতই। এই ভাবনায় তিনি তলিয়ে গেলেন। তপস্বীবা দীর্ঘদিন তপস্যা করে যে ফল লাভ কবেন, শোন গভীরভাবে ভাবতে পারায় কিছুক্ষণেব মধ্যেই তা লাভ করলেন। তার শরীর থেকে গৃহী মানুষের সমস্ত চিহ্ন খসে পড়ল।



বদলে ফুটে উঠতে লাগল প্রকৃত তপস্বীব চিহ্নগুলি। শোন তখন নন্দমূলক গুহাব দিকে যাত্রা করলেন।

এই ঘটনার পব চল্লিশটি বছর কেটে গেছে। চল্লিশ বছব পবে হঠাৎ একদিন বোধিসত্ত্বের শোনের কথা মনে পড়ল। তিনি সেই মুহূর্তে বন্ধুকে দেখাব জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। নিজেকে ধিক্কাব দিতে লাগলেন। কেন এতদিন তিনি শোনকে ভুলে বইলেন। চারদিকে চর পাঠালেন শোনেব খোঁজে। একে একে চববা ব্যর্থ হয়ে ফিবে এল। বাজা পুবস্কাব ঘোষণা করলেন। তারপর মনেব দুঃখে শোনকে নিযে একটি গান বেঁধে নিযে সেই গানটি গাইতে লাগলেন। রাজার অমাত্যরা দেখলেন এটি বাজার প্রিয গান। বাজাব প্রিয হওযাব জন্য তাঁবাও সেই গানটি গাইতে শুরু কবে দিলেন। প্রজাবাও গানটি লিখে নিল। এভাবে সমস্ত বাবাণসীতে ওগো বন্ধু শোন' গানটি অহরহ শোনা যেতে লাগল।



২



এভাবে কেটে গেল আব দশটি বছব। মহাবাজ অবিন্দম তখন বহু সন্তানেব জনক। বড ছেলেব নাম ছিল দীর্ঘায়ুঃকুমাব।

এদিকে তপস্বী শোনও একদিন ভাবলেন, 'অবিন্দম বেশ কিছুকাল যাবৎ আমাকে দেখাব জন্য আকুল হযেছে। আমি এবাব তাঁব সঙ্গে দেখা কবতে যাব। তাঁকে বুঝিযে বলব সংসার কত অসাব জিনিস। বিষযসুখ আবর্জনার তুল্য। এভাবে তাঁর জ্ঞানচক্ষু খুলতে সাহায্য কবব। তাঁকে প্রব্রজ্যা নেওযাব।'

এবপর শোন ঋষি আকাশপথে যাত্রা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এসে উপস্থিত হলেন বাজাব বাগানে। সেখানে আসন বিছিযে বসলেন। তপস্যায মগ্ন হলেন। পঞ্চচূডক নামে এক বালককে তাব মা বাজাব বাগানে পাঠিযেছিলেন কাঠ কুডিযে আনতে। পঞ্চচূডক রাজাব প্রিয গানটি 'ওগো বন্ধু শোন' গাইতে গাইতে বাগানে ঢুকল। ছেলেটি কাঠ কুডোতে কুডোতে বারবাব ঐ একই গান গাইছে দেখে শোন জিজ্ঞেস কবলেন, 'বাছা, তুমি এই একটা গান ছাডা আর কোন গান জান না?'

'জানি আচার্য।'

'তাহলে কেন বারবাব এই গানটি গাইছ?'



'আমাদের রাজার প্রিয় গান এটি।'

'এ গানের পাল্টা গান জান?'

'না আচার্য।'

'আমি যদি তোমাকে শিখিয়ে দিই তাহলে রাজার সামনে গিয়ে সেটা গাইতে পারবে?'

'পারব।'

'এস, তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি।'

'শুনেছি শোন কোথায় আছে, দেখেছিও তাঁকে' এই গানটি শোন ছেলেটিকে শিখিয়ে দিলেন। ছেলেটি গান শিখে শোন ঋষিকে বলে গেল, 'আচার্য, আমি যতক্ষণ না রাজাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসছি ততক্ষণ আপনি দয়া করে এখানেই থাকবেন।' শোন বললেন, 'তথাস্তু।'

ছেলেটি বাড়িতে ফিরে গিয়ে তার মাকে বলল, 'মা, আমাকে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়ে দাও।' স্নান করে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে সে রাজপ্রসাদের কাছে এসে দ্বারীকে বলল, 'আপনি রাজাকে বলুন তাঁর সঙ্গে গান গাইবার জন্য একটি ছেলে বাইরে অপেক্ষা করছে।' রাজা সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চচূড়ককে ডাকিয়ে আনলেন।

'তুমি নাকি আমার সঙ্গে গান করতে চাও?'

'হ্যাঁ মহারাজ।'

'বেশ, গান কর তাহলে।'

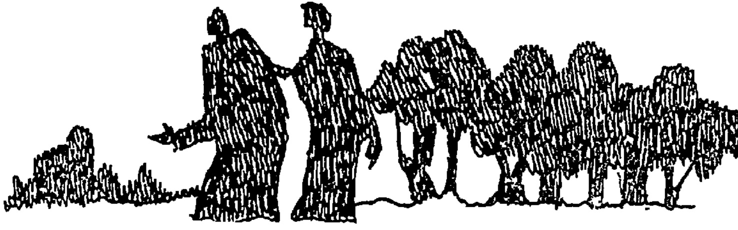
'না মহারাজ, আমি এখানে গাইব না।'

'কোথায় গাইবে?'

'আপনি ভেরি বাজিয়ে অনেক লোক আনান।'

রাজা তাই করলেন। তারপর পঞ্চচূড়ককে বললেন, 'এবার গান কর।' পঞ্চচূড়ক বলল, 'মহারাজ, প্রথমে আপনি আপনার গানটি করুন। আমি আর একটা পাল্টা গান গাইব।' রাজা তখন 'ওগো বন্ধু শোন তুমি কোথায় আছ' গানটা গাইলেন। পঞ্চচূড়ক তারপর গান ধরল। রাজা তখন তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কোথায় তাঁকে দেখেছ? কোন্ শহরে, কোন্ বনে?' পঞ্চচূড়ক বলল, 'মহারাজ, এই শহরেই। আপনারই বাগানে তিনি আছেন, চলুন।'





বাগানে এসে বাজা শোনেব দীন বেশ শুকনো চেহারা দেখে ভাবলেন, 'শোন বেচারা নেহাতই দুঃখে আছে।' ফলে তিনি অনুকম্পা প্রকাশ করে কথা বলতে লাগলেন। শোন রাজার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝলেন, ভোগলালসার মধ্যে থেকে বাজার স্বভাবে বিকৃতি এসেছে। তিনি স্পষ্ট ভাবে বাজাকে বললেন, 'শুনুন রাজন, আমি আপনাব কৃপাপ্রার্থী নই।'

শোন বললেন, 'ভোগে গলা অবধি ডুবে থেকে তোমার কাণ্ডজ্ঞানও যেতে বসেছে। তোমার মত যাদের অবস্থা হয মৃত্যুর পর তা'দের নরকযন্ত্রণা ভোগ কবতে হয। তুমি এখন থেকেই সতর্ক হও।' তারপর ধর্মকথা ব্যাখ্যা কবতে লাগলেন। শোন ঋষিব প্রশান্ত মনেব প্রভাব পড়ল বাজার ওপর। শেষে শোন তাঁকে প্রস্তাব দিলেন, 'তোমার এখন প্রব্রজ্যা নেওযা উচিত।' এই পরামর্শ দান করে শোন আকাশপথে উড়ে চলে গেলেন। বাজাব অন্তবাত্মায ঘটে গেল এক বিবাট পবিবর্তন।

বাজা প্রব্রজ্যা নেবেন স্থিব কবলেন। অমাত্যবা কেউ সমর্থন কবল, কেউ বা আপত্তি জানাল। কিন্তু রাজা অটল রইলেন। দীর্ঘাযুঃকুমারকে বাজপদে অধিষ্ঠিত হতে বলে তিনি গৃহত্যাগ কবলেন।

সম্বুলা জাতক

বাবাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তেব স্বস্তিসেন নামে একটি ছেলে ছিল। বড় হলে রাজা তাঁকে যুবরাজ করলেন। স্বস্তিসেনের প্রধানা মহিষী সম্বুলা ছিলেন অসামান্যা রূপবতী। বেশ আমোদ-আনন্দে তাঁদের দিন কাটত।



দুঃখের বিষয় হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করে দুর্যোগ নেমে এল স্বস্তিসেন ও সম্বুলার জীবনে। স্বস্তিসেন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁর শরীর খসে খসে পড়তে লাগল। দুঃখে-বিষাদে স্বস্তিসেন ঠিক করলেন তিনি বনবাসী হবেন। সেখানেই প্রাণত্যাগ করবেন। সম্বুলা তাঁর অনুগামী হতে চাইলেন। স্বস্তিসেন তাঁকে অনেক বোঝালেন। বললেন, তোমার শরীরে আমার মত পচন ধরে নি. কেন তুমি আমার সঙ্গে আসবে।' সম্বুলা জানালেন, 'আপনার সেবা করাই আমার ব্রত। সেই ব্রত পালন করতেই আমি আপনার অনুগামী হব।'

স্বস্তিসেন বাবা-মার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তাঁরা কাঁদতে লাগলেন। সম্বুলাকে সঙ্গে নিয়ে স্বস্তিসেন চললেন অরণ্যের দিকে। ছায়াদায়ী একটি বিশাল গাছের তলায় তাঁরা কুটির বানালেন।



সম্বুলা রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে স্বস্তিসেনের হাত-মুখ ধোয়ার জল এনে দিতেন। দাঁত মাজার জন্য দাঁতন কাঠি যোগাতেন। তারপর তাঁকে কয়েকটি পাকা ফল খাইয়ে ঝুড়ি, খন্তা প্রভৃতি নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। সারাটা সকাল বনে বনে ঘুরে ফলমূল যোগাড় করতেন। ফিরে আসতেন মাঝ দুপুরে। তখন আরেক দফা স্বস্তিসেনের সেবা করতেন। ঘা-গুলো ধুইয়ে দিতেন। বনৌষধি বেটে ঘায়ের ওপর লাগিয়ে দিতেন। তারপর তাঁকে খাইয়ে নিজে খেয়ে নিতেন। স্বস্তিসেনের সারা গায়ে হাত বুলিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়াতেন। নিজে পাশে শুয়ে থাকতেন।

একদিন সম্বুলা ফলমূল যোগাড় করতে বেরিয়ে একটি হ্রদের সামনে এলেন। ভাবলেন, 'স্নান করে নিই।' স্নান সেরে যখন উঠে আসছেন তখন দেখলেন এক কিম্ভূতকিমাকার দৈত্য তাঁর দিকে

এগিয়ে আসছে। সম্বুলা দেখলেন মহা বিপদ। যদি তিনি এই দৈত্যের পেটে যান তাহলে স্বস্তিসেনের দুঃখের শেষ থাকবে না। সম্বুলা দানবের বিকট চেহারা দেখে আতঙ্কিত হয়ে দেবতাদের সাহায্য চাইতে লাগলেন। তাতে স্বর্গে শক্রর আসন টলে উঠল। তিনি বুঝলেন সম্বুলা বিপদে পড়েছেন। শক্র সম্বুলাকে রক্ষা করতে ছুটে এলেন। দানবের মাথার ঠিক ওপরে বজ্র রেখে বললেন, 'সম্বুলার দিকে এক পা এগোলে তোর মাথা দু টুকরো হয়ে যাবে।' তারপর ভাবলেন, 'দৈত্যটা হয়ত এখন সম্বুলাকে ছেড়ে দেবে, কিন্তু পরে সুযোগ পেলেই আবার ধরবে।' এই ভেবে শক্র দৈত্যটাকে শেকলে বেঁধে এক পাহাড়ের গুহায় বন্দী করে রাখলেন। আর সম্বুলাকে বললেন, 'হে শীলবতী নারী, তোমার কোন ভয় নেই, তুমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।'



এত সব কাণ্ডের পর সম্বুলার ফিরে আসতে দেরি হয়ে গেল। ফিরে এসে দেখেন স্বস্তিসেন কুটিরে নেই। তাতে তিনি খুবই ভয় পেয়ে গেলেন। 'ঐ জীর্ণ শরীর নিয়ে কোথায় গেলেন স্বস্তিসেন' এইসব ভাবতে লাগলেন। বিলাপ করতে লাগলেন। কিছু পরে স্বস্তিসেন ফিরে এলে সম্বুলা তাঁকে সমস্ত ঘটনাটি খুলে বললেন। স্বস্তিসেন কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করলেন না। তিনি সে কথা প্রকাশও করলেন, 'মেয়েরা কথায় কথায় মিথ্যে কথা বলে। কে জানে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'



স্বস্তিসেনের কথায় সম্বুলা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি এক অসম্ভব প্রতিজ্ঞা করে বসলেন: 'যদি আমি সত্যি কথা বলে থাকি, সত্য পথে চলে থাকি, তাহলে এসব সত্যক্রিয়ার জোরে এই মাটির কলসীর জল আমি আপনার শরীরে ঢালব, আর তাতেই আপনার রোগ সেরে যাবে। যদি তা না যাবে তাহলে বুঝবেন আমি মিথ্যে বলেছি।' সম্বুলা দেবতাদের স্মরণ করে কলসীর জল স্বস্তিসেনের মাথায় ঢেলে দিলেন। তাঁর সারা শরীর ধুইয়ে দিলেন।

তামার কলসের দাগ যেমন তেঁতুল দিয়ে মাজলেই উঠে যায় ঠিক সেইরকম কাণ্ড ঘটল। স্বস্তিসেনের ঘাগুলো তো মিলিয়ে গেলই, এমন কি ঘাযের কোন দাগও রইল না। স্বস্তিসেন যেন নতুন জীবন ফিরে পেলেন।

এরপর স্বস্তিসেন আর সম্বুলা বারাণসীর উদ্দেশে রওনা হলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত স্বস্তিসেনের দেহলাবণ্য ফিরে এসেছে দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন। স্বস্তিসেনকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করে প্রব্রজ্যা নিলেন। তবে ব্রহ্মদত্ত অরণ্যে গেলেন না। তিনি রাজবাড়ির বাগানেই কুটির গড়ে নিয়ে থাকতে লাগলেন। সারাদিনে একবার প্রাসাদে আসতেন খেতে।

এদিকে স্বস্তিসেন রাজা হওয়ার পর অতীতের কথা সবই ভুলে গেলেন। বিষয়সুখে তিনি সম্পূর্ণ ডুবে গেলেন। শিকার, গান-বাজনা আর নানারকম স্ফূর্তিতে স্বস্তিসেনের সময় কেটে যায়। সারাদিনে একবারও সম্বুলার খোঁজ নেওয়ার সুযোগ পেতেন না তিনি। দুঃখকষ্টে সম্বুলার মন ভেঙ্গে পড়ল। তাঁর শরীর আর আগের মত রইল না। সোনার মত রঙ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। পাতলা চামড়ার ওপর দড়িদড়ার মত জেগে উঠল শিরাগুলো।

একদিন তপস্বী ব্রহ্মদত্ত প্রাসাদে এসেছেন, সম্বুলা তাঁকে খেতে দিয়ে তাঁর সামনে বসে আছেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তোমার কিসের দুঃখ। কে তোমার দুঃখের কারণ আমাকে বল।' সম্বুলা তখন তাঁকে সব খুলে বলে কেঁদে ফেললেন।



এরপর ব্রহ্মদত্ত স্বস্তিসেনকে ডেকে বললেন, 'তুমি যা করে চলেছ, শাস্ত্রে একে মিত্রদ্রোহিতা বলে। মিত্রদ্রোহীকে মৃত্যুর পর নরকবাস করতে হয়। সম্বুলার জন্যই তুমি নবজীবন ফিরে পেয়েছ। সেই সম্বুলা বেঁচে আছে না মরে গেছে তুমি খোঁজও নাও না।' স্বস্তিসেনের হুঁশ ফিরল। একে একে সব কথা তাঁর মনে পড়ল। বাকি জীবন স্বস্তিসেন-সম্বুলা খুব আনন্দের সঙ্গেই কাটালেন।



মহাহংস জাতক

১

পুরাকালে বাবাণসীবাজেব নাম ছিল সংযম। সংযমেব প্রধানা মহিষীব নাম ক্ষেমা। যে সময়েব কথা বলা হচ্ছে তখন বোধিসত্ত্ব জন্ম নিয়েছিলেন হংসকুলে। ন হাজাব হাঁসেব দলপতি তিনি। ন হাজাব হাঁসসমেত চিত্রকূট পর্বতে থাকেন।

একদিন ক্ষেমাদেবী এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন ঃ

সোনাব রঙেব হাঁসেবা বাজপালঙ্কে বসে আছে। মানুষের ভাষায় তারা কথা বলছে। তাদেব গলাব স্বব খুবই মিষ্টি। আব কথাগুলোও চমৎকার। সবই ধর্মকথা। শুনতে শুনতে ক্ষেমা বলে উঠলেন, 'সাধু! সাধু!' হঠাৎ সেইসব সোনার হাঁস জানলা দিয়ে উড়ে চলে গেল।

এভাবে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তাব আগে ক্ষেমাদেবী 'ধব, ধব, হাঁসগুলো পালিয়ে যাচ্ছে রে' বলে হাত বাড়িয়ে উঠে বসেছিলেন। দাসীবা তা শুনে হেসে ফেলল, 'এখানে হাঁস কোথায় রাণীমা?'

ক্ষেমাদেবী বুঝলেন এতক্ষণ তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলেও তিনি কিছুতেই মানতে পাবলেন যে স্বপ্ন মিথ্যে। ভেবে দেখলেন, 'যা নেই, যা কোনকালে ছিল না, এমন জিনিস তো আমি স্বপ্নে দেখি না। তাহলে কোথাও নিশ্চয়ই সোনার হাঁস আছে যারা ধর্মকথা বলে।' ক্ষেমাদেবী দাসীদেব সঙ্গে পবামর্শ করে অসুস্থতাব ভান করে বিছানায় শুয়ে রইলেন। দবজায় খিল পড়ল।

সাবাদিনে একবারও দবজা না খোলায় বাজা নিজে এলেন ক্ষেমাদেবীর কাছে। দবজায় টোকা দিতে দাসীবা ভেতব থেকে দবজা খুলে দিয়ে একপাশে সবে দাঁড়াল। সংযম বাণীব শিয়বে এসে দাঁড়ালেন। ক্ষেমার মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।





'কি হয়েছে?'
'কিছু না।'
'গোপন কোরো না ক্ষেমা।'
'সামান্য ব্যাপার মহারাজ।'
'যত সামান্যই হোক তুমি আমাকে বল।'
'সে কথা শুনলে আপনি হাসবেন।'
'তুমি নির্ভয়ে বল।'

'মহারাজ, আমি স্বপ্নে এক সোনার হাঁসকে দেখেছি। সে আমাকে মধুর স্বরে ধর্মকথা শোনাচ্ছিল।'

'বেশ।'

'এখন ঐ হাঁসটির কাছে আমি আবার ধর্মকথা শুনতে চাই। আর তা না পারলে আমার পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব।'

'এ পৃথিবীতে কোথাও যদি ঐ রকম সোনার বরণ হাঁস থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে।'

এরপর রাজা সংযম অমাত্যদের ডেকে ঘটনাটি জানিয়ে পরামর্শ চাইলেন। অমাত্যরা অনেক ভেবে বললেন, 'দেখুন মহারাজ, সোনার হাঁসের কথা আমরা কখনও শুনিনি, দেখা তো দূরের কথা।' রাজা তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'সোনার হাঁসের কথা কে জানতে পারেন বলুন দেখি।' অমাত্যরা তখন বললেন, 'মহারাজ, ব্রাহ্মণরা অনেক সময় অনেক অদ্ভুত জিনিসের খোঁজ রাখেন। আপনি তাঁদের জিজ্ঞেস করুন।'

ব্রাহ্মণদের খবর পাঠানো হল। তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ মহারাজ, বাপঠাকুর্দার মুখে শুনেছি বটে কোন কোন প্রাণীর গায়ের রঙ সোনার মত হয়ে থাকে। এ-ও শুনেছি ধৃতরাষ্ট্রকুলে যেসব হাঁস জন্মায় তারা নাকি ধার্মিক এবং জ্ঞানবান হয়ে থাকে।'



ধৃতরাষ্ট্রকুলের ঐ হাঁসদের কোথায় পাওয়া যাবে সে কথা অবশ্য ব্রাহ্মণরা বলতে পারলেন না। তাঁরা পরামর্শ দিলেন, 'আপনি রাজ্যের সব ব্যাধদের ডেকে খোঁজ নিন। তারা জানলেও জানতে পারে।' ব্যাধদের ডাকা হলে তাদের দলপতি বলল, 'বাপঠাকুর্দার মুখে শুনেছি সোনার হাঁস হয়।'

'কিন্তু তারা থাকে কোথায়?'

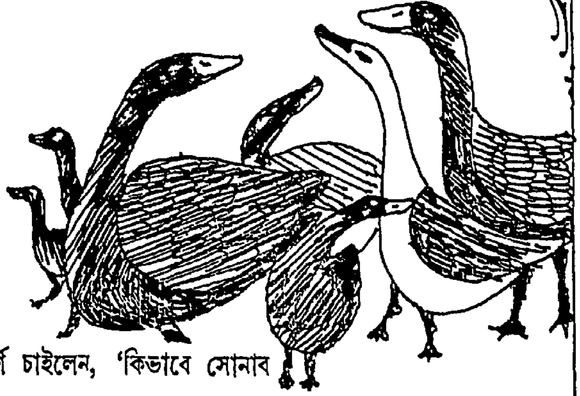
'যতদূর জানি হিমবন্ত প্রদেশে।'

'হিমবন্ত প্রদেশের কোথায়?'

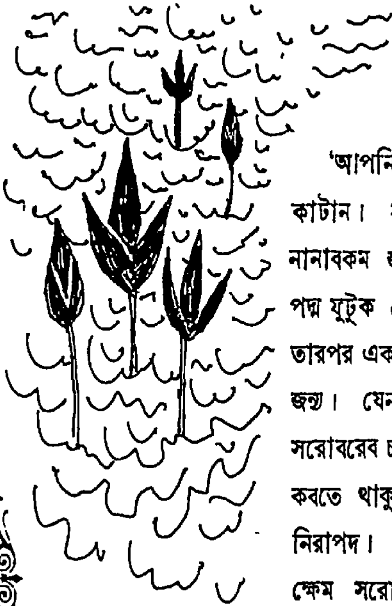
'চিত্রকূট পর্বতে।'

'এদের ধরা যায় কিভাবে?'

'তা তো জানি না মহারাজ।'



রাজা আবার ব্রাহ্মণদের পরামর্শ চাইলেন, 'কিভাবে সোনার হাঁসকে ধরা যায়।' ব্রাহ্মণরা বললেন, 'মহারাজ, সোনার হাঁস ধরার জন্য চিত্রকূটে যাওয়ার দরকার নেই। তারা নিজেরাই যাতে বারাণসীতে আসে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।' এই বলে ব্রাহ্মণরা এক অভিনব পরিকল্পনার কথা বললেন।



'আপনি বারাণসী নগরের উত্তরদিকে বড়সড় একটি সরোবর কাটান। সরোবরটি জলে টইটম্বুর করে তুলুন। আর সেখানে নানারকম জলজ গাছ-লতা লাগাবারও ব্যবস্থা করুন। পাঁচ রঙের পদ্ম ফুটুক সেই সরোবরে। সরোবরের নাম দিন ক্ষেম-সরোবর। তারপর এক বুদ্ধিমান ব্যাধকে নিযুক্ত করুন সরোবরটি পাহারা দেওয়ার জন্য। যেন কোন লোক ঐ সরোবরের কাছে যেতে না পারে। ঐ সরোবরের চার কোণে সর্বক্ষণ চারজন ঘোষক দাঁড়িয়ে থেকে ঘোষণা করতে থাকুক, এই সরোবর অভয়-সরোবর। এখানে সমস্ত প্রাণীই নিরাপদ। একবার এরকমটি করা হলে অনেক পাখি দূরদূরান্ত থেকে ক্ষেম সরোবরে আসবে। একসময় ধৃতরাষ্ট্র বংশজাত হাঁসরাও আসবে। তখন নরম জাল দিয়ে তাদের ধরতে হবে।'

২

যথাসময়ে ক্ষেম সরোবর তৈরি হল। রাজা ব্যাধকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন কখন কোন্ জাতের পাখিরা আসছে ব্যাধ যেন সে খবর রাজাকে দিয়ে যায়। সোনার হাঁস আসার খবর যেদিন ব্যাধ আনতে পারবে সেদিন সে অঢেল পুরস্কার পাবে। যে ব্যাধ ক্ষেম সরোবর পাহারা দিত তার নতুন নাম হল ক্ষেম-নিষাদ। ক্ষেম-নিষাদ প্রতিদিন রাজাকে খবর দিয়ে আসত কি পাখি আসছে। পাণ্ডু হাঁস, শ্বেত হাঁস মনঃশিলা হাঁস ইত্যাদি নিয়মিত আসতে লাগল।

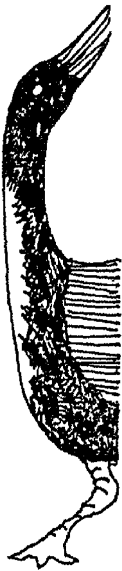
পাখিদের মুখে মুখে ঐ সরোবরের খবর ধৃতরাষ্ট্র হাঁসরা পেল। তখন তারা সুমুখ হংসরাজকে বোধিসত্ত্বের কাছে পাঠাল। সুমুখ গিয়ে বোধিসত্ত্বকে বলল, 'প্রভু, আমরা অভয় সরোবরে চরতে যেতে চাই।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'দেখ, মানুষ নানারকম কৌশল খাটায়। আমাদের সুবিধের জন্য তারা কিছু করবে না। নিশ্চয়ই ওরা আমাদের জালে আটকাতে চাইছে। তোমরা ওখানে যেতে চেয়ো না।'

'কিন্তু প্রভু, আমাদের খুবই ইচ্ছে করছে।'

'এতে বিপদ হতে পারে।'

'কেন, অন্য হাঁসরা তো রোজই চরে ফিরে আসছে।'

বোধিসত্ত্ব দেখলেন সুমুখকে যখন বোঝানো গেল না তখন আর উপায় নেই। হাঁসের দল ক্ষেম সরোবরের উদ্দেশে উড়ে চলল।



প্রথম দিন সুবর্ণহংসের দল আসার পরেই ক্ষেম-নিষাদ রাজাকে গিয়ে খবর দিল। রাজা ব্যাধকে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে বললেন, 'এবার তুমি দেখ, কিভাবে অক্ষত অবস্থায় ওদের একজনকে ধরতে পার। ধরা পড়লে তুমি আরও পুরস্কার পাবে।'

ব্যাধ ফিরে এল। এবার সে ফাঁদ বানিয়ে সাত দিন অপেক্ষা করল। তারপর দেখল ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর যে হাঁসটি, সে রোজ এসে একই জায়গায় নামে। সেখান থেকেই জলজ-গুল্ম খেতে শুরু করে। ক্ষেম-নিষাদ ঠিক সেই জায়গাটিতেই ফাঁদ পেতে রাখল। বোধিসত্ত্ব পরের দিন এসে জলে নামা মাত্র ফাঁদে পড়লেন। ফাঁদ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁর পায়ের মাংস কেটে গেল শিরা ছিঁড়ে গেল। আরও টানাটানি করলে পা-টি

হারাতে হয়। বাচ্চাদের অঙ্গহানি হওয়া খুবই খারাপ। সেজন্য তিনি চুপ করে রইলেন। আবার, ফাঁদে পড়েছেন বলে যে ডেকে উঠবেন, তা-ও করলেন না। হাঁসের দল তাহলে ভয় পেয়ে উড়ে যাবে। কিন্তু খালি পেটে চিত্রকূট পর্বত পর্যন্ত উড়ে যেতে পারবে না। মাঝপথে সমুদ্রে পড়ে তারা মারা যাবে।

হাঁসের দলের খাওয়া যখন শেষ হওয়ার মুখে, বোধিসত্ত্ব তখন ডেকে উঠলেন। সেই ডাকে বাকি সবাই বুঝল, কেউ একজন ফাঁদে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল হাঁসের দল আকাশে উড়ে গেল। তিনটি সারিতে তারা উড়ে চলল চিত্রকূট পাহাড়ের দিকে। সুমুখ দেখলেন, তিনটি সারির কোনটিতেই বোধিসত্ত্ব নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফিরে এলেন বোধিসত্ত্বের কাছে। ক্ষেম-নিষাদ তখন এগিয়ে আসছে ফাঁদের হাঁসটিকে ধরতে। সুমুখ মানুষের ভাষায় ব্যাধের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

'তোমার নাম কি?'

'আমার নাম ক্ষেম-নিষাদ।'

'ক্ষেম, শোন। তুমি যাঁকে ফাঁদে বন্দী করেছ তিনি সামান্য হাঁস নন। ইনি জ্ঞানী, ধার্মিক আর ন হাজার হাঁসের দলপতি।'



ক্ষেম-নিষাদ হাঁসের কথা শুনে বেশ অবাক হল। বিশেষ করে সুমুখ যখন বলল, 'আমি এঁর সেনাপতি। ওঁকে বন্দী করে যা লাভ করবে, আমাকে বন্দী করতে তার চেয়ে কম কিছু পাবে না। সুতরাং এঁকে ছেড়ে দাও। আমাকে নিয়ে চল।'

ব্যাধের মধ্যে মৈত্রীভাব জেগে উঠল। সে বোধিসত্ত্বের কাটা জায়গা জল দিয়ে ধুয়ে দিতে লাগল। মৈত্রীভাবের গুণে বোধিসত্ত্বের কাটা পায়ের মাংস চামড়া ঠিকমত জুড়ে গেল। ছেঁড়া শিরাও যুক্ত হল। তিনি তার আগের পা-টিই যেন ফিরে পেলেন। আর এ সবই ঘটল ব্যাধের মধ্যে সুমুখ যে মৈত্রীভাব জাগিয়ে তুলেছিল তার গুণে। ব্যাধ হংসরাজকে উড়ে যেতে বলল।

কিন্তু সুমুখ তাতে রাজি নন। তিনি বললেন, 'তুমি আমাদের রাজা আর আমার জন্য দুটি খাঁচা নিয়ে এস। একটি খাঁচায় সাদা ফুল বিছিয়ে দাও। আরেকটিতে বিছিয়ে দাও লাল ফুল। সাদা ফুলের খাঁচাটিতে রাজাকে বসাও, আর লালফুলের খাঁচাটিতে বসাও আমাকে। তারপর রাজার কাছে নিয়ে চল।'

'অমন আদেশ করবেন না।'

'কেন?'

'রাজারা বড় সাংঘাতিক হয়, আপনাদের বধ করবেন তিনি।'

ক্ষেম-নিষাদকে আশ্বস্ত করতে সুমুখ বললেন, 'রাজারা জ্ঞানী হন। আমি ধর্মকথা বলে তাঁর মন বদলে দেব। তাছাড়া তুমি রাজার আদেশে আমার প্রভুকে ধরেছিলে। রাজা খুশি হয়ে তোমাকে ধনরত্ন দিতেন। আমরা তোমার ক্ষতি করতে পারি না।'

ব্যাধ লতা দিয়ে দুটি খাঁচা বানিয়ে তাতে সুবর্ণ হংসদের রাখল। রাস্তা দিয়ে ব্যাধ চলেছে। ঐ অপূর্ব সুন্দর হাঁসদুটিকে দেখে পথচারীরা চোখ ফেরাতে পারল না। তারাও পিছন পিছন চলল।



দুয়ারী গিয়ে রাজাকে জানাল, 'মহারাজ, ক্ষেম-নিষাদ সোনার হাঁস নিয়ে আসছে।' রাজা তাকে নিয়ে আসতে বললেন। সে আসা মাত্র অমাত্যদের বললেন, 'ব্যাধকে এক্ষুনি পুরস্কার দাও।' তারপর ক্ষেম-নিষাদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কিভাবে এঁদের ধরলে।' ব্যাধ তখন যা যা ঘটেছিল সবই বলল। এমন কি সে যে এঁদের মুক্ত করে

দিযেছিল সে কথাও গোপন কবল না। রাজা তখন সুমুখকে জিজ্ঞেস কবলেন :

'নিজেব ইচ্ছেতেই যখন এসেছ তখন ভয পাচ্ছ কেন? কেন তোমার মুখে কথা নেই?'

'আমি মোটেই ভয পাই নি মহারাজ।'

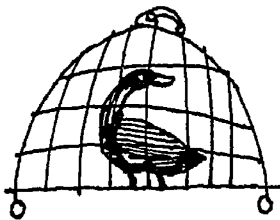
'ওহে হংস সেনাপতি, ভয পাওনি বলছ, কিন্তু এখানে তোমাকে বক্ষা করার জন্য তো কেউই নেই।'

'দেখ রাজা, আমবা আকাশচাবী। সেজন্য আমাদেব রক্ষা করার জন্য সৈন্যবাহিনী লাগে না।'

এভাবে বাজার সঙ্গে সুমুখের কথা যতই এগোতে লাগল বাজা ততই আশ্চর্য বোধ কবতে লাগলেন সুমুখেব জ্ঞান দেখে। সুমুখ রাজাকে 'মিথ্যাচাবী' বলে অভিযোগ করলেন। কেননা ক্ষেম-সরোবরকে অভয সরোবব হিসাবে ঘোষণা করার পরও সেখানে ফাঁদ পেতে সুমুখ ও মহাসত্ত্বকে ধবা হয়েছে। রাজা বললেন, 'অভযবাণী এখনও সত্য, কেননা তোমাদেব কোন ক্ষতি আমি কবব না। হংসরাজ ও তোমার মুখে ধর্মকথা শোনাই আমাব রাণীর ইচ্ছে। শুধু সেই ইচ্ছেটুকু তোমবা পূবণ কব।'

এবপর সোনার হাঁসদের অনেক সমাদর করা হল। ক্ষেমাদেবী এবং রাজা তাঁদের মুখে ধর্মকথা শুনলেন। তারপর প্রাসাদের ছাদে উঠে দু হাতে দুজনকে বসিয়ে বললেন, 'পুণ্যাত্মা পাখি, তোমাদের যেখানে প্রাণ চায তোমরা সেখানে উডে যাও।'

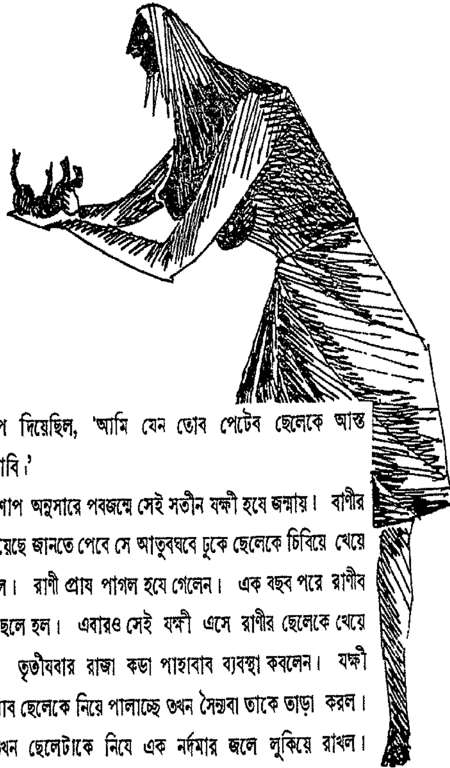
সুমুখ ও মহাসত্ত্বেব সোনালী ডানা আকাশে পলকের জন্য দেখা গেল। তাবপর তাঁবা গিযে নামলেন চিত্রকূট পর্বতে। আত্মীযকুটুম্ব ও বন্ধুরা হংসবাজ এবং তার সেনাপতিকে নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে দেখে জযধ্বনি দিল।





জয়দ্দিষ জাতক

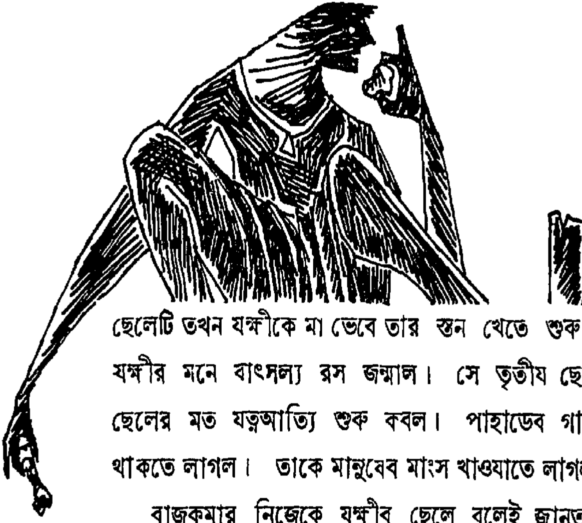
পুবাকালে কাম্পিল্য বাজ্যে উত্তব পঞ্চাল নামে একটি নগব ছিল। সেখানে রাজত্ব কবতেন পঞ্চাল নামে এক বাজা। পঞ্চাল বাজাব প্রধানা মহিষী এক পুত্র প্রসব কবেন। পঞ্চাল বাজাব ঐ মহিষীব আগের জন্মে এক সতীন ছিল। দুই সতীনে একবাব তুমুল ঝগড়া হয। তখন পঞ্চাল বাজার প্রধানা মহিষীকে তাঁব সতীন



অভিশাপ দিয়েছিল, 'আমি যেন তোব পেটেব ছেলেকে আস্ত খেতে পাবি।'

ঐ শাপ অনুসারে পবজন্মে সেই সতীন যক্ষী হযে জন্মায়। বাণীর ছেলে হয়েছে জানতে পেবে সে আতুবঘবে ঢুকে ছেলেকে চিবিয়ে খেয়ে চলে গেল। রাণী প্রায পাগল হযে গেলেন। এক বছব পরে রাণীব দ্বিতীয় ছেলে হল। এবারও সেই যক্ষী এসে রাণীর ছেলেকে খেয়ে ফেলল। তৃতীযবার রাজা কড়া পাহাবাব ব্যবস্থা কবলেন। যক্ষী যখন এবাব ছেলেকে নিয়ে পালাচ্ছে তখন সৈন্যবা তাকে তাড়া করল। যক্ষী তখন ছেলেটাকে নিযে এক নর্দমার জলে লুকিয়ে রাখল।





ছেলেটি তখন যক্ষীকে মা ভেবে তার স্তন খেতে শুরু করে। এতে যক্ষীর মনে বাৎসল্য রস জন্মাল। সে তৃতীয় ছেলেটিকে নিজের ছেলের মত যত্নআত্তি শুরু করল। পাহাড়ের গায়ে তাকে নিয়ে থাকতে লাগল। তাকে মানুষের মাংস খাওয়াতে লাগল।

রাজকুমার নিজেকে যক্ষীর ছেলে বলেই জানত। যক্ষীর মত ইচ্ছে করলেই সে রূপ পরিবর্তন করতে পারত না বা অদৃশ্য হতে পারত না। কুমার বড় হওয়ার পর যক্ষী তাকে একটি শিকড় দিল। ঐ শিকড়ের সাহায্যে সে অদৃশ্য হতে পারত। অদৃশ্য হয়ে মানুষের মাংস খেত। ওদিকে যক্ষীর বয়স হয়েছিল। সে মহারাজ বৈশ্রবণের সেবা করতে চলে গেল।

পঞ্চাল-মহিষীর এর পরেও একটি ছেলে জন্মায়। কিন্তু এতদিনে ঐ যক্ষী মারা গেছে। ফলে ঐ ছেলের কোন বিপদ ঘটল না। শত্রু জয় করে সে জন্মেছে, এজন্য তার নাম রাখা হল জয়দ্দিষ। কুমার জয়দ্দিষ যথাসময়ে বিদ্যাশিক্ষা এবং অস্ত্রশিক্ষা শেষ করলেন। রাজা পঞ্চাল তাঁর মাথায় শ্বেতচ্ছত্র ধরার বন্দোবস্ত করলেন। জয়দ্দিষ উত্তর পঞ্চালের রাজা হলেন। রাজা জয়দ্দিষের প্রধানা মহিষীর গর্ভে জন্ম নিলেন বোধিসত্ত্ব। তাঁর নাম রাখা হল অলীনশত্রুকুমার। বয়সকালে অলীনশত্রুকুমারকে যুবরাজ করা হল।

এদিকে যক্ষীর কাছে বড় হওয়া রাজার তৃতীয় ছেলে সেই শিকড় হারিয়ে বসে আছে। ফলে লোকের চোখের আড়ালে গিয়ে সে যে মানুষের মাংস খাবে তার আর উপায় নেই। এখন সে সকলের চোখের সামনেই শ্মশানে গিয়ে মানুষের মাংস খায়। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে লোকজন ভয় পেয়ে গেল। তারা রাজার কাছে এসে



জানাল, 'মহারাজ, মানুষের মত দেখতে এক যক্ষ শ্মশানে এসে মানুষের মাংস খাচ্ছে। তাকে এখুনি না ধরতে পারলে সে নগরে ঢুকে মানুষ মারতে শুরু করবে।' রাজা তক্ষুনি সৈন্য পাঠালেন। সৈন্যরা শ্মশান ঘিরে ফেললে সে ভয়ে চিৎকার করে লাফ দিল। তার চিৎকারে সৈন্যরা গেল বেজায় ঘাবড়ে। যক্ষীর পালিত ছেলে তখন বনে চলে গেল। বনের যেখান দিয়ে রাজপথ গেছে সেখানে এক গাছের ডালে সে চড়ল। গাছের তলা দিয়ে মানুষ যেতে দেখলে ধরে খেত।

যক্ষীপুত্রের পায়ে একবার কাঁটা ফুটল। সে সাতদিন গাছ থেকে নামতে পারল না। সম্পূর্ণ অনাহারে কাটাল। আটদিনের মাথায় রাজা জয়দ্দিষ হরিণ শিকার করে ঐ পথে ফিরছিলেন। সৈন্যসামন্ত অদূরেই ছিল। রাজা গাছটির কাছে আসামাত্র যক্ষপুত্র তাঁকে ধরল। উলঙ্গ ও বিকটাকৃতি নররূপী সেই যক্ষকে দেখে রাজা দিশেহারা হলেন। তিনি তাকে হরিণটি দিতে চাইলেন। যক্ষ রাজি হল না। রাজা তখন বললেন, 'এক ব্রাহ্মণকে পুরস্কার দেব বলে এসেছি। যদি তা হবার আগেই তুমি আমাকে খেয়ে ফেল, তাহলে আমার সত্য রক্ষা হয় না।' এ কথা শুনে যক্ষপুত্র তাঁকে বলল, 'ঠিক আছে, ছেড়ে দিচ্ছি। তবে কাজ শেষ করে কালই ফিরে আসবে।'



প্রাসাদে ফিরে এসে জয়দ্দিষ প্রথমেই নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। ব্রাহ্মণকে অর্থ দান করলেন। তারপর ছেলে অলীনশত্রুকুমারকে রাজত্ব দিতে চাইলেন। অলীনকুমার তখন জয়দ্দিষকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' জয়দ্দিষ প্রথমে কিছুতেই বলবেন না। অলীনকুমারও রাজা হতে রাজি নন। তিনি বললেন, 'আপনি এখানে থাকলে তাতেই আমার স্বর্গসুখ। আপনি থাকবেন না আর আমি রাজা হব, তা আমি পারব না।'

বাধ্য হয়ে তখন জয়দ্দিষ সবাইকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন অলীনশত্রুকুমার স্থির করলেন তিনিই যক্ষের কাছে যাবেন। শুনে রাজা, মন্ত্রী, অমাত্য, পুরোহিত এবং রাজমাতা সকলেই কেঁদে ফেললেন। কিন্তু তাঁকে বাধা দেওয়া গেল না।

অলীনকুমার যখন যক্ষের কাছে গেলেন, যক্ষ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই এখানে কেন এসেছিস? জানিস না কি এই খাদের কাছে যে আসবে সে-ই আমার পেটে যাবে।' অলীনকুমার নির্ভয়ে বললেন,



সেইজন্যই এসেছি। গতকাল তুমি আমার বাবাকে খাবে বলে তাঁকে ধরেছিলে। আজ আমি এসেছি বাবার মুক্তি আদায় করতে। তুমি আমাকে খাও। আমার বাবাকে ছেড়ে দাও।'

যক্ষ এতদিন দেখে আসছে তার ভয়ে সবাই পালায়। আজ অলীনকুমারের মত সাহসী একজনকে দেখে সে একেবারে চমকে গেল। এই সাহসী যুবককে খেতে তার মন চাইল না। তাই সে কুমারকে বলল, 'বেশ, তাই হবে। তুই তাহলে শুকনো ডাল আর পাতা জোগাড় করে এখানে আগুন জ্বাল।' যক্ষ ভেবেছিল, কুমার পালিয়ে যাবার এই মস্ত সুযোগ হাতছাড়া করবে না। কিন্তু দেখা গেল, সে সত্যি সত্যি শুকনো ডালপালা জড়ো করে আগুন জ্বেলেছে। এভাবে অলীনকুমারের আরও পরীক্ষা নিয়ে যক্ষ তাকে রেহাই দিল।

কুমার দেখল, এই যক্ষের সব কিছুই মানুষের মত। তখন তাঁর মনে পড়ে গেল নিজের সেই দাদাদের কথা যাদের যক্ষ নিয়ে গিয়েছিল। ইনিই নিশ্চয়ই তৃতীয় ভাই একথা ভেবে তিনি তাকে বললেন, 'আপনি যক্ষ নন, আপনি সম্পর্কে আমার জ্যাঠামশাই হন।' যক্ষ তা মানতে চায় না। শেষে যক্ষের পরামর্শে এক দিব্যচক্ষু তপস্বীর কাছে তারা গেল। তপস্বী বললেন, কুমারের কথা সত্য। কুমার তখন যক্ষকে অনুরোধ করলেন উত্তর পঞ্চালে ফিরে গিয়ে রাজত্ব করতে। কিন্তু যক্ষ ঐ তপস্বীর কাছেই প্রব্রজ্যা নিলেন।



যক্ষের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে অলীনকুমার ফিরে এলেন। বাবাকে সব খুলে বললেন। বাবা তখন নিজের হারিয়ে যাওয়া দাদাকে রাজত্ব দেওয়ার কথা ভাবলেন। তাঁরা আবার সেই দিব্যাত্মা তপস্বীর কাছে গেলেন। রাজা জয়দ্দিষ দাদাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'আমি প্রব্রজ্যা নিয়েছি, তোমরাই রাজ্য চালাও।' এরপর এক চমৎকার ব্যবস্থা করা হল। রাজা জয়দ্দিষ কয়েকটি গ্রাম তৈরি করলেন। সেই গ্রামের মধ্যেই তপস্যার জায়গা তৈরি করা হল। জয়দ্দিষের দাদাও সম্মত হলেন সেখানে থেকে তপস্যা করতে।





কুশ জাতক

পুরাকালে মল্লরাজ্যের রাজধানী ছিল কুশাবতী নগর। সেখানে রাজত্ব করতেন ইক্ষ্বাকু রাজা। রাজা ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন করতেন। কিন্তু দুঃখের কথা, রাজার কোন সন্তান ছিল না। একদিন

প্রজারা রাজদ্বারে এসে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে যদি আপনার কোন পুত্র সন্তান না জন্মায়। আপনি এক্ষুনি পুত্র প্রার্থনায় যজ্ঞাদি শুরু করুন।' রাজা প্রজাদের পরামর্শে যজ্ঞ শুরু করলেন। তখন দেবরাজ শক্র রাজার প্রধানা মহিষী শীলবতীকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, 'তোমার দুটি সন্তান হবে, একজন প্রজ্ঞাবান কিন্তু কদাকার, অপরজন রূপবান কিন্তু প্রজ্ঞাহীন হবে। এখন তুমি বল, তুমি প্রথমে কাকে চাও?' শীলবতী বললেন, 'আমার প্রথম পুত্র প্রজ্ঞাবান হোক।'



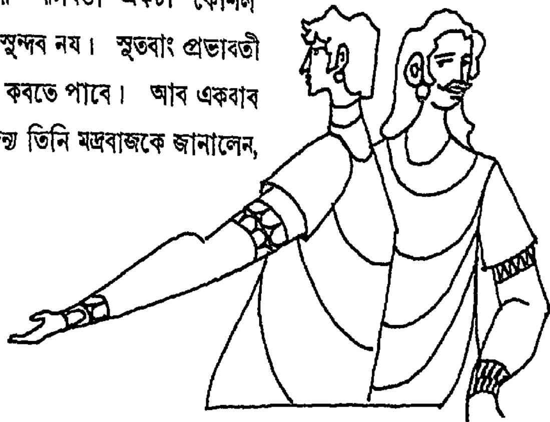
যথাসময়ে শীলবতী এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। এই ছেলে আর কেউ নন, স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। তাঁর নাম রাখা হল কুশকুমার। কুশকুমার যখন সবে হাঁটতে শিখেছেন তখন মহিষীর দ্বিতীয় ছেলে ভূমিষ্ঠ হল। তার নাম রাখা হল জয়ম্পতি। কুশকুমার ছিলেন মহা প্রজ্ঞাবান। শিক্ষাগুরু ছাড়াই তিনি সমস্ত শিক্ষা আয়ত্ত করেছিলেন। কুশকুমারের ষোল বছর বয়স পূর্ণ হলে রাজা তাঁকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করতে চাইলেন। অবিবাহিতকে রাজপদ দেওয়া যায় না। সেজন্য কুশকুমারকে বিবাহ দিতে হয়।

রাণী শীলবতীকে তিনি বললেন, 'ছেলের মনের কথা জেনে এস।' কুশকুমার বিয়ের প্রস্তাবে উৎসাহ দেখালেন না। তিনি বললেন, 'আমি বিয়ে করব না। যতদিন আপনারা বেঁচে আছেন আমি আপনাদের সেবা করতে চাই। তারপর প্রব্রজ্যা নেব।' কুশকুমার জানতেন তিনি সুন্দর নন, কোন সুন্দরী নারীকে তিনি বিয়ে করলে তাঁদের সম্পর্ক সুখের হবে না। সেজন্যই তিনি এই পন্থা নিলেন।



কিন্তু পর পর কয়েকবার রাজা একই প্রস্তাব পাঠালেন। তখন কুমার ভাবলেন সরাসরি বাবা-মার কথা অস্বীকার করা ঠিক নয়। তিনি নিজে এক স্বর্ণ নারীমূর্তি গড়লেন। তারপর সেই মূর্তি দেখিয়ে বললেন, 'এরকম কন্যা পেলে তবেই আমি বিয়ে করব।'

অনেক খোঁজাখুঁজির পর মদ্ররাজার কন্যাকে পাওয়া গেল। তাঁর নাম প্রভাবতী। সেই দেবকন্যাতুল্য প্রভাবতী স্বর্ণপ্রতিমার চেয়েও সুন্দর। বিয়ের আগে রাণী শীলবতী একটা কৌশল করলেন। তিনি জানতেন, তাঁর ছেলে সুন্দর নয়। সুতরাং প্রভাবতী হঠাৎ কুশকুমারকে দেখে পছন্দ না-ও করতে পারে। আর একবার মন বিরূপ হলে তা দূর করা কঠিন। সেজন্য তিনি মদ্ররাজকে জানালেন,





'আপনার মেয়েকে বলে দেবেন আমাদের একটি পারিবারিক প্রথা আছে। প্রথম বছর দিনের আলোয় সে স্বামীর মুখ দেখতে পাবে না।'

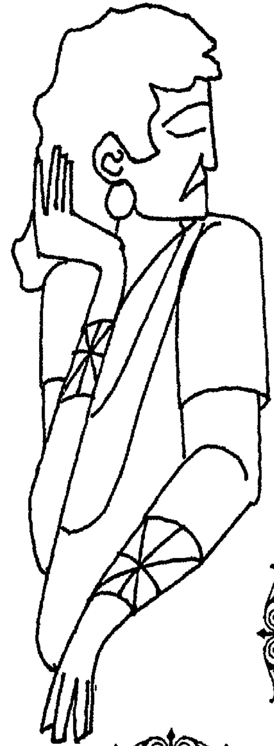
যথাসময়ে ধূমধাম করে কুশকুমার ও প্রভাবতীর বিয়ে হয়ে গেল। কিছুদিন যাওয়ার পরই কুশকুমার মাকে বলল, 'মা, আমি দিনের বেলায় প্রভাবতীকে দেখতে চাই।' শীলবতী বললেন, 'তাহলে তোমাকে ছদ্মবেশ নিতে হবে।' তখন কুশকুমার একবার ঘোড়ার সহিস, একবার হাতির মাহুত সাজলেন। দুবারই যখন প্রভাবতী কাছে এলেন তখন তিনি তাঁকে ছুঁয়ে দিলেন। প্রভাবতী তাঁর কুরূপ দেখে ভীষণ রেগে যান। এরপর প্রভাবতীও শীলবতীকে একই ইচ্ছা জানালেন। শীলবতী তখন দূর থেকে জয়ম্পদকে দেখালেন। কিন্তু জয়ম্পদের পেছনে ছিলেন কুশকুমার। তিনি রাণীর দিকে হাত নাড়ছিলেন। প্রভাবতী জয়ম্পদকে দেখে যতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন কুশকুমারকে দেখে ততটাই বিরক্ত হলেন। এর কিছুদিন পরে প্রভাবতী সত্য জেনে ফেলেন। তখন তিনি কুশবতী নগর ছেড়ে মদ্ররাজার কাছে ফিরে যেতে চাইলেন। কুশকুমারও এতে বাদ সাধলেন না।

২

প্রভাবতী চলে যাওয়ায় কুশ রাজা দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন। প্রভাবতী হয়ত তখনও মদ্ররাজার প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছন নি, এমন সময় বোধিসত্ত্ব শীলবতীকে বললেন, 'মা, প্রভাবতীকে ফিরিয়ে আনতে আমি যাচ্ছি। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি রাজ্যশাসন করবে।' শুনে প্রভাবতী বললেন, 'বেশ বাছা যাও, তবে সাবধানে যেও। মনে হয় না সে সহজে তোমাকে গ্রহণ করতে পারবে।'

কুশকুমার পর দিন রওনা হয়ে সেদিনই সন্ধ্যায় শাকল নগরে পৌঁছলেন। প্রথমেই তিনি নিজের পরিচয় গোপন করলেন। রূপের অভাব নিজের গুণ দিয়ে পুষিয়ে নেবেন এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ছদ্মবেশে তিনি কুমোর, মালী, বীণাবাদক ও কারিগর সেজে নানা জিনিস বানালেন। প্রতিটি জিনিসই মদ্ররাজার অন্তঃপুরে গিয়েছিল। প্রভাবতী প্রত্যেকটি জিনিসে নিজের ছবি দেখতে পেয়ে বুঝলেন, এ আর কারও কাজ নয়, কুশকুমারই করেছেন। প্রভাবতী তাই সেসব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

কুশকুমারও একে একে সেসব বৃত্তি ছেড়ে দিলেন। বুঝলেন ওসবে কাজ হবে না। তখন তিনি রাঁধুনির কাজ নিলেন রাজ বাড়িতে। রান্নার সুখ্যাতিতে মদ্ররাজাও পঞ্চমুখ। কিন্তু প্রভাবতী বুঝলেন, 'এ বামুনঠাকুর আর কেউ নন, স্বয়ং কুশকুমার।' সেজন্য তিনি রাজবাড়ির খাবার খাওয়া ছেড়ে দিলেন। এমন কি যাতায়াতের পথে কুশকুমারের সঙ্গে কয়েকবার দেখা হলে তাঁকে খুব খারাপ ভাষায় নিন্দে করলেন।



দিন যায়, কুশকুমার দেখলেন কিছুতেই প্রভাবতীর মন জয় করা যাচ্ছে না। তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, 'বাবা-মাকে ছেড়ে এতদিন এখানে রইলাম, তাঁদের মনে অত কষ্টই না দিলাম, আর কতদিন থাকব।' কুশকুমারের দুঃখে তখন স্বর্গে শক্রের আসন টলে উঠল। শক্র দেখলেন কুশকুমারের জন্য কিছু করা দরকার। তিনি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আশপাশের তিনজন রাজার কাছে দূত হয়ে গিয়ে বললেন, 'মদ্ররাজার কন্যা কুশকুমারকে পরিত্যাগ করেছেন। আপনি তাঁর স্বামী হোন।' এই একই কথা তিন রাজাকে বলা হল। কিন্তু রাজারা জানলেন তাঁদের প্রত্যেককে আলাদা করেই বলা হয়েছে। ফলে



প্রত্যেকে সসৈন্যে এলেন মদ্রবাজাব সীমান্তে।

মদ্রবাজা খবব পেযে খুবই বিচলিত হলেন। ভাবলেন, 'আব উপায নেই, এবাব ধনপ্রাণে বিনষ্ট হব।' মদ্ররাজা প্রভাবতীর ওপব বাগে বিবক্তিতে কাঁপতে লাগলেন। তিনি অমাত্যদেব বললেন, 'ঐ এক কন্যাকে তিন বাজার হাতে তো আব দেওয়া যায না। প্রভাবতী অন্যায কবেছে। কুশকুমাবেব মত যোগ্য স্বামীকে সে ছেড়ে চলে এসেছে বলেই আজ এই বিপত্তি। প্রভাবতীকে কেটে তিন টুকরো করে ওদেব সামনে দিযে এস।' প্রভাবতী সব শুনে তাঁর মা-কে বললেন 'মা, কোন চিন্তা কোবো না। আমাব স্বামীই আমাকে বক্ষা কববেন।'



প্রভাবতী বন্ধনশালায গিযে কুশকুমাবেব পা ধবে ক্ষমা চাইলেন। কুশকুমাব তাঁকে আলিঙ্গন কবলেন। তাবপব বাজাকে বললেন, 'আপনি সৈন্য সাজান।' তিনি নিজে একটি হাতির পিঠে উঠলেন। পেছনে বসালেন প্রভাবতীকে। কুশকুমাবেব যুদ্ধবিক্রমের সামনে বাজারা খড়কুটোব মত ভেসে গেল। কুশকুমাব তাদেব বন্দী কবে নিযে এলেন। তারপব তাঁব নির্দেশে মদ্রবাজাব অন্যান্য মেযেদেব সঙ্গে তাদেব বিযে দেওযা হল। কুশকুমাবও প্রভাবতীকে নিযে ফিবে চললেন নিজেব রাজ্যে।

মহাসুতসোম জাতক



কুরুরাজ্যের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে কৌরব্য নামে এক রাজা ছিলেন। কৌরব্যের প্রধানা মহিষীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব জন্ম নেন। বোধিসত্ত্ব এ জন্মে সোমবস খুব ভালবাসতেন। সেজন্য তাঁর নাম হয সুতসোম।

বযসকালে সুতসোম তক্ষশিলায বিদ্যাচর্চা করতে গেলেন। বোধিসত্ত্ব যে আচার্যের কাছে বিদ্যাশিক্ষার জন্য যাচ্ছিলেন, সেই একই আচার্যের কাছে শিক্ষার জন্য কাশীরাজাব ছেলে ব্রহ্মদত্তকুমাব যাচ্ছিলেন। বাস্তায তাঁদেব দেখা হল। বন্ধুত্বও হল। যতদিন গুরুর কাছে ছিলেন দুজনেব মধ্যে গভীব বন্ধুত্ব ছিল। সুতসোম ছিলেন প্রাজ্ঞ, মেধাবী। তিনি ব্রহ্মদত্তকুমাবকে শাস্ত্র বুঝতে সাহায্য করতেন। জ্ঞানী এবং শীলবান হিসেবে বোধিসত্ত্বেব খুব সুখ্যাতি হল। শাস্ত্র শিক্ষা শেষ করে একসময ব্রহ্মদত্তকুমার ও সুতসোম

নিজের নিজেব বাজত্বে ফিবে চললেন। সুতসোম অঙ্গবিদ্যা জানতেন। এই বিদ্যার দ্বাবা তিনি বুঝেছিলেন ব্রহ্মদত্তকুমার মানুষের মধ্যে ত্রাসেব কারণ হবেন। ব্রহ্মদত্তকুমাবকে তিনি বললেন, 'ভাই, শীলবান থেকো, পোষধ পালন কব।'

ব্রহ্মদত্তকুমাব ফিবে এসে বারাণসীব বাজা হলেন। বোধিসত্ত্বেব উপদেশ অচিরেই ভুলে গেলেন। ব্রহ্মদত্তকুমার মাংস খেতে এত ভালবাসতেন যে মাংস না থাকলে তাঁব খাওয়াই হতো না। পোষধেব দিন উপোষ কবা দূরেব কথা, তিনি সেদিনও মাংস খেতেন। পোষধের দিন রাজ্যে কোথাও পশুবধ করা হয না। সেজন্য তাঁর পাচক আগের দিনই মাংস জোগাড করে বাখত। একবার পোষধের দিন সেই সঞ্চিত মাংস কুকুব খেযে ফেলল। পাচক দেখল বাজাকে মাংস ছাড়া ভাত দিলে নিজের গর্দান যাবে। সেজন্য সে ভাগাড থেকে মরা মানুষেব উরুব মাংস কেটে এনে ভাল করে রান্না করল। বাজা সেই মাংস মুখে দেওয়া মাত্র তাঁব সাবা শবীব আনন্দে শিহরিত হল। তাঁর শরীবের সাত হাজাব বস-নালী কাঁপতে লাগল। তিনি মুহূর্তের মধ্যে টেব পেলেন, এ মাংস নরমাংস। কোন এক জন্মে তিনি যক্ষ ছিলেন। তখন প্রচুব মানুষেব মাংস খেযেছিলেন। পাচককে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস কবলেন :

'এ কিসেব মাংস ?'

'কেন মহাবাজ, বোজ যা খান।'

'বাজে কথা। এ মাংস খুব চমৎকাব।'

'রান্নার গুণে হয়েছে।'

'সত্যি কথা বল, নাহলে গর্দান যাবে।'

'মহারাজ, মানুষের মাংস।'

'এবার থেকে এই মাংসই আমাকে দেবে।'

'কোথায় পাব মহারাজ ?'

'কেন, কারাগাবে কি বন্দী নেই ?'

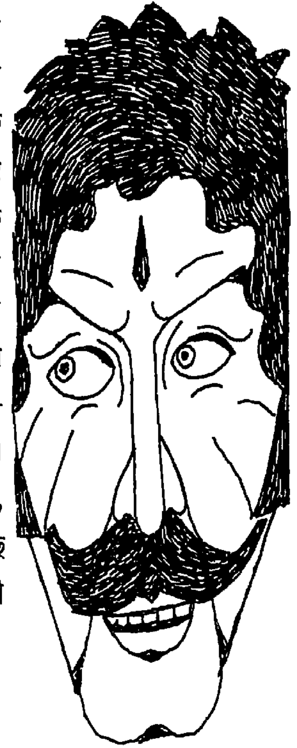


এবপর একে একে কারাগাবের বন্দীবা জবাই হতে থাকল। কাবাগাব জনশূন্য হল। তারপব রাজাব পবামর্শে পাচক বাস্তায় হাজাব টাকাব মাল ফেলে বাখত। যে তাতে হাত দিত তাকে ধবে



এনে জবাই কবা হতো। কিছুদিন পবে দেখা গেল কেউই আর মালে হাত দিচ্ছে না। তখন রাজা লুকিযে থেকে মানুষ মারা শুরু করলেন। বাবাণসীতে দাৰুণ ত্রাসেব সঞ্চাব হল। প্রজাবা বাজার কাছে বিচার চাইতে এল। রাজা বললেন, 'আমি তো জানি না ঘাতক কে, তাহলে কি করে তাকে ধরব?' প্রজাবা বাজাব কথায খুশি হতে পাবল না। তারা সেনাপতি কালহস্তীকে গিযে ধবল, 'আমাদেব ধন-প্রাণ বক্ষা করুন।'

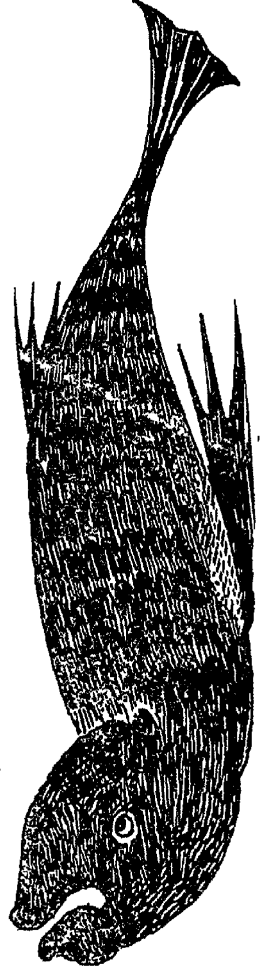
কালহস্তী প্রজাদেব আশ্বাস দিলেন। রাতে কডা পাহারাব ,ব্যবস্থা কবলেন। অচিবেই বাজার পাচক এক ঝুডি মানুষেব মাংসসমেত ধরা পডল। কালহস্তীব জেরাব মুখে সে সব কথা স্বীকাব করল। সেনাপতি, অমাত্য ও সভাসদগণ একযোগে তখন বাজাকে ধরলেন। বাজা পাচকেব কথা স্বীকাব কবলেন। বললেন, 'আমি মানুষের মাংস খেতে ভালবাসি।' সেনাপতি ও অমাত্যবা তাঁকে বহুবার বললেন, 'আপনি এই বীভৎস রুচি ত্যাগ করুন, স্বাভাবিক হোন।' বাজা বললেন, 'তা আমি পাবব না।' তখন বাজপরিবাবেব সবাইকে ডাকা হল। সকলের সামনে রাজাকে রাজ্য ত্যাগ কবাব আদেশ দেওযা হল। কালহস্তী বললেন, 'একদিকে আপনাব আত্মীয-পবিজন, এই বাজকীয ঐশ্বর্য, আবেকদিকে আপনাব কুৎসিত বসনা। আবেকবাব ভেবে দেখুন মহাবাজ।' এতেও বাজাব হুঁশ হল না, তিনি বললেন, 'এ দুযেব মধ্যে আমি নবমাংসই বেছে নিচ্ছি সেনাপতি।' সবাই 'ধিক। ধিক।' কবতে লাগল। কালহস্তী তখন বাজাকে কল্যাণপথে আনাব জন্য তিনটি গল্প বললেন।



প্রথম গল্প :

অতীতকালে মহাসাগরে ছটি বিশাল আকারেব মাছ ছিল। তাদের নাম : আনন্দ, প্রনন্দ, মধ্যবহাব, তিমি, তিমিঙ্গিল আব তিমিরপিঙ্গল। ওরা ডুবো পাহাডেব গা থেকে শ্যাওলা খেযে বেঁচে থাকত। আনন্দ থাকত মহাসমুদ্রেব একদিকে। বোজ অনেক মাছ তাব সঙ্গে দেখা কবতে যেত। একদিন তাবা ভাবল, 'সব জীবজন্তুরই বাজা আছে, আমাদেরই বা কেন থাকবে না।' এই ভেবে তারা আনন্দকে বাজা করবে ঠিক কবল। সকলে একমত হওযায আনন্দ বাজা হল।

এরপর রোজ সকাল-সন্ধ্যায় মাছের দল এসে আনন্দের সঙ্গে দেখা করে যায়। একদিন আনন্দ ডুবো পাহাড়ের শ্যাওলা খাওয়ার সময়ে কি করে যেন একটা মাছ তার মুখে ঢুকে পড়ে। খেতে গিয়ে আনন্দ চমৎকার স্বাদ পেল। তখন জিভ বের করে খাবারটা দেখতে চাইল। মুখ থেকে বের করে দেখল, সে মাছ খেয়ে ফেলেছে। তখন সে ভাবল, 'এতদিন কি ভুলই না করেছি। এত সুস্বাদু জিনিস হাতের সামনে থাকতেও খাইনি। এবার থেকে মাছের দল দেখা করতে এসে যখন ফিরে যাবে, তখন পেছন থেকে নিঃসাড়ে কয়েকটা ধরে খাব।'



এইরকম ভাবার পর সত্যি সত্যি সে তাই শুরু করল। এদিকে কিছুদিন পরে মাছের দল দেখে, রোজই তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তারা ভাবতে লাগল, ব্যাপারটা কি? তারপর এক বুদ্ধিমান মাছ একদিন আনন্দের কানের পাশে লুকিয়ে থেকে সব দেখে ফেলল। সে জ্ঞাতিদের সাবধান করে দিল। আনন্দেরও মাছ খাওয়া বন্ধ হল। মাছ খেতে না পেয়ে সে খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়ল। মাছ ছাড়া আর কিছু সে খায় না। সেজন্য খিদেয় কাতর হয়ে একদিন এক ডুবো পাহাড় দেখে সে ভাবল, 'ব্যাটারা এখানেই লুকিয়ে আছে। আমি আমার শরীর দিয়ে পাহাড়টাকে জড়িয়ে ধরে রাখব। দেখি ওরা কোনখান দিয়ে পালায়।' এই ভেবে আনন্দ তার বিশাল শরীর দিয়ে পাহাড়টা ঘিরে ফেলল। এতে তার নিজের লেজটা নিজেরই মুখের কাছে চলে এল। নিজের লেজ দেখে সে তখন ভাবল, 'বেশ একটা বড় মাছ দেখছি'। এই বলে সে কামড় দিল। আর রক্তাক্ত হয়ে নিজেই মারা গেল। ঐ বিশালাকার মাছ তখন ছোট মাছ ও অজস্র পোকার খাদ্য হল।

দ্বিতীয় গল্প :

অনেককাল আগে এই বারাণসী নগরেই এক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করত। তাঁরা ছিলেন শীলসম্পন্ন। ব্রাহ্মণের এক ছেলে হল। ছেলেটিও বিদ্যাবুদ্ধি এবং শীলাচারে বংশের ধারা বজায় রাখল। সে মদমাংস কিছুই খেত না। তার বয়সী কিছু যুবক বন্ধু তাকে নিজেদের



দলে টানতে খুব চেষ্টা করল। তাকে বলল, 'চল ভাই, একদিন মদ খাওয়া যাক।' সে বলল, 'না ভাই, আমি মদ ছুঁই না। তোমরা খাও।' তখন তারা বলল, 'আমাদের সঙ্গে যেতে তো কোন আপত্তি নেই তোমার, মদ না হয় না-ই খেলে।' ব্রাহ্মণ যুবক বলল, 'তোমরা মদ খাবে, আমি গিয়ে কি করব?' যুবকের দল বলল, 'তোমার জন্য দুধ আর মধু থাকবে, তুমি তাই খেয়ো।' তখন ব্রাহ্মণ যুবক রাজি হল।

ধূর্ত যুবকের দল এক বাগানে ঢুকে বলাবলি করতে লাগল, 'পদ্মমধু খাব, পদ্মমধু নিয়ে আয়।' ব্রাহ্মণ যুবক জানত না তারা চালাকি করে মদকেই পদ্মমধু বলছে। আগেই একজন এসে পদ্মপাতায় মদের পাত্র রেখে গিয়েছিল। এখন খড় দিয়ে সেই পাত্রের ফুটোর সঙ্গে জুড়ে দিল। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে তারা পদ্মফুলের মাঝখানে খড় বসিয়ে টানছে। ব্রাহ্মণ যুবক ঐভাবে মদ খেয়ে নেশাগ্রস্থ হল। বাড়ি ফিরে এল মত্ত অবস্থায়। এরপর থেকে তার বাবা মদ খেতে বারণ করা সত্ত্বেও সে মদ খেতে লাগল। কিছুতেই সে মদ খাওয়া ছাড়তে পারল না। শীলবান ব্রাহ্মণ পরিবারের কর্তা ছেলের এই দুরাচার সহ্য করলেন না। তিনি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। ঐ যুবক কম বয়সে নিতান্ত কষ্ট পেয়ে শেষ পর্যন্ত রাস্তায় বেঘোরে মারা গেল।



তৃতীয় গল্প ঃ

স্বজাতির মাংস খেয়ে একবার সোনার হাঁসের দল প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। এই হাঁসের দলকে বলা হতো ধৃতরাষ্ট্র হংস। ধৃতরাষ্ট্র হংসদের মধ্যে একবার বিজাতীয় খাবার খাওয়ার ইচ্ছে প্রবল হয়। তখন তারা পরস্পরের মাংস খেতে শুরু করে। এভাবে তাদের বংশ লোপ পেতে বসেছিল

গল্প তিনটি শেষ করে সেনাপতি কালহস্তী রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, এখনও সময় আছে, আপনি মত ঠিক করুন।'

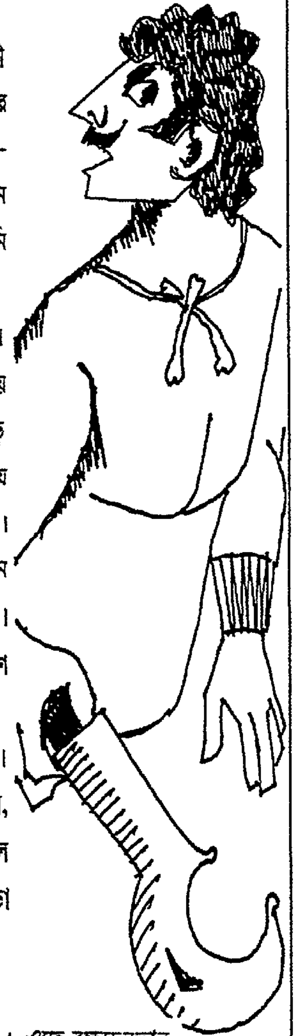
ততক্ষণে প্রজারা আর নিজেদের ধরে রাখতে পারল না। তারা চিৎকার করে উঠল, 'সেনাপতি মশাই। আপনি খুনী ধরেছেন, এবার শাস্তি দিন। এই নরখাদক রাজাকে আপনি কেন অত বোঝাতে চেষ্টা করছেন?' তবু সেনাপতি আরেকবার রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, শেষবারের মত বলুন আপনার কি ইচ্ছে।' রাজা বললেন,

'আমি নরমাংস খাওয়া ছাড়তে পারব না।'

'তাহলে আপনি এই মুহূর্তে রাজ্য ত্যাগ করুন।'

'কালহস্তী, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি আমাকে একটি খড়গ দাও, আর ঐ পাচককে আমার সঙ্গে যেতে দাও।'

সেই থেকে রাজা বনের মধ্যে এক গাছে বাসা বেঁধে থেকে বনচারী মানুষ মারতে লাগলেন। পাচক তাঁকে মানুষের মাংস রান্না করে দিত। এভাবে ঐ বনভূমি এক বিভীষিকা হয়ে উঠল। নরমাংস-খাদক রাজার ভীতিপ্রদ গল্প ছড়িয়ে পড়ল দেশদেশান্তরে। একদিন নরখাদক রাজা মানুষ শিকার করতে পারলেন না। সেদিন তিনি পাচকটিকেই কেটে রান্না করে খেলেন।



সারা জম্বুদ্বীপে তখন এই ভয়ঙ্কর নরখাদকের কথা শোনা যাচ্ছে। একবার এক ধনী ব্রাহ্মণ অনেক ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে ঐ বন পেরিয়ে যেতে চেষ্টা করল। নরখাদক হঠাৎ তাঁর সামনে লাফ দিয়ে পড়ে বলল, 'আমিই সেই নরখাদক'। তার চিৎকারে ভয় পেয়ে সৈন্যরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। নরখাদক ব্রাহ্মণকে পিঠে ফেলে ছুটল। সৈন্যদের মধ্যে একজন খুব সাহসী ছিল। সে নরখাদকের পেছনে তাড়া করে ছুটে গেল। নরখাদকও তখন জোরে ছুটতে লাগল। নরখাদকের পায়ে হঠাৎ একটা বিশাল কাঁটা ফুটে গেল। প্রাণ বাঁচাতে ব্রাহ্মণকে ফেলে রেখে সে পালিয়ে গেল।

নরখাদক তো ফিরে গেল সেই গাছটিতে। পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়ে সে মনে মনে বৃক্ষদেবতার কাছে মানত করল, 'হে বৃক্ষদেবতা, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার পা সেরে যায়, তাহলে আমি একশ একজন ক্ষত্রিয় রাজার গলার রক্তে তোমার গোড়া ধুইয়ে দেব।'

এক সপ্তাহের মধ্যে নরখাদকের ঘা সেরে গেল। এতে বৃক্ষদেবতার কোন হাত ছিল না। কিন্তু নরখাদক তার মানত পূরণ করতে খড়গ হাতে বেরিয়ে পড়ল। একে একে একশ জন ক্ষত্রিয় রাজাকে ধরে এনে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল। এই কাণ্ডকারখানা দেখে বৃক্ষদেবতাও ভীত হলেন। বৃক্ষদেবতা তখন দেবরাজ শক্রের কাছে গেলেন।



দেবরাজ শক্র সব শুনে বললেন ঃ

'এই নবখাদকাকে শান্ত করা আমাব অসাধ্য। তবে একজন আছেন, তাঁব নাম সুতসোম। কৌরব্যরাজপুত্র সুতসোমই একে দমন কবে বন্দী বাজাদেব প্রাণ বাঁচাবেন। ব্রহ্মদত্তকুমারেব নবমাংস খাওযাব অভ্যেস ছাড়িযে দেবেন। গোটা জম্বুদ্বীপকে তিনিই এই বিপদ থেকে বক্ষা কববেন। তুমি যদি বাজাদের প্রাণ বাঁচাতে চাও তাহলে নবখাদককে গিযে বল, সে সুতসোমকে ধবে এনে তাবপব যেন বলিদান শুরু করে।'

বৃক্ষদেবতা ফিরে এসে নবখাদককে দেখা দিযে বললেন, 'সুতসোমকে না পেলে এ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না।' নবখাদক বলল, 'কোন চিন্তা নেই, এক্ষুনি তাঁকে ধবে আনছি।'

এদিকে সুতসোম তখন অন্য স্থানে যাচ্ছিলেন। বাস্তায এক ব্রাহ্মণ তাঁকে পদ্যে বচিত কযেকটি শাস্ত্রবচন শোনাতে চাইলেন। সুতসোম ব্রাহ্মণকে বললেন, 'আপনি বাজপ্রাসাদে আতিথ্য নিন, আমি ফিরে এসে আপনার শ্লোক শুনব।'

সুতসোম জানতেন না স্নানেব ঘাটেই নবখাদকরূপী তাঁব প্রাক্তন বন্ধু ওৎ পেতে বযেছে। যাই হোক, সহস্র সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে নরখাদক তাঁকে পিঠে ফেলে ছুটতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বনে এসে হাজির হল। সুতসোমকে মাটিতে নামিযে নরখাদক জিজ্ঞেস কবল, 'তোমার চোখে জল দেখছি। তাহলে মৃত্যুকে তোমাব মত পণ্ডিতও ভয পায।' সুতসোম বললেন, 'আমি মৃত্যুভযে কাঁদছি না। আমাব সত্য রক্ষা হল না বলেই কান্না পাচ্ছে।' নবখাদক জিজ্ঞেস কবল, 'কিসের সত্য বক্ষা?' সুতসোম তখন স্নান করতে যাওযার সময ব্রাহ্মণেব সঙ্গে দেখা হওযাব বৃত্তান্তটি বললেন। শ্লোক শুনে তিনি ব্রাহ্মণকে পুবস্কৃত কববেন এই ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছাটি তিনি পূর্ণ কবতে পাবলেন না—এই হচ্ছে সুতসোমেব দুঃখেব কারণ।

নবখাদক সুতসোমকে প্রতিশ্রুতি পালনেব জন্য ছেড়ে দিতে রাজি হল। সুতসোমও প্রতিজ্ঞা পালন কবে নবখাদকেব কাছে ফিবে এলেন। উনি ফিরে আসার পব নবখাদকেব খুব ইচ্ছে হল শ্লোকগুলি শোনার। সে বারবাব সুতসোমকে মিনতি করল। কিন্তু সুতসোম





তার কৌতূহলের আগুন উসকে দেওয়ার জন্য বারবারই তাকে বললেন, 'তুমি নরখাদক, ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত, ধর্মের বা জ্ঞানের কথা তোমাকে শোনাতে যাব কেন?' নরখাদক যখন ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন সুতসোম মধুর কণ্ঠে ধর্মকথা শুরু করলেন। ধর্মকথায় মুগ্ধ হয়ে নরখাদক সুতসোমকে বর দিতে চাইল। সুতসোম বললেন, 'কি লাভ? আমি বর চাইলে পরে তুমি তা দিতে পারবে না।' নরখাদক বলল, 'আমার প্রাণ গেলেও সত্য রক্ষা করব।' শেষে সুতসোম বর চাইতে লাগলেন। রাজাদের প্রাণ ভিক্ষা ও অন্য কিছু বর চাইবার পর তিনি বললেন, 'তুমি নরমাংস ত্যাগ কর।' সুতসোমের এই প্রার্থনায় নরখাদক কেঁদে ফেলল। বলল, 'এ বর তুমি চেয়ো না। এজন্য আমার রাজ্য গেছে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা গেছে, আমি অরণ্যচারী হয়েছি। নরমাংস আমার অতি প্রিয়।'

সুতসোম তখন দীর্ঘক্ষণ ধরে ব্রহ্মদত্তকুমারকে বোঝালেন, 'শ্রেয় আর প্রিয় এ দুয়ের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে বিচক্ষণ মানুষ শ্রেয়র পথে চলেন। যত কষ্টই হোক সেক্ষেত্রে তাঁরা প্রিয়কে বিসর্জন দেন।'

সুতসোমের কথায় নরখাদক সম্মত হল। রাজারা মুক্তি লাভ করলেন। সুতসোম তখন ব্রহ্মদত্তকুমারকে নিয়ে তাঁর নিজের রাজ্যে এলেন। সেনাপতি কালহস্তীকে বললেন, 'তোমাদের রাজাকে আমি পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠা করেছি, এখন তোমরা তাঁকে তাঁর পুরনো গৌরব ফিরিয়ে দাও।' কালহস্তী সেইমত ব্যবস্থা করলেন। সমগ্র জম্বুদ্বীপে শুধু সুতসোমের জয়ধ্বনি শোনা যেতে লাগল।

মূকপঙ্গু জাতক

১



বারাণসীতে তখন রাজত্ব করেন কাশীরাজ। কাশীরাজ ধর্মপরায়ণ। সেই ভাবেই রাজ্য শাসন করেন। রাজ্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নেই। কিন্তু রাজার ষোলশ পত্নীর একজনও কোন সন্তান প্রসব করতে পারেন নি। প্রজারা একদিন রাজার প্রাসাদের সামনে এসে বলল, 'মহারাজ, আপনি ছেলে কামনা করে পুজো-আচ্চা করুন।' রাজার ষোলশ পত্নী পুত্র কামনায় চন্দ্র-সূর্যের পুজো করলেন। এতেও কোন লাভ হল না।

তখন রাজা প্রধানা মহিষী চন্দ্রাদেবীকে ডাকলেন। চন্দ্রাদেবী



মদ্ররাজের কন্যা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শীলবতী। রাজা তাঁকেও বললেন, 'তুমি পুত্র কামনা করে ব্রত পালন কর।' চন্দ্রাদেবী এক পূর্ণিমা তিথিতে পোষধ পালন করলেন। সেইদিন তিনি কঠিন শয্যায় শুলেন। সেখানে শুয়ে তিনি মনে মনে প্রার্থনা করলেন, 'যদি আমি সর্বদা শীলাচার পালন করে থাকি, তাহলে সেই পুণ্যবলে যেন আমার পুত্রসন্তান জন্মায়।'

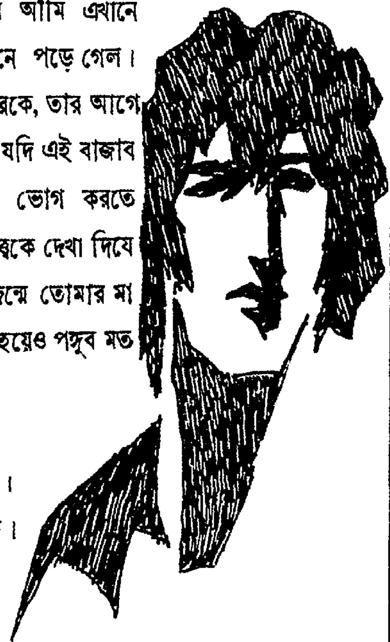
রাণী চন্দ্রার প্রার্থনায় শক্রের আসন টলে উঠল। তিনি বুঝলেন, শীলবতী রাণী চন্দ্রা পুত্র কামনা করছেন। দেবরাজ তখন দেবলোকে বোধিসত্ত্বকে দেখতে পেলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'তুমি চন্দ্রার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ কর। তাহলে পৃথিবীতে কল্যাণকর অনেক কাজ করতে পারবে।' বোধিসত্ত্ব তখন পাঁচশ দেবপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যে চললেন। নিজে প্রবেশ করলেন চন্দ্রার গর্ভে। অন্যান্য দেবপুত্রদের প্রবেশ করালেন অমাত্য পত্নীদের গর্ভে।

যথাসময়ে বোধিসত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হলেন। এই সংবাদ শোনামাত্র রাজার মধ্যে স্নেহ জেগে উঠল। স্নেহ যেন তাঁর চামড়া-মাংস ভেদ করে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেল। স্নেহবশে রাজা স্নান করে উঠলেন। তিনি তখন জানতে চাইলেন, 'আজ অমাত্যদের কারও বাড়িতে কোন পুত্র জন্মেছে কি।' রাজপুত্রের প্রিয় অনুচর খুঁজে বের করার জন্যই তিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন। যখন শুনলেন পাঁচশটি শিশু জন্মেছে অমাত্যদের ঘরে, তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, 'এদের সবাইকে রাজপুত্রের মতই পোশাক-পরিচ্ছদ দাও।' তারপর রাজশিশুকে স্তন দেওয়ার যোগ্য এক ধাত্রীর খোঁজ করতে বললেন। রাজপুত্র তার বুকের দুধ খেয়েই বেড়ে উঠবে।

রাজা ছেলে পেয়ে এত খুশি হয়েছিলেন যে তিনি রাণীকে বর দিতে চাইলেন। রাণী কিন্তু তক্ষুনি কোন বর চাইলেন না। তিনি ভবিষ্যৎ কালের জন্য তা জমা করে রাখলেন। রাজা তখন জ্যোতিষী ডেকে রাজপুত্রের ভবিষ্যৎ জানতে চাইলেন। তাঁর কোন ফাঁড়া বা কোপ আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। জ্যোতিষী বিচার করে বললেন, 'না

মহারাজ, তেমন কিছু দেখছি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি রাজপুত্র অতি শুভলক্ষণসম্পন্ন। ইনি চতুর্মহাদ্বীপে রাজত্ব করার যোগ্য।' রাজপুত্রের জন্মের সময় খুব বৃষ্টি হয়েছিল বলে তাঁর নাম রাখা হল মেঘকুমার।

মেঘকুমারের বয়স একমাস হল। একদিন ধাত্রী এসে তাঁকে রাজার কোলে দিয়ে গেল। রাজা ছেলেকে কোলে বসিয়ে খেলতে দিলেন। এমন সময় রাজার কাছে চারজন চোরকে ধরে আনা হল। রাজা আদেশ দিলেন একজনকে শূলে চড়াতে, একজনকে শেকলে বেঁধে জেলে দিতে, বাকি দুজনকে গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে।



এই ভয়ঙ্কর আদেশ শুনে রাজপুত্র শিউরে উঠলেন। তারপর রাজপুরীর ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে ভাবলেন, 'কেন আমি এখানে এলাম।' ভাবামাত্র বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে গেল। আগের জন্মে তিনি ছিলেন দেবলোকে, তার আগে নরকে, তার আগে ছিলেন বারাণসীরই রাজা। রাজপুত্র বুঝলেন, তিনি যদি এই রাজার প্রাসাদেই জীবন কাটান তাঁকে আবার নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। রাজভবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তখন বোধিসত্ত্বকে দেখা দিয়ে বললেন, 'বাবা, আমি অনেক আগে, কোন এক জন্মে তোমার মা ছিলাম। এখান থেকে যদি মুক্তি চাও তাহলে পঙ্গু না হয়েও পঙ্গুর মত পড়ে থাক।'

এই বলে তিনি কয়েকটি পদ্ধতির কথা বললেন :

১. কোন কিছুতেই বুদ্ধির লক্ষণ দেখাবে না।
২. জড় পদার্থের মত সব সময় পড়ে থাকবে।
৩. বোবা না হয়েও বোবা হয়ে থাকবে।
৪. কালা না হয়েও কালা সেজে থাকবে।

২

এরপর মেঘকুমার এই পন্থা অনুসারেই চলতে লাগলেন। বাচ্চারা স্তন না পেলে স্তনের জন্য কাঁদে। কিন্তু মেঘকুমার টুঁ শব্দটি করেন না। কিছুদিন এভাবে যাওয়ার পর ধাত্রীরা ভাবল, 'পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ শিশুদের অঙ্গ দেখতে যেমন হয় ও মোটেই সেরকম নয়। একে দেখে তো মনে হয় সুস্থ।' এরপর নানা ভাবে মেঘকুমারকে পরীক্ষা করা হল। মত্ত হাতি, বিষধর সাপ কোন কিছুর ভয়েই



মেঘকুমার এই দলটি ত্যাগ করলেন না। প্রত্যেকবার এরকম পরীক্ষার সময় মেঘকুমার মনে মনে ভাবতেন, 'এখন আমি দলত্যাগ করলে ভবিষ্যতে আমার বিপদ আরও বেড়ে যাবে। রাজকীয় জীবনযাপন মানেই অনেক পাপ কাজ করা। যার ফলে আমাকে আবার নরকে যেতে হবে।' অতীত জীবনে নরকবাসের যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতা হুবহু মনে পড়ে যেত। দেখতে পেতেন, যন্ত্রণায় তাঁর মুখ বেঁকে যাচ্ছে। নরকের ভয়ে মেঘকুমার নিজেকে সামলে রাখতে পারতেন।

এভাবে মেঘকুমারের বয়স ষোল পূর্ণ হল। কিন্তু ষোল বছরের এই তরুণ সম্পূর্ণ জড়ভরত। তাই রাজা একদিন বিরক্ত হয়ে জ্যোতিষীদের ডেকে পাঠালেন।

'কুমারের জন্মের সময় যা বলেছিলেন মনে আছে?'

'মনে আছে মহারাজ।'

'তাহলে আপনারা গণনা করতে জানেন না।'

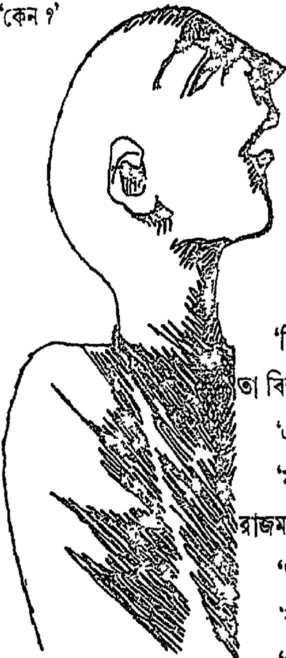
'জানি মহারাজ।'

'তাহলে মিথ্যে কথা বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ মহারাজ।'

'কেন?'





'নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে তখন সত্যি কথা বললে পুত্রস্নেহে আপনি তা বিশ্বাস করতেন না।'

'এখন কি করা উচিত?'

'মহারাজ, প্রাসাদে এই ছেলে থাকলে হয় আপনার না হলে রাজমহিষীর জীবন নিয়ে টানাটানি হবে, কিংবা রাজ্য নষ্ট হবে।'

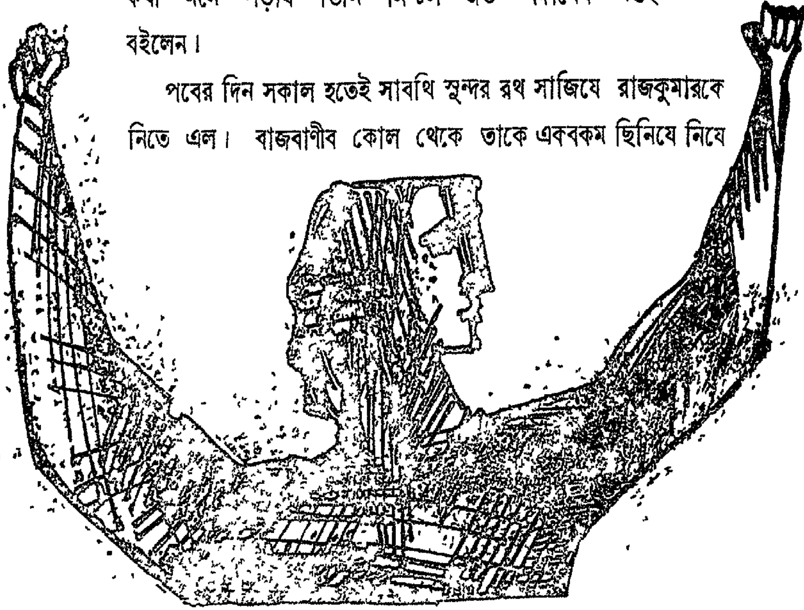
'তাহলে উপায় কি?'

'কুমারকে হত্যা করুন।'

'তাই হবে।'

চন্দ্রাদেবী রাজার আদেশ শুনে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এলেন। মহারাজের কাছে একটি বর তাঁর প্রাপ্য ছিল। সেই বরের জোরে তিনি সাতদিনের জন্য মেঘকুমারকে রাজা করলেন। একদিন, দুদিন করে সেই সাতটি দিনও কেটে গেল। চন্দ্রাদেবী তখন মেঘকুমারের সামনে বিলাপ করতে লাগলেন। মেঘকুমারের মনও এতে আর্দ্র হল। তিনি ভাবলেন, 'মার ভুল ভেঙ্গে দিই।' পরমুহূর্তে ডাইনির কথা মনে পড়ায় তিনি নিশ্চল জড় পদার্থের মতই রইলেন।

পরের দিন সকাল হতেই সারথি সুন্দর রথ সাজিয়ে রাজকুমারকে নিতে এল। রাজরাণীর কোল থেকে তাকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে



চলে গেল। শ্মশানে পৌঁছে সারথি গর্ত করার জন্য রথ থেকে নামল। মেঘকুমার তখন মনে মনে ভাবলেন, 'এইবার আমাকে আত্মরক্ষা করতে হবে।' কিন্তু তিনি দীর্ঘ ষোল বছর হাত-পা কোন কাজেই লাগান নি। সেজন্যে ভাবলেন, 'আগে দেখে নেওয়া যাক হাত-পা-গুলো অবশ হয়ে গেল নাকি।' এই ভেবে তিনি রথ থেকে নেমে রথটাকে ধরে এক টান দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পর্বতপ্রমাণ রথটি উল্টে পড়ে গেল। মেঘকুমার এবার একটু সাজগোজ করতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবরাজ শক্রের আসন গরম হয়ে উঠল। শক্র বুঝলেন, মেঘকুমার সাজতে চান। আবার এ-ও বুঝলেন মেঘকুমার দিব্য সাজ চাইছেন। শক্রের প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে মেঘকুমারের শরীরে দিব্য



আভরণসমূহ দেখা দিল।

সারথি তখন মাটি খুঁড়ে চলছে। মেঘকুমার সেই গর্তের এক পাশে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। মেঘকুমারের দিব্য সাজ, দেবদূতের মত চেহারা দেখে সারথি প্রায় মূর্ছা যায় আর কি। কুমারের সঙ্গে কথোপকথনে সারথি বারবার প্রশ্ন করতে লাগল, 'কেন তাহলে আপনি জড় সেজে থেকে রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করলেন?'

'রাজ-ঐশ্বর্য আমার কাছে গলিত শব।'

'আশ্চর্য করলেন রাজকুমার।'

'হ্যাঁ। প্রব্রজ্যাই আমার লক্ষ্য।'

'আমাকেও সঙ্গে নিন প্রভু।'



মেঘকুমার দেখলেন, 'সারথিকে এখানে প্রব্রজ্যা দিলে সে আর ফিরে যাবে না। সেক্ষেত্রে সবাই ভাববে আমি তাহলে সত্যিই যক্ষ। আর বাবা-মা-ও এখানে আসবেন না। এই রথ, এত স্বর্ণালঙ্কার সবই নষ্ট হবে।' এজন্যে তিনি সারথিকে বললেন, 'দেখ, প্রব্রজ্যা পেতে হলে অ-ঋণী হতে হয়। রাজাকে রথ আর স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে এস আগে, তারপর প্রব্রজ্যা নাও।' শুনে সারথি ভাবল, উনি যা বললেন তা করতে হলে ওঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়া দরকার, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ইনি এখানে থাকবেন। তাছাড়া সব শুনে রাজাও হয়ত তাঁর ছেলেকে দেখতে চাইতে পারেন।

'কুমার, আমার একটি প্রার্থনা আছে।'

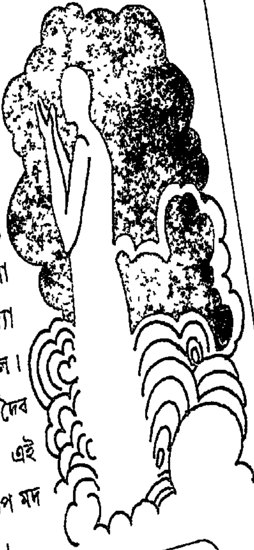
'বল কি প্রার্থনা।'

আমি রাজাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে থাকবেন।

নিশ্চয়ই থাকব। তুমি রাজাকে গিয়ে আমার কুশল জানাও।

৩

কাশীরাজ পুত্রের কুশলসংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। অমাত্যরা চাইলেন সঙ্গে যেতে। অন্তঃপুর-বাসিনীরাও ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এতজনের যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি দরকার। রথ সাজাতে ও দরকারী জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে কেটে গেল পর পর তিনটি দিন। তারপর তাঁরা সকলে নগরী ছেড়ে চললেন সেই শ্মশানের দিকে।



ওদিকে সারথি চলে যেতেই মেঘকুমার প্রব্রজ্যা নিতে আগ্রহী হলেন। শক্র দৈব প্রভাবে সুন্দর পর্ণকুটির তৈরি করেছিলেন। শ্মশানটি মুহূর্তের মধ্যে এক তপোবনে পরিণত হল। মেঘকুমার তপস্যায় বসা মাত্র সিদ্ধিলাভ করলেন। তিনি গাছের পাতা অল্প জলে ফুটিয়ে অমৃত মনে করে খেলেন।

মেঘকুমারের বাবা এসে নবীন তপস্বীর সামনে দাঁড়ালেন। তাঁরা দেখলেন, মেঘকুমার যেন এক জ্যোতির্মণ্ডলী। নিজের ছেলের পা তাঁরা স্পর্শ করলেন। মেঘকুমার সকলকে ধর্মকথা শুনিয়ে প্রব্রজ্যা দিলেন। কাশীরাজ্য পরিত্যক্ত হল। ধনাগারগুলি উন্মুক্ত থাকল। তখন আশপাশের তিনজন রাজা কাশীরাজ্য দখল করতে এসে দৈব প্রভাবে মেঘকুমার কাছে এলেন। তাঁরাও প্রব্রজ্যা নিলেন। এই ধর্মচারিতা এত ব্যাপক হয়েছিল যে কাশীরাজ্যে একজন মদ্যপ মদ খাওয়ার কোন সঙ্গী পেল না। তখন সে-ও এসে প্রব্রজ্যা নিল।

মহাজনক জাতক

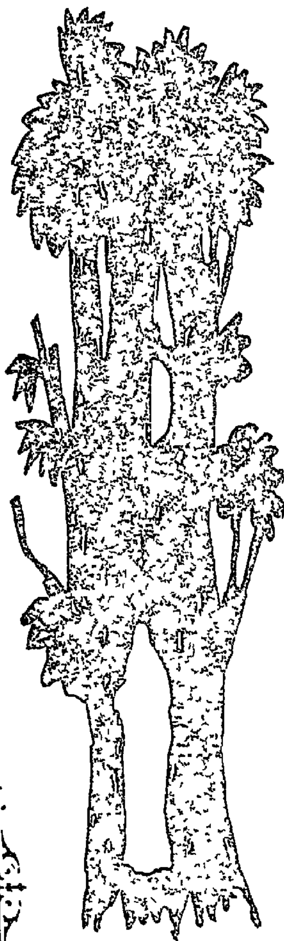
১

পুরাকালে মিথিলারাজ্যে রাজত্ব করতেন জনক নামে এক রাজা। জনকরাজের দুটি ছেলে। বড় ছেলে অরিষ্টজনক, ছোট ছেলের নাম পোলজনক। রাজা বড় ছেলেকে যুবরাজ আর ছোট ছেলেকে সেনাপতি করে যথাসময়ে দেহ রাখলেন।

জনকরাজার মৃত্যুর পর অরিষ্টজনক রাজা হলেন। পোলজনক



হলেন যুবরাজ। অরিষ্টজনক খুব কান-পাতলা ছিলেন। যে যা বলত তাই বিশ্বাস করতেন। রাজার এক চাকর বারবার তাঁকে বলতে লাগল, 'মহারাজ, পোলজনক আপনাকে হত্যা করে রাজা হতে চান।' বারবার এই একই কথা শুনে রাজা চাকরের কথা বিশ্বাস করলেন। তিনি পোলজনককে বন্দী করে কারাগারে পাঠালেন। পোলজনক কয়েদখানায় বসে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আমি যদি রাজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে থাকি তাহলে কয়েদখানার দরজা যেন জীবনে কোনদিন না খোলে। আর আমি যদি নির্দোষ হই তাহলে এই মুহূর্তে কারাগারের দরজা ভেঙ্গে পড়ুক, আমার হাতের শেকল খুলে পড়ুক।'



রাজকুমারের প্রতিজ্ঞা অনুসারে কারাগারের পাঁচিল ভেঙ্গে পড়ল। কুমারও নিঃশব্দে নগর ছেড়ে সীমান্তের গ্রামে আশ্রয় নিলেন। গ্রামবাসীরা পোলজনককে চিনত। তারা তাঁর অনেক সেবাযত্ন করল। পরে লোকজন জোগাড় করে পোলজনক মিথিলা রাজ্য আক্রমণ করলেন।

অরিষ্টজনকের সৈন্যরা যুদ্ধে হারতে লাগল। অরিষ্টজনক যুদ্ধে যাওয়ার আগে প্রধানা মহিষীকে ডেকে বললেন, 'আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। যুদ্ধে কে হারবে কে জিতবে বলা কঠিন। আমি হারলে তুমি যেভাবে হোক আমাদের সন্তানকে বাঁচাবে।' তখন প্রধানা মহিষীর গর্ভে রয়েছেন স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। রাজার হেরে যাওয়ার খবর পাওয়া মাত্র রাণী একটা ঝুড়িতে প্রচুর ধনসম্পদ লুকিয়ে নিয়ে এক কাপড়ে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। রাণীকে সাহায্য করতে এলেন স্বয়ং শক্র। তিনি এক অলৌকিক রথে করে রাণীকে রেখে এলেন চম্পানগরে। চম্পানগরের এক বিত্তশালী প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাণীকে নিজের বোন হিসেবে আশ্রয় দিলেন। এভাবে রাণী গর্ভরক্ষা করতে সমর্থ হলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই রাণীর একটি ছেলে জন্মাল। বাবার নাম অনুসারে ছেলের নাম রাখা হল মহাজনক। একটু বড় হয়ে মহাজনক বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে যেতেন। বাচ্চারা তাকে 'ধোপার ছেলে' বলে রাগাত। মহাজনক তখন পিতৃ-পরিচয় জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

শেষ পর্যন্ত রাণী কুমারকে সব কথা খুলে বললেন। কুমারের বয়স তখন ষোল উত্তীর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন শাস্ত্রে ও অস্ত্রবিদ্যায় যথেষ্ট নৈপুণ্য

অর্জন করেছেন। নিজের অতীত বৃত্তান্ত জানার পর কুমারের মধ্যে দুটি স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠল। এক: পিতৃহত্যার প্রতিশোধ, দুই: মিথিলার রাজ্যভার নিজের হাতে নেওয়া। মহাজনক তাঁর মাকে জিজ্ঞেস করলেন:

'মা, তোমার কাছে ব্যবসা করার মত কিছু টাকা হবে?'

'আমার কাছে অনেক ধনরত্ন আছে বাবা। তুমি কি করতে চাও?'

'আমি বাবার রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চাই।'

'আমার কাছে যে পরিমাণ অর্থ আছে তা দিয়ে তুমি সৈন্যবাহিনী গড়তে পারবে।'

'না মা, তুমি অর্ধেক টাকা আমাকে দাও। আমি ব্যবসা করব।'

'সে তো অনেক বিপদের রাস্তা।'

'কিছু ভেবো না. আমি ঐ টাকা অনেক গুণ বাড়িয়ে নিয়ে তা দিয়ে সৈন্যবাহিনী গড়ব।'



কয়েকদিন পরে মার অনুমতি নিয়ে মহাজনককুমার সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতে রওনা হলেন।

প্রথম কয়েকদিন নির্বিঘ্নে কাটলেও পরে সমুদ্রে বিশাল ঝড় উঠল। মহাজনকের নৌকো সমুদ্রে হারিয়ে গেল। মাস্তুল ধরে ভাসতে ভাসতে মহাজনক সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করলেন। সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাজনককে মরতে দিতে পারলেন না। কারণ তিনি মাতৃভক্ত। পিতৃঋণ শোধ করতে চলেছেন। মাতৃপিতৃভক্তকে সমুদ্র কখনও গ্রাস করে না। দেবী আকাশপথে কুমারের সামনে এলেন। তাঁর সঙ্গে নানারকম কথা বললেন। তারপর কুমারের ইচ্ছায় তাঁকে মিথিলায় পৌঁছে দিলেন। সমুদ্রে সাতদিন ভেসে থাকার ক্লান্তি দেবীর পদস্পর্শে দূর হল। যখন মিথিলারাজের উদ্যানে তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হল তখন মহাজনকের দেবদূতের মত চেহারা সেই বাগানে ঝলমল করে উঠল।

ওদিকে মিথিলার রাজা পোলজনক একটিমাত্র কন্যা সীবলিকে রেখে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তিনি চারটি শর্ত বলে যান। যে ঐ চারটি শর্ত পূরণ করতে সমর্থ হবে সে-ই মিথিলার রাজা এবং সীবলির স্বামী হবে। শর্তগুলি হল: ১. সীবলি যাঁকে পছন্দ করবে, ২. মহাধনুকে যে ছিলা পরাতে পারবে, ৩. গোপন ধনরাশি কোথায়



আছে যে বলে দিতে পারবে, ৪. পালঙ্কের শিয়রের দিকটি যিনি নির্দেশ করতে পারবেন।

রাজার মৃত্যুর পর সেনাপতি ও অমাত্যরা শর্ত পূরণের চেষ্টা করতে গিয়ে একে একে লাঞ্ছিত হলেন। তখন ঠিক করা হল, যে কেউ একটিমাত্র শর্ত পূরণ করতে পারবে তাঁকেই মিথিলা-রাজ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু সে কাজও কেউ করতে পারল না। তখন পুরোহিতরা আলোচনা করে পুষ্পকরথ ছেড়ে দিলেন।



পুষ্পকরথ এপথ-সেপথ ঘুরে দ্রুতবেগে রাজার বাগানের দিকে ছুটে গেল। সেখানে মহাজনক শুয়ে ছিলেন। তাঁর চারপাশে একবার ঘুরপাক খেয়ে রথ থেমে গেল। পুরোহিতরা মহাজনকের পায়ের লক্ষণাদি বিচার করে বুঝলেন এই ব্যক্তি শুধু মিথিলা কেন, সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজা হতে পারেন। মহাজনককে অভ্যর্থনা করে প্রাসাদে নিয়ে আসা হল। মহাজনক অমাত্যদের সঙ্গে প্রাসাদে ঢুকলেন। যে চারটি শর্ত ছিল সেগুলিও অবলীলায় পূরণ করলেন। তারপর সীবলির সঙ্গে মহাজনকের বিয়ে হল। তিনি তখন চম্পানগর থেকে নিজের মা এবং মামাকে আনলেন।

৩

দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ ভোগ করার পর একদিন মহাজনক আমবাগানে বেড়াতে গেলেন। সেখানে একটি আমগাছের শাখাপ্রশাখা ফলভারে নুয়ে ছিল। তিনি সেখান থেকে কয়েকটি আম পেড়ে খেলেন। তারপর সকলেই সেই গাছের আম পেড়ে খেতে লাগল। ফিরে আসার সময় মহাজনক দেখলেন, গাছটি হতশ্রী হয়েছে। কিন্তু গাছটির উল্টোদিকের ফলহীন একটি গাছের পাতা ও ডালগুলি অক্ষত রয়েছে। ভারি সুন্দর লাগছে তার সবুজ শ্রী। এ থেকে তিনি বুঝলেন, রাজসিংহাসন হল ফলবতী আমগাছ, আর প্রব্রজ্যা হল নিষ্ফল আম গাছ। মহাজনক বিলম্ব না করে প্রব্রজ্যা নিলেন।

সীবলি রাজাকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক সাধ্যসাধনা করলেন। রাজার অনুগামী হয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করলেন। কিন্তু প্রব্রজ্যার একাকীত্ব রক্ষা করার জন্য মহাজনক ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেজন্য সীবলিকে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হল। তিনি পুত্রের হাতে রাজ্য শাসনের ভার দিয়ে নিজেও প্রব্রজ্যা নিলেন।

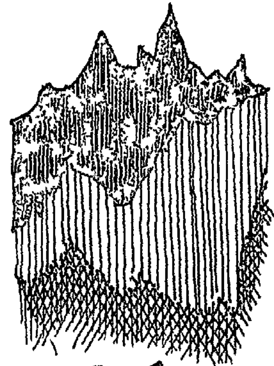


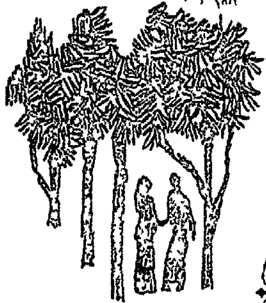
শ্যাম জাতক

পুরাকালে বারাণসীর নদীর দু পাড়ে দুটি গ্রাম ছিল। দুটি গ্রামই ছিল ব্যাধদের। প্রতিটি গ্রামে পাঁচশ ব্যাধ বাস করত। এই পাঁচশ ব্যাধের একজন করে দলপতি ছিল। দলপতি দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। দুজনের বন্ধুত্ব যাতে আরও দীর্ঘকাল অটুট থাকে সেজন্য তারা ঠিক করেছিল যদি কখনও একজনের ছেলে আর একজনের মেয়ে হয়, তাহলে তাদের পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে দেবে।

একসময় দুজনেরই দুটি সন্তান জন্মাল। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলের নাম হল দুকূলক, মেয়েটির নাম রাখা হল পারিকা। ছেলেমেয়ে দুটি দেখতে খুব সুন্দর হয়েছিল। সাধারণত ব্যাধদের মধ্যে কেউ অত সুন্দর হয় না। এরা বড় হতে ওদের বাবা-মা চাইলেন বিয়ে দিতে। কিন্তু দুজনেই পূর্ব জন্মে ছিলেন দেবতা। তাঁরা বিয়ে করতে চাইলেন না। বাবা-মা সে কথায় কান না দিয়ে দুকূলকের সঙ্গে পারিকার বিয়ে দিলেন।

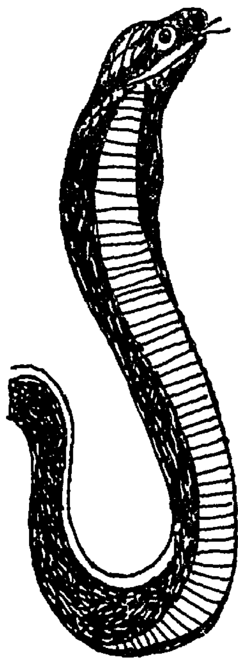
দুকূলক ও পারিকা বিয়ের পরেও আশ্রমবাসীদের মত থাকতে লাগলেন। দুকূলক পশু-পাখি বধ করতেন না। তাঁর বাবা মা জানতে চাইল, 'ব্যাধকুলে জন্মেও যদি পশু-পাখি না মার তাহলে তোমরা কি করে খাবে? বল দেখি বাপু তোমাদের মনের ইচ্ছেটা কি?' একথা শুনে দুকূলক বললেন, 'বাবা, আমি প্রব্রজ্যা নিতে চাই।' পারিকাও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমিও প্রব্রজ্যা নিতে চাই।' বাবা-মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আটকাচ্ছে কোথায়?' তাঁরা বললেন, 'আপনাদের অনুমতির জন্যই অপেক্ষা করছি।' দুকূলক ও পারিকার বাব-মা অনুমতি দিলেন। দুজনে তখন হিমালয়ের দিকে যাত্রা করলেন।





তাঁরা চলেছেন হিমালয়ের দিকে। শক্র দেখলেন দুজন মহাতপস্বী হিমালয়ে যাচ্ছেন। এঁদের আশ্রম দরকার। তিনি বিশ্বকর্মাকে নির্দেশ দিলেন, 'যাও, এরা পৌঁছবার আগেই দুটি সুন্দর কুটির গড়ে দাও। আর প্রব্রজ্যার জন্য দরকারী জিনিসও দিয়ে দাও।' বিশ্বকর্মা তাই করলেন। দুকূলক এবং পারিকা সেই আশ্রমে উঠে মৈত্রী ভাবনায় সময় কাটাতে লাগলেন। দুকূলক বন্য ফল জোগাড় করে আনতেন।





পারিকা আশ্রমের কাজ করতেন। এভাবে চলতে লাগল। শক্র একদিন দেখলেন, 'ওরা দুজনেই অন্ধ হবেন, সুতরাং ওঁদের একটি ছেলে দরকার।' শক্র এসে সে কথা দুকূলককে বললেন। দুকূলক এতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'তাহলে সংসারে থাকতে কি বাধা ছিল?' যাই হোক, শেষ পর্যন্ত শক্রের আশীর্বাদে ওঁরা একটি পুত্র সন্তান উপহার পেলেন। তার নাম রাখা হল সুবর্ণশ্যাম।

সুবর্ণশ্যামকে বাবা-মা 'শ্যাম' বলেই ডাকতেন। এভাবে দিন যায়। একদিন শ্যামের ষোল বছর পূর্ণ হল। এরপর দুকূলক ও পারিকা ফলের খোঁজে বনে গেলেন। বনে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এক গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়লেন। ঐ গাছের গুঁড়ির মধ্যে এক বিষাক্ত সাপ থাকত। দুকূলক ও পারিকার ঘাম বৃষ্টির জলের সঙ্গে সেই সাপের নাকে এসে লাগল। তাঁদের ঘামের অম্ল ও লোনা স্বাদে সাপটি ক্ষিপ্ত হল। সে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলল। তাতে দুজনেরই চক্ষুদুটি চিরতরে নষ্ট হল। অন্ধ হয়ে তাঁরা বাড়ি ফেরার রাস্তাটাও হারিয়ে ফেললেন।



শোনা যায়, পূর্বজন্মে দুকূলক ও পারিকা ছিলেন বৈদ্য এবং বৈদ্য-পত্নী। একবার এক কৃপণ ধনী রোগীর চোখদুটি যেতে বসেছিল। বৈদ্য তখন চিকিৎসা করে তার চোখ সারান। কিন্তু কৃপণ বৈদ্য তাঁর পারিশ্রমিক দিতে চায় না। তখন পত্নীর পরামর্শে বৈদ্য ঐ রোগীর চোখে এমন ওষুধ দিলেন যে তার দুটি চোখই অন্ধ হয়ে যায়। সেই পাপের ফলেই তাঁরা এ জন্মে অন্ধ হলেন।

শ্যাম এবার থেকে বাবা-মার সেবার ভার পেলেন। তিনিই তখন তাঁদের চোখের মণি। অন্ধ বাপ-মা সব ব্যাপারেই শ্যামের ওপর নির্ভরশীল। কি জল তুলে আনা, কি ফল জোগাড় করা, সমস্ত কাজই শ্যামকে করতে হচ্ছে। একদিন শ্যাম আশ্রমের জল আনতে নদীতে গেলেন। ঘড়াটি রাখলেন দুটি হরিণের পিঠে। সেদিন ঐ বনে বারাণসীর রাজা পিলিযক্ষ শিকারের সন্ধানে ঘুরছিলেন। এই রাজা হরিণের মাংস খেতে খুব ভালবাসতেন। তিনি ধনুর্বিদ্যায় চৌখস ছিলেন। বনের মধ্যে হঠাৎ দুটি হরিণ ও শ্যামকে আসতে দেখে তিনি ভাবলেন, 'এ কোন কিম্ভুত জন্তু হবে। এতদিন এ অঞ্চলে ঘুরছি,



কিন্তু কোনদিন তো মানুষ দেখিনি। এব সম্পর্কে জানতে হবে। তবে তাব আগে এক তীব মেরে একে দুর্বল করে দিতে হবে।'

পিলিযক্ষের বিষাক্ত তীর শ্যামকে মৃত্যুমুখে নিযে গেল। শ্যাম বৃথাই তাঁব চাবদিকে তাকিযে আক্রমণকাবীব খোঁজ কবলেন। পবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাব কোন শত্রু নেই, আমাকে মেরেও কারও কোন লাভ হবে না, তবু আমাকে মারলেন। যিনি আমাকে মেরেছেন আমি তাঁব পরিচয় পেতে ইচ্ছুক, দযা করে সামনে আসুন।' এই ভদ্র সম্ভাষণে পিলিযক্ষ খুবই লজ্জা পেলেন। তবু তিনি শেষ পর্যন্ত শ্যামেব কাছে এলেন। কথাপ্রসঙ্গে জানতে পাবলেন, অন্ধ তপস্বী ও তপস্বিনীর কথা। পিলিযক্ষ মৃত্যুমুখযাত্রীকে আশ্বাস দিলেন, 'তোমার অবর্তমানে আমি তোমারই মত ভালবাসায তোমার পিতামাতাব সেবা করব।'

বহুসুন্দবী নামে এক স্বর্গীয দেবী একবাব বোধিসত্ত্বের মা হযেছিলেন। তারপব থেকে চিরকাল তিনি বোধিসত্ত্বেব কথা ভেবে এসেছেন। সেদিন ভাবতে গিযে শ্যামের ঐ করুণ অবস্থা দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক কবলেন, 'সত্য প্রতিজ্ঞা কবে ওঁকে বাঁচাতে হবে।' এই ভেবে তিনি আকাশদেবতা হয়ে রাজাকে বললেন শ্যামের আশ্রমে যেতে। বাজা পিলিযক্ষ শ্যামেব আশ্রমে গিযে তপস্বী ও তপস্বিনীকে নিজেব পাপের কথা বললেন। এরপব তাঁবা বাজার সঙ্গে শ্যামেব কাছে এলেন। তাঁবা সেখানে আসার পব প্রতিজ্ঞা কবলেন, 'যদি শ্যাম সত্য পথে চলে থাকে তাহলে বিষের তেজ নষ্ট হবে।' এতে শ্যাম পাশ ফিবলেন। তখন বহুসুন্দরীও প্রতিজ্ঞা কবলেন, 'আমি যদি শ্যামকে সবচেযে ভালবেসে থাকি তাহলে ও যেন আবোগ্য লাভ কবে।'

কিছুক্ষণ পরে শ্যাম তো উঠে বসলেনই, শ্যামের বাবা-মাও ফিরে পেলেন নিজেদেব দৃষ্টিশক্তি। তখন শ্যাম বাজাকে আপ্যাযন করলেন। জানালেন তিনি বিষেব প্রকোপে মূর্ছা গিয়েছিলেন। শ্যাম বললেন, 'তাছাডা আমি বাবা-মাকে সেবাযত্ন করি, তাই আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন দেবকুল।' এ কথা শুনে রাজা বিস্মিত হয়ে গেলেন।



শ্যাম রাজাকে অনেক ধর্মকথা শোনালেন।

রাজা বারাণসীতে ফিরে এসে পোষধ পালন করলেন। প্রাণী-হিংসা ত্যাগ করলেন। দানধ্যানে রত থেকে আয়ুক্ষয় করতে লাগলেন। যথাসময়ে রাজার স্বর্গলাভ হল। বোধিসত্ত্ব বাপ-মার সেবা করে বোধি লাভ করলেন।

ভূরিদত্ত জাতক

১

পুরাকালে বারাণসীতে রাজত্ব করতেন ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্ত তাঁর ছেলেকে যুবরাজ করেন। একদিন যুবরাজের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি দেখে ব্রহ্মদত্ত মনে মনে ভয় পেলেন। ভাবলেন, 'যুবরাজের ক্ষমতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, হয়ত আমি বেঁচে থাকতেই তাঁর রাজা হওয়ার ইচ্ছে হবে।' এই ভেবে তিনি যুবরাজকে আদেশ দিলেন, 'তুমি এ রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও। আমার মৃত্যুর পর এখানে এসে রাজত্ব করবে।'

রাজাকে সম্মান দেখিয়ে কুমার দেশত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর মন বিষাদে ভরে গেল। ঠিক করলেন, প্রব্রজ্যা নেবেন। এই ভেবে যমুনা নদীর তীরে পাতার কুটির তৈরি করে থাকতে শুরু করলেন।

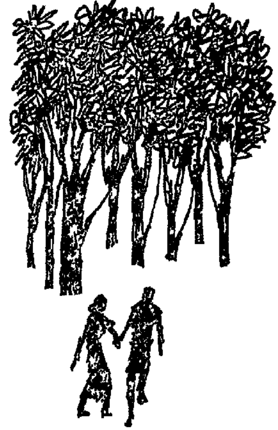


তখন সমুদ্রের নাগকন্যাদের মধ্যে এক বিধবা নাগকন্যা ছিলেন। তাঁর খুব ইচ্ছে হল আবার বিয়ে করেন। এই আশায় তিনি নাগভবন ছেড়ে পৃথিবীতে উঠে এলেন। যমুনাতীরে ঘুরতে ঘুরতে ঐ কুটিরটি দেখতে পেলেন। নাগকন্যা ভাবলেন, 'যদি এই তপস্বী শুদ্ধাচারী হন তাহলে তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন না। কিন্তু যদি মনের দুঃখে প্রব্রজ্যা নিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর সংসার করার ইচ্ছে ক্ষয়ে যায় নি।'

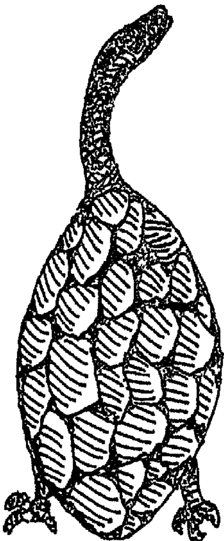
এর পর নাগকন্যা পরপর তিনদিন এসে কুমারের কঠিন শয্যাকে ফুলশয্যা করে রেখে গেলেন। কুমার তিন রাত্রি ঐ ফুলশয্যায় শয়ন করে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। চতুর্থ দিন সকালে তিনি লুকিয়ে রইলেন। নাগকন্যা ফুল নিয়ে এলে তিনি তাঁকে ধরে ফেললেন। তারপর তাঁরা গান্ধর্বমতে বিবাহ করে সেখানে সুখে বসবাস করতে লাগলেন। তাঁদের দুটি সন্তান হল। বড়টি ছেলে, তার নাম রাখা

হল সাগব ব্রহ্মদত্ত। আব মেযের নাম বাখা হল সমুদ্রজা। একদিন বারাণসীবাসী এক বনচর কুমাবকে দেখে ফেলল। সে কয়েকদিন কুমাবের কাছে কাটিযে ফিবে গেল।

ওদিকে বারাণসীরাজ আয়ু ক্ষয় কবে দেহান্তরিত হলেন। তখন কুমারের খোঁজ পড়ল। বনচরেব সাহায্যে অমাত্যরা কুমারেব কাছে রাজ-অভিষেকেব প্রস্তাব নিযে এলেন। কুমারকে ঐ বনেই বাজপদে অধিষ্ঠিত করা হল। নাগকন্যা কিন্তু কুমাবেব সঙ্গে যেতে বাজি হলেন না। পুত্র-কন্যাকে কুমাবের হাতে তুলে দিযে তিনি বললেন, 'মহাবাজ, আমি গেলে আপনাব অমঙ্গল হবে। সেখানে অত লোকজন। কোন কারণে আমার রাগ হলে দৃষ্টিপাতমাত্র লোক ভস্ম হযে যাবে। এতে আপনারই দুর্ণাম হবে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' কাঁদতে কাঁদতে তাঁবা পবস্পবের কাছ থেকে বিদায নিলেন। যাওযাব সময় নাগকন্যা বাজাকে সতর্ক করে বলে গেলেন, 'সাগব আব সমুদ্রজার শরীর খুবই নমনীয। জলীয পদার্থে গড়া। যাওযাব সময় এদের জলপূর্ণ পাত্রে কবে নিযে যাবেন। প্রাসাদেও এদের জলকেলির ভাল ব্যবস্থা করবেন। তাহলেই সাগর আব সমুদ্রজা ভাল থাকবে।'



২



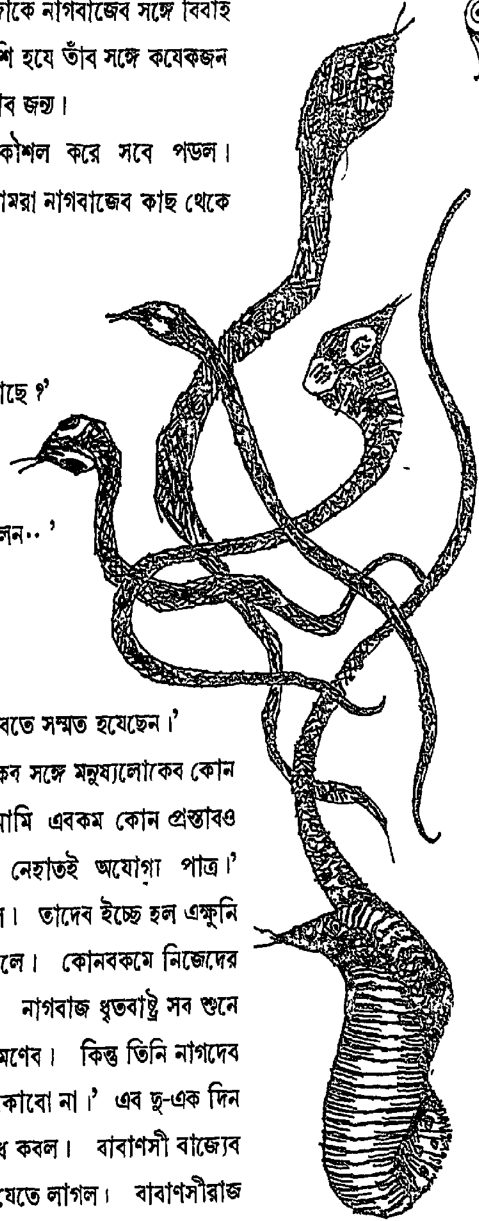
নাগকন্যার নির্দেশমত বাজা প্রাসাদের কাছে একটি পুকুর কাটিযেছিলেন। ছেলেমেযেবা সেই পুকুরের জলে মনের আনন্দে খেলা করে বেড়াত। একদিন পুকুবেব ফুটো দিযে জল ঢোকানোব সময কি করে যেন একটা কচ্ছপ ঢুকে পড়ে। বাজার ছেলেমেযে সাঁতাব কাটতে কাটতে কচ্ছপটিকে দেখে আঁতকে ওঠে। চিংকার করতে থাকে। তখন রাজাব নির্দেশে জাল ফেলে কচ্ছপকে ধরা হল।

কচ্ছপটিকে তোলাব পব অমাত্যরা বিচারে বসলেন। এই দুর্বিনীত কচ্ছপের কি শাস্তি দেওয়া উচিত এ নিযে বিস্তব আলোচনা হল. তাবপব ঠিক হল, কচ্ছপটাকে যমুনার আবর্তে ফেলে দেওযা হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। যমুনার আবর্তে পড়ে ঘুবতে ঘুবতে কচ্ছপ তলিযে যেতে লাগল। থামল একেবাবে নাগপুরীতে গিযে। সেখানে সহস্র নাগ খেলা করছিল। তাবা কচ্ছপকে আক্রমণ কবতে এল।



কচ্ছপ তখন বুদ্ধি করে বলল, সে বারাণসীরাজের দূত হিসেবে নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসেছিল। কচ্ছপকে তখন নাগরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। কচ্ছপ বলল 'বারাণসীরাজ নাগরাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান। সেজন্য তিনি নিজের মেয়ে সমুদ্রজাকে নাগরাজের সঙ্গে বিবাহ দিতে চান।' কচ্ছপের কথায় ধৃতরাষ্ট্র খুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে কয়েকজন নাগকে পাঠালেন বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করার জন্য।

পৃথিবীতে আসার সময় কচ্ছপ কৌশল করে সরে পড়ল। নাগদূতরা রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'আমরা নাগরাজের কাছ থেকে আসছি।'



'আপনাদের আসার উদ্দেশ্য?'

'আমরা নাগরাজের দূত।'

'আপনার রাজার কি কোন প্রস্তাব আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'বলুন।'

'আপনি যে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন··'

'আমি!'

'আজ্ঞে।'

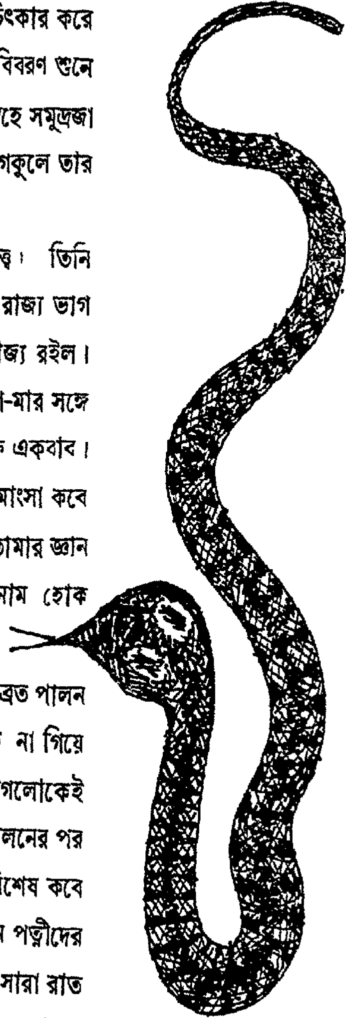
'বেশ, বলে যান।'

'নাগরাজ আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছেন।'

মহারাজ তখন জানালেন, 'নাগলোকের সঙ্গে মনুষ্যলোকের কোন বৈবাহিক সম্পর্ক হতে পারে না। আমি এরকম কোন প্রস্তাবও পাঠাই নি। ক্ষত্রিয়কুলের পক্ষে সাপ নেহাতই অযোগ্য পাত্র।' এ কথা শুনে নাগদূতেরা ভীষণ রেগে গেল। তাদের ইচ্ছে হল এক্ষুনি বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলে রাজাকে মেরে ফেলে। কোনরকমে নিজেদের সংযত করে তারা নাগলোকে ফিরে গেল। নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্র সব শুনে নাগদের আদেশ দিলেন বারাণসী আক্রমণের। কিন্তু তিনি নাগদের সতর্ক করে দিলেন, 'তবে কাউকে হত্যা কোরো না।' এর দু-এক দিন পরেই অসংখ্য নাগ রাজপ্রাসাদ অবরোধ করল। বারাণসী রাজ্যের সর্বত্র কেবল বিষাক্ত সাপের ফণা দেখা যেতে লাগল। বারাণসীরাজ তখন বাধ্য হয়ে নাগরাজের সঙ্গে সন্ধি করলেন। সমুদ্রজার সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বিয়ে হয়ে গেল।

৩

ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী হয়ে সমুদ্রজার তেমন কোন বিপত্তি ঘটে নি। কারণ ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে নাগরা সমুদ্রজার কাছে সর্বদাই মানুষরূপ ধারণ করে আসত। তাই দীর্ঘকাল সে জানতেই পারেনি যে নাগরাজের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্র ও সমুদ্রজার চারটি পুত্র সন্তান জন্মাল। সবচেয়ে ছোটটির নাম অরিষ্ট। অরিষ্ট একদিন মায়ের দুধ খাওয়ার সময় সাপের শরীর ধারণ করে লেজ দিয়ে মায়ের পিঠে মৃদু আঘাত করল। এতে সমুদ্রজা চিৎকার করে ওঠে। অরিষ্টের এক চোখে নখ ঢুকিয়ে দেয়। ঘটনার বিবরণ শুনে ধৃতরাষ্ট্র অরিষ্টের ওপর খুবই রেগে যান। কিন্তু মাতৃস্নেহে সমুদ্রজা অরিষ্টকে রক্ষা করল। সেদিনই সে জানতে পারল যে নাগকুলে তার বিয়ে হয়েছে।



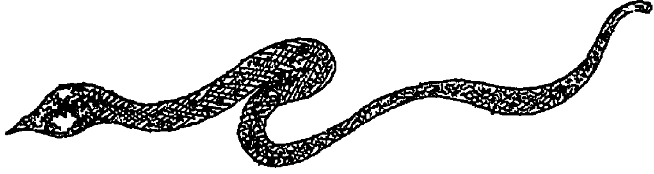
ধৃতরাষ্ট্রের চার ছেলের মধ্যে ছোটটি স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। তিনি অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র চার পুত্রের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিলেন। তাঁর নিজের হাতে মাত্র একশ যোজন রাজ্য রইল। আলাদা হয়ে যাওয়ার পর তাঁর পুত্ররা মাসে একবার বাপ-মার সঙ্গে দেখা করতে আসত। কিন্তু বোধিসত্ত্ব আসতেন প্রতি পক্ষে একবার।

বোধিসত্ত্ব একবার স্বর্গে গিয়ে এক কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করে আসেন। দেবরাজ শক্র তখন খুশি হয়ে বলেন, 'দত্ত, তোমার জ্ঞান বিপুলা পৃথিবীর সমান। তাই আজ থেকে তোমার নাম হোক ভূরিদত্ত।'

ভূরিদত্ত নাগলোকে ফিরে এসে ইচ্ছে করলেন পোষধ ব্রত পালন করবেন। তাঁর পত্নীরা বলল, 'প্রভু, আপনি পৃথিবীতে না গিয়ে নাগলোকেই তা পালন করুন।' বোধিসত্ত্ব পত্নীদের কথায় নাগলোকেই ব্রত পালন শুরু করলেন। পর পর কয়েকদিন ব্রত পালনের পর দেখলেন, সেখানে পোষধ পালনে বড় বিঘ্ন ঘটছে। বিশেষ করে সুন্দরী নর্তকীরা তাঁর একাগ্রতা নষ্ট করে দিচ্ছে। তখন তিনি পত্নীদের বললেন, 'যমুনার তীরে গিয়ে আমি পোষধ পালন করব। সারা রাত সেখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকব। সকালে গিয়ে তোমরা আমার পুজো করবে।' এরপর থেকে তিনি তাই শুরু করলেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাগকন্যারা যেত তাঁকে অর্চনা করে ফিরিয়ে আনতে।



যে সময়ের কথা, তখন বারাণসী নগরের কাছাকাছি এক গ্রাম থেকে এক ব্রাহ্মণ বনে পশু শিকারের জন্য যেত। ঐ ব্রাহ্মণের ছেলেটিও তার সঙ্গে থাকত, তার নাম সোমদত্ত। ব্রাহ্মণ হলেও সে ছিল গরীব এক গ্রামবাসী। ব্যাধের বৃত্তি নিয়ে জীবিকার ব্যবস্থা করত। ব্রাহ্মণের স্ত্রী ছিল খুবই ভয়ঙ্করী। সে রেগে গেলে ব্রাহ্মণকেও মারতে কসুর করত না।



একদিন সোমদত্তকে সঙ্গে নিয়ে বনে বনে ঘুরে ব্রাহ্মণ একটা গোসাপ পর্যন্ত মারতে পারল না। ছেলেকে ডেকে ব্রাহ্মণ বলল, 'দেখ, আজ তো কিছুই জুটল না। এখন খালি হাতে ফিরলে তোর মা আর আমাকে আস্ত রাখবে না। কিছু একটা জোটাতেই হবে।' তারপর বোধিসত্ত্ব যেখানে পোষধ পালন করছিলেন সেখানে গেল। সেখানে যমুনায় একটা হরিণ জল খাচ্ছিল। তারা সেটাকে মেরে তার মাংস কেটে নিল। কিন্তু এসব করতে করতে রাত হয়ে গেল। তাই যেখানে বোধিসত্ত্ব পোষধ পালন করছিলেন তার কাছাকাছি একটা গাছে চড়ে বসল রাতটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য।



ভোরবেলা নাগকন্যাদের নৃত্য, ফুল আর সুগন্ধির প্রভাবে ব্রাহ্মণের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখল সেই নাগরাজ দৈত্যরূপ ধারণ করেছেন। নাগকন্যারা তার পুজো করছে। ব্রাহ্মণ ওঁর পরিচয় জানার জন্য ব্যাকুল হল।

আপনি দেব, দানব, না মানব?'

'আমি নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ভূরিদত্ত।'

বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে দেখে বুঝলেন, 'এই ব্রাহ্মণ খুব খারাপ স্বভাবের লোক। এ সুযোগ পেলেই আমার ক্ষতি করবে। একে বরং নাগলোকে নিয়ে যাই। তাহলে নির্বিঘ্নে এখানে পোষধ পালন করতে পারব।' এরপর তিনি ব্রাহ্মণ ও তার ছেলেকে রাজি করিয়ে নাগলোকে নিয়ে এলেন। নাগলোকে ব্রাহ্মণ ও তার ছেলের দিন চরম আনন্দে কাটতে লাগল।





ব্রাহ্মণ যে নাগলোকে আসতে পারল, তার কারণ তার অতীত পুণ্যের ফল। ক্রমে সেই ফল ফুরিয়ে গেল। ব্রাহ্মণের মনে দুশ্চিন্তা দেখা দিল। তারা ফিরতে চাইল। সব কাজে সাফল্য অর্জন করা যায় যে মণির সাহায্যে, বোধিসত্ত্ব তখন তাকে সেই মণি দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু বোধিসত্ত্বের পোষধের ব্যাপারটি তুলে বললেন, 'আপনি এই রাজসুখ পাওয়ার পরেও স্বর্গে যাওয়ার জন্য পোষধ পালন করছেন। আর আমি কিনা বিষয়সুখে আবদ্ধ থাকব!' বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'হয়ত সত্যিই ব্রাহ্মণের মনে ধর্মভাব জেগেছে।' তিনি একটা থলিতে কিছু রত্ন বেঁধে ব্রাহ্মণের হাতে দিলেন। তারপর তার ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করলেন।

পৃথিবীতে ফিরে এসে ব্রাহ্মণ ছেলেকে দেখিয়ে বলল, 'এই জায়গায় আমরা হরিণটাকে মেরেছিলাম, এখানে নাগকন্যারা নাচছিলেন।' তারপর রত্নের পুঁটলি রেখে বাপ-ছেলে মিলে স্নান করতে লাগল। স্নান সেরে উঠে দেখল পুঁটলিটা নেই। ব্রাহ্মণীর কাছে ফিরে ব্রাহ্মণ সমস্ত বৃত্তান্ত বলল। এতে ব্রাহ্মণী তাদের শুধু মারতে বাকি রাখল। আবার তারা বনে ঢুকল হরিণের মাংসের খোঁজে।

৫

কাশীরাজ্যে তখন এক ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা নিয়ে সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি বাস করতেন হিমালয়ে পর্বতের কোলে। একবার গরুড় পাখি বিশাল একটা সাপ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। ঝুলন্ত সাপটা বাঁচার আশায় লেজ দিয়ে সেই ব্রাহ্মণ যে গাছের তলায় বসে তপস্যা করতেন, সেই গাছটিকে জড়িয়ে ধরে। এই গাছটাও উপড়ে ফেলেন গরুড়। পরে হিমালয় পাহাড়ে বসে সাপটিকে খেতে গিয়ে দেখলেন গাছটা পড়ে যাচ্ছে। গাছটাকে দেখার পর গরুড়ের মনে পড়ে গেল, 'এই গাছটা ঋষিকে ছায়া দিত, এখন তিনি যদি আমাকে অভিশাপ দেন!' এই ভেবে গরুড় ঋষির কাছে গেল। ঋষি বললেন, না দেখে অপরাধ করলে পাপ হয় না।' এতে গরুড় খুব খুশি হয়ে ঋষিকে বিষঝাড়ার মন্ত্র শেখালেন।



বারাণসীর এক গরীব ব্রাহ্মণ ঋণের দায়ে শহর ছেড়ে বনে চলে আসেন। তিনি ঐ ঋষির আশ্রমে উঠে ঋষির খুব সেবাযত্ন করলেন।

চলে যাবার সময় ঋষি তাঁকে মন্ত্রটি শিখিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ তখন ঠিক করলেন, তিনি সাপুড়েগিরি করে খাবেন। বিষঝাড়াব মন্ত্র নিয়ে ব্রাহ্মণ যখন যমুনাতীরে এসেছেন ঠিক তখনই নাগকন্যাব। ঐ সর্বকামদ মণি সমেত যমুনাতীরে উঠে এসেছেন ভূরিদত্তেব অর্চনা করতে। ব্রাহ্মণ মন্ত্র জপ করতে করতে যাচ্ছিলেন। তা শুনে নাগকন্যারা ভাবলেন, 'সাপুড়ে এসেছে।' এই ভয়ে তাঁরা মণিটা ফেলে পালালেন। ব্রাহ্মণ মণিটা কুড়িয়ে নিলেন।

এমন সময় সোমদত্ত আর তাব বাবা বনে যাচ্ছিল শিকারেব জন্য। ব্রাহ্মণের হাতে মণি দেখে সোমদত্তের বাবা ভাবল, 'যেভাবে হোক মণিটা এর কাছ থেকে নিতে হবে। বিষঝাড়ার মন্ত্র শিখে ব্রাহ্মণ সেই মন্ত্রকেই কাজে লাগাতে চাইছে। ফলে সোমদত্তের বাবা যখন এটা-ওটার বিনিময়ে মণি চাইল সে রাজি হল না। সে বলল, 'যদি উগ্র বিষধব মহানাগ পাই তাহলে এই মণি তোমায় দিই।' সোমদত্তেব বাবা তখন তাঁকে দেখিয়ে দিলেন বোধিসত্ত্বের বিশাল শবীব। ব্রাহ্মণও মণিটি সোমদত্তেব বাবাকে দিলেন। কিন্তু মণিটি তার হাত থেকে পিছলে ভূগর্ভে চলে গেল আপনা আপনি। এতে বাপ-ছেলে দুজনেই খুব মুষড়ে পড়ল। ঐ ব্রাহ্মণ তখন মন্ত্র পড়তে পড়তে বোধিসত্ত্বের দিকে এগিয়ে চললেন। বোধিসত্ত্ব তাঁকে আসতে দেখে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কবলেন, 'আর চোখ খুলব না, কেননা রেগে তাকালেই ব্রাহ্মণ ভস্ম হয়ে যাবে। যাই ঘটুক না কেন, আমি হিংসাব পথে যাব না।'



৬

এবপর থেকে ঐ বাজিকব বোধিসত্ত্বকে নিয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়ান। নাগপুরীতে বৃদ্ধা সমুদ্রজা দীর্ঘকাল বোধিসত্ত্বকে না দেখে কাতব হলেন। নাগ সৈন্যবা চাবদিকে তাঁকে খুঁজতে বেবিয়ে পড়ল। শেষে বাবাণসীবাজেব সভায় বোধিসত্ত্ব খেলা দেখাচ্ছেন দেখা গেল। নাগ-সৈন্যবা তখন নিজেদেব অলৌকিক শক্তিব প্রভাবে বোধিসত্ত্বকে মুক্ত কবল। সমস্ত বৃত্তান্ত বাবাণসীবাজেব কাছে প্রকাশ পেলে তিনি ভূবিদত্তকে জিজ্ঞেস কবলেন :

'তুমি মহাবিষধব হয়েও বাজিকরেব হাতে ধরা পড়লে কি কবে?'

'আমি তখন পোষধে ছিলাম।'

তারপব বাবাণসীবাজ ভাগ্নেদেব চিনতে পাবলেন। ভূবিদত্ত রাজাকে ধর্মকথা শোনালেন। ভূবিদত্ত বাজাকে বললেন, 'মামা, আমাদেব দাদামশায এখন অমুক বনে প্রব্রজ্যা নিয়ে বাস কবছেন। মা সামনের মাসেব প্রথম ববিবাব দাদামশাযকে দেখতে সেখানে যাবেন। আপনিও আসুন। সকলের একসঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে।'

এবপর ভূবিদত্ত নাগলোকে ফিবে এসে অসুস্থ হযে পড়লেন। আব তাঁব ভাই সুভগ মিত্রদ্রোহী সেই ব্রাহ্মণকে লেজে বেঁধে নিযে নাগলোকে ফিবে এলেন। কিন্তু অবিষ্ট বললেন, 'ভাই, ওঁকে মেবো না। ও ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ আর্য।'

'সুভগ, তুমি কি জান কে জগৎ সৃষ্টি কবেছেন?'

'না, জানি না।'

'ব্রাহ্মণদেব পিতামহ।'

'আমি জানতাম না।'

'ব্রাহ্মণদের দান কবলে মানুষ আর জন্মান্তব গ্রহণ কবে না।'

'ব্রাহ্মণদের কিভাবে দান কবতে হয?'

'সকলেব আগে।'

'ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে আমাকে আরও বল।'

'জান কি কিভাবে সমুদ্রেব জল নোনা হল?'

'না, জানি না।'

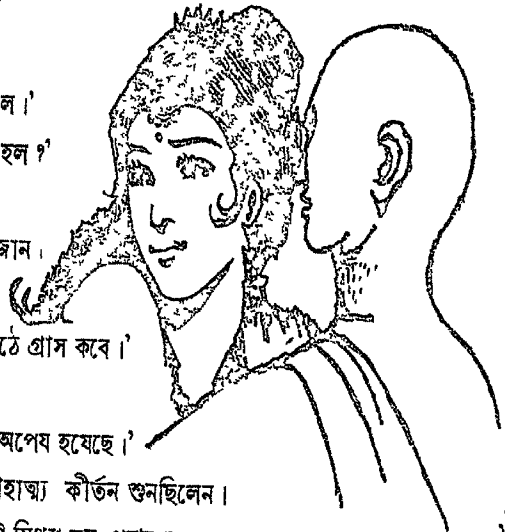
'তা জান না, অথচ ব্রাহ্মণদেব মাবতে জান।'

'আমি না জেনে অন্যায কবেছি।'

'এক ব্রাহ্মণকে সাগরের জল উথলে উঠে গ্রাস কবে।'

'তাবপর?'

'সেই থেকে সাগবের জল নোনা আর অপেয হযেছে।'



ভূরিদত্ত বোগশয্যায শুযে ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য কীর্তন শুনছিলেন। শুনতে শুনতে তাঁর রাগ হল। কেননা অবিষ্ট মিথ্যা তত্ত্ব প্রচার কবছে। অযথা ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য কীর্তন করছে। ভূবিদত্ত তখন বললেন:

'প্রাজ্ঞের কাছে বেদপাঠ কল্যাণদাযী নয। বেদ তিনটি



মরীচিকার মতই মায়াময়। প্রাজ্ঞ লোকদের তা ভুল পথে নিয়ে যায়। হত্যাকারী আর মিত্রদ্রোহীরা বেদ পড়লে রক্ষা পাবে, এ নেহাতই বাজে কথা। ভেজা বা শুকনো কোন কাঠই নিজে থেকে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে না, চেষ্টা না করলে কোন মানুষই প্রজ্ঞাবান হতে পারে না। মন্ত্র উচ্চারণ করে পুজো করলেই প্রাজ্ঞ হওয়া যায় না। বেদ পাঠ ব্রাহ্মণের কাজ, ক্ষত্রিয়ের কাজ পৃথিবীকে পালন করা, আর বৈশ্যের কাজ চাষবাস করা। শূদ্রের কাজ তিন বর্ণের লোকদের সেবা করা। এই চতুরাশ্রম প্রথা ব্রাহ্মণরা তৈরি করেছে। কিন্তু এ যদি সত্য হতো তাহলে ক্ষত্রিয় ছাড়া কেউ রাজ্য শাসন করতে পারত না। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ বেদ পাঠ করতে পারত না। কিন্তু তা যে সত্যি নয় সে কথা সবাই জানে। যে প্রাণী বধ করে সে এবং যাকে বধ করা হয় উভয়েরই স্বর্গবাস হয়—ব্রাহ্মণরা এই কথা বলে থাকে। ভাই, তাহলে ব্রাহ্মণেরা পরস্পর খুনোখুনি করে স্বর্গে যায় না কেন? এসব কথা সত্যি নয়। এরা ..., ছলচাতুরি করে লোক ঠকায়। এরা নিকৃষ্ট জীব।'



ভূরিদত্ত এভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তত্ত্বকে খণ্ডন করলেন। কিন্তু সেই লোভী, ব্যাধের বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণকে একটাও খারাপ কথা না বলে নাগলোক থেকে চলে যেতে বললেন।

এ কাহিনীর শেষ ভূরিদত্তের মাতামহের আশ্রমে। সেখানে মামা-ভাগনে ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা একত্রিত হল। সমুদ্রজা তাঁর পিতাকে প্রণাম করলেন। তারপর যে যার ঘরে ফিরে গেলেন। বোধিসত্ত্বও যতদিন বেঁচে রইলেন সর্ববিধ শীল রক্ষা করে গেলেন। আয়ু ক্ষয় করে একদিন তিনি দেবলোকে চলে গেলেন।

পরিশিষ্ট/৭

জাতককথা

'জাতক' শব্দটির বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষ অর্থ আছে। গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম কাহিনীসমূহকেই এককথায় জাতক বলে। বৌদ্ধদের বিচারে কেবলমাত্র একজন্মের সুকৃতির ফলে কেউ গৌতম বুদ্ধের সব প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারেন না। কোটিকল্পকাল জীবকুলের নানা প্রজাতিতে জন্মগ্রহণ ও পালনের ফলেই গৌতম নির্বাণ লাভ করেছিলেন। এভাবে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে-করতে অভিসম্বুদ্ধ হন। যার ফলে তাঁর 'পূর্বনিবাস জ্ঞান' জন্মায়। অর্থাৎ তিনি নিজের নখদর্পনে অতীত জন্মবৃত্তান্তসমূহ দেখতে সক্ষম হন। ধর্মকথা বলার সময় তিনি অতীতের এই কাহিনীগুলি বলতেন। জাতক বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের নবাঙ্গের একটি অঙ্গ।

মূল জাতক কাহিনীর সংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধ্যাপক ফৌসবল কর্তৃক সম্পাদিত পালি ভাষায় লিখিত 'জাতকাত্থ বণ্ননা'য় ৫৪৭টি জাতক আছে। কিন্তু এর মধ্যে অনেকগুলিই পুনরুক্তিমূলক। আবার কোন-কোন ক্ষেত্রে একই জাতক দুবার দুটি নামে কথিত হয়েছে।

উত্তরে কপিলাবস্তু ও শ্রাবস্তী থেকে দক্ষিণে রাজগৃহ এবং বুদ্ধ গয়া, পশ্চিমে সাঙ্কাশ্যা থেকে পূর্বে সঙ্গ ও বৈশালী হল গৌতম বুদ্ধের প্রধান লীলাভূমি। আপামর জনসাধারণকে মুক্তির পথ দেখানই বুদ্ধের কৃত্য ছিল। সুতরাং অনুমান করা যায় এই অঞ্চলের প্রধান ভাষা ছিল পালি। কারণ জাতক কাহিনীগুলি পালি ভাষায় রচিত। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকের প্রথমভাগে অশ্ব ঘোষ সিংহলে যান। তিনিই বৌদ্ধ শাস্ত্রের মূল পাণ্ডুলিপি পুনরায় পালিভাষায় অনুবাদ করেন। অনুমান 'জাতকাত্থ বণ্ননা' বুদ্ধ ঘোষের সময়েই পুনরায় অনূদিত হয়।

জাতক কাহিনীর কিছু কিছু অংশের সঙ্গে হিন্দু শাস্ত্র ও পুরাণের মিল দেখা যায়। এছাড়াও এমন কিছু কিছু লক্ষণ আছে যা থেকে পণ্ডিতদের নানা প্রশ্ন দেখা যায় সমস্ত জাতকই কি গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক রচিত ? কাহিনীসমূহের রচনার নৈপুণ্য ও কৌশলের মধ্যকার পার্থক্য। পুনরুক্তি দোষ ভাষা

ও ভাষাগত ত্রুটি দেখে তাঁদের অনুমান, দীর্ঘ সময় কাল ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতক রচিত হয়। এমনকি কোন কোন জাতক কাহিনীতে বৌদ্ধভাব নেহাতই বাহ্যিক ব্যাপার। জাতকের সঙ্কলনের কাজটি হয়েছিল খ্রীষ্টের জন্মের ৩৭০ বছর আগে। জাতকের গল্পের প্রভাব ভারতবর্ষীয় সাহিত্যেই শুধু প্রবল নয়, বিদেশী সাহিত্যেও জাতক-প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

জাতক কাহিনীতে বিশ্বপ্রেম, পুরাতত্ত্ব, উদ্ভিদ প্রেম, পরিবেশ ভাবনা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি জাতকের গল্প থেকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃতি বেশ সহজ, সরল ভাবে বোঝা যায়।

পরিশিষ্ট/২ জাতকের ব্রহ্মদত্ত

বেশিরভাগ জাতকের গল্পের শুরুতেই একটি লাইন আছে, 'অতীতে বারাণসীয়ম ব্রহ্মদত্তে রাজ্জং কারেন্তে'। এই লাইনটিকে গল্প বলার ঢঙ বা ভণিতা বলেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ঠিক যেমনটি দেখা যায় সহস্র এক আরব্য রজনীর গল্পে বা বিক্রমাদিত্যের নাম জড়িয়ে পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যানে।

অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন বুদ্ধদেবের শতাধিক বছর আগে কাশীতে যথার্থ ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি কোশলরাজ দীর্ঘীতিকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করে দীর্ঘীতির রাজ্য দখল করেন। পরে অবশ্য কোশলরাজের দেশে দীর্ঘায়ুর উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তার পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দেন।

তবে জাতককাহিনীর বিচারের সময় এ তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। কাহিনী শুরুর একটা রীতি সব ভাষায় সর্বকালে থাকে। একদা এক দিয়ে যেমন পাশ্চাত্যের রূপকথা শুরু হয়।

পরিশিষ্ট/৩ বুদ্ধ

জাতক উল্লেখিত বুদ্ধ সব সময়ই অতীত বুদ্ধ। অর্থাৎ বুদ্ধের পূর্ব জন্মের বৃত্তান্তসমূহ। গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী ১৭ জন বুদ্ধের কথা জাতকে পাওয়া যায়। এই ২৭ জনের মধ্যে প্রথম ৪ জনের নাম তণহঙ্কর, মেধঙ্কর, শরণঙ্কর এবং দীপঙ্কর যেভাবে কাহিনীর বিন্যাস করা হয়েছে তাতে বুদ্ধকে

লৌকিক সময অতিক্রম কবে ভাবা হযেছে। প্রাচীনকালে তত্ত্বজ্ঞ তপস্বীদেব সঙ্গে বুদ্ধেব একটি যোগসূত্রও কল্পনা কবা হযেছে।
গৌতমবুদ্ধ এই সব অতীত বুদ্ধেবই ফলস্বৰূপ বলে বৌদ্ধবা মনে কবেন। কপিলাবস্তুব বাজা শাক্য বংশীয শুদ্ধোদনেব পুত্র হযে গৌতম বুদ্ধ জন্মান। তাঁব মাযেব নাম মাযা দেবী। তিনি জন্মান বৈশাখী পূর্ণিমায শাল বৃক্ষমূলে। মহামাযা তখন পিত্রালযে যাচ্ছিলেন। বিশ্বামিত্র আচার্যেব নিকট সিদ্ধার্থ সর্ববিদ্যায শিক্ষিত হন। সাবথি ছন্দকেব সঙ্গে বথে ভ্রমণেব সময জবা, মৃত্যু প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কবেন। এতে তাঁব মধ্যে গভীব বৈবাগ্যভাব জাগে। আব এক বৈশাখী পূর্ণিমায বোধিবৃক্ষেব মূলে বসে তিনি বুদ্ধত্ব অর্জন কবেন।

পরিশিষ্ট/৪

টীকাটিপ্পনি

কপিলবস্তু—বাবাণসীব উত্তবে নেপাল প্রদেশে বোহিনী নদীব তীবে এক প্রাচীন নগব।

কৌশাম্বী—এলাহাবাদেব উত্তব পশ্চিমে যমুনা নদীব তীবে অবস্থিত। বাসবদত্তা, বত্নাবলী ইত্যাদি সংস্কৃত নাটকেব সৌজন্যে কৌশাম্বী সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ কবে।

জম্বুদ্বীপ—চাবটি মহাদ্বীপেব একটি। জম্বুদ্বীপেব অবস্থান সব থেকে দক্ষিণে। ভাবতবর্ষ এই দ্বীপেব অন্তর্গত।

বৈশালী—গঙ্গাব উত্তব তীবেব জনপদ। কানিংহামেব মতে হাজিপুবেব উত্তবে 'বেলচব নামে যে অঞ্চলটি আছে সেটিই প্রাচীন বৈশালী।

বাজগৃহ—প্রাচীন নাম সিবিব্রজ। বুদ্ধগযা থেকে বিহাবে যাওযাব পথে পাটনা জেলায অবস্থিত।

শ্রাবস্তী—বর্তমান নাম শেট মহেঠ। অযোধ্যা প্রদেশে গোণ্ডা জেলায অবস্থিত।

হিমবন্ত—হিমালয অঞ্চল। বা জম্বুদ্বীপেব উত্তবেব পাবত্য অঞ্চল।

চুল্লক চুল্ল—ছোট।

ত্রিবত্ন—বুদ্ধ ধর্ম এবং সঙ্ঘ-ই হল বৌদ্ধদেব ত্রিবত্ন।

খুল্ল—ক্ষুদ্র।

শীল—চবিত্র চবিত্রবক্ষাব উপায।

পঞ্চশীল—প্রাণীহত্যা চৌর্যবৃত্তি অব্রহ্মচর্য মিথ্যাচাব ও সুবাপানে বিবত থাকাই পঞ্চশীলত্ব।

অর্হত্ব—অবিদ্যা, কাম আব ভব এই তিনটিকে বৌদ্ধবা আস্রব বলেন। আস্রবেব বিনাশ ঘটলে অর্হত্ব লাভ হয়।
আচার্য—শিক্ষক।
প্রত্যন্তগ্রাম—বাজ্যেব সীমানায় যে গ্রাম অবস্থিত।
লাঙ্গলীষা—লাঙ্গল+ঈষা।
সপ্তবত্ন—সুবর্ণ, বজত, মুক্তা, মণি, বৈদুর্য হীবক ও প্রবাল।
কটাহক—কাঠেব ফলক।
চতুর্মধু—মধু, গুড, তেল ও সব।
আমকশ্মশান—যে শ্মশানে দাহ কবা হয় না, শব ফেলে আসা হয় শিযাল শকুনেব খাবাব জন্য।
অভিজ্ঞা—অলৌকিক জ্ঞান।
বজক—যাবা কাপড বঙ কবে।
মহাসাল বা মহাশাল—যাব মহাশালা (বড বাডি) আছে। অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি।
অজাতশত্রু—মগধবাজ বিম্বিসাবেব পুত্র।
অগতি—মিথ্যাচাব, দ্বেষ, মোহ ও ভীতিকে অগতি বলা হয়।
দশবাজ ধর্ম—দান শীল, ত্যাগ অক্রোধ, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, আর্হব, তপ ও অবিবোধন।
গান্ধাব—বর্তমান পেশোযাবেব কাছাকাছি অঞ্চল।
তিন্দুক গাছ—গাব গাছ ও আবলুশ গাছ।
আজানেয—উৎকৃষ্ট জাতীয।
শক্র—দেববাজ। পালি সাহিত্যে শক্রকে ভূতনাথ বা ভূতপতিও বলা হযে থাকে।
যক্ষ—বৌদ্ধ সাহিত্যে এবা বাক্ষসেব নামান্তব।
প্রব্রজ্যা—সন্ন্যাস গ্রহণ, ভিক্ষুধর্ম।
নিযামক—পথ প্রদর্শক।
উপবাজ—বাজপ্রতিনিধি।
মহানিষ্ক্রমণ—বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিব জন্য সিদ্ধার্থেব গৃহত্যাগ।
লসীকা—শবীবেব মধ্যকাব বস।
বিশাখা—বৌদ্ধ উপাসিকা হিসাবে খ্যাতা। ইনি মগধেব প্রসিদ্ধ ধনী ধনঞ্জয শ্রেষ্ঠীব কন্যা।
উপালি—গৌতমবুদ্ধেব প্রধানতম শিষ্যদেব একজন।
ধর্মগণ্ডিকা—হাঁডিকাঠ।
শ্বেতচ্ছত্র—বাজ চিহ্ন।
মহাসত্ত্ব—বোধিসত্ত্বকে অনেক ক্ষেত্রেই মহাসত্ত্ব বলে সম্বোধন কবা হযেছে।
আদ্রাহলপথ—আব কোনদিন শত্রুতা কবব না এই প্রতিজ্ঞা।
অভীক্ষ্ণ—পুন পুনঃ।
সুপর্ণ—দেবলোকেব পাখি, গরুডেব অপব নাম।
চতুর্মহাবাজ—পুবাণ বর্তি দিকপাল, ধৃতবাষ্ট্র, বিরূঢক, বিরূপাক্ষ ও বৈশ্রবণ

প্রত্যেকবুদ্ধ—নিজেব ক্ষমতায যিনি নির্বাণ লাভেব যোগ্য অথচ জনসাধাবণকে ধর্ম উপদেশ দেন না। প্রত্যেকবুদ্ধ সর্বজ্ঞ নন।

পঞ্চ মহানদী—গঙ্গা, যমুনা, অচিববতী, সবযূ এবং মাহী।

মাব—বৌদ্ধ মতে মাব পাপ প্রবৃত্তিব দেবতা। মাবেব তিন কন্যা তৃষ্ণা, বতি ও অবতি (ক্রোধ)।

চোববাজ—বাজ্য অপহবণকাবী।

কিম্ফল—কি বকম ফল তা জানা নেই।

অঙ্গবিদ্যা—যাব দ্বাবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব লক্ষণ দেখে ভবিষ্যৎ গণনা কবা যায।

শক্রেব আসন—বৌদ্ধধর্মে সাধু ব্যক্তিব বিপদ হলে শক্রেব আসন উত্তপ্ত হয। যেমন হিন্দুশাস্ত্রে দেবতাব আসন টলে।

বভ্রু বিড়াল।

চর্মকীল—আঁচিল।

বৈশ্রবন—কুবেবেব আবেকটি নাম।

শীলমীমাংস—চবিত্রেব বলেব মীমাংসা।

মৈত্রী ভাবনা—নিজেকে শত্রুহীন কবাব বাসনা, আত্মীয স্বজন-সহ সমগ্র প্রাণীকূল সুখে থাকুক এইবকম চিন্তা কবা।

ধনপাল—বাজাব কোষাগাব থেকে লোকজনকে তাদেব প্রাপ্য যে দিযে থাকে।

মযূব জাতক—মযূবেব বঙ সোনাব মত। সেইজন্যে বাজা তাব মাংস খেতে চেযেছেন। জাতকেব ইংবেজী অনুবাদক প্রদত্ত টীকা থেকে জানা যায যে চীন দেশেব লোকেরা বিশ্বাস কবত যে সোনা খেলে যতদিন শবীবেব মধ্যে সোনা থাকবে দেহ-ও ততদিন সোনাব মত বঙ ধবে বাখবে।

যমজপাপ—যে পাপ একা থাকে না, যেমন বাগ আব হিংসা।

নিত্য-অনিত্য—বৌদ্ধ মতে আকাশ আব নির্বাণ এই দুটি জিনিসই নিত্য, বাদবাকি সবই অনিত্য।

অপ্রমত্ত—অবিচলিত থাকা। যাবা প্রমত্ত অমধুব ও অপ্রিয জিনিস তাদেব কাছে লোভনীয মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ কবে।

অনুশাসিকা—যে সব সময সবাইকে সতর্ক হযে চলতে বলে।

বিড়াল জাতক—এই জাতকে শিযালেব কথা থাকলেও, শিযালেব কাজটিকে বিড়ালব্রত বলে চিহ্নিত কবা হচ্ছে।

হস্তিমঙ্গল—গজোৎসব। সুসজ্জিত হাতিব এক শোভাযাত্রা।